সাগরে মিলায় জল
দ্বিতীয় খণ্ড

ছায়া ঘনায়মান

॥ এক ॥

লড়াই চলছিল উস্ত-মেদ্‌ভেদিৎসা জেলা সদরের প্রবেশপথগুলো জুড়ে। গরমকালেব মরশুমী পথ ছেড়ে গ্রিগর যখন হেৎমান মোড়লের সদর রাস্তায় উঠল তখনই প্রথম ওর কানে এল চাপা বন্দুকের আওয়াজ।

সারা পথটিতে নজরে পড়েছে লালফৌজের তাড়াতাড়ি পেছু হটে যাওয়ার চিহ্ন। অসংখ্য পরিত্যক্ত ব্রিচ্‌কা গাড়ি, দু চাকার গাড়ি। একটা ছোট গ্রামের ওপাশে পাহাড়ী খাতের মধ্যে পড়েছিল একখানা কামান। গোলার ঘা খেয়ে তার চাকার ডাণ্ডাটা চুরমার, নল বেঁকে গেছে। কামানের সঙ্গে বাঁধা দড়িদড়া তেরছা করে পেঁচানো খাত থেকে আধ মাইল দূরে নোনা জলের বিলের মধ্যে রোদে-পোড়া মুড়ো ঘাসের ওপর পড়ে আছে সেপাইদের মৃতদেহ—কাপড়-চোপড়ে জড়ানো। খাকি কোর্তা আর পাৎলুন পরা, পায়ে পটি আর ভারী লোহার নাল-লাগানো জুতো। এরা সব লালফৌজের সেপাই, কসাক ঘোড়সওয়ারদের হাতে ধরা পড়ে তলোয়ারে কাটা পড়েছিল। ঘোড়ায় চেপে যেতে যেতে অনায়াসেই গ্রিগর সেটা আঁচ করতে পারল ওদের কোঁচকানো জামায় চাপ-চাপ শুকনো রক্ত আর লাশগুলোর ধরন দেখে। কাস্তে-কাটা ঘাসের মতো পড়ে আছে সব। কসাকরা এদের কাপড়চোপড় খুলে নেয়নি। হয়তো-বা একটানা পেছু তাড়া করে চলেছিল বলেই। একটা কাঁটা-ঝোপের কাছ ঘেঁষে পড়েছিল এক কসাকের মৃতদেহ। অনেকখানি ছড়ানো দুপায়ের ওপর লাল ডোরাগুলোকে কালচে দেখায়। খানিক দূরেই একটা পাতলা টাট্টু ঘোড়া পড়ে আছে। পিঠে সাবেকী ধরনের জিন আঁটা, বলটুগুলো গেরুয়া রং করা।

গ্রিগর আর প্রোখরের ঘোড়া ক্রমেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ওদের দানাপানি দেবার সময় হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মাত্র কদিন আগেই যেখানে লড়াই হয়ে গেছে সেখানে থামতে গ্রিগরের মন চাইছে না। আরো মাইলখানেক এগিয়ে চলে সে, তারপর একটা পাহাড়ী খাতের ভেতরে ঢুকে ঘোড়া রোখে। অল্প

দূরে দেখতে পায় একটা ডোবা। ডোবার ধারে বাঁধের গোড়া অবধি ধুয়ে ভেসে গেছে। ডোবার ধ্বসে-যাওয়া ফাটল-ধরা কিনারা অবধি ঘোড়া নিয়ে এসেছিল প্রোখর। কিন্তু আচমকা সে পেছু হটে এল।

গ্রিগর জিজ্ঞেস করে, কী ব্যাপার?

—এগিয়ে এস আরেকটু, দেখবে!

গ্রিগর ঘোড়া চালিয়ে যায় আলের ধারে। কাদার ওপর পড়ে আছে একটি স্ত্রীলোকের মৃতদেহ। নীল ঘাগরার নিচের প্রান্তটা দিয়ে মুখ ঢাকা। পুষ্ট ফর্সা পা দুটো, রোদ-পোড়া জঙ্ঘা, হাটুর কাছে টোল খাওয়া। লজ্জাহীন আর বীভৎসভাবে দুদিকে ফাঁক হয়ে আছে। বাঁ হাতখানা পিঠের দিকে মোচড়ানো।

তাড়াতাড়ি ঘোড়া থেকে নেমে গ্রিগর মাথার টুপিটা খোলে। মাথা নিচু করে মরা মেয়েমানুষটির ঘাগরা টেনে শরীর ঢেকে দেয়। মৃত্যুর পরেও লাবণ্যময় ঢলঢলে মুখখানা সুশ্রী দেখাচ্ছে। ব্যথায় কোঁচকানো ভুরু দুটোর নিচে আধবোজা চোখ সামান্য চিকমিক করে। কোমল রেখায় আঁকা ঠোঁট জোড়ার ফাঁকে মুক্তার মতো ঝিলিক দেয় শক্ত করে চেপে থাকা দাঁতগুলো। ঘাসের ওপর চাপা গালটায় সরু একগাছি চুল এসে পড়েছে। মরণ এসে এমনিতেই সে গালে অস্পষ্ট একটা জাফরান-হলদে ছোপ বুলিয়ে দিয়েছিল, এখন সেখানে পিঁপড়ে আনাগোনা করছে।

প্রোখর নিচু গলায় বললে, কুত্তার বাচ্চাগুলো এমন সোনার চাঁদটিকেও শেষ করেছে!—পুরো এক মিনিট চুপ করে থেকে সে সজোরে থুতু ছুঁড়ে বলল:

—ইচ্ছে করে এই সব…এইসব নোংরা বজ্জাতগুলোকে দেয়ালের ধারে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারি! চল, আর নয়, যিশুর দোহাই! আর তাকাতে পারছি না। পেটের নাড়ি ঠেলে আসছে।

গ্রিগর বলে, একে কবর দেয়া দরকার মনে করছ না?

—কেন বাবা, যত মড়া নজরে পড়বে সবই আমাদের সৎকার করতে হবে?—প্রোখর আপত্তি করে—এই তো কতগুলো বুড়ো হাবড়াকে ইয়াগদ্‌নয়েতে গোর দিয়ে এলাম, এখন আবার এই মেয়েছেলেটা……এদের সবাইকে মাটিতে পুঁততে গেলে হাতে যে কড়া পড়ে যাবে। আর কবর খুঁড়বই বা কী দিয়ে? সে তো ভাই তরোয়ালের কাজ নয়। মাটি এখন যা গরম, দু ফুট নিচে অবধি পুড়ে ইঁট হয়ে গেছে।

আর একদণ্ডও তিষ্ঠোবার ইচ্ছে নেই প্রোখরের। তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে রেকাবে বুটের ডগা আটকে গেল ওর।

আবার উতবাইয়ের পথে ঘোড়া চালিয়েছে দুজন। প্রোখর এতক্ষণ নিবিষ্ট মনে কী যেন ভাবছিল, এবার গ্রিগরকে জিজ্ঞেস করলে:

—তোমার কী মনে হয় পান্তালিয়েভিচ? রক্ত-গঙ্গা তো কিছু কম বহাইনি আমরা, কি বল?

—তা তো বটেই!

—কিন্তু তোমার কী মনে হয়। তাড়াতাড়ি খতম হয়ে যাবে লড়াই?

—ওরা যখন আমাদের একেবারে সাবাড় করবে তখন শেষ হবে।

—আচ্ছাই আপদ ডেকে এনেছি আমরা যাহোক! শয়তানের পোয়াবারো! হয়ত আমাদের যত তাড়াতাড়ি শেষ করে ততই মঙ্গল। জার্মান যুদ্ধের আমলে নিজেই নিজের আঙুল গুলি করে উড়িয়ে লড়াই থেকে ছুটি পেয়েছি। আর এখন যদি গোটা হাতখানাই উড়িয়ে দাও তবু তোমায় জোর করে খাটাবে। যারা পঙ্গু, চলতে ফিরতে পারে না, অন্ধ, তাদেরও চাই; যাদের পিলে ফেটে গেল, যত রাজ্যের আবর্জনা, তাদেরও নিতে হবে যতক্ষণ অবধি দু পায়ে খাড়া থাকতে পারে! এইভাবে কি কখনো লড়াই শেষ করা যাবে? জাহান্নমে যাক ওদের সবাই!—হতাশার স্বর প্রোখরের কথায়। রাস্তা থেকে সরে গিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে ও নিচু গলায় কী যেন বিড়বিড় করে বলে আর ঘোড়ার জিনের পেটি খুলতে থাকে।

সন্ধ্যের পর ওরা উস্ত-মেদ্‌ভেদিৎসারই কাছাকাছি একটা পল্লীতে এসে হাজির হল। তিন নম্বর রেজিমেন্টের একদল পাহারাদার সেপাইকে বসানো হয়েছিল গ্রামের সীমানায়। তারা গ্রিগরদের প্রথমে রুখেছিল, কিন্তু গলার আওয়াজ শুনে নিজেদের ডিভিশন-সেনাপতিকে চিনে ফেলল। কসাকরা জানাল এই গ্রামেই নাকি ডিভিশনের সদর ঘাঁটি, আর ওদের প্রধান সহকারী সেনাপতি ক্যাপ্টেন কপিলভ তারই অপেক্ষায় প্রহর গুনছে। সেপাই ঘাঁটির বাচাল জমাদারটি গ্রিগরের সঙ্গে একজন কসাককে দিলে ওকে সদর দপ্তরে নিয়ে যাবার জন্য, তারপর ফের বললে:

—গ্রিগর পান্তালিয়েভিচ্, ওরা বড় জোরদার ঘাঁটি আঁকড়ে বসেছে, বেশ কিছুদিনের মধ্যে উস্ত্-মেদ্‌ভেদিৎসায় ঢুকব তেমন তো মনে হয় না। তারপর অবিশ্যি কী হবে ভগবানই জানেন।...আমাদের তো সেপাই যথেষ্টই আছে। ব্রিটিশ সেপাইরাও নাকি মরোজভ্‌স্কি থেকে আসছে। তেমন কিছু শুনেছেন নাকি?

—না।—ঘোড়াকে গুঁতো দিয়ে গ্রিগর জবাব দিলে।

সেনাপতিরা যে বাড়িটায় উঠেছিল তার জানলার খড়খড়িগুলো শক্ত করে বেঁধে আটকানো। গ্রিগর প্রথমটা ভেবেছিল ঘরে কেউ নেই, কিন্তু গলি-বারান্দায় ঢুকতেই ওর কানে এল চাপা, উত্তেজিত কথাবার্তা। এতক্ষণ অন্ধকারের পর এখন বড় ঘরটার মধ্যে ঢুকে ছাদ থেকে ঝোলানো প্রকাণ্ড

বাতির আলোয় গ্রিগরের চোখ ধাঁধিয়ে যায়। ওর নাকে একটা ঝাঁঝালো তামাকের গন্ধ ভক করে এসে ঠেকে।

কপিলভ খুশী হয়ে বলে—ওঃ শেষ পর্যন্ত এলে তুমি তাহলে!—টেবিলের ওপাশে নীল ধোঁয়ার কুণ্ডলী ঠেলে আচমকা ভেসে ওঠে ওর চেহারাটা—তোমার আশায় অনেকক্ষণ বসে আছি ভাই!

গ্রিগর সবাইকে নমস্কার জানায়। টুপি আর জোব্বাকোট খুলে টেবিলের দিকে এগোয়।

—এ যে ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার করেছ জায়গাটা! দম নেবার জো নেই! একটা ছোট জানালা অন্তত খুলে দাও!—ভ্রূকুটি করে বলে গ্রিগর।

কপিলভের পাশে বসেছিল খারলাম্পি ইয়েরমাকভ। সে হেসে পাল্টা জবাব দিলে:

—কিন্তু আমাদের নাক সয়ে গেছে, খেয়ালই হয়নি কারুর।—কনুই দিয়ে একটা শার্সি ঠেলে খড়খড়ি তুলে দিলে ও।

ঘরের ভেতর রাতের তাজা হাওয়া এসে ঢোকে। বাতির শিখাটা একবার দপ করে উঠেই নিবে যায়।

—বাঃ! বেশ ব্যবস্থাটি করলে যাহোক! কেন খামোখা জানালাটা খুলতে গেলে?—টেবিল হাতড়াতে হাতড়াতে বিরক্তির স্বরে কপিলভ বললে, কারুর কাছে দেশলাই হবে? সাবধান, ম্যাপটার ঠিক পাশেই কালির দোয়াত রয়েছে।

ওরা বাতি জ্বালিয়ে জানলার ফুটোটা ঢেকে দিলে। তারপর কপিলভ চটপট বোঝাতে শুরু করলে:

—আপাতত, বুঝলে কমরেড মেলেখফ, লড়াইয়ের অবস্থাটা হচ্ছে এই রকম: লালফৌজ উস্ত-মেদ্‌ভেদিৎসা দখল করে তিন দিকে ঘিরে রেখেছে, ওদের ফৌজে প্রায় চার হাজার সঙিনধারী সেপাই। ওদের কামান আর মেশিনগানেরও কিছু কমতি নেই। মঠবাড়ির চারপাশ দিয়ে পরিখা খুঁড়ছে, সেই সঙ্গে আরো অনেক জায়গায়। ডনের ধারের ঠিলাগুলো ওদের দখলে। আর ওদের ঘাঁটির কথা যদি বল তো সে কবজা করা একেবারে সাধ্যের বাইরে না হলেও ভয়ানক কঠিন তো বটেই। আমাদের তরফে সেনাপতি ফিট্‌জেলাউরভের ডিভিশনগুলো আর অফিসারদের দুটো ঝটিকা-বাহিনী ছাড়াও বোগাতিরিয়েভের ছ নম্বর ব্রিগেড আর আমাদের এক নম্বর ডিভিশন এসে পড়েছে। কিন্তু ডিভিশন পুরো জোরদার হয়নি এখনও। পদাতিক রেজিমেণ্টটার পাত্তা নেই, এখনো উস্ত্-খপেরস্ক-এর কাছাকাছি কোথাও রয়েছে। ঘোড়সওয়াররা অবশ্য সবাই এসে পড়েছে, তবে ফৌজের এখনও পুরো মদত পেতে ঢের দেরি।

চার নম্বর রেজিমেণ্টের সেনাপতি কর্নেল দুদারিয়েভ বললে—যেমন ধর না, আমার রেজিমেণ্টে তিন নম্বর স্কোয়াড্রনের সেপাই হল গিয়ে মাত্র আটত্রিশজন কসাক।

ইয়েরমাকভ প্রশ্ন করলে, গোড়ায় কতজন ছিল?

—নিরানব্বই।

—স্কোয়াড্রন ভেঙে দিতে গেলে কোন্ আক্কেলে? কী দরের কমাণ্ডার হে তুমি?—টেবিলে আঙুল বাজিয়ে ভ্রূকুটি করে বললে গ্রিগর।

—আরে ওদের আটকে রাখবে সে সাধ্যি কার? ওরা সব গাঁয়ের ভেতর ছড়িয়ে পড়ল, পরিবারের লোকদের দেখতে চলে গেল যে-যার মতো। কিন্তু সবাই আবার গড়াতে গড়াতে ফিরে আসবে দেখো। আজই তো তিনজন ফিরেছে।

কপিলভ মানচিত্রটা ঠেলে দেয় গ্রিগরের দিকে। তর্জনি দিয়ে দেখিয়ে দেয় ফৌজের অবস্থান। তারপর বলতে থাকে:

—আমরা এখন অবধি হামলা শুরু করিনি। কাল দু'নম্বর রেজিমেণ্টটা পায়ে হেঁটে এই এলাকার ওপর চড়াও হয়েছিল, তবে কোনো সুবিধে করতে পারেনি।

—খুব ক্ষতি হয়েছে কি?

—রেজিমেণ্টের কমাণ্ডারের রিপোর্টে যা বলেছে তাতে কাল তাঁর ছাব্বিশজন সেপাই মরেছে কিংবা জখম হয়েছে। এবার ফৌজের অবস্থাটা তুলনা করে দেখ। সংখ্যার দিক দিয়ে আমরা বেশী আছি, কিন্তু পদাতিক ফৌজের আক্রমণকে মদত দেবার মতো যথেষ্ট মেশিনগান আমাদের নেই, গোলাগুলি সরবরাহের ব্যাপারেও আমাদের অবস্থা মোটেই সুবিধের নয়। আমাদের রসদ বিভাগের কর্তা বলেছেন হাতে এলেই চারশো গোলা আর দেড় লাখ কার্তুজ দেবেন। কিন্তু সেও সেই হাতে এলে! অথচ আমাদের হামলা করতে হবে কালই, সেনাপতি ফিট্জেলাউরভ সেই রকমই হুকুম দিয়েছেন। তাঁর মতে আমাদের উচিত ঝটিকা-ফৌজীদলের সাহায্যের জন্য একটা গোটা রেজিমেণ্ট লাগানো। কাল ওরা চারবার হামলা করেছিল, ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছিল বিস্তর। লড়াই করেছে বাঘের মতো সে কথা আমি বলবই। যাক্, এখন ফিট্জেলাউরভ বলছেন আমরা যেন বাহিনীর ডান প্রান্তটাকে জোরদার করি আর এখানে এই অংশে আক্রমণ সরিয়ে আনি। দেখতে পাচ্ছ? এখানকার জমিটা এমন যে শত্রুর লাইনের প্রায় সাতশো থেকে হাজার ফুটের কাছাকাছি এসে পড়া যায়। এখন ব্যাপার হয়েছে তাঁর সহকারী এইমাত্র ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। তোমাকে আর আমাকে এই মৌখিক খবরটুকু দিতে এসেছিল যাতে আমরা কাল সকাল ছটার সময় জেনারেল ফিটজেলাউরভের দপ্তরে

যাই। সকলে যাতে সমঝোতা করে কাজ করে তার জন্য সেখানে সভা হবে। তিনি আর তাঁর সহকারীরা এখন বলশয় শেনিন গাঁয়ে আছেন। আমাদের কাজ হল এই মুহূর্তে শত্রুদের মেরে ফিরিয়ে দেওয়া—সেবেব্রিয়াকোভো স্টেশন থেকে ওঁর নতুন ফৌজ এসে পড়ার আগেই। ডনের ওপারে আমাদের সেপাইরা খুব একটা তৎপরতা দেখাচ্ছে না। …………চার নম্বর ডিভিশনটা খপার ডিঙিয়ে গেছে। কিন্তু লালফৌজ জবরদস্ত বাহিনী পাঠিয়ে রুখছে। রেলের রাস্তাগুলো গোয়ারের মতো আঁকড়ে আছে। কিন্তু এর মধ্যে ওরা ডনের ওপর একটা ভাসানো পুল ফেলে উস্ত-মেদ্‌ভেদিৎসা থেকে ওদের রসদপত্র আর মজুত সেপাইদের যত তাড়াতাড়ি পারে পার করিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

—কসাকরা বলছে মিত্রপক্ষই নাকি বাদ সাধছে। সত্যি নাকি?

—গুজব তো শুনতে পাচ্ছি অনেকগুলো ইংরেজ গোলন্দাজ ফৌজ আর ট্যাঙ্ক নাকি চেরনিশেভ্‌স্কি থেকে এগিয়ে আসছে। কিন্তু প্রশ্ন হল এ-সব ট্যাঙ্ক ডন পার হবে কি করে? আমার মতে ট্যাঙ্কের ব্যাপারটা নেহাতই গুজব। এ ধরনের গালগল্প আমরা অনেক কাল হল শুনছি।…

ঘরের মধ্যে একটানা নীরবতা।

কপিলভ তার বাদামী অফিসার-উর্দির বোতাম খুলে হাতের তেলোয় ফুলো ফুলো গালটা রেখে অনেকক্ষণ ধরে কী ভাবতে থাকে আর পুড়ে শেষ হয়ে যাওয়া একটা সিগারেট চুষতে থাকে। ক্লান্তিতে আধবোজা হয়ে আসে গোল গোল কালো চোখ দুটো। বিনিদ্র রাতের কালিমা পড়ে সুন্দর চেহারাটা তার খারাপ হয়ে গেছে।

এক সময় এ-ভদ্রলোক ছিল দিবাবিভাগীয় এক গির্জা স্কুলের শিক্ষক, কিন্তু রোববারে দিনগুলোয় জেলার ব্যবসাদারদের বাড়িতে তার নেমন্তন্ন থাকত। ছোটখাটো বাজি রেখে তাস পিটতে হত ব্যবসাদারদের আর তাদের বউদের সঙ্গে। গিটার সে ভালোই বাজাত। বেশ ফূর্তিবাজ মিশুক তরুণ ছিল। তারপর বিয়ে করলে এক তরুণী শিক্ষিকাকে। জেলা সদরেই হয়তো বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিত, পেনশন-সহ অবসর পাওয়া অবধি কাজও করে যেত নিঃসন্দেহে, কিন্তু মহাযুদ্ধের সময় ডাক পড়ল তার লড়াইয়ে। যুঙ্কারদের জঙ্গী কলেজে সামরিক শিক্ষার পর তাকে একটা কসাক রেজিমেন্টের সঙ্গে রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দেওয়া হল। যুদ্ধে তার চেহারা বা চরিত্রের কোনো পরিবর্তন হয়নি। গোলগাল বেঁটেখাটো দেহ, ভালোমানুষ গোছের মুখখানা, তলোয়ার ধরার কায়দা আর অধস্তন কর্মচারীদের সঙ্গে তার কথাবার্তার মধ্যে কিছু একটা ছিল যা একান্ত নিরীহ আর নিতান্তই অ-সামরিক। সৈন্যদের মতো কড়া হুকুমের সুর তার গলায় নেই; অফিসারের উর্দি পরত চটের থলির মতো; তিন বছর রণাঙ্গনে কাটিয়েও জঙ্গী মেজাজ আর

ফিটফাট দুরন্ত ভাবটা তার আয়ত্ত হল না। চেহারা দেখলে মনে হত যেন নেহাতই খাপছাড়া-ভাবে যুদ্ধে এসে পড়েছে। খাঁটি অফিসারের চেয়ে বরং অফিসারের পোশাক-পরা একজন মোটাসোটা শহুরে ভদ্রলোকের সঙ্গেই তার সাদৃশ্যটা ছিল বেশী। তবু কসাকরা তাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করত যথেষ্ট। সেনাপতিদের সভায় তার বক্তব্যও মন দিয়ে শুনত। বিদ্রোহী ফৌজের নায়করা তার ধীরস্থির বিচারবুদ্ধি, অনাড়ম্বর চরিত্র আর আত্মঘোষণাবর্জিত সাহসের যথেষ্ট কদর করতেন। শেষোক্ত গুণটির পরিচয় যুদ্ধক্ষেত্রে অনেকবারই মিলেছে।

গ্রিগরের প্রাক্তন সহকারী সেনাপতিমণ্ডলীর প্রধান ছিল অশিক্ষিত গণ্ডমূর্খ ফৌজদার ক্রুঝিলিন। চিরা নদীর কাছে এক লড়াইয়ে ক্রুঝিলিন মারা পড়ে। তারপর কপিলভ দপ্তরের ভার নিয়ে বেশ বিচক্ষণতার সঙ্গে নিজের কর্তব্য পালন করে যেতে লাগল। একসময় যেভাবে ছাত্রদের ক্লাশের খাতা সংশোধন করত সেইভাবেই সহকারীদের সঙ্গে বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অভিযানের পরিকল্পনা করত সে। আবার দরকার পড়লে গ্রিগরের মুখের একটি কথাতেই সহকারীদের নিজেদের দায়িত্বে ছেড়ে দিয়ে ঘোড়ায় চেপে কোনো রেজিমেন্টের ভার নিয়ে ছুটে যেত লড়াইয়ে।

নতুন সহকারী-প্রধানের ওপর গোড়ায় তেমন আস্থা ছিল না গ্রিগরের। কিন্তু মাস কয়েকের মধ্যেই ওকে আরো ভালো করে চিনে নিল সে। একদিন একটা লড়াইয়ের পর সরাসরিই বললে

—কপিলভ, তোমার ওপর আমার আগে মোটেই ভরসা ছিল না, কিন্তু এখন দেখছি আমিই ভুল করছিলাম, তাই বলি কি, তুমি ওসব গ্রাহ্যির মধ্যে এনো না।

কপিলভ হাসল। কোনো জবাব দিল না। কিন্তু গ্রিগর এভাবে হাপলার মতো খোলাখুলি স্বীকার করার ফলে সে যে খুব খুশী হয়েছে তা বেশ বোঝা গেল।

যশের কাঙাল ও একেবারেই নয়, কোনো বাঁধাধরা রাজনৈতিক মতামতও ওর নেই। যুদ্ধের সম্পর্কে ওর ধারণা এটা একটা অবশ্যপ্রয়োজনীয় পাপ, খুব তাড়াতাড়ি যে শেষ হবে এমন ভরসা ও করে না। এখন তাই উস্ত্-মেদভেদিৎসা দখলের কী উপায় করা দরকার তা নিয়ে সে মাথা ঘামাচ্ছে না, বরং ফৌজের সেপাইদের পাঠিয়ে দিচ্ছে নিজেদের দেশ গাঁয়ে। ওর ধারণা মাসখানেক কি হপ্তা-ছয়েকের ছুটিতে ওদের একবার বাড়ি দৌড়ে আসা মন্দ নয় ··· ।

গ্রিগর অনেকক্ষণ কপিলভের দিকে চেয়ে থেকে শেষ অবধি উঠে দাঁড়ায়।

—দেখুন মশাইরা নিজেদের আস্তানায় ফিরে গিয়ে বরং ঘুমোনো যাক এখন। এখানে বসে উস্ত্-মেদভেদিৎসা দখলের জন্য মাথা ঘামিয়ে কোনো লাভ

নেই। জেনারেলরাই ভেবেচিন্তে একটা হিল্লে করবেন। কাল আমি ঘোড়ায় চেপে ফিট্জেলাউরভের কাছে যাচ্ছি; আমাদের উনি জ্ঞান বুদ্ধি দান করুন, কী আর করবেন! কিন্তু দুনম্বর রেজিমেণ্ট সম্পর্কে আমার নিজের যা ধারণা তা হল আমাদের হাতে এখনো কিছুটা কর্তৃত্ব রয়েছে। আমার মনে হয় রেজিমেণ্টের কমাণ্ডার দুদারিয়েভ্‌কে নিচু পদে নামিয়ে দেওয়াই ভালো—তার পদমর্যাদা আর উপাধি কেড়ে নেওয়া হোক……

—সেই সঙ্গে তার পরিজের খোরাকিটাও!—ইয়েরমাকভ বাগড়া দিলে।

—না, ঠাট্টা নয়—গ্রিগর বলেই চললে—আজকেই তাকে স্কোয়াড্রন কমাণ্ডারের পদে নামিয়ে দেওয়া উচিত, আর খাবলাম্‌পিকে পাঠানো উচিত রেজিমেণ্টের কমাণ্ডার করে। ইয়েরমাকভ, তুমি এই মুহূর্তে চলে যাও; রেজিমেণ্টের ভাব নিয়ে কাল সকালে আমাদের নির্দেশের জন্য অপেক্ষা কোরো। কপিলভ এখুনি দুদারিয়েভের পদাবনতির হুকুমনামাটা লিখে দিচ্ছে। সেটা নিয়ে তুমি যেতে পার। দুদারিয়েভের দ্বারা কখনো রেজিমেণ্ট চালানো চলবে না। ওব একেবারে আক্কেল নেই—আমার ভয় হয় ওর জন্য কসাকদের ওপর নতুন একচোট হামলা না হয়। আপনারা তো জানেন পদাতিক সেপাইদের লড়াই কী জিনিস……। কমাণ্ডারের কাজ যদি কমাণ্ডারই না বোঝে তো সেপাইদের জানেব ঝক্কি নেওয়া এমন কিছু কঠিন কাজ নয়।

. —সে কথা ঠিক। আমিও দুদারিয়েভকে সরিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী—। —গ্রিগরকে সমর্থন করলে কপিলভ।

ইয়েরমাকভের মুখে একটা অসন্তোষেব ভাব লক্ষ্য করে গ্রিগর জিজ্ঞেস করলে—কী হে ইয়েরমাকভ, তোমার মত নেই নাকি?

, কই. না। আমি তো কিছু বলিনি। এখন একটু ভুরুও উঁচোতে পারব না নাকি?

—সেও ভালো। ইয়েরমাকভের অমত নেই। আপাতত ওর ঘোড়সওয়ার রেজিমেণ্টের ভার নেবে রীয়াবচিকভ। কপিলভ হুকুমটা লিখে ফেল তো, তারপর ভোর অবধি একটু ঘুমিয়ে নাও। ছটার সময় উঠো। আমরা গিয়ে এই জেনারেলটির সঙ্গে মোলাকাত করে আসি। সঙ্গে চারজন আরদালি নেব আমি।

কপিলভ অবাক হয়ে ভুরু উঁচোয়:

—অতজনকে নিয়ে তোমার দরকার কি?

—এই ভড়ং দেখানো আর কি।

তা ছাড়া আমরা এখন চুনোপুঁটিও কিছু নই, একটা গোটা ডিভিশনের কর্তা!—গ্রিগর হেসে কাঁধজোড়া উঁচু করে, তারপর পিঠে জোব্বাকোটটা চাপিয়ে দরজার দিকে এগোয়।

একটা চালাঘরের ছাঞ্চির নিচে শুয়ে পড়েছে গ্রিগর। গায়ে ঘোড়ার কম্বল চাপিয়ে। বুট আর জোব্বাকোটটাও খোলেনি। আরদালিরা অনেকক্ষণ থেকে উঠোনে হৈ-চৈ করছে। কাছেই কোথায় যেন ঘোড়াগুলো নাক ঝাড়ছে আর একতালে জাবর কেটে চলেছে। টাটকা গোবর-ঘুঁটে আর সেই সঙ্গে সারাদিনের গরমের পর এখনো পুরো ঠাণ্ডা-না-হওয়া মাটির সোঁদা গন্ধ। তন্দ্রার মধ্যে গ্রিগরের কানে আসে আরদালিদের গলার আওয়াজ, হাসি। শুনতে পায় ওদের ভেতর ক'জন ঘোড়ায় জিন আঁটতে আঁটতে লম্বা হাঁফ ছেড়ে বলছে :

—আরে ভাই, হাল্লাক হয়ে গেলুম। এই রাত দুপুর, এখন যেতে হবে কিনা ঘোড়ায় চেপে। আমাদের কপালে ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই...... আবে থির হযে দাঁড়া শয়তান। খুব তোল্। পাউঁচু কর্ বলছি'— গলার স্বরে বোঝা যায় বয়েস কম।

আরেকজন চাপা, ভাবী বসা গলায় আস্তে আস্তে বললে :

—সেপাইগিরি কবে কবে তো জান কাবার হয়ে গেল, ভালো ভালো সব ঘোড়া নষ্ট হতে বসেছে.....।—এবপব গলার আওয়াজে মিনতির ভাব ফুটে ওঠে লোকটাব, তাড়াতাড়ি বলে, ওরে একটু তামাক দে না, নেশা কার। বাঃ বেশ দোস্ত যা হোক। বেলিয়াভিনে থাকতে একজোড়া লালফৌজী বুট দিযেছিলাম, ভুলে গিযেছিস? ওবে হারামী, আর কেউ হলে ওই বুটের জন্য আমায চিবদিন মনে কবে রাখত, আর এখন একটু নেশা কবব বলে এক চিমটি তামাক অবধি বের করতে পারছি না তোর কাছ থেকে'

ঘোড়ার দাঁতেব ফাঁকে লাগামেব লোহাটা কিঁউকিড করছিল। লম্বা গভীর নিশ্বাস ছেড়ে সে চলতে শুরু কবল, শুকনো শক্ত পাথুরে মাটির ওপর খটখট করে উঠল নালেব আওয়াজ। গ্রিগর মনে মনে হাসে আর ভাবে—ওদের সবাব মুখে ওই এক কথা। সেপাইগিরি করে জান কাবার হয়ে গেল'—ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়ে গ্রিগর। চোখে ঘুম নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে একটা স্বপ্ন দেখে, এ স্বপ্ন সে আগেও বহুবার দেখেছে; ...বাদামী মাঠ-ক্ষেতেব ওপাশে যেন উঁচু-উঁচু মুড়ো ঘাস ডিঙিয়ে সারে সারে এগিয়ে আসছে লালফৌজী সেপাই। দৃষ্টি যতদূব পৌছোয় ততদূব অবধি ছড়িয়ে রয়েছে প্রথম দলটা। তারই পেছন পেছন আবো ছ-সাতটা দল। চাপা স্তব্ধতার মধ্যে লোকগুলো ক্রমেই এগিয়ে আসতে থাকে। খুদে খুদে কালো মূর্তিগুলো ক্রমেই আকাবে বড়ো হয়ে ওঠে, এবার গ্রিগর যেন দেখতে পায় ওরা দ্রুতবেগে হুমড়ি খেতে খেতে ছুটে আসছে। আসছে, আসছে, একেবারে বন্দুকের পাল্লার মধ্যে এসে পড়ল, রাইফেল উঁচিয়ে কান-ঢাকা কাপড়ের হেলমেট মাথায়, নিঃশব্দে হাঁ করে রয়েছে মুখগুলো। গ্রিগর একটা

অগভীর পরিখার মধ্যে শুয়ে উত্তেজনাভরে রাইফেলের ঘোড়া টিপে মুহুর্মুহু গুলি চালিয়ে যাচ্ছে। ওর গুলি লেগে লালফৌজী সেপাইরা সিধে মাটির দিকে মাথা নিচু করে উল্টে পড়ে। ঘরার মধ্যে একপ্রস্থ তাজা কার্তুজ পুরলে গ্রিগর, তারপর মুহূর্তের জন্য এপাশ ওপাশ চাইতেই ওর নজরে পড়ল কসাকরা পরিখা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে পেছন দিকে ছুট দিচ্ছে, ভয়ে সকলের মুখ পাংশু। বুকটা যেন ভয়ানক ঢিপঢিপ করছে টের পায় ও; চেঁচিয়ে ওঠে: বন্দুক চালাও! এই শুয়োরগুলো! কোথায় চললে সব? থামো, ভাগো মৎ!—তারস্বরে চেচায় বটে কিন্তু গলার স্বর ভয়ঙ্কর দুবল, প্রায় শোনাই যায় না। ভয়ে কাঠ হয়ে যায় ও। সেও লাফিয়ে ওঠে এবার, দাঁড়িয়ে থেকেই শেষবারের মতো একবার গুলি চালায় রোগা বুড়োটে একজন লালফৌজী সেপাইয়ের দিকে—লোকটা নিঃশব্দে ওর দিকেই দৌড়ে আসছিল। গ্রিগর দেখলে তাক ফসকে গেছে। লোকটার মুখখানা ভয়ানক গম্ভীর, শঙ্কার চিহ্নও নেই তাতে। দৌড়াচ্ছে হালকা পায়ে, মাটিতে যেন পা পড়ছেই না, ভুরজোড়া কোঁচকানো, মাথার পেছনে টুপি, জোব্বাকোটের উঁচুতে তোলা কিনারা। নিমেষের জন্য গ্রিগর তাকায় এগিয়ে আসা দুশমনের দিকে, দ্যাখে চকচক করছে চোখজোড়া, ছোট ছোট কোঁকড়া কাঁচা দাড়িভরা ফ্যাকাশে গাল। দেখতে পায় বুটের খাটো আর চওড়া খোলটা, সমান্য টোল খাওয়া রাইফেলের নলের ছোট খোলটা, কালো মুখ আর তারই ওপরে তালে তালে দোল খেতে থাকা সঙিনের ফলা। একটা দুর্নিবার আতঙ্ক গ্রিগরকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলে। রাইফেলের বল্টু ধরে টানে কিন্তু বল্টু যেন নড়তেই চায় না কোথায় আটকে গেছে। মরিয়া হয়ে হাঁটু দিয়ে বল্টুটাকে ঠেলে কিন্তু কোনো ফল হয় না। এদিকে লালফৌজের লোকটা হাত পাঁচেকের মধ্যে এসে পড়েছে। গ্রিগর ঘুরে দৌড়োতে শুরু করে। সামনে গোটা মাঠখানা জুড়ে পলায়মান কসাকদের একেকটা দঙ্গল। পেছন থেকে শুনতে পায় পেছু তাড়া করে আসা লোকটার ঘন ঘন নিশ্বাসের শব্দ আর বুটের ফাঁকা খটখট আওয়াজ। কিন্তু এর চেয়ে বেশী জোরে তো আর ছুটতে পারে না ও। প্রাণপণে চেষ্টা করে দুবল জড়িয়ে আসা পা দুটোকে তাড়াতাড়ি চালাতে। অবশেষে একটা পোড়ো, অন্ধকার কবরখানায় এসে পৌছায়, ভাঙা পাঁচিল লাফিয়ে ডিঙিয়ে ছুটতে থাকে নিচু গত হয়ে যাওয়া কবরগুলোর মাঝখান দিয়ে, বাঁকা ক্রুশ আর ছোট ছোট বেদীর পাশ দিয়ে, আর একটু চেষ্টা করলেই নিরাপদ হওয়া যায়। কিন্তু ওর পেছনে পায়ের শব্দ এবার যেন জোরালো হয়ে উঠেছে, আরো জোরে শোনা যাচ্ছে আওয়াজ। পেছু তাড়া করে আসা লোকটার গরম নিশ্বাস ওর পিঠ পুড়িয়ে দিচ্ছে, আর ঠিক এমনি মুহূর্তে মনে হল ওর জোব্বাকোটের

কিনারা কে যেন টেনে ধরেছে। একটা বুক চাপা আর্তনাদ ঠেলে বেরুল ওর গলা দিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেল।

চিত হয়ে শুয়েছিল গ্রিগর। আঁটো বুটের ভেতর জোর করে ঢোকানো পা-দুটোয় সাড় নেই। বুক বেয়ে কালঘাম ছোটে, সারা শরীরটা বেদনা-জজর মনে হয়। ভাঙা গলায় বলে ওঠে—দুত্তোর!—নিজের গলার আওয়াজ শুনে আশ্বস্ত হয়, তবু যেন বিশ্বাস করতে পারে না এই মাত্র যা ঘটে গেল তা সবই স্বপ্নের মধ্যে। তারপর কাত হয়ে মাথা অবধি জোব্বাকোট মুড়ি দিয়ে ভাবতে থাকে আমার উচিত ছিল লোকটাকে কাছে আসতে দেয়া। তারপর তার তলোয়ারের ঘা এড়িয়ে সঙিনের খোঁচায় কাত করে ফেলে দিয়েই দৌড়ে পালানো যেত——।

গ্রিগর শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকে স্বপ্নের কথা। এই দ্বিতীয়বার সে দেখলে এ স্বপ্ন। তারপর ওর মনটা খুশিতে ভরে ওঠে এই কথা ভেবে যে নেহাতই একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছে সে। বাস্তবে আদৌ কোনো বিপদের সম্ভাবনাই নেই। ও ভাবতে থাকে—সত্যি সত্যি যা ঘটে তার দশগুণ সাংঘাতিক মনে হয় স্বপ্নের মধ্যে, এটাই বড়ো তাজ্জব। সারা জীবনে কোনোদিন এমন ভয়ঙ্কর অবস্থায় পড়েছি বলে মনে হয় না, চূড়ান্ত বিপদের মধ্যেও না।—ভাবতে-ভাবতেই ঘুম পেতে থাকে গ্রিগরের সোয়াস্তি-ভরে অসাড় পা দুটো টান টান করে ছড়িয়ে দেয়।

ভোরে ওকে ঘুম থেকে তোলে কপিলভ।

—ওঠো হে। তৈরি হয়ে নাও চটপট। ওখানে ঠিক ছটার সময় হাজির হবার হুকুম।

সহকারী প্রধান সেনাপতি সবে দাড়ি কামিয়ে, জুতো সাফ করে, ভাজ পড়া অথচ পরিষ্কার উর্দিখানা গায়ে চাপিয়েছে। তাড়াহুড়ো করে ক্ষুর দিয়ে দাড়ি কামাতে গিয়ে ফুলো গাল দুটো কেটে গিয়েছিল দু জায়গায়। তবে আগে যে জিনিসটা ওর আদপেই ছিল না, বেশ একটা হোমরা চোমরা ফিটফাট ভাব দেখা যাচ্ছে এখন।

গ্রিগর ওকে একবার বেশ করে খুঁটিয়ে দেখে মনে মনে ভাবল—বাঃ, বেড়ে দাঁড় করিয়েছে দেখছি চেহারাখানা। জেনারেলের সামনে যেমন তেমন হয়ে যেতে চায় না বুঝি।

গ্রিগরের মনের ভাবটা ধরতে পেরেই যেন কপিলভ বললে

—নোংরা-ফোংরা হয়ে না যাওয়াই ভালো। তোমাকেও বলি চেহারাটা একটু ঘষে মেজে নাও।

গ্রিগর আড়মোড়া ভেঙে বিড়বিড় করে বললে, আমি যেমন আছি

এমনই যাব! বলছ আমাদের ছটার সময় সেখানে হাজির থাকার হুকুম? তার মানে এর মধ্যেই তোমার আমার ওপর হুকুম চালাতে শুরু করেছে?

কপিলভ হেসে কাঁধ উঁচু করে।

—যেমন দিনকাল পড়েছে, হালচালই আলাদা! উনি হলেন আমাদের ওপরওলা, মেনে চলতেই হবে। ফিট্‌জেলাউরভ জেনারেল, উনি কি আর আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারেন।

—যা বলেছ। আগে তাঁরাই আসতেন, এখন আমাদের যেতে হয় তাঁদের কাছে।—বলতে বলতে গ্রিগর কুয়োর ধারে চলল হাতমুখ ধুতে।

বাড়ির গিন্নি ছুটে ঘরে ঢুকে একটা পরিষ্কার নকৃশা-তোলা তোয়ালে নিয়ে এল। গ্রিগরের হাতে দেবার সময় মাথাটা সে ঘনঘন নাড়ছিল। তোয়ালের কোণা দিয়ে জোরে রগড়ে রগড়ে ঘষে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিয়ে মুখ লাল করে তুলল গ্রিগর। কপিলভকে বললে:

—তুমি ঠিকই বলেছ। তবে জেনারেল মশাইদের মনে রাখা উচিত একটা কথা: বিপ্লবের পর মানুষ অনেক বদলে গেছে, বলা যেতে পারে তাদের নতুন জন্ম হয়েছে। কিন্তু অফিসাররা তাদের পুরোনো মাপকাঠিতেই সবকিছু মাপতে চান। অবিশ্যি তাঁদের মাপকাঠি এখন আর আস্ত নেই……। অফিসারদের হাত-পায়ের গিঁট সহজে খুলতে চায় না। ওঁদের ঘিলুতে খানিকটা তেল দেওয়া দরকার যাতে চলবার সময় অন্তত ক্যাঁচকোঁচ না করে।

কপিলভ আস্তিনের ওপর থেকে ফুঁ দিয়ে একটু ধুলো ঝেড়ে অন্যমনস্কভাবে জিজ্ঞেস করলে: কী বোঝাতে চাইছ?

—মানে ওদের ঠিক আগের মতোই চালচলন রয়ে গেছে কিনা। যেমন ধর সেই জার্মান যুদ্ধের আমল থেকেই আমি অফিসার, এখনও তাই রয়েছি। দেহের রক্ত খরচ করে আমার প্রাপ্য পেয়েছি। কিন্তু যখন অফিসারদের দঙ্গলের মধ্যে গিয়ে পড়ি তখন মনে হয় যেন ঘর ছেড়ে খালি পাতলুন পরে বরফের মাঠের মধ্যে দৌড়চ্ছি। এমন একটা বেদরদী ভাব ওদের যে শিরদাঁড়া অবধি আমার ঠাণ্ডা হয়ে যায়!—গ্রিগরেব চোখ দুটো যেন জ্বলতে থাকে। ওর নিজের অজ্ঞাতেই গলার স্বর উঁচু পর্দায় ওঠে।

কপিলভ একটু অখুশীভাবে ওর দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বলে:

—অতো জোবে নয়, আরদালিরা শুনতে পাবে।

গলার স্বর নামিয়ে গ্রিগর বলে চলে, কেন এমন হয় বলছ? হয় তার কারণ ওদের কাছে আমি একটি সাদা দাঁড়কাক। ওদের আছে হাত, আর আমার হাতে কড়া পড়ার দরুণ এটা হাত নয়, খুর! ওরা

শুধু পা ঘষে, আর আমি কি করলাম না-করলাম সবকিছুর উপর ঢু মেরে বসি। ওদের গায়ে সাবান-সেন্ট আর মেয়েমানুষী ক্রীম-পাউডারের খোশবাই আর আমার গায়ে ঘোড়ার পেচ্ছাব আর ঘামের দুর্গন্ধ। ওদের সবাই শিক্ষিত, এদিকে আমি গির্জা-স্কুলের চৌকাঠ ডিঙোতেই হিমসিম খেয়ে গেছি। ওদের কাছে আমি আগা-পাস্তলা অন্য মানুষ। ওরকমটা যে হয় তার কারণ এই। তারপর যখন ওদের ছেড়ে আসি তখন মনে হয় মুখের ওপর যেন মাকড়সার জাল লেগেছে: সারা শরীরটা সুড়সুড় করে আর বিশ্রী-রকম অসোয়াস্তি বোধ হয়, ফের পরিষ্কার হবার জন্য মনটা আঁকুপাকু করে। —কুয়োর পাড়ে তোয়ালেটা রাখল গ্রিগর, একটা ভাঙা চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ালে। রোদের তাতে পোড় খায়নি বলে কালচে মুখের ওপর ওর কপালটাকে দেখায় ফর্সা চকচকে।

এবার আরো আস্তে-আস্তে বলে, ওরা বুঝতে চায় না পুরনো সব কিছুই ভেঙে গুঁড়ো হয়ে ধুলোয় মিশে গেছে। ওদের ধারণা আমরা অন্য মাল-মসলায় তৈরি, অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ গোরুভেড়ার সামিল। ওরা ভাবে যুদ্ধবিদ্যার ব্যাপারটা আমরা বা আমাদের মতো লোকেরা ওদের চেয়ে কম বুঝি। কিন্তু লালফৌজের সেনাপতি কারা? বুদিয়নি কি অফিসার? যুদ্ধের আগে সে ছিল সাধারণ সার্জেন্ট, অথচ আমাদের সেনাপতিদের ঘোল খাইয়ে ছেড়েছে! ঝ্লোভা কি অফিসার? অথচ ওর হাতেই অফিসারদের রেজিমেন্টগুলো সাবাড় হয়ে গেছে। কসাক সেনাপতিদের মধ্যে গুসেল্শ্চিকফ একজন নামকরা সেনাপতি, তবু সে গেল শীতের সময় শুধু পাতলুন সম্বল করে ঘোড়ায় চেপে উস্ত-খপরেস্ক থেকে পিঠটান দিয়েছিল। ওকে ভাগিয়েছিল কে সে খবর রাখ? মস্কোর কোন্ এক তালা-কারিগর, লালফৌজের রেজিমেন্ট-সেনাপতি। বন্দীরা পরে ওর কথা খুব বলাবলি করত। এটাই পরিষ্কার করে বোঝা দরকার। আমাদের মুখ্খু-সুখ্খু অফিসারদের কথাই ধর না কেন। বিদ্রোহের সময় আমরা কি কসাকদের আনাড়ির মতো চালিয়েছি? জেনারেলরা আমাদের কতটুকু সাহায্য দিয়েছিল বল?

—সাহায্য তারা যথেষ্টই করেছিল।—কপিলভের কথাটা অর্থপূর্ণ মনে হয়।

—হ্যাঁ, তারা হয়তো কুদীনভকে সাহায্য করেছিল, কিন্তু আমাকে ওদের সাহায্য ছাড়াই চলতে হয়েছিল। কারুর পরামর্শের ধার না ধেরেই আমি লালফৌজকে হারিয়ে দিয়েছি।

তা হলই বা। সামরিক ব্যাপারে বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করা যায়—এ তুমি বিশ্বাস কর না?

—হ্যাঁ, তা বইকি। কিন্তু লড়াইয়ের ব্যাপারে সেইটেই আসল কথা নয়, ভাই।

—তাহলে আসল কথাটা কী পাস্তালিয়েভিচ ?

—যে আদর্শের জন্য লড়ছি সেইটে।

কপিলভ হেসে বলে, সে তো অন্য কথা।......সে প্রশ্নই ওঠে না...... এ যুদ্ধে আদর্শই হল বড় কথা। যে জানে কীসের জন্যে লড়ছে, নিজের আদর্শে বিশ্বাস যার আছে সেই যুদ্ধে জিতবে। আমাদের এই বুড়ো পৃথিবীর মতোই অনেক কালের পুরনো এই সত্য। এখন আর নতুন করে তাকে নিজের আবিষ্কার বলে চালিয়ে লাভ নেই। আমি বাবা সাবেকী, সাবেক কালের হালচালই আমার ভালো। যদি অবস্থা অন্যদিকে ফেরে তো এক পাও নড়ব না, কোনো কিছুর জন্য লড়বও না। আমাদের দিকে যারা আছে তারা তাদের পুরনো অধিকার বজায় রাখতে চায়, হাতিয়ারের জোরে বিদ্রোহীদের ঠাণ্ডা করতে চায়, ঠাণ্ডা-করনেওয়ালাদের দলে তুমি আছ, আমি আছি। তোমাকে আমি অনেকদিন ধরে বোঝবার চেষ্টা করছি গ্রিগর পান্তালিয়েভিচ, কিন্তু বুঝে উঠতে পারছি না।...

গ্রিগর পালটা জবাব দিলে, সে তুমি পরে বুঝবে। এখন চল। —চালাঘরের দিকে এগিয়ে চলল সে।

বাড়ির গিন্নী গ্রিগরের প্রত্যেকটা চালচলন লক্ষ্য করছিল। গ্রিগরকে খুশী করার জন্য সে বললে :

—একটু দুধ খাবে ?

—মা তোমায় ধন্যবাদ, কিন্তু এখন আর দুধ খাবার সময় নেই। পরে খাবো'খন।

একটা চালার কাছে দাঁড়িয়ে প্রোখর জাইকভ হাপুসহুপুস করে টক দুধের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছিল। গ্রিগরকে ঘোড়ার বাধন খুলতে দেখে ওর চোখের পলক পড়ে না। জামার হাতায় মুখ মুছে জিজ্ঞেস করে :

—অনেকটা দূর যাচ্ছ ? তোমার সঙ্গে আসব নাকি ?

গ্রিগরের গা জ্বলে ওঠে, বিরক্ত হয়ে বলে :

—ঘেয়ো কুত্তা, খেলা পেয়ে গেছ নাকি ? নিজের কাজ জান না ? ঘোড়াটাকে লাগাম কষানো হল কেন ? আমাকে ঘোড়া এনে দেবার কথা কার ? হতভাগা পেটুক। হরদম মুখ চালাচ্ছ, ক্ষান্তি নেই। চামচে ফেলে দে হতভাগা! শৃঙ্খলা-ট্রিঙ্খলা সব গেছে ? শোধরাবার বাইরে চলে গেছিস।

ঘোড়ার জিনে জুত করে বসতে বসতে প্রোখর কিছুটা আহত কণ্ঠে বলে—অমন খেপে উঠলে কেন ? যত খুশি গালিগালাজ কর বাপু, কোনো ফায়দা নেই। মাথার চুল তো পাকেনি তোমার হাজার হলেও। কোথাও যাবার আগে একটু দাঁতে কাটতেও পাব না ? অমন চেঁচাচ্ছ কেন বল তো ?

—তার মানে শুয়োরের বাচ্চা তোরাই আমায় পাগল করে ছাড়বি!

তুমি তো একটি অজমূর্খ!—অপমানসূচক কথাটি ফস করে বেরিয়ে এসেছে কপিলভের মুখ থেকে। সে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। কপিলভ জানে গ্রিগরের রাগলে কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। এই বুঝি ফেটে পড়ল, ভয় পেয়ে যায় সে। কিন্তু গ্রিগরের দিকে চট করে একবার নজর বুলিয়েই আশ্বস্ত হয় ও, জিনের ওপর হেলান দিয়ে বসে হাসছে গ্রিগর নিঃশব্দে, গালপাট্টার নীচে ঝকমকিয়ে উঠেছে হাসিভরা একসার দাঁতের পাটি। কপিলভ অবাক হয়ে যায় ওর বক্তৃতার এই ফলাফল দেখে। তাছাড়া গ্রিগরের হাসিটা এমন সংক্রামক যে ও নিজেও হো-হো করে হেসে ওঠে। বলে: এই দেখ! আর কোনো বুদ্ধিমান লোক হলে এতক্ষণে কেঁদেই ফেলত আর তুমি হি-হি করে হাসছ। বেয়াড়া নও তো কী?

—তাহলে তুমি আমায় অজমূর্খ বললে? চুলোয় যাও!—ওর হাসি থামতে গ্রিগর বলে—আমি তোমাদের ওসব আদব-কায়দা শিখতে চাই না। বলদ চরাবার সময় আদব-কায়দা আমার কী কাজে লাগবে? তবে ভগবান করুন যতোদিন বলদ দাবড়াতে হবে ততোদিন যদি বাঁচি, যেন বলদদের হাতে-পায়ে ধরে সাধতে না হয় 'ও বাবা বলদ, কথা শোনো। ওগো ছোট্ট সোনা, আমার মাথা খাও! দয়া করে ঘাড়ের ওপর জোয়ালটা পেতে দাও। ও বলদ মশাই আমার বিনীত অনুরোধ, বেচাল হয়ে অন্যদিকে যেয়ো না।' ওদের সঙ্গে কথা বলতে হয় আরো সিধে-সিধে—'ওঠ্ ওঠ্!' বলদরা 'থানান্তর' বলতে এইটুকুই বোঝে।

—'থানান্তর' নয় হে, 'স্থানান্তর'।—কপিলভ শুধরে দেয়।

—যা তোমার খুশী। কিন্তু একটা ব্যাপারে তোমার সঙ্গে একমত হতে পারছি না।

—কী সেটা?

—ওই যে বললে আমি অজমূর্খ। তোমার কাছে আমি গোমুখ্যু হতে পারি, কিন্তু দুদিন সবুর করো। সময় দাও, আমি লালদের দলে গিয়ে ভিড়ি, তারপর আমার ওজন বেড়ে যাবে কত দেখ। তখন তোমাদের মতো ধোপদুরস্ত ভদ্দরলোক আর লেখাপড়া জানা পরগাছারা যেন আমার হাতে না পড়ে। ভুঁড়ি চেনে ফাঁসিয়ে দেবো, সেই সঙ্গে তোমার আত্মারামটিকেও খাঁচাছাড়া করব।—খানিকটা তামাশা খানিকটা গাম্ভীর্যের সুরে বলে গ্রিগর। ঘোড়াকে খুঁচিয়ে জোর কদমে ছোটায় সে।

ডনপারের গ্রামগুলোতে এমন একটা অশরীরী নীরবতা ছড়িয়ে পড়েছে যে ক্ষীণতম প্রত্যেকটা শব্দই আলোড়ন তোলে, প্রতিধ্বনি জাগায়। স্তেপের প্রান্তরে শুধু ভাড়ুই আর তিতিরের ডাক, কিন্তু কাছাকাছি গ্রামগুলোতে সেই একটানা চাপা গুরুগুরু আওয়াজটা সব সময় লেগেই আছে যা কেবল বিরাট জঙ্গী বাহিনীর চলাফেরার সঙ্গেই শোনা যায়।

রাস্তার চাকার দাগের ওপর গোলাবারুদের গাড়ি আর বন্দুক-টানা মাল-গাড়ির চাকার খটখট শব্দ। ঘোড়াগুলো কুয়োর ধারে চিঁহি-চিঁহি ডাকছে। কৃষ্ণসাগরীয় পদাতিক কসাকদের ফৌজী কোম্পানি চলে যাবার সময় একটা চাপা হাল্কা শব্দ উঠছে। ব্রিচ্‌কা গাড়ি আর রণাঙ্গন-গামী রসদ গোলাবারুদ বোঝাই ওয়াগনগুলো ঘড়ঘড় করে ছুটছে; ফৌজী রসুইখানার আশেপাশে সেদ্ধ মকাইয়ের সুবাস, লরেল পাতায় জড়ানো টিন-মাংসের আর তাজা সেঁকা রুটির চমৎকার গন্ধ।

উস্ত্‌-মেদভেদিৎসার ঠিক ঘাঁটিতেই রাইফেল ছোঁড়া-ছুঁড়ি চলছিল দু'তরফে। মাঝে মাঝে কামানেরও মন্থর গম্ভীর আওয়াজ। লড়াই সবে শুরু হয়েছে।

জেনারেল ফিট্জেরাল্ড তখন প্রাতরাশ করছেন।

একজন বুড়ো-মতো নাকাল হয়ে-যাওয়া চেহারার হাবিলদার এসে রিপোর্ট করলে

এক নম্বর বিদ্রোহী ডিভিশনের কমাণ্ডার মেলেখভ আর তার ডিভিশনের প্রধান সহকারী কাপলভ এসেছেন।

—ওদের আমার ঘরে বসতে বল।—প্রকাণ্ড গিঁট-জাগান হাতটা দিয়ে ডিমের খোসা-বোঝাই প্লেটখানা একপাশে সরিয়ে ফিটজেরাল্ড ধীরে সুস্থে একগ্লাস চাটকা ভরে চুমুক দিতে লাগলেন। তারপর পরিপাটি করে কোলের কাপড়টা ভাঁজ করে টেবিল ছেড়ে উঠলেন।

অসাধারণ লম্বা, বয়সের ফলে ভারিক্কি আর ফোলা চেহারাটা এই বাঁকা-চোরা দরজা, চৌকাঠ আর ছোট ছোট মলিন জানলাওলা ক্ষুদ্র-পরিসর কসাক ঘরটার মধ্যে অবিশ্বাস্য রকম প্রকাণ্ড দেখায়। মোটা গলায় কেশে, নিখুঁত সাদা উঁচু কলারটা ঠিক করতে করতে জেনারেল সাহেব পাশের কামরায় ঢুকলেন, কপিলভ আর গ্রেগর উঠে দাঁড়াতে অল্প একটু ঝুঁকে ওদের নমস্কার জানালেন। ওদের সঙ্গে করমর্দন না করে ইশারায় টেবিলটা দেখিয়ে দিলেন।

হাত দিয়ে তলোয়ারটা স্থির রেখে গ্রিগর সাবধানে বসল একটা টুলের একেবারে কিনারায়, আড়চোখে তাকাল কপিলভের দিকে।

ফিট্জেরাল্ড প্রকাণ্ড ভারী দেহটা ছেড়ে দিলেন ভিয়েনীজ চেয়ারখানার ওপর, সেটা ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠল ওঁর ভারে, মোটা পা-দুটো গুটিয়ে বড় বড় হাত দুখানা রাখলেন হাঁটুর ওপর। তারপর গম্ভীর ভারী গলায় বললেন :

—দেখুন, আমি আপনাদের এখানে ডেকেছি কয়েকটা ব্যাপারে ফয়সালা করতে ...

বিদ্রোহীদের লড়াই শেষ হয়ে গেছে। স্বাধীন ফৌজীদল হিসাবে

আপনাদের বাহিনীর অস্তিত্ব আর থাকবে না। সত্যি বলতে কি ফৌজীদল আপনাদের আদপেই ছিল না। সব ধাপ্পা। ডন বাহিনীর সঙ্গে তাদের জুড়ে দিতে হবে। আমরা এবার পরিকল্পনা মাফিক আক্রমণ শুরু করব। এবার সেইটে আপনাদের বোঝবার সময় হয়েছে, তাছাড়া উচ্চতর কর্তৃপক্ষের হুকুম বিনাসর্তে আপনাদের মেনে নিতে হবে। এবার দয়া করে অন্তত এইটুকু বলুন আপনাদের পদাতিক রেজিমেণ্ট গতকাল কেন ঝটিকা-বাহিনীর আক্রমণে মত দেয়নি? আমার হুকুম সত্ত্বেও রেজিমেণ্ট হামলা করতে অস্বীকার করেছে কেন? আপনাদের তথা-কথিত ডিভিশনের কমাণ্ডারটি কে?

—আমি।—নিচু গলায় জবাব দিলে গ্রিগর।

—তা হলে দয়া করে প্রশ্নটার জবাব দিন।

—কাল অবধি আমি ডিভিশনে ফিরে আসতে পারিনি।

—তার আগে পর্যন্ত দয়া করে কোথায় ছিলেন, বলুন?

—বাড়ি গিয়েছিলাম দেখা করতে।

—সামরিক তৎপরতার সময় ডিভিশনের কমাণ্ডার গেছেন বাড়ি বেড়াতে। বেশ! ডিভিশন তো নয়, বাজে লোকের দঙ্গল! যা খুশি তাই করলেই হল, কোন মাথা-মুণ্ড নেই, জঘন্য ব্যাপার!—ছোট ঘরখানার মধ্যে জেনারেলের মোটা গলার আওয়াজ ক্রমেই চড়া হতে শুরু করেছিল। বাইরে সেনাপতির সহকারীরা পা টিপে-টিপে চলাফেরা করছে আর নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলছে। এ-ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে হাসছে। কপিলভের গালদুটো ক্রমেই ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে, কিন্তু গ্রিগর যতই জেনারেলের মুখের দিকে চায়, তার মাংসল হাতের মুঠোর দিকে তাকিয়ে থাকে, ততই টের পেতে থাকে যেন একটা অদম্য রাগ জেগে উঠছে ওর নিজের মনের মধ্যে।

ফিট্জেলাউরভ একটা অপ্রত্যাশিত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ান, চেয়ারের পেছন দিকটা চেপে ধরে গলা চড়িয়ে বলেন:

—আপনারা তো ফৌজ পরিচালনা করছেন না, চালাচ্ছেন একদল লাল রক্ষীকে। ওরা কসাক নয়, কতকগুলো ইতর জানোয়ার! দেখুন মেলেখফ মশাই, আপনার আর ডিভিশন চালাতে হবে না, আপনি বরং গরু চরান। আপনার উচিত ছিল জুতো সাফ করা! শুনতে পাচ্ছেন? হুকুম মানা হল না কেন? আপনারা কি মিটিং করছিলেন তখন? সাবধান! এখানে আমরা 'কমরেড'-টমরেড নই, ওসব বলশেভিক কায়দা চলবে না। চলতে দেব না আমরা!

—আমার সঙ্গে অমন চেঁচিয়ে কথা বলবেন না বলে দিচ্ছি। ভারী গলায় বলে গ্রিগর, পা দিয়ে টুলখানা পেছনে ঠেলে উঠে দাঁড়ায়।

ফিট্জেলাউরভ উত্তেজনায় হাঁপাতে হাঁপাতে টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে ভাঙা গলায় বললেন, —কী বললেন আপনি?

গ্রিগর এবার আরেকটু জোরে বললে, আমি বলছি আমার সঙ্গে এমন চেঁচিয়ে কথা বলবেন না। আপনি আমাদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন এইটে স্থির করবার জন্য যে···।—এক সেকেণ্ডের জন্য চুপ করে গ্রিগর। চোখ নামিয়ে নেয়। ফিট্‌জেলাউরভের হাতের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থেকে সে গলার স্বর একেবারে নামিয়ে এক রকম ফিস্‌ফিস্‌ করেই বলে—দেখুন জেনারেল সাহেব, যদি আমার গায়ে আপনার কড়ে আঙুলটিও ওঠে তাহলে এইখানেই আপনাকে আমি কোতল করব।

ঘরটা এমন নিস্তব্ধ যে ফিট্‌জেলাউরভের ঘন-ঘন নিশ্বাসের শব্দও পরিষ্কার শুনতে পাওয়া যায়। ঝাড়া এক মিনিট ধরে সবাই নিশ্চুপ। দরজাটা সামান্য কঁ্যাচ করে ওঠে। ফাঁক দিয়ে উঁকি দেয় একজন হাবিলদার। ভয় পেয়ে গেছে লোকটা। আবার সেইরকম সাবধানেই দরজাটা ভেজিয়ে দেয় সে। গ্রিগর তলোয়ারের বাঁটটা চেপে ধরে দাঁড়ায়। কপিলভের হাঁটু কাঁপছিল। দেয়ালের ওপর ঘুরছে ওর চোখদুটো। ফিট্‌জেলাউরভ চেয়ারের ওপর তাঁর দেহের সব ভার ছেড়ে দিয়ে ককিয়ে উঠলেন ভারী গম্ভীর গলায়। তারপর চড়া গলায় বললেন, বাঃ বেশ কাণ্ড যা-হোক।—গ্রিগরের দিকে না তাকিয়ে এবার বেশ নরম স্বরে তিনি বললেন—বসুন না! মেজাজ একটু চড়ে গিয়েছিল, এবার ঠিক হয়ে গেছে। এখন দয়া করে শুনুন। আমি হুকুম দিচ্ছি এই মুহূর্তে আপনারা গোটা ঘোড়-সওয়ার ফৌজ বদলি করে দিন...কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন।

গ্রিগর বসল। মুখের ওপর হঠাৎ ঘাম জেগে উঠেছে ওর। প্রচুর ঘাম মুছে ফেলল জামার আস্তিন দিয়ে।

—হ্যাঁ, যা বলছিলাম···। গোটা ঘোড়সওয়ার বাহিনীকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে দক্ষিণ-পুব রণাঙ্গণে। এখনই শুরু করতে হবে আক্রমণ। আপনাদের ডান প্রান্তে জঙ্গী কমাণ্ডার চুমাকফের দু-নম্বর ব্যাটেলিয়নের সঙ্গে সংযোগ হবে···।

গ্রিগর ক্লান্ত কণ্ঠে বলে—আমি ডিভিশন নিয়ে যাব না।—পকেট হাতড়ে রুমাল খোঁজে ও। নাতালিয়ার লেসের রুমালখানা দিয়ে আরেকবার কপালের ঘাম মুছে বলে—ডিভিশন নিয়ে আমি ওখানে যাচ্ছি না।

—কেন নয়?

—নতুন করে ফৌজ সাজাতে যথেষ্ট সময় লাগবে।

—তা নিয়ে তো আপনার মাথাব্যথা নেই। এ কাজের যা ফলাফল হবে তার দায়িত্ব আমার।

—কিন্তু মাথাব্যথা যে আমারই, শুধু আপনিই তো আর দায়ী হবেন না।

—তাহলে আমার হুকুম মানতে অস্বীকার করছেন আপনি?—ভাঙা গলায় ফিট্‌জেলাউরভ বললেন জোর করে নিজেকে সামলে রেখে।
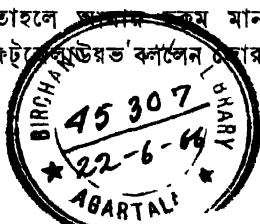
—হ্যাঁ।

—তা যদি হয় তাহলে দয়া করে এই মুহূর্তে ডিভিশনের ভার ছেড়ে দিন। এখন আমি বেশ বুঝতে পারছি কেন কাল হুকুম মানা হয়নি।···

—আপনি বরং তাই ভেবে আনন্দলাভ করুন। কিন্তু আমি ডিভিশনের ভার আপনার হাতে তুলে দেব না।

—তাহলে আমি কী বুঝব?

—ঠিক যা বললাম তাই।—অস্পষ্ট হাসি গ্রিগরের ঠোঁটের কোণে।

ফিট্জেলাউরভ গলা চড়িয়ে বললেন, আমি আপনাকে সেনাপতির পদ থেকে বরখাস্ত করছি!—কিন্তু গ্রিগর তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল।

—আমি আপনার কর্মচারী নই জেনারেল সাহেব।

—তাহলে কার কর্মচারী আপনি?

—আমি বিদ্রোহী ফৌজের কমাণ্ডার কুদীনভের কর্মচারী। কিন্তু আপনার মুখে এসব কথা শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি···অন্তত এই মুহূর্তে আপনি আর আমি পদমর্যাদায় কেউ কারুর কম নই। আপনার হাতে একটা ডিভিশন রয়েছে, আমার হাতেও একটা ডিভিশন। তাছাড়া আপাতত আপনার অত গলাবাজি না করলেও চলবে।···আমি যখন স্কোয়াড্রন কমাণ্ডারের পদে নেমে যাব, তখন আপনি যত খুশী চোট করবেন আমার ওপর। কিন্তু তখনও···

—নোংরা তর্জনীটা তুলে গ্রিগর হাসিমুখে অথচ আগুন-ঠিকরে-পড়া চোখে শেষ কথাগুলো বললে:

—তখনও আপনার গলাবাজি আমি মেনে নেব না।

ফিট্জেলাউরভ উঠে জামার আট কলারটা ঠিকমতো বসিয়ে সামান্য একটু ঝুঁকে বললেন:

—আর আমাদের আলোচনার কিছু নেই। আপনাদের যা খুশী করুন! আমি অবিলম্বে ফৌজের সদর দপ্তরে আপনার আচরণ সম্পর্কে রিপোর্ট করছি। আর আমি একথাও জানিয়ে দিচ্ছি যে এ সবের ফল পেতে বেশী দেরি হবে না। আমাদের সামরিক আদালত আজকাল অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে কাজ করে থাকে।

কপিলভের হতাশাভরা চোখের দিকে একটুও নজর না দিয়ে গ্রিগর মাথায় টুপিটা বসিয়ে দরজার দিকে এগোয়। চৌকাঠের কাছে থমকে দাঁড়িয়ে বলে:

—আপনার যেখানে খুশী রিপোর্ট করতে পারেন, কিন্তু আমাকে ভয় দেখাতে আপনি পারবেন না। আমি ভীতু ধরনের লোক নই।···আর আপাতত আমাকে ঘাঁটাতে না আসাই আপনার পক্ষে ভালো।··· —এক মুহূর্ত কী ভেবে নিয়ে ফের সে বলে—কারণ সেক্ষেত্রে হয়তো-বা

আমার কসাকরা আপনাকে বেশ একটু নরম-গরম দিযে দিতে পারে।...
লাথি মেরে দরজা খুলে তলোযারটা খটাং খটাং করে ও লম্বা পা ফেলে এগিযে যায বারান্দার দিকে।

সিঁড়ির ওপর ওকে এসে ধরে কপিলভ উত্তেজিত অবস্থায। হতাশভাবে হাত দুটো মোচড়াতে মোচড়াতে ফিসফিস করে বলে তুমি পাগল হযে গেছ পাস্তালিয়েভিচ।—গ্রিগর চাবুকটা হাতের মধ্যে চেপে ধরে তারস্বরে হাঁক দেয: ঘোড়া কোথায?

প্রোখর সিঁড়ির কাছে ছুটে আসে পাগলের মতো।

গ্রিগর ঘোড়া ছুটিযে ফটক পেরুবার সময পেছন ফিরে চায। তিনজন আরদালি ফিট্‌জেলাউরভকে ঘিরে লম্ফঝম্প করছে ওকে ঠেলে তুলতে চেষ্টা করছে প্রকাণ্ড উঁচু ঘোড়াটার জিনের ওপর।

গ্রিগর আর কপিলভ প্রায আধ মাইল রাস্তা এগিযে আসে নীরবে। কপিলভ মুখ বুজে আছে, কারণ ও জানে গ্রিগরের এখন আলাপে উৎসাহ নেই, আর তাছাড়া এ সমযটা ওর সঙ্গে তর্কাতর্কি করাও বিপজ্জনক। শেষ পর্যন্ত গ্রিগরই চুপ করে থাকতে পারলে না।

তীক্ষ্ণ গলায বললে, অমন চুপ করে আছ যে বড? আমার সঙ্গে এসেছিলে কেন? সাক্ষী দাড়াবার জন্য? তুমি কিছুই বলোনি তাই বোঝাবার মতলব

—কিন্তু যাই বলো ভাই, বেশ কাণ্ড দেখালে তুমি।

—আর উনি বুঝি কিছুই করেননি?

—আমি মেনে নিচ্ছি ওরও দোষ ছিল। যেভাবে উনি কথা বলছিলেন তোমার সঙ্গে সে সত্যিই অতি বিশ্রী।

—আদৌ কথা বলেছেন কিনা আমাদের সঙ্গে সেইটেই সন্দেহ। ঘোড়া থেকে এমন হাকডাক করতে লাগলেন যেন কেউ তার পশ্চাদ্দেশে ছুঁচ ফুটিযে দিযেছে।

—কিন্তু যাই বল, তুমিও একটা দেখালে বটে। সিনিযর অফিসারের সঙ্গে বেযাদবি মানে লড়াই চলার সময।

—সে কিছুই নয। কেবল দুঃখের কথা এই যে গাযে হাত তুলতে চেষ্টা করেনি। তাহলে ওঁর কপালের ওপর তলোযারের অ্যাযসা ঘা বসাতাম যে মাথার খুলি চৌচির হযে যেত।

ঘোড়ার গতি কমিযে দিযে কপিলভ অসন্তুষ্টভাবে বলল, এখন যা মনে হচ্ছে এসবের ফল কিছু সুবিধার হবে না। লক্ষণ দেখে মনে হয ওরা এবার শক্ত হাতে শেকল ধরবে, তাই খুব সাবধান বলে দিচ্ছি।

ঘোড়া দুটো পাশাপাশি হাঁটছে আর নাক ঝেড়ে মাছি তাড়াচ্ছে লেজ দিযে। গ্রিগর কৌতুকভরা চোখে একবার কপিলভের দিকে তাকিযে বলল

—তা অমন ফুলবাবুটি সাজতে গিয়েছিলে কেন? বুঝি মনে ভেবেছিলে তোমায় উনি চা খেতে দেবেন? ওঁর সুন্দর হাতখানা দিয়ে তোমাকে ধরে নিয়ে বসাবেন টেবিলের ধারে? দাড়ি কামিয়েছ, উর্দি সাফ করেছ, জুতো পালিশ করেছ ····তোমাকে রুমালে থুতু দিয়ে হাঁটুর ময়লা ঘষে উঠাতেও দেখেছিলাম।

কপিলভ লাল হয়ে ওঠে, ওসব ছাড়ান দাও।

গ্রিগর উপহাস করে বলে, তোমার সব পরিশ্রম বৃথা হল। শুধু চা দেয়নি তাই নয়, হাতটিও বাড়িয়ে দেননি একবারও।

—তুমি থাকতে সে-আশাই আমি করিনি।—কপিলভ তাড়াতাড়ি বিড়বিড় করে বলে। তারপর চোখদুটো কুঁচকে আনন্দে আর বিস্ময়ে বলে উঠে ওই দ্যাখো! আমাদের লোক তো নয় ওরা। মিত্রপক্ষের লোক।

একটা সরু গলি ধরে ছ'টা খচ্চর আসছিল একখানা ব্রিটিশ কামান টানতে টানতে। পাশে ঘোড়া চালিয়ে আসছে একজন ইংরেজ অফিসার। পাটকিলে-রঙ বেড়ে ঘোড়া। সামনে যে খচ্চরটা, তার পিঠেও ব্রিটিশ উর্দি-পরা একজন সওয়ার, কিন্তু তার টুপির নিচের ওপর রুশ অফিসারের তকমা, লেফ্‌টেন্যান্টের পদবচিহ্ন পরা।

নিচু থেকে বেশ কয়েক গজ দূরে থাকতেই অফিসারটি শোলার টুপির ডগায় দু'আঙুল ছুঁয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে ইশারায় ওকে রাস্তা ছেড়ে দিতে বলল। রাস্তা এত সরু যে একেবারে পাশের পাথরের দেয়াল ঘেঁষে ঘোড়াগুলোকে না চালালে চলাই অসম্ভব।

গ্রিগরের গালের পেশী কুঁচকে ওঠে। দাঁতে দাঁত চেপে সে সোজা ঘোড়া চালিয়ে নিয়ে যায় অফিসারটির দিকে। লোকটা অবাক হয়ে ভুরু উঁচিয়ে একটুখানি সরে দাঁড়ায়। ওরা বেশ কষ্টেসৃষ্টে রাস্তা পেরোতে থাকে। তা সত্ত্বেও ইংরেজটিকে তার সাদা চামড়ার পটিওয়ালা ডান-পাখানাকে তুলে ধরতে হয় ঘোড়ার চমৎকার পালিশ করা চক্‌চকে কোমর বরাবর।

গোলন্দাজ দলের একজন—রুশ অফিসারই হবে লোকটা—ক্রুদ্ধভাবে গ্রিগরের আপাদমস্তক তাকিয়ে দেখে।

—ওহে, তুমি তো সরে দাঁড়াতে পারতে! এখানেও গোঁয়ার্তুমি জাহির করার দরকার কি ছিল এত?—ফোঁড়ন কাটল লোকটা।

—বেটা কুত্তীর বাচ্চা, মুখ বুজে ঘোড়া চালা! নয়তো তোকেও সরাব!—খানিকটা গলা চড়িয়ে গ্রিগর জবাব দিলে।

অফিসার এবার জিনের ওপর সিধে হয়ে বসে ওদের দিকে ফিরে চঁচালে·

—ধরুন তো মশাই বদমায়েসটাকে!

ওদের দেখিয়ে-দেখিয়ে চাবুক নাচাতে নাচাতে গ্রিগর এগল হাঁটার চালে

ঘোড়া চালিয়ে। গোলন্দাজ সেপাইরা সবাই ছেলে-ছোকরা, এখনো গোঁপ গজায়নি কারুর। ধুলোমাখা ক্লান্ত চেহারা সকলের। ওরা সবিদ্বেষে তাকায় বটে কিন্তু কেউই আর ওকে ঠেকাতে চেষ্টা করে না। ছটা কামান নিয়ে গোলন্দাজরা যখন একটা বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল, কপিলভ ঠোঁট কামড়ে ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে এল গ্রিগরের পাশাপাশি।

—তুমি এমন হাঁদার মতো করছ কেন গ্রিগর পান্তালিয়েভিচ! এসব কী ছেলেমানুষী হচ্ছে!

গ্রিগর পালটা জবাব দিলে, কেন হে, তুমি আমার গুরুমশাই হলে নাকি?

কপিলভ কাঁধ উঁচু করে বললে, বিট্‌জেলাউবভের সঙ্গে তোমার ঝগড়ার তবু একটা মানে বুঝি। কিন্তু ওই ইংরেজ ভদ্রলোক তোমার কী ক্ষতি করেছে? ওর টুপিখানা বুঝি তোমার ভালো লাগেনি?

—উস্ত-মেদ্‌ভেদিৎসার এত কাছে ও জিনিস আমার চোখে তত ভালো ঠেকেনি। অন্য কোথাও পরলে পারত। ...যখন দুটো কুকুরে কামড়া-কামড়ি করে তখন আর কোনো কুকুর মাথা গলাতে আসে না, বুঝতে পেরেছ?

—ওহো! তাহলে তুমি বিদেশীদের মাথা গলানো পছন্দ কর না? কিন্তু আমার মনে হয় কেও যখন তোমার টুঁটি টিপে ধরে তখন যে কোনো সাহায্যই মন্দের ভালো।

—ভালো তোমার কাছেই থাক, কিন্তু আমি আমার দেশের মাটিতে ওদের পা ঠেকাতে দেব না।

—চীনারা যে লাল সেপাইদের হয়ে লড়ছে তা দেখেছ?

—তাতে কি হল?

—ব্যাপারটা কি একই রকম হল না? সেও তো সেই বিদেশী সাহায্যই।

—তার সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। চীনারা স্বেচ্ছায় লালদের মদত দিচ্ছে।

—আর এদের বুঝি সব জোর করে আনা হয়েছে এখানে?

কী জবাব দেবে জানে না গ্রিগর। অনেকটা রাস্তা সে নীরবে চলে। খালি ভাবে, কিন্তু স্বস্তি পায় না। শেষে বলেই ফেলে। গলার স্বরে চাপা থাকে না মনের ক্ষোভ

—তোমরা শিক্ষিত মানুষরা সব অমনিধারাই কোনো উনিশ-বিশই তোমরা হতে দেবে না। আমি, ভাই, বুঝতে পারছি তোমার কথার কোনোখানে একটা ফাঁক আছে, কিন্তু ঠিক কীভাবে তোমায় ঘায়েল করব তা জানি না। যাক, ছাড়ান দাও এসব। আমাকে আর প্যাঁচে ফেলো না, তোমার সাহায্য ছাড়াই এর মধ্যে অনেক ঝামেলা বাধিয়ে ফেলেছি।

কপিলভ বিরক্ত হয়ে মুখ বুজে থাকে। বাদবাকি রাস্তাটুকু কেউ একটি

কথাও বলে না। শুধু একবার প্রোখর দারুণ কৌতূহলের বশে ঘোড়া চালিয়ে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে :

—গ্রিগর পান্তালিয়েভিচ···দেখুন হুজুর · আচ্ছা, ওই যে জানোয়ারটাকে ক্যাডেটরা কামানের সঙ্গে জুতে নিয়ে যাচ্ছিল ওটা কী জন্তু? গাধার মতো কান, অথচ বাদবাকি সব এমনি ঘোড়ার মতো। জানোয়ারটাকে আমার মোটেই বরদাস্ত হচ্ছিল না। ওগুলো আবার কোন্ শয়তান? বলবেন দয়া করে? মানে আমরা আবার এটার ওপর বাজি ধরেছি কিনা···

ঝাড়া পাঁচ মিনিট ধরে ওদের পেছনে-পেছনে এল প্রোখর কিন্তু কোনো জবাব পেল না। শেষ অবধি পেছিয়ে পড়ে দলের আর সব আরদালিরা এগিয়ে আসতে ওদের চাপা গলায় বললে :

—ওরা ভাই একটি কথাও বলছেন না, বেশ বোঝা যাচ্ছে ওঁরা নিজেরাই অবাক হয়ে গেছেন—ভেবে পাচ্ছেন না কীভাবে এই নোংরা চীজটা এসে জুটল দিন দুপুরে।

কসাক ফৌজী কোম্পানি চতুর্থবার মাথা তুলেছিল অগভীর পরিখাগুলোর ভেতর থেকে। কিন্তু লালফৌজের মারাত্মক মেশিনগানের মুখে এবারও মাটিতে আশ্রয় নিলে তারা। সেই ভোর সকাল থেকে নদীর বাঁ দিকে জঙ্গলের [illegible] লুকিয়ে-থাকা লালফৌজী গোলন্দাজরা একটানা কসাক ঘাঁটিগুলোর ওপর গোলাবর্ষণ করে চলেছে। গোলা পড়ছে উপত্যকায় জড়ো-হওয়া মজুত সেপাইদের ওপরেও।

কামানের গোলার পাতলা ধোঁয়া দুধের মতো সাদা হয়ে ডনপারের টিলা ছেয়ে ওপরে উঠছে। কসাক গড়খাইয়ের ভাঙা লাইনগুলোর সামনে পেছনে বাদামী ধুলো উড়িয়েছে বুলেট।

দুপুরের দিকে লড়াই হয়ে উঠে জোরালো। ডনের পারে খানিকটা দূর অবধি কামানের শব্দ ছুটে যায় পশ্চিমা বাতাসে ভর করে।

বিদ্রোহী গোলন্দাজদের তদারকী ঘাঁটি থেকে গ্রিগর যুদ্ধের গতি লক্ষ্য করছিল দূরবীন দিয়ে—ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও অফিসারদের কোম্পানিগুলো একটানা এগিয়েই চলেছে একেবারে খানিকটা করে সামনে ছুটে গিয়ে। গুলিগোলা জোরালো হতেই ওরা শুয়ে পড়ে মাটিতে মাথা গোঁজে, আবার খানিকটা করে দৌড়ে গিয়ে নতুন জায়গায় হাজির হয়। কিন্তু আরো বাঁয়ের দিকে মঠের তরফে বিদ্রোহী পদাতিকদের কোনো তৎপরতাই নজরে আসে না। গ্রিগর ইয়েরমাকভ্‌কে একটা চিঠি পাঠায় পত্রবাহকের মারফত।

এক ঘণ্টা বাদে উত্তেজিতভাবে ছুটতে ছুটতে আসে ইয়েরমাকভ। কামান ঘাঁটির পাশে ঘোড়া থেকে নেমে হাঁফাতে হাঁফাতে এগিয়ে যায় তদারকী ঘাঁটির পরিখার দিকে। বেশ খানিকটা দূরে থাকতেই সে হাত নেড়ে চেঁচিয়ে বলতে থাকে, কিছুতেই কসাকদের নড়াতে পারছি না! ওরা এগুবেই না! এর

মধ্যে আমাদের তেইশজন লোক খতম, কোনোকালে তারা ছিল বলেই মনে হয় না। লালফৌজ কেমন মেশিনগান দিয়ে কাত করে দিল ওদের দেখেছ ?

—ওদিকে অফিসারেরা এগিয়ে যাচ্ছে আর তুমি বলছ তোমার সেপাইদের খাড়া করে তুলতে পারছ না ? দাঁত চেপে চেপে বলে গ্রিগর।

—কিন্তু তুমি তাকিয়ে দ্যাখো। ওদের পল্টনদের প্রত্যেকের একটা করে হাত-মেশিনগান, কার্তুজে ঠাসা। কিন্তু আমাদের কী আছে ?

—রাখো, আর কৈফিয়ত দিতে হবে না। এখুনি ওদের এগিয়ে নিয়ে যাও, নয়তো তোমার খুলি উড়িয়ে দেব।

ইয়েরমাকভ ভয়ানক মুখ খিস্তি ক'রে টিলা থেকে ছুটে নামতে শুরু করে। পেছন পেছন যায় গ্রিগর। দু'নম্বর পদাতিক রেজিমেণ্টটাকে ও নিজেই হামলায় লাগাবে ঠিক করেছে।

ফৌজের পাশের কামানটাকে সুকৌশলে কাঁটাঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। কাছাকাছি আসতে গোলন্দাজ কমাণ্ডার গ্রিগরকে থামাল।

—গ্রিগর পান্তালিয়েভিচ, একবারটি এসে ব্রিটিশের কলাকৌশল তারিফ করে যাও। এখুনি পুলের ওপর গোলা ছুঁড়তে শুরু করা হবে। চল, টিলার মাথায় গিয়ে উঠি।

সরু ফিতের মতো ভাসানো পুলটা দূরবীনে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল—লালফৌজ ডনের ওপর পেতেছে ওটাকে। ওপর দিয়ে একটানা স্রোতের মতো মালগাড়ি পার হচ্ছে।

একটা পাথুরে খাতের ওপাশে নিচু জায়গায় বসিয়ে রাখা ব্রিটিশ কামান থেকে মিনিট দশেক বাদে গোলা ছোঁড়া আরম্ভ হল। চতুর্থ গোলাটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলের মাঝখানটা উড়ে গেল। মালগাড়ির সার দাঁড়িয়ে পড়ে। লালফৌজের লোকরা তাড়াতাড়ি ভাঙা ব্রিচকাগাড়ি আর মরা ঘোড়াগুলোকে নদীতে ফেলে দিতে শুরু করে।

ডান তীর থেকে মিস্ত্রি সেপাই বোঝাই চারটে বজরা রওনা দিয়েছিল। কিন্তু ওরা পুলের ভাঙা তক্তা সরে মেরামত করেছে এমন সময় আবার এক পশলা গোলা গিয়ে পড়ল ব্রিটিশ কামান থেকে। একটা গোলার ঘায়ে বাঁ পাড়ের সিঁড়িখানা শূন্যে ছিটকে উঠল। আরেকটা গোলা পুলের ঠিক পাশেই একটা সবুজ জলের স্তম্ভ তুললে। মালগাড়ির সার দাঁড়িয়ে গেল আবার।

গ্রিগরের গোলন্দাজ কমাণ্ডার তারিফের সুরে বললে—কুত্তার বাচ্চাগুলো কিন্তু নিশানা করে একেবারে অব্যর্থ। এখন আর সন্ধ্যে অবধি নদী পার হবার কোনো সুযোগ ওরা পাবে না। ও পুল এক মিনিটও আস্ত থাকবে না।

চোখ থেকে দুরবীন না সরিয়ে গ্রিগর বললে, কিন্তু তোমার কামান কেন চুপ করে আছে? পদাতিক সেপাইদের মদত দেয়া উচিত ছিল তোমার! লালফৌজের মেশিনগান-ঘাঁটিগুলো তো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছ।

—পারলে খুশী হতাম, কিন্তু হাতে যে একটা গোলাও নেই। শেষ গোলাটা প্রায় আধ ঘণ্টা হল ছেড়েছি। তারপর এখন উপোস।

—তাহলে এখানে পড়ে আছ কেন? তল্পিতল্পা গুটিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করে দাও।

—ক্যাডেটদের কাছে গোলা চেয়ে পাঠিয়েছি।

গ্রিগর সোজাসুজি জানিয়ে দেয়—ওরা তোমাদের গোলা দেবে না।

—একবার 'না' বলেছিল বটে, তবে আমি আবার চেয়েছি। এবার হয়তো ওদের কৃপা হবে। শুধু ওই মেশিনগানগুলো উড়িয়ে দেবার জন্য হয়তো ডজন দুই দিতেও পারে। তামাশা নয়, আমাদের তেইশটি লোককে মেরেছে। আরো কতজনকে সাবাড় করবে কে জানে? দেখ, কীভাবে চালিয়ে যাচ্ছে গুলি।

গ্রিগর কসাক পরিখাগুলোর দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেয়। কাছেই পাহাড়ের ঢালু গায়ে বুলেটের ঘা লেগে শুকনো মাটি ছিটকে উঠছে। যেখানেই মেশিনগানের গুলি সার বেঁধে এসে পড়ছে সেখানেই ধুলো উঠছে, যেন অদৃশ্য কেউ পরিখাগুলোর ওপর দিয়ে একটা গলন্ত ধুসর রেখা টেনে দিচ্ছে! কসাকদের গড়খাইগুলো যেন আগাগোড়াই ধোঁয়ায় ঢাকা, ওপরে ধুলোর মেঘ জমেছে।

গ্রিগরের নজর আর ব্রিটিশ কামানের গোলা ছোঁড়ার দিকে নয়! এক মিনিট ধরে কামান আর মেশিনগানের একটানা গর্জন শোনবার পর ও টিলা থেকে নিচে নেমে ইয়েরমাকভ্‌কে গিয়ে ধরলে।

—আমার হুকুম না পাওয়া পর্যন্ত হামলা করবে না। কামানের সাহায্য না পেলে আমরা ওদের কখনোই তাড়াব না।

—সেই কথাই তো বলছিলাম। উসখুস করতে-থাকা ঘোড়াটার পিঠে স্থির হয়ে বসে তিরস্কারের সুরে বললে ইয়েরমাকভ।

ইয়েরমাকভকে নির্ভয়ে গুলিগোলার ভেতর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে দেখে গ্রিগর উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবতে লাগল: এখন আবার সিধে রাস্তা ধরে ছুটল কেন? মেশিনগান চালিয়ে শেষ করে দেবে যে! খাতের মধ্যে ঢুকে পড়া উচিত ছিল ওর। তারপর নদীর ধার বরাবর ঘোড়া চালিয়ে পাহাড় ঘুরে আসতে পারত নিজের সেপাইদের কাছে।—ইয়েরমাকভ তখন প্রচণ্ড বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে খাতটার দিকে ছুটেছে। ভেতরে ঢুকে ওপাশ দিয়ে বেরুলো না সে। গ্রিগর স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে—যাক, তাহলে

বুঝতে পেরেছে! এখন ঠিক চলে যাবে।—টিলার পাশে শুয়ে পড়ে ও আস্তে-আস্তে একটা সিগারেট পাকিয়ে নিল।

একটা অদ্ভুত ঔদাসীন্য পেয়ে বসেছে যেন ওকে। না, মেশিনগানের গুলির মধ্যে আর কসাকদের ও বের করে নিয়ে যাবে না। কোনো মানে হয় না নেবার। অফিসারদের ঝটিকা ফৌজগুলোই বরং আক্রমণ চালাক। ওরাই দখল করুক ওস্ত্‌মেদ্‌ভেদিৎসা। টিলার ধারে শুয়ে এই প্রথম জীবনে ও সরাসরি লড়াই থেকে দূরে সরে রইল। ঠিক এই মুহূর্তে ওর এই মনোভাবের কারণ ভীরুতা নয়, মৃত্যুভয় নয়, এমনকি অনর্থক ক্ষয়-ক্ষতি হচ্ছে এ ধারণাও নয়। খানিক আগেও ও নিজের জানের পরোয়া করেনি, কিংবা ওর হেপাজতে কসাকদের প্রাণের জন্যও ওর মায়া ছিল না। কিন্তু এখন যেন কোথায় একটা তার ছিঁড়ে গেছে।···

আশে-পাশে যা কিছু ঘটছে তার বিপুল অর্থহীনতা আগে কোনোদিনও ওর কাছে এমন স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। হয়তো বা এই অপ্রত্যাশিত মনোভাবের কারণ কপিলভের সঙ্গে ওর কথাবার্তা, কিংবা ফিট্‌জেলাউরভের সঙ্গে সংঘর্ষ, অথবা দুটো ঘটনারই সংযোগফল। ব্যাপারটা যাই হোক, আর গুলিগোলার মধ্যে মাথা পেতে দেওয়া নয়। ওর মনে একটা অস্পষ্ট অনুভূতি জাগছে—বলশেভিকদের সঙ্গে কসাকদের সমঝোতা করিয়ে দেবার কাজ ওর নয়। ওর নিজেরই সমঝোতার সম্ভাবনা নেই, ওদের কথা তো আলাদা। কিন্তু ও বুঝতে পারছে—এই সব মানুষ যাদের মনমেজাজ আলাদা, ওর সঙ্গে যাদের বনে না, তাদের হয়ে লড়তে ও আর পারবে না, লড়বে না—এই সব ফিট্‌জেলাউরভের দল ওকে যেমন মনেপ্রাণে ঘৃণা করে, ওরও তেমনি প্রচণ্ড ঘৃণা ওদের ওপর। আবার সেই পুরনো দ্বন্দ্বটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে। ওরা লড়াই করুক। আমি সরে দাঁড়িয়ে কেবল দেখি। সেই ডিভিশনের ভার আমার হাতছাড়া হবে সঙ্গে সঙ্গে বলবে আমাকে পেছনে পাঠিয়ে দিতে। ঢের হয়েছে! —গ্রিগর ভাবে আর মনে মনে কপিলভের সঙ্গে ওর তর্কটাকে আবার জিইয়ে তোলে, লালফৌজের তরফে ও যুক্তি দেখাতে শুরু করে দেয়। —চীনারা তো লালফৌজের সঙ্গে যোগ দিয়েছে খালি হাতে। সামান্য সেপাইয়ের মাইনের জন্য ওরা ওদের দলে যোগ দিয়েছে আর জানের ঝুঁকি নিচ্ছে দিনের পর দিন। তাছাড়া ওই মাইনেয় ওদের হয়ই বা কী? কোন জিনিসটা কেনা যায় ও-কটি পয়সায়? একবার তাস খেলতেই তো ফতুর।······তাই ব্যাপারটা পয়সা রোজগারের নয়, অন্য কিছু। অথচ এদিকে তো মিত্রপক্ষ অফিসার পাঠাচ্ছে, ট্যাঙ্ক পাঠাচ্ছে, বন্দুক এমনকি খচ্চরও পাঠাচ্ছে। কিন্তু শেষমেস এসবের বদলে কড়ায় গণ্ডায় পাওনাটি বুঝে নেবে। তফাৎ এইখানে। হ্যাঁ, আজ সন্ধ্যায় আবার এই নিয়ে তর্ক

করতে হবে। দপ্তরে ফিরে গিয়ে ওকে একপাশে ডেকে নিয়ে বলব: কপিলভ একটা তফাৎ কিন্তু রয়েছে। আমাকে আর বোকা বানাতে পারছ না এবার।

কিন্তু নতুন করে তর্ক তোলা ওর কপালে বুঝি আর ছিল না। সেদিন বিকালেই কপিলভ চার নম্বর রেজিমেণ্টে চলে গেল—সে-রেজিমেণ্টটাকে রাখা হয়েছিল মজুত হিসাবে। পথে একটা উড়ো বুলেটের আঘাতে সে মারা পড়ল। গ্রিগর ওব মৃত্যুর খবর পেল দুদিন বাদে।

পরদিন সকালে জেনারেল ফিট্‌জেলাউরভের পরিচালনায় পাঁচ নম্বর ডিভিশন ঝটিকা আক্রমণে দখল করল উস্ত্‌মেদ্‌ভেদিৎসা।

॥ দুই ॥

গ্রিগর চলে যাবার দিন তিনেক বাদে মিংকা করশুনভ এসেছিল তাতারস্কে। ও শুধু একা নয়, ওর সঙ্গে ছিল পিটুনি ফৌজীদলের আরো দুজন সাথী। ওদের একজন বড়োসড়ো কালমিক, দ্বিতীয়জন ওচা খুদে কসাক। কালমিকটিকে মিংকা ঠাট্টা করে বলত "ইদিকে আয়" আর কসাক মাতাল বদমায়েশটিকে খাতির করে নাম দিয়েছিল সিলান্তি পেত্রোভিচ।

পিটুনি ফৌজে থেকে মিংকা বড়ো কম কাজ করেনি ডনবাহিনীর জন্য। শীতের সময় ওর পদোন্নতি ঘটল, প্রথমে সার্জেন্ট মেজর, পরে এন্সাইন। গ্রামে ফিরে এল রীতিমতো অফিসার-উর্দি হাঁকিয়ে। ডন পার হয়ে আসার সময় ওর দিনকাল যে মন্দ কাটেনি তা ওর চেহারাতেই বোঝা যায় চওড়া কাঁধের ওপর পাতলা খাকি উর্দি দিব্যি ফিটফাট হয়ে বসেছে, আঁটসাঁট খাড়া কলারের ওপর দিয়ে লালচে চামড়ার তেল চকচকে ভাজ দেখা যায়, নীল ডোরাদার পাতলুন এমনভাবে সেঁটে থাকে যেন পাছা বরাবর বুঝি বা ফেটেই যাবে। এই সব ঠাটবাট নিয়ে মিংকা হয়তো আতামানের দেহরক্ষী হতে পারত, প্রাসাদে বাস করে মহামান্য সম্রাটের পবিত্র বপু রক্ষা করতে পারত যদি না এই হতচ্ছাড়া বিপ্লবটা মুশকিল বাধাত। কিন্তু তাহলেও জীবন সম্পর্কে মিংকার অভিযোগ নেই। সে অফিসারের পদটা পেয়েছে গ্রিগর মেলেখফের মতো বিপদে মাথা গলিয়ে নয়, বা বেপরোয়া বীরত্ব দেখিয়ে নয়। পিটুনি ফৌজে কাজ করতে হলে আলাদা গুণ চাই। সেসব গুণ মিংকার যথেষ্টই ছিল। কাউকে বলশেভিক সন্দেহ করলে ও নিজেই তার ব্যবস্থা করে, অন্য কসাকদের ওপর ওর তেমন আস্থা নেই। বেইমানদের নিজের হাতে চাবুক হাঁকড়ে বা ডাণ্ডা চালিয়ে শাস্তি দিতে তার কোনো আপত্তি নেই। আর বন্দীদের জেরা সওয়াল করার ব্যাপারে গোটা ফৌজীদলের মধ্যে ওর জুড়ি নেই। কমাণ্ডার নিজেও কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বলে মশাইরা যে যাই বল, করশুনভকে পাল্লা দেয় সাধ্যি কার। ও তো মানুষ নয়, দানব।—আরেকটা গুণ ছিল মিংকার: যখন কোনো বন্দীকে গুলি করা ঠিক হবে না, অথচ তাকে ছেড়ে দেওয়াটাও কাম্য নয়, তখন তার শাস্তি বার্চগাছের ডাল দিয়ে চাবুক মারা—আর এই শাস্তি দেবার ভার পড়ত মিংকার ওপর। কাজটা এত ভালভাবে সারত সে যে পঞ্চাশ ঘা পড়ার পরই আসামী রক্ত বমি

শুরু করত, আর একশোটা ঘায়ের পর অন্য কসাকরা আসামীকে নির্বিবাদে থলিতে পুরে নিয়ে চলে যেত। একবার বুকে কানও পাতার দরকার হত না তাদের। একবার শাস্তি পেলে মিৎকার হাত থেকে জ্যান্ত ফিরে আসেনি কেউ। ও নিজেই অনেকবার হেসে-হেসে বলেছে : যতগুলো লাল সেপাইকে আমি চাবকে শেষ করেছি তাদের ছালচামড়া দিয়ে ঘাঘরা পাতলুন বানালে তা দিয়ে গোটা তাতারস্ক গাঁটাকে কাপড় পরানো যেত।

ছেলেবেলা থেকে মজ্জাগত মিৎকার এই নিষ্ঠুরতা পিটুনি ফৌজে ঢোকার ফলে শুধু যে অনুকূল আবহাওয়াই পেল তা নয়, কোনোরকম লাগাম না থাকায় তা আরো প্রবল হয়ে উঠল। ওর কাজের যা ধারা তাতে করে অফিসার শ্রেণীর যত সব তলানি, নেশাখোর, নারী-ধর্ষক, লুটেরা ও অন্যান্য আবর্জনার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই ওর সংযোগ ঘটল। আর লালরক্ষীদের ওপর ঘৃণার দরুন ও যেন ইচ্ছে করেই চাষীসুলভ খাটুনি খেটে ওদের কাছ থেকে যা কিছু শেখবার ছিল সব শিখে ফেলল। এমনকি গুরুদেরও ছাড়িয়ে যেতে তার তেমন কষ্ট হল না। যেখানে একজন দুর্বল-স্নায়ু অফিসার অন্য লোকের রক্ত দেখে, যন্ত্রণা দেখে আর এগোতে পারত না, সেখানে মিৎকা হলদে চকচকে চোখদুটো কুঁচকে শেষ অবধি কাজটা সেরে তবে ছাড়ত।

গ্রামে ফিরে এসে মহা মাতব্বরের মতো গদাইলস্করী চালে ও হেঁটে চলল বাড়ির দিকে, পথ-চলা মেয়েদের নমস্কারের অবধি জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি ও। আধ পোড়া ধোঁয়ায়-কালো ফটকটার সামনে ঘোড়া থেকে নেমে লাগাম ছেড়ে দিল কালমিকটার হাতে। তারপর পা-দুটো চাগিয়ে হাঁটতে হাঁটতে উঠোনের মধ্যে ঢুকল। সিলান্তির সঙ্গে নিঃশব্দে পায়চারি করতে লাগল বাড়ির ধ্বসা ভিতের ওপর দিয়ে। জানালার নীলচে-সবুজ কাঁচ আগুনে গলে গিয়ে গাদা হয়ে জমেছিল এক জায়গায়। চাবুকের বাঁট দিয়ে সেটা ছুঁয়ে মিৎকা ধরা গলায় বললে :

—পুড়িয়ে শেষ করেছে। অথচ এই বাড়ি ছিল একটা দেখবার মতো বাড়ি। গাঁয়ের সেরা। আমাদের গাঁয়েরই একজন লোক মিশকা কশেভয়, পুড়িয়েছে, আমার দাদুকেও খুন করেছে সে। বুঝলে সিলান্তি পেত্রোভিচ, আমার নিজের ঘর বাড়ি দেখতে হল আজ......। সিলান্তি উত্তেজিতভাবে জিজ্ঞেস করলে : কশেভয়দের কেউ বেঁচে আছে ?

—আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু তাদের পরে দেখা যাবে......এবার চল আমার তালুই মশাইয়ের কাছে। মেলেখফদের বাড়ির রাস্তায় বোগাতিরিয়েভের ছেলের বউয়ের সঙ্গে দেখা হতে মিৎকা জিজ্ঞেস করলে :

—ডনের ওপার থেকে আমার মা ফিরেছে ?

—এখনও ফিরেছে বলে তো মনে হয় না মিত্রি মিরোনিচ্।

—মেলেখফ বাড়িতে আছে নাকি ?

—বুড়ো মেলেখফ ?

—হ্যাঁ।

—সে বাড়িতে আছে। গ্রিগর ছাড়া গোটা পরিবারই তো রয়েছে। পিয়োত্রা মারা গিয়েছিল গত শীতের সময়, শোনোনি তুমি ?—মাথা নাড়ল মিৎকা। তারপর আস্তে আস্তে ঘোড়া চালিয়ে এগোতে থাকল। নির্জন রাস্তা ধরে চলতে চলতে ওর হলদে বেড়ালের মতো চোখজোড়া যেন শান্ত নিরুত্তেজ হয়েই রইল, এখুনি ওর মনের মধ্যে যে ঝড় বইছে তার কোনো চিহ্নই নেই সেখানে। মেলেখফদের বাড়ির আঙিনায় ঢুকে সঙ্গীদের কাউকে বিশেষভাবে উদ্দেশ না করে নিজের মনেই নিচু গলায় বলতে লাগল: এইভাবেই ঘরে ডেকে নেয় নিজের গাঁয়ের মানুষ! এরপর আবার আত্মীয়দের বাড়ি নেমন্তন্নে যেতে হবে……ঠিক আছে, আবার বোঝাপড়া করা যাবে।

একটা চালাবাড়ির নিচে বসে পান্তালিমন প্রকোফিয়েভিচ ফসল-তোলা কল মেরামত করছিল। একদল ঘোড়সওয়ার আর তার মধ্যে করশুনভকে চিনতে পেরে, সে এগিয়ে গেল ফটকের দিকে। ফটকের পাল্লা খুলে ধরে সে সবিনয়ে বললে

—আসতে আজ্ঞা হোক। অতিথিরা এলেন বলে বড় খুশী হলুম। সবাই ভেতরে আসুন।

—এই যে তালুইমশাই! সবাই বেঁচেবর্তে আছে তো ?

—মঙ্গল হোক, এখন অবধি তো সবাই ভালো। কিন্তু গায়ে কি অফিসারের উর্দিটাই থাকবে ?

—কেন আপনি কি ভেবেছিলেন একমাত্র আপনার ছেলেদেরই সাদা তকমা পরার এক্তিয়ার ?—বুড়োর দিকে লম্বা শিরা-ওঠা হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে আত্মতৃপ্তির স্বরে বললে মিৎকা।

পান্তালিমন প্রকোফিয়েভিচ হেসে জবাব দিলে: ওগুলো পাবার জন্য আমার ছেলেদের তেমন গরজ ছিল না।—তারপর সামনে এগিয়ে গিয়ে আগন্তুকদের দেখিয়ে দিতে লাগল কোথায় ঘোড়া বাঁধতে হবে।

অতিথিদের খেতে দেয় ইলিনিচ্‌না। তারপর শুরু হয় ওদের আলাপ। মিৎকা নিজের পরিবারের কথা জিজ্ঞেস করে, কিন্তু গম্ভীর হয়ে থাকে, মুখে রাগ বা দুঃখ প্রকাশ করে না। কথায় কথায় জিজ্ঞেস করে মিশা কশেভয়ের পরিবারের কেউ গ্রামে রয়ে গেছে কিনা। মিশার মা ও তার ছোট বাচ্চাগুলো বাড়িতেই আছে শুনে মিৎকা সিলান্তির দিকে চেয়ে অলক্ষ্যে চট করে চোখ টেপে।

অতিথিরা এবার যাবার জন্য তাড়া লাগায়। পান্তালিমন প্রকোফিয়েভিচ ওদের বিদায় দিতে গিয়ে বলে:

—কিছুদিন গাঁয়েই থাকবে ঠিক করেছ নাকি ?

—অ্যাঁ—হ্যাঁ, হয়তো দু-তিন দিন থাকব।

—মায়ের সঙ্গে দেখা করবে তো ?

—সে দেখা যাক কি হয়।

—এখন অনেকটা দূর যাচ্ছ ?

—হুম্‌ ...... যাই গাঁয়ের দু-একজনের সঙ্গে দেখা করে আসি শিগগিরই ফিরব।

* *

মিৎকা আর তার সঙ্গীরা মেলেখফদের বাড়ি ফিরে আসার আগেই গাঁয়ে খবর রটে গিয়েছিল কবশুনভ কালমিকদের সঙ্গে এসেছে আর কশেভয়-পরিবারের সকলকে খুন করেছে।

গুজবটা কানে যায়নি পান্তালিমনের। কামারদের বাড়ি ঘুরে এসে ফের ফসলতোলা কলটায় হাত লাগাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল সে। এমন সময় এল ইলিনিচ্‌না

—ও প্রোকোফিচ্‌! তাড়াতাড়ি।

বুড়ীর গলা। আতঙ্কের ভাবটা চাপা থাকেনি। অবাক হয়ে পান্তালিমন ছুটে এল ঘরের দিকে।

নাতালিয়া দাঁড়িয়ে ছিল চুল্লির কাছে। চোখে তার জল, মুখখানা ফ্যাকাশে। আনিকুশকার বউয়ের দিকে চোখ ইশারা করে ইলিনিচ্‌না রীতিমতো ধরা গলায় বললে

—ওগো, খবর শুনেছ ?

—গ্রিগরের কিছু হল নাকি! ও ভগবান, রক্ষে কর! —শুনে ভয় পেয়ে যায় পান্তালিমন। কিন্তু কেউ মুখে একটি কথা বলে না দেখে ফ্যাকাশে হয়ে যায়। ভয়ে খেপে উঠে চিৎকার করে বলে

—কই, মুখ খোল্‌ না হতচ্ছাড়াগুলো! কী হয়েছে, অ্যাঁ ? গ্রিগরের কিছু হল ?—তারপর চেঁচানির জবাব না পেয়ে হাল ছেড়ে দেওয়ার মতো বেঞ্চিতে বসে পড়ে ধপ করে। কাঁপতে থাকা হাঁটুদুটো চাপড়ায়।

দুনিয়াই প্রথম বুঝতে পেরেছিল ছেলের সম্পর্কে খারাপ খবরের ভয় করছে ওর বাপ। সে তাড়াতাড়ি বললে

—না বাবা, গ্রিগরের কথা নয়। মিৎকা খুন করেছে কশেভয়দের।

—'খুন করেছে' মানে ?—পান্তালিমনের বুক থেকে যেন ভারি পাথরটা নিমেষে নেমে যায়। দুনিয়ার কথার মানে তবু ধরতে না পেরে সে ফের জিজ্ঞেস করে কশেভয়দের ? মিত্রি ? খবরটা নিয়ে মেলেখফদের বাড়ি ছুটে এসেছিল আনিকুশকার বউ। তোত্‌লাতে তোত্‌লাতে সে বলতে শুরু করে :

—আমাদের বাছুরটা খুঁজতে বেরিয়েছিলুম। তো গিয়ে পড়লুম কশেভয়দের ঘরের সামনে। মিত্রি আর তার সঙ্গী দুজন সেপাই ঘোড়া নিয়ে ঢুকল ওদের উঠোনে। আমি ভাবছিলুম—বাছুরটা তো হাওয়া-কলঘরের ওদিকে নিশ্চয়ই যাবে না। বাছুরটার এখন ফেরার সময়…

পান্তালিমন খেপে গিয়ে বললে, তোমার বাছুরের ফিরিস্তি শুনে আমার কী হবে?

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ফের বলতে শুরু করে আনিকুশকার বউ—…তারপর ওরা তো ঘরের ভেতরে ঢুকল। আমিও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবুব করতে থাকি। ভেতর থেকে ওদের চিৎকারেব শব্দ শুনতে পাই, ঘুষির আওয়াজও কানে আসে। ভয়ে তো আমি মরেই যাই আর কি। ভাবলুম পালাই। বেড়ার ধার থেকে দুপা সরেছি কি পেছনে পায়ের আওয়াজ। ঘাড ফিরিযে দেখি তোমাদের মিত্রি, বুড়ীর গলায় একটা দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে, যেন সে একটা কুকুর। হে ভগবান, মাপ কর! বুড়ীকে টেনে নিয়ে গেল চালাঘরের কাছে আর সে বুড়ী হতভাগিনীর গলা দিয়ে একটি আওয়াজও বেরুল না: হয়তো বা আগেই সম্বিত হাবিয়েছিল। মিত্রির সঙ্গের কালমিকটা লাফ দিয়ে উঠল আডকাঠের ওপর।……আমি চেয়ে দেখছি, এদিকে মিত্রি দড়ির একটা কোণ কালমিকটার হাতে তুলে দিয়ে চেঁচিয়ে বললে—এটা টেনে নিয়ে ওপরে গিঁট বেঁধে ফেল।—উঃ, তখন যে আমাব কী যাতনা। একেবারে চোখের সুমুখে হতভাগী বুড়ীকে ফাঁসি দিয়ে মারলে গো। তাবপর সবাই ঘোড়ায় চেপে রাস্তায় নামল। বোধহয় সরকারী কাছারি-বাড়িব দিকেই গেল সব। কশেভয়দের বাড়িতে ঢুকতে আমাব গা ছমছম করছিল।…… কিন্তু সিঁড়িমুখে দরজার নিচে, সিঁড়িতে দেখলুম রক্ত গড়াচ্ছে। ঈশ্বর করুন যেন আর কোনোদিন এ ভয়ানক দৃশ্য চোখে না দেখতে হয়।

স্বামীর দিকে কটমট কবে চেয়ে ইলিনিচ্না বললে, আমাদেব ভালো অতিথই পাঠিয়েছিলেন ভগবান যা-হোক। সমস্ত কাহিনীটা পান্তালিমন শুনল ভয়ানক একটা উত্তেজনাব মধ্যে। আনিকুশ্কাব বউ থামতেই বুড়ো সিঁড়ি-দরজার দিকে এগিয়ে গেল মুখে একটি কথাও না বলে।

একটু বাদেই মিৎকা আর তার সঙ্গীসাথীরা এসে হাজির হল ফটকের সামনে। পান্তালিমন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ওদের দিকে এগিয়ে যায়।

বেশ একটু দূরে থাকতেই বুড়ো বলে, থামো! এ বাড়ির উঠোনে ঘোড়া ঢুকিও না!

অবাক হয়ে মিৎকা বলে, কী ব্যাপার তালুই মশাই? পান্তালিমন সোজা সামনে গিয়ে মিৎকার হলদে কুতকুতে চোখের দিকে চেয়ে থেকে বললে, ফিরে যাও! রাগ কোরো না বাছা, কিন্তু আমার বাড়িতে তোমাদের থাকতে দিতে ইচ্ছে নেই আমাব। তোমবা বরং নিজেদের রাস্তা দেখ।

মিৎকা যেন ব্যাপার বুঝতে পেরেছে এমনি স্বরে বললে, ও-ও। তা হলে আমাদের তাড়িয়ে দিচ্ছ?—ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে ওর মুখটা। বুড়ো কঠিন স্বরে বললে, আমার ঘরদোর নোংরা করতে তোমাদের দেব না। ফের কখনো আমার বাড়ির চৌকাঠ মাড়িও না বলে দিলাম। জল্লাদদের সঙ্গে মেলেখফের বংশের কোনো সম্পর্ক নেই—এটুকু জেনে রেখো।

—বুঝতে পেরেছি। কিন্তু তুমি যেন একটু বেশী দয়ালু হয়েছ মনে হচ্ছে!

—দয়া কাকে বলে সে ধারণা তোমার নেই বোধ হয়, বিশেষ করে যখন মেয়ে আর বাচ্ছাদেরও খুন করতে শুরু করেছ। বুঝলে মিত্রি, এ কাজ তোমার সাজে না……তোমার মরা বাপ আজ তোমায় দেখলে মোটেই খুশী হতেন না।

—বুড়ো গাধা, তুমি চাও আমি ওদেব আদব করব বসে-বসে? আমার বাপকে ওরা মেরেছে, দাদামশাইকে খুন করেছে, আর তার বদলে ওদের আমি খেষ্টানি দেখিয়ে চুমু খাব মনে করেছ? যমের দোরে যাও তুমি!—মিৎকা ক্ষিপ্তভাবে লাগাম টেনে ঘোড়া বের করে নিয়ে যায় ফটকের বাইরে।

—আমায় গালমন্দ কোরো না মিত্রি, তুমি আমার ছেলের মতো। তোমাব সঙ্গে আমাব ঝগড়া নেই, তুমি শান্তিতে চলে যাও। মুখখানা আরো ফ্যাকাশে [illegible] মারমুখো ভঙ্গিতে হাতেব চাবুক নেড়ে মিৎকা জোর গলায় শুনিয়ে দিলে:

—জোর করে আমাকে পাপ কাজে ঠেলে দিও না। নেহাৎ নাতালিয়ার জন্য দুঃখ হয় নইলে। তোমায় দেখিয়ে দিতাম, কদ্দূব তোমাব দয়াধর্ম…… আমি তো তোমাকে চিনি। তোমার নাড়িনক্ষত্র আমাব জানা: দনিয়েৎসের উপরে তো তুমি যাওনি? তুমি তখন ভিড়েছিলে লালদেব দলে, তাই না? সব আমার জানা আছে। তোমাদেব অবস্থাও কশেভয়দের মতোই করা উচিত ছিল, কুত্তীব বাচ্চারা। এস হে ভাই সব। হ্যাঁ রে খোঁড়া কুত্তা, আমার হাতে যেন পড়িসনে। ঘুষি খেয়ে মরবি। তোর অতিথিসেবার কথা আমার মনে থাকবে। তোব মতো আত্মীয়দের ওপব হাত তুলতেও আমার বাধেনি।

কাঁপা হাতে ফটকের পাল্লাটা ভেজিয়ে পান্তালিমন খিল তুলে দেয়। তারপর খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘবে এসে ঢোকে। নাতালিয়ার মুখের দিকে না চেয়ে বলে, তোমার ভাইটিকে তাড়িয়ে দিয়ে এলাম।

নাতালিয়া কিছু বললে না, যদিও শ্বশুরের কাজে ওর মনের সায় ঠিকই ছিল। কিন্তু ইলিনিচ্না তাড়াতাড়ি ক্রুশ প্রণাম করে খুশিভরা গলায় বলে ওঠে:

—মঙ্গল হোক। একেবারে দূর হয়েছে, শ্বাপদ গেল। নাতালিয়া মা, কিছু মনে কোরো না, তোমার মিৎকা ভাইটি একটা আস্ত জানোয়ার হয়ে

দাঁড়িয়েছে। বেশ কাজ জুটিয়েছে যাহোক! ছাখো একবারটি। অন্য কসাকদের মতো খাঁটি ফৌজে কাজ নেই! জুটেছে পিটুনি ফৌজের দলে! এই কি কসাকের কাজ! জল্লাদ হয়ে বুড়ীকে ফাঁসিতে লটকানো, নিরীহ শিশুদের গলায় তলোয়ার কোপানো? মিশকার কাজের জন্য ওদের দায়ী করা কেন? বেশ তো, তাহলে লাল সেপাইরাও তোমাকে, আমাকে, মিশাৎকা আর পলিউশ্‌কাকে মারতে পারত গ্রিশ্‌কার জন্য। কিন্তু ওরা তা করেনি। ওরা দয়া দেখিয়েছিল। না, না, ঈশ্বর না করুন, এসব কাজে আমার একেবারে সায় নেই।

রুমালের কোণে চোখের জল মুছে নাতালিয়া শুধু বললে, আমিও আমার ভাইয়ের পক্ষে নই মা।

সেদিনই মিৎকা গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। লোকের মুখে খবর রটল সে নাকি কারগিনের কাছেই কোথাও আবার যোগ দিয়েছে পিটুনি ফৌজে। দনিয়েৎসের উক্রেইনীয় এলাকার লোকেরা নাকি উজানী ডনের বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করেছিল, তাদের শায়েস্তা করতে গিয়েছে মিৎকা।

॥ তিন ॥

মিৎকা চলে যাবার পর হপ্তাখানেক ধরে গাঁয়ে ওকে নিয়েই আলোচনা চলে। কসাইয়ের মতো কশেভয়ের পরিবারকে বেপরোয়া খুন করেছে বলে বেশীর ভাগ লোকই দুষতে থাকে ওকে। সমাজের তহবিল থেকে ওদের কবর দেবার খরচ তোলা হয়। ওদের ছোট্ট কুঁড়েখানা বেচে দেবার চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু কোনো খদ্দের পাওয়া গেল না। গাঁয়ের আতামান-মোড়লের হুকুমে জানলা-দরজার পাল্লায় আড়াআড়ি তক্তা এঁটে দেওয়া হল। ছোট ছেলেপিলেরা অনেকদিন পর্যন্ত ভয়ে সেদিকে খেলতে যেত না। বুড়োবুড়ীরা কুঁড়েঘরটার সামনে দিয়ে যাবার সময় ক্রুশ প্রণাম করত আর যারা খুন হয়েছে তাদের আ ্মার সদ্গতি কামনা করে প্রার্থনা করত।

তারপর যখন স্তেপ অঞ্চলে ফসল বোনার সময় এল তখন লোকে এসব ঘটনা ভুলে যেতে শুরু করল।

আগের মতোই ফের কাজে ডুবে গেল গাঁয়ের সবাই, শুরু হল রণাঙ্গন সম্পর্কে নানা গুজব। চাষীদের মধ্যে যারা ঘোড়া বলদ সামলে রাখতে পেরেছিল তাদের এবার সমাজ সেবার কাজে গাড়ি আর বলদ ঘোড়া পাঠাতে হচ্ছে বলে আপত্তি আর গালাগাল শুরু হয়ে গেল। প্রায় রোজই মাঠ থেকে বলদ বা ঘোড়া উঠিয়ে এনে জেলাকেন্দ্রে পাঠাতে হয়। মই-কলের ঘোড়াগুলোকে খুলে আনবার সময় বুড়োরা প্রায়ই এই একটানা যুদ্ধের মুণ্ডপাত করে। কিন্তু কামানের গোলা, কার্তুজ, কাঁটাতারের বেড়া, আর রসদ, গাড়িতে করে পাঠাতেই হয় লড়াইয়ের ময়দানে। পাঠায়ও ওরা গাড়ি। কিন্তু এখন যেন ওদের শত্রুতার মতলবেই এসেছে এই সুন্দর দিনগুলো। এখন ওদের কেবলি ইচ্ছে হচ্ছে ফসল বোনার, তারপর সেই পাকা-পাকা, অদ্ভুত রকম সরস ফসল ঘরে তোলার।

পান্তালিমন ফসল কাটার জন্য তৈরি হচ্ছে আর ভয়ানক চটে উঠছে দারিয়ার ওপর। দারিয়া কার্তুজ বইবার জন্য বলদ জোড়া নিয়ে চলে গেছে। মাল যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসার কথা। অথচ এক হপ্তা হয়ে গেল এখন অবধি তার কোনো খবরবার্তা নেই। সেই পুরনো ভালো বলদ দুটো না হলে এদিকে স্তেপের মাঠে গিয়ে কোনো লাভই হবে না।

সোজা কথা হল দারিয়াকে একেবারে পাঠানোই উচিত হয়নি……। বলদগুলো ওর হাতে দেবার সময়ই পান্তালিমনের মনে খটকা বেধেছিল, কারণ ও তো জানে দারিয়া কেবল ফুর্তি করে সময় কাটাবার ফিকির খোঁজে, গরু-বাছুরের দিকে ওর টান কোথায়? কিন্তু আর কাকেই বা পাঠাবে? দুনিয়া যেতে পারে না, অতদূর রাস্তা অজানা-অচেনা কসাকদের সঙ্গে যাওয়া ওর মতো কুমারী মেয়ের কাজ নয়। নাতালিয়ার বাচ্চাকাচ্চা আছে। বুড়ো নিজে তো আর ওই হতচ্ছাড়া কার্তুজগুলো নিয়ে যেতে পারে না? দারিয়া কিন্তু বেশ খুশী হয়েই রাজী হয়ে গেল। সে এর আগেও অনেক জায়গায় গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেছে মহা তৃপ্তির সঙ্গে। গেছে মিল-বার্তে, কিংবা খামার সংক্রান্ত কোনো কাজে। বাড়ির বাইরে অনেকটা স্বাধীনভাবে চলতে-ফিরতে পাবে বলেই এইভাবে যাওয়া-আসা করে ও। প্রত্যেকবারই আনন্দ আর আমোদের সন্ধান পায়। শাশুড়ীর চোখের আড়াল হতে পারে, আর-সব মেয়েদের সঙ্গে প্রাণ খুলে গালগল্প করতে পারে, তাছাড়া ওর নিজের ভাষায় “পিরীতও বাধাতে পারে” যে কোনো ফিকিরে থাকা লম্পট কসাকের সঙ্গে। বাড়িতে থাকলে ইলিনিচ্‌নার কড়াকড়িতে একটুও বেচাল হবার উপায় নেই—এমন কি পিয়োত্রা মরে যাবার পরেও। পিয়োত্রা বেঁচে থাকতেই দারিয়া যেন কত সতীলক্ষ্মী ছিল, আর এখন সে মরে গেছে তবু ওকে পতিভক্ত হয়ে থাকতে হবে।

পান্তালিমন ভালো করেই জানত বলদগুলোর তেমন যত্ন হবে না, কিন্তু

আর কিছু করারও ছিল না তার। শেষ অবধি বড় ছেলের বউকেই পাঠাল সে। কিন্তু সারা হপ্তাটা সে ভীষণ উদ্বেগ আর মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে কাটিয়েছে। মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে আর ভেবেছে—বলদগুলো আমার গেল এবার।

এগারো দিনের দিন ফিরে আসে দাবিযা। পান্তালিমন তখন সবে খামার থেকে ফিরেছে। আনিকুশ্কার বউয়ের সঙ্গে মিলে ফসল বুনছিল সে। আনিকুশ্কার বউ আর দুনিযাকে মাঠে রেখে জল-খাবার খেতে এসেছিল। বুড়োবুড়ী আর নাতালিয়া খেতে বসেছে এমন সময় জানলার ধারে ত্রিচকা-গাড়ির চাকার পরিচিত আওয়াজটা শোনা গেল। টপ্ করে উঠে নাতালিযা জানলার কাছে যেতেই দেখে দাবিযা, আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে দুর্বল রোগা বলদ দুটোকে তাড়িযে আনছে।

তাড়াতাড়ি খাবারের গ্রাস মুখে তুলে বিষম খেতে খেতে বুড়ো বলে, উনি এলেন নাকি?

—হ্যাঁ।

—বলদগুলোকে আর চোখে দেখব আশা করিনি। যাক, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। হতভাগী ইল্লুতে। ঘরে ফিরেছে নেহাত ফিরতে হবে বলে।—বিড়বিড় করে বুড়ো। ক্রুশ প্রণাম করে তৃপ্তি সহকারে ঢেঁকুর তোলে।

দাবিযা বলদের জোয়াল খুলে রান্নাঘরে ঢোকে। চৌকাঠের ওপর ভাঁজ-করা ঘোড়ার কম্বলটা রেখে সবাইকে সম্ভাষণ জানায়।

পান্তালিমন ওর সম্ভাষণের জবাব না দিয়ে ভুরুর তলা দিয়ে তাকিয়ে অনুযোগের সুরে বলে, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ফিরলেন কেন গো? রাস্তায় আরো একটা হপ্তা দিব্যি কাটিয়ে আসতে পারতেন।

মাথা থেকে ধুলো-ভরা ওড়নাটা খুলতে খুলতে দাবিযা গ্লালটা জবাব দেয়, তুমি গেলেই পারতে?

দাবিযা বাড়ি ফিরতেই এমনি ধরনের বিরূপ অভ্যর্থনা হল, তাই, কথার মোড় ঘুরিয়ে দেবার জন্য ইলিনিচনা বললে অত দেরি হল যে ফিরতে?

—কিছুতেই ওরা ছাড়বে না, তাই উপায় ছিল না।

পান্তালিমন অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লে। জিজ্ঞেস করলে, ক্রিস্তোনিযার বউকে ওরা ঘাঁটি অবধি নিয়ে ছেড়ে দিলে আর তোমায় কেন ছাড়ল না?

দাবিযার চোখ দুটো রাগে জ্বলে। বলে, হ্যাঁ ছাড়েইনি তো। যদি বিশ্বাস না হয় যাও ঘোড়ায় চেপে,—যার হাতে গাড়ির ভার তাকে জিজ্ঞেস করে এস গে।

কোনো দরকার নেই আমার। কিন্তু এর পরের বার তোমাকে বাড়িতেই থাকতে হবে। যেতেই যদি হয় তো একেবারে যমের দুয়ারে পাঠালেই ভাল।

—ও, এখন আমায় ধমকাচ্ছ! আচ্ছা বেশ তো, যাবই না! কান ধরে পাঠালেও যাব না!

—বলদগুলো সব ঠিক আছে?—এবার বুড়ো খুব নরম করে বলে।

—হ্যাঁ। তোমার বলদদের কিছু হয়নি……।—অনিচ্ছাভরে জবাব দেয় দারিয়া, মুখটা ওর আঁধার হয়ে উঠেছে।

নাতালিয়া ভাবল, রাস্তায় বোধহয় কোনো নাগরকে ছেড়ে আসতে হয়েছে, তাই মেজাজ অমন তিরিক্ষি। দারিয়া সম্পর্কে আর দারিয়ার কলঙ্কময় প্রেমাভিসার সম্পর্কে বরাবরই একটা অনুকম্পা আর অসন্তুষ্টির ভাব রয়েছে নাতালিয়ার।

প্রাতরাশের পর পান্তালিমন গাডি নিয়ে বেরুবার জন্য তৈরি হচ্ছে এমন সময় এল গাঁয়ের আতামান মোড়ল।

—তোমাকে আগেই বিদায় দিতে পারতাম পান্তালিমন কিন্তু এক মিনিট সবুর করে যাও, এখুনি যেও না।—সুরটা অতিরিক্ত নরম করে বুড়ো পান্তালিমন বললে, আবার গাডির খোঁজে এসেছ নাকি? রাগে অবশ্য ওর গলার স্বর প্রায় বুজে আসছে তখন।

—না, এবার অন্য ব্যাপার। গোটা ডনবাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল সিদোরিন খোদ আজ এখানে আসবেন। বুঝতে পেরেছ? জেলা আতামানের এক দূতের কাছ থেকে এইমাত্র চিঠি পেলাম—গাঁয়ের প্রত্যেকটি বুড়ো আর মেয়েমানুষকে সভায় হাজির হতে হবে।

পান্তালিমন গলার স্বর চডিয়ে বলে—ওদের কি আক্কেল নেই? জরুরি কাজের সময় কে এখন মিটিংয়ে লোক ডাকতে যাবে? তোমাদের জেনারেল সিদোরিন কি শীতের সময় খড় জোগাবেন আমাদের?

আতামান শান্তভাবে জবাব দিলে, উনি তোমাকে যতখানি আমাকেও ততখানিই দেবেন। আমার ওপর যা হুকুম হয়েছে তাই করছি। এবার ঘোড়া খুলে নাও দিকি। ওঁকে বেশ আদব-যত্ন করতে হ্‌বে। ভালো কথা, মিত্রপক্ষের জেনারেলরাও নাকি ওঁর সঙ্গে ঘোরাফেরা করছেন শুনলাম।

পান্তালিমন গাডির পাশে মুহূর্তকের জন্য দাঁডিয়ে কী ভাবলে, তারপর বলদের জোয়াল খুলতে লাগল। কথায় কাজ হয়েছে দেখে আতামান খুশী হয়ে বললে, তোমার ঘুডীটাকে ধার পাওয়া যেতে পারে?

—কেন ঘুডী দিয়ে কী হবে?

—ওদের অভ্যর্থনা জানাতে দুবনয়-দেল্ অবধি দুটো ত্রয়কাগাডি পাঠাতে হুকুম দিয়েছে হতচ্ছাডাগুলো। কিন্তু কোথায় এখন গাড়িঘোড়া পাই সেই সমস্যা। সেই সাত ভোরে উঠে ছুটোছুটি করছি। পাঁচবার জামা ভেজালাম। এখন অবধি মাত্র চারটে ঘোড়া জুগিয়েছি। সবাই কাজে বেরিয়েছে, এখন গলা ফাটিয়ে চেঁচালেই বা কী……

পান্তালিমন এতক্ষণে একটু নরম হয়েছে। আতামানকে ঘুড়ীটা দিতে রাজী হল সে। ছোট স্প্রিং-বসানো গাডিখানা অবধি দিতে আপত্তি করল না। হাজার হোক, ফৌজের কমাণ্ডার-ইন-চীফ আসছেন, সঙ্গে তার বিদেশী জেনারেলও থাকবেন—পান্তালিমনের চিরকালই জেনারেল-টেনারেলদের ওপর অগাধ ভক্তিশ্রদ্ধা।

আতামানের চেষ্টা-চরিত্রের ফলে দুটো গাড়ি জোগাড হল। দুরনয়-দেলে গাড়ি পাঠানো হল সম্মানিত অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাতে। লোকজন চত্বরে ভিড জমিয়েছে। অনেকে ফসলকাটা ছেড়ে হুডমুড করে ছুটে এল স্তেপের মাঠ থেকে।

হাতের কাজ তুলে রেখে পান্তালিমন ফর্সা জামা-কাপড, ডোরাদার পাতলুনটা পরলে, গ্রিগর ওর জন্য যে টুপিটা এনেছিল সেইটে মাথায় দিলে। তারপর হেলেদুলে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলল বাজারের দিকে। বুড়ীকে বলে গেল যেন দারিয়াকে দিয়ে দুনিয়ার জলখাবারটা মাঠে পাঠিয়ে দেয়।

একটু বাদেই পথের ধারে ধুলোর ঘূর্ণি উঠতে থাকে—মেঘের মতো ঘন ধুলো উড়ে যেতে থাকে গাঁয়ের দিকে। ধুলোর ভেতর থেকে কী যেন চক্‌চকে দেখা যায় পিতলের মতো। দূর থেকে শোনা যায় গাড়ির চোপদারের গলার আওয়াজ। ঝকমকে ঘন নীল রঙের দুখানা নতুন গাড়িতে চেপে অতিথিরা আসছেন। আর ওঁদের অনেকটা পেছন পেছন হোঁচট খেতে-খেতে আসছে খালি ত্রয়কাগাড়িগুলো। এই গুরুগম্ভীর অনুষ্ঠানটির জন্য আতামান ডাকহরকরাদের ঘণ্টাগুলো তলব করেছিল। সেগুলো এখন গাড়ির জোয়ালের নিচে করুণভাবে আর্তনাদ করছে। চত্বরে জমা মানুষের ভিড়ের মধ্যে বেশ একটু চাঞ্চল্য দেখা গেল। আলাপের গুঞ্জন, তার মধ্যে আবার বাচ্চাকাচ্চাদের চেঁচামেচি। আতামান উতলা হয়ে ভিড়ের মধ্যে ঘুরে ঘুরে গ্রামের প্রবীণদের খুঁজে বের করছে। কসাক প্রথায় রুটি আর নুন উপহার দেবার ভারটা তাদেরই ওপর পড়বে কিনা। পান্তালিমনের ওপর নজর পড়ে আতামানের। খুশী হয়ে তাকে টেনে নেয়:

—বাঁচাও আমায়, ভগবানের দোহাই! তুমি তো জান, বুঝদার লোক, কী করতে হয় না-হয় সবই জানো।...ওদের সঙ্গে ওঠ-বস্ করার কায়দা তোমার জানা। তাছাড়া, তুমি এলাকার সরকারী দপ্তরের লোক, তোমার ছেলেও একজন। রুটি আর নুনটা তুমিই নিয়ে যাও। জান তো আমি কেমন ভয়কাতুরে মানুষ। আমার তো হাঁটু কাঁপছে।

এই সম্মানটুকু পেয়ে পান্তালিমন তো একেবারে গদগদ। তবু চক্ষুলজ্জার খাতিরে প্রথমটা গররাজী হল। তারপর একেবারে ঘাড়ের মধ্যে মাথা গুঁজে চট্ করে ক্রুশ প্রণাম সেরেই নক্‌শাদার তোয়ালে-ঢাকা রুটি-নুনের থালাটা হাতে তুলে নিলে। কনুই দিয়ে ভিড় ঠেলে ও এগিয়ে গেল সামনে।

এক পাল কুকুরের গলা-কাটানো চিৎকারের মধ্যে গাড়িগুলো তাড়াতাড়ি এগোয় চত্বরের দিকে। মুখখানা ফ্যাকাশে করে আতামান পান্তালিমনকে জিজ্ঞেস করলে, কেমন বুঝছ? ভয় করছে না?—এইসব কেউকেটা মানুষ জীবনে এই প্রথম দেখছে সে। পান্তালিমন তার দিকে একবার আড়চোখে চেয়ে শুকনো গলায় উত্তেজিতভাবে বললে:

—এইটে ধর তো, ততক্ষণ একটু দাড়িটা আঁচড়ে নিই। এই নাও।

আতামান বিনীতভাবে থালাটা হাতে নিল। পান্তালিমন গোঁফজোড়া আর দাড়িটা আঁচড়ে সমান করে বুকটা জোয়ান ছেলের মতো একটু চিতিয়ে খোঁড়া পায়ের ডগায় ভর দিয়ে এমনভাবে দাঁড়ায় যেন অঙ্গের বিকৃতিটা চোখে না পড়ে। তারপর থালাটা আবার তুলে নেয়। কিন্তু হাতের মধ্যে সেটা এমন কাঁপতে থাকে যে আতামান শশব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করে: পড়ে যাবে না তো হে? খেয়াল রেখো কিন্তু!

পান্তালিমন বিদ্রূপভরে কাঁধ জোড়া কোঁচকায়। হুঁঃ, থালা পড়বে ওর হাত থেকে। এমন বাজে কথাও বলতে পারে কেউ? সে হল এলাকার সরকারী পরিষদের সদস্য, রাজ্যপালের প্রাসাদের সবার সঙ্গেই তার 'করমর্দনের' সম্পর্ক আর সে কিনা ঘাবড়াবে একজন জেনারেলকে দেখে? এই হতভাগা ক্ষুদে আতামানটার বোধহয় মাথার ঠিক নেই!

—আমি যখন ফৌজী এলাকায় ছিলাম, স্বয়ং সহ-আতামানের সঙ্গে একসঙ্গে বসে চিনি-দেওয়া চা খেয়েছি, বুঝলে ভায়া।—শুরু করে পান্তালিমন। কিন্তু মুখের কথা মুখেই থেকে যায় ওর।

প্রথম গাড়িখানা হাত বারো দূরে এসে থেমেছে। চালকটির দাড়ি পরিষ্কার করে কামানো, মাথায় প্রকাণ্ড চূড়ো-তোলা টুপি, উর্দির কাঁধের ওপর, সরু অ-কমিশন ধরনের পদক-চিহ্ন। টপ করে বেরিয়ে এসেই সে দরজাটা খুলে ধরলে। খাকি পোশাক-পরা দুজন অফিসার গম্ভীর বদনে বেরিয়ে এসে জনতার দিকে এগোতে লাগলেন। হেঁটে চললেন সোজা পান্তালিমনের দিকে। পান্তালিমন তখন অ্যাটেনশন্ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। অবিচল মূর্তির মতো। অনাড়ম্বর পোশাক-পরা এই লোক দুটোই জেনারেল হবে—আন্দাজ করে নিল ও। আর ওই যারা পেছনে আসছে আরো চটকদার উর্দি পরে, ওরা নেহাত কর্মচারী, সেনাপতিদের সাঙ্গোপাঙ্গ মাত্র। তাহলে জেনারেলদের ভারী ভারী কাঁধের ঝালরগুলো কোথায় গেল? কাঁধের ফৌজী সজ্জা, পদক এসব কই? সাধারণ ফৌজী কেরানীদের থেকে তফাত করা যায় না। এ কোন্ ধরনের জেনারেল আবার?

অপলক চোখে বুড়ো তাকিয়ে রইল আগন্তুকদের দিকে; চাউনির মধ্যে ক্রমেই ফুটে উঠতে লাগল বিস্ময়। খানিকক্ষণের জন্য ও একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছিল। এমনকি একটু অপদস্থও মনে হল নিজেকে, তার প্রথম কারণ

সে ওদের সঙ্গে দেখা করার জন্য রীতিমতো তৈরি হয়ে বসেছিল। তার ওপর মনে হল এই লোকগুলো জেনারেল নামেরই যোগ্য নয়। নিকুচি করেছে, ও যদি জানত জেনাবেল বলতে এমনি ধরনেব চীজ্ এসে দেখা দেবে, তাহলে এত যত্ন করে ধড়াচুড়ো পরত না, ওদের প্রতীক্ষায় দাঁড়িযে দাঁড়িয়ে কাঁপত না, অন্তত এমন হাঁদার মতো হাতে থালাটি নিয়ে দাঁড়িযে তো নিশ্চয়ই থাকত না। তার ওপর কোন্ এক খাঁদানাকী বুড়ী বিচ্ছিরি কবে সেঁকেছে রুটিখানা। না, লোকেব চোখে আগে কোনোদিন হাস্যাস্পদ হতে হযনি পান্তালিমন প্রোকোফিযেভিচকে, কিন্তু এবাবে তা-ই ঘটল। খানিক আগেও পেছন থেকে ছোট ছেলে-মেযেদেব চাপা হাসি শুনতে পেযেছিল। একটা খুদে শযতান তো চিৎকাব কবে বলেই ফেলল, ওই ত্যাখ্ রে, খোঁড়া মেলেখফ-বুড়ো কেমন কষ্ট কবছে। চেহাবাখানা দেখ—যেন বুরুশ গিলে ফেলেছে। তবু যদি এইসব ঠাট্টা-তামাশা আব খোঁড়া পাযে সিধে দাড়িযে থাকার কষ্টটা সইবার ফলে কোনো কাজ হত। রাগে এখন পান্তালিমনেব ব্রহ্মতালু জ্বলছে। আব এই হতভাগা ভীতু আতামানটা বযেছে সবকিছুব গোড়ায। এসে হুমড়ি দিযে পড়ল, ঘুড়ীটা আব তারান্তাস গাড়িখানা নিযে গেল, জিভ বেব কবে ছুটল সাবা গাঁযে কোথায ত্রযকা গাড়িব জন্য ঘণ্টা পাওযা যাবে। তাছাড়া বেলোক জীবনে কোনোদিন কিছু দেখল না সে একফালি ন্যাকড়া পেযেও খুশী। পান্তালিমন এমন জেনাবেল তো কোনোদিন দেখেনি। যেমন সেই আমলেব বাজকীয সেনা-পবিদর্শনেব কথাই ধব বুকে পদক ঝুলিযে সোনালী ফিতে লাগিযে মাচ কবে চলেছে, হ্যা, তাকালেও বুকটা দশহাত উঁচু হযে ওঠে। জেনাবেল তো নয, সব দেবতাব পটেব মতো চেহাবা। আর এবা? বং-জ্বলা উর্দি পবা, কাগতাড়ুযাব মতো। একজনেব মাথায তো চুড়োতোলা টুপিটাও নেই ঠিক মতো, উর্দি পবলে যেমনটি থাকা উচিত। তা নয, মলমলে মোড়া এক ধবনেব টুপি। মুখখানা একেবারে ঝাড়াপোঁছা কামানো, লণ্ঠন জ্বালিযে খুঁজলেও একগাছি দাড়িব দেখা মেলা ভাব। কালো হযে ওঠে পান্তালিমনেব মুখখানা। বিবক্ত হযে থুতু ফেলত আবেকটু হলে। কিন্তু কে যেন পিঠেব ওপব জোব একটা গুঁতো মেবে ফিসফিস কবে বললে

—যাও না। জিনিসটা নিযে যাও ওদেব কাছে। পান্তালিমন হেঁটে চলল। ওব মাথাব ওপব দিযে ভিড়টার দিকে একবার তাকিযে জেনাবেল সিদোরিন গমগমে গলায বললেন

—আপনাদের নমস্কাব জানাই।

নানাকণ্ঠে একসঙ্গে চেঁচিযে উঠল গাঁয়ের লোকেরা—হুজুর, আপনার স্বাস্থ্য কামনা করি।

পান্তালিমনের হাত থেকে রুটি আর নুনটা বেশ সুললিত ভঙ্গিতে

গ্রহণ করে জেনারেল বললেন,—ধন্যবাদ।—থালাটা এগিয়ে দিলেন সহকর্মীর হাতে।

রুটি আর নুনের পালা শেষ করে পান্তালিমন আবার ফিরে এসে মিশল ভিড়ের মধ্যে। ভিয়েশেন্স্কার এক বক্তা যখন ভিয়েশেন্স্কা জেলায় কসাকদের হয়ে আগন্তুকদের স্বাগত জানালে তখন আর শোনবার জন্য সেখানে দাঁড়াল না পান্তালিমন। বেরিয়ে গেল খানিক দূরে দাঁড়িয়ে-থাকা ত্রয়কা গাড়ি-গুলোর দিকে।

ঘোড়াগুলো ঘামে নেয়ে উঠেছিল। দুপাশের পাঁজর বসে গেছে। বুড়ো নিজের ঘুড়ীটার কাছে গিয়ে জামার হাতা দিয়ে সেটার নাক মুছে একটা নিশ্বাস ফেলল। ওর ইচ্ছে হচ্ছিল প্রাণভরে গালাগালি দিয়ে এখুনি ঘুড়ীটাকে খুলে নিয়ে যায় বাড়ির দিকে। ওর সব মোহ কেটে গেছে।

এর মধ্যে তাতারস্কের মানুষদের কাছে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন জেনারেল সিদোরিন। লালফৌজের পেছনদিকের এলাকায় থেকে তারা জঙ্গী কার্য-কলাপ চালাচ্ছে বলে তাদের তারিফ জানিয়ে বললেন :

—আমাদের উভয়েরই যে দুশমন তাদের বিরুদ্ধে আপনারা বীরত্বের সঙ্গে লড়েছেন। জন্মভূমি কোনোদিন আপনাদের সেবার কথা ভুলবে না : আমাদের এই দেশ ক্রমশ বলশেভিকদের হাত থেকে, তাদের ভয়ানক জোয়াল থেকে মুক্ত হচ্ছে। আপনাদের গ্রামের যে-সমস্ত মহিলারা লাল-ফৌজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াইয়ে মস্তবড়ো ভূমিকা নিয়েছিলেন বলে আমরা জানতে পেরেছি, তাদের জন্য কৃতজ্ঞতার এই নিদর্শন আজ আমরা উপহার দিতে চাই। যে-সব কসাক বীরাঙ্গনার নাম আর খানিকক্ষণের মধ্যেই ঘোষণা করা হবে তাঁরা যেন সামনে এগিয়ে আসেন।

অফিসারদের একজন একটা সংক্ষিপ্ত নামের তালিকা পড়ে শোনাল। প্রথম নামটা দারিয়া মেলেখভার, বাদবাকিগুলো সেইসব বিধবাদের যাঁদের স্বামীরা বিদ্রোহের গোড়ার দিকে মারা পড়েছিল, যারা দারিয়ারই মতো কমিউনিস্ট বন্দীদের পাইকারী হত্যায় যোগ দিয়েছিল—সেই সেরদবস্কি রেজিমেণ্ট আত্মসমর্পণ করার পর তাদের তাতারস্কে ধরে নিয়ে আসার সময়।*

পান্তালিমন হুকুম করে এলেও দারিয়া কিন্তু খামারে গাড়ি নিয়ে যায়নি। সে এই চত্বরেই ছিল গাঁয়ের মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে। বেশ সেজেগুজেই এসেছিল ছুটির দিনের মতো। যে মুহূর্তে শুনল তার নাম ডাকা হয়েছে অমনি আশপাশের মেয়েদের ঠেলে সোজা সামনে এগিয়ে এল সে। সাদা লেস্-লাগানো ওড়নাটা টেনে, চোখদুটো আধখানা বুজে একটু অপ্রতিভ হাসল। এতখানি পথের যাত্রা, তার ওপর প্রেমাভিসারের ক্লান্তির পরও চেহারার চটক ওর কিছু কমেনি! সূর্যের তাপের ছোঁয়া-

* এ-কাহিনীর বর্ণনা আছে 'সাগরে মিলায় ডন'-এর প্রথম খণ্ডে।

না-লাগা ফ্যাকাশে গালদুটোতে যেন ওর উৎসুক চোখেরই উত্তাপের ঝলক লেগেছে ; ইচ্ছাকৃতভাবে বাঁকানো ওর আঁকা ভুরুর ভঙ্গিতে আর হাসিমাখা ঠোঁটের প্রান্তে যেন উঁকি দিচ্ছে একটা বেপরোয়া কলঙ্কের চিহ্ন।

ভিতর দিকে পিছন ফিরে পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে ছিল একজন অফিসার। তাকে আস্তে ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দারিয়া বলল :

—বিধবা সেপাইবউয়ের রাস্তা ছাড় !

সিধে সিদোরিনের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় ও।

সহকারীর হাত থেকে সেন্ট-জর্জ পদকটা নিয়ে সিদোরিন কাঁপা হাতে সেটা দারিয়ার জামার বাঁদিকের বুকে পিন দিয়ে এঁটে দেন, আর হাসি-ভরা চোখে চেয়ে থাকেন ওর চোখের দিকে।

—তুমিই তাহলে সেই এনসাইন মেলেখফের স্ত্রী যে মার্চ মাসে মারা গিয়েছিল ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—এখুনি তোমাকে কিছু টাকাও পুরস্কার দেওয়া হবে। পাঁচশো রুবল। এই অফিসারই দেবেন। জঙ্গী আতামান আফ্রিকানো পেত্রোভিচ বোগায়েভস্কি এবং ডন অঞ্চলের গভর্নমেন্ট তোমাকে অসীম বীরত্বের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। তাঁদের সমবেদনাও জ্ঞাপন করছেন। তোমার দুঃখে তাঁরা গভীর সমবেদনা জানাচ্ছেন।

জেনারেল যা বললেন তার সবটা মাথায় ঢোকে না দারিয়ার। মাথা ঝুঁকিয়ে একবার ধন্যবাদ জানিয়ে সহকারীর হাত থেকে সে টাকাটা নিলে। জেনারেলের যৌবন এখনো একেবারে চলে যায়নি। তাঁর চোখের দিকে সোজা চেয়ে দারিয়া নীরবে হাসতে থাকে। দুজনই প্রায় সমান লম্বা। জেনারেলের শুকনো মুখখানা খুঁটিয়ে দেখতে বিশেষ কুণ্ঠা হল না দারিয়ার। সহজাত সব্যঙ্গ মনোভাব নিয়ে ও ভাবতে থাকে—আমার পিয়োত্রাকে এরা শস্তা লোক ঠাউরেছে, একজোড়া বলদের জোয়ালির দামে তার দাম কষেছে। তাহলেও অবিশ্যি এই জেনারেলটি তেমন খারাপ দেখতে নয় ; চলনসই।—সিদোরিন অপেক্ষা করছিলেন কখন দারিয়া যায়, কিন্তু তবু সে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। সহকারী সেনাপতি আর পেছনে দাঁড়িয়ে-থাকা অন্য সব অফিসাররা ভুরু উঁচিয়ে এ-ওকে ইশারা করে ফুর্তিবাজ বিধবাটিকে দেখায়, ওদের চোখ ঝিকমিক করছে মজা দেখে।

দারিয়া বললে, যেতে পারি ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়। তাড়াতাড়ি সিদোরিন সায় দিলেন।

একটু বেকায়দা ভঙ্গিতে দারিয়া টাকাটা গোঁজে জামার ফাঁকে। তারপর ফিরে আসে ভিড়ের মধ্যে। এত বক্তৃতা আর অনুষ্ঠানের পর ক্লান্ত হয়ে অফিসাররা এবার লক্ষ্য করতে থাকে ওর হাল্‌কা-পায়ে চলাফেরা।

মার্তিন শামিলের বিধবা বউটি সিদোরিনের কাছে এগিয়ে আসে দ্বিধাভরে। ওর পুরনো জামার ওপর যখন মেডেলটা এঁটে দেওয়া হল তখন ও কান্নায় ভেঙে পড়ল। সে এমনই অকৃত্রিম আর মেয়েলী আবেগভরা কান্না যে নিমেষের মধ্যে অফিসারদের মুখ থেকে পরিহাসের চিহ্ন উড়ে গিয়ে একটা গম্ভীর সমবেদনাময় তিক্ততা ফুটে উঠল।

মুখটা অন্ধকার করে সিদোরিন জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে তোমার স্বামীও খুন হয়েছিল?

কাঁদতে কাঁদতে দুহাতে মুখ ঢেকে নিঃশব্দে মাথা নাড়ল সে।

একজন কসাক ভারী গলায় মন্তব্য করলে, অনেক ছেলেপিলের মা ও, মস্ত বড় সংসার।

একটু বাদেই অতিথিরা জেলা দপ্তরের দিকে রওনা হলেন। তাড়াতাড়ি ছত্রভঙ্গ হয়ে লোকজন সবাই ছুটল ফসল তোলার কাজে। একপাল কুকুরের চেঁচানির মধ্যে গাড়িগুলো অদৃশ্য হয়ে যাবার একটু বাদেই দেখা গেল শুধু তিনজন বুড়ো মানুষ দাঁড়িয়ে আছে গির্জার বেড়ার ধারে।

দুহাত দুপাশে ছড়িয়ে একজন বললে, দিনকালও পড়েছে সেই রকম! সেকালে দেখতাম সেন্ট জর্জ পদক দেওয়া হত সত্যিকারের বড় কাজের জন্য, বীরত্বের জন্য। আর যাদের দেওয়া হত তারাও কি যে-সে লোক! কী সাহস তাদের, ভয় কাকে বলে কেউ জানত না! লোকজন কি আর সাধে বলত 'হয় লড়াইয়ে মর, নয়তো পদক নিয়ে ফেরো।' আর আজকাল এঁনারা মেয়েমানুষের গলায় মেডেল ঝুলিয়ে দিচ্ছেন। যদি মেয়েরা সত্যি-সত্যি কিছু করত আপত্তি ছিল না। কিন্তু। কসাকরা বন্দীদের গাঁয়ের ভেতর টেনে আনলে, আর মেয়েরা উকোনঠ্যাঙা দিয়ে নিরস্ত্র লোকগুলোকে খুঁচিয়ে মারলে। এর মধ্যে বীরত্বটা কোথায়? আমি তো বাবা বুঝি না, ঈশ্বর মাপ করুন।

আরেকজন বুড়ো চোখে কম দেখে, খুনখুনে। একপাশে টা সরিয়ে জেব থেকে আস্তে আস্তে একটা কাপড়ের থলে বের করে বলল:

—কর্তারা নভোচেরকাসে বসে হয়তো আমাদের চেয়েও ভালো দেখতে পান। আমার মনে হয় তাঁরা ভেবেছেন—মেয়েদেরকেও যাতে টানা যায়, তাদেরও কিছু দিতে হবে। যাতে করে সকলের উৎসাহ আসে। সবাই আরো ভালো করে লড়ে। এই মেডেল আর এই পাঁচশো টাকা, কোন্ মেয়েমানুষটা এমন তারিফ পেলে 'না' করবে শুনি? কেউ কেউ হয়তো লড়াইয়ে যেতে চায় না, লড়াই এড়িয়ে নিরাপদে থাকতে চায়, কিন্তু এখন কি আর তারা ঘরে থাকতে পারবে? ওদের বউরাই কান ঝালাপালা করে ছাড়বে। রাতের কোকিল চেঁচায় বেশী। সব মেয়েমানুষই ভাবতে শুরু করবে: 'হয়তো আমাকেও একটা মেডেল দেবে।'

তিন নম্বর লোকটা বাধা দিয়ে বললে, ফিওদোর ভায়া, তুমি বাজে বকছ। ওদের পুরস্কারের হক ছিল, পুরস্কার পেয়েছে। ওরা বিধবা হয়েছে, টাকা পেলে চাষবাসের সুবিধে হবে। মেডেল পেয়েছে সাহস দেখাতে পেরেছে বলে। কৎলিয়ারভকে মারার হিম্মত প্রথম হয়েছিল দারিয়া মেলেখভার। ভালো কাজই করেছিল! ভগবানই ওদের আসল বিচার করবেন ঠিকই, কিন্তু তাই বলে মেয়েদের তুমি দোষ দিতে পারো না। রক্তের ডাক শুনেছে ওরা…।

বুড়োরা তর্ক আর গালাগালি করে চলল যতক্ষণ না গির্জায় সন্ধ্যার ঘণ্টা বাজে। ঘণ্টা বেজে উঠতেই তিনজন দাঁড়িয়ে পড়ল। টুপি খুলে ক্রুশ-প্রণাম করে সাড়ম্বর ভঙ্গিতে দরজা পেরিয়ে গির্জায় ঢুকল তারা।

॥ চার ॥

মেলেখফ পরিবারে জীবনের ধারা যেভাবে বদলে গেল তা বিস্ময়কর। কিছুদিন আগে পর্যন্তও পান্তালিমন প্রকোফিয়েভিচ নিজেকে বাড়ির সর্ব-শক্তিমান কর্তা মনে করত, বাড়ির সবাই তাকে মেনেও চলত বিনাশর্তে। সবাই একসঙ্গে মিলে কাজ করত, দুঃখসুখের ভাগ নিত। ওদের গোটা অস্তিত্বের মধ্যেই ফুটে উঠত একটা দৃঢ়, কর্তব্যনিষ্ঠ সমঝোতার ভাব। সমস্ত পরিবারটাই ছিল একসঙ্গে শক্ত করে বাঁধা। কিন্তু সেই গত বসন্তকাল থেকে সব যেন ওলট-পালট হয়ে গেল। প্রথম গণ্ডি ভেঙে বেরিয়ে গেল দুনিয়া। সরাসরি বাপকে অমান্য করেনি সে, কিন্তু যে কোনো কাজ করতে হলেই ওর অনিচ্ছাটুকু প্রকাশ হয়ে পড়ত, কাজ যেন ওর নিজের জন্য নয়, মজুর খাটতে হচ্ছে নেহাত। চলনবলনেও বেশ গম্ভীর হয়ে গেছে, আর সকলের সঙ্গে তেমন মেশে না। আজকাল ওর প্রাণখোলা হাসিও শোনা যায় না।

গ্রিগর লড়াইয়ের ময়দানে চলে যাবার পর নাতালিয়াও বুড়োবুড়ীদের সঙ্গে তেমন মিশছে না। বেশীর ভাগ সময়ই কাটায় বাচ্চাদের সঙ্গে। ওদের সঙ্গেই যা-কিছু প্রাণখোলা আলাপ। ওদের নিয়েই পড়ে থাকা। আর মনে হয় কী যেন একটা আক্ষেপে নীরবে গুমরে মরছে ওর ভেতরটা।

কিন্তু পরিবারের আর কারুকে দুঃখের শরিক করতে ও একটি কথাও বলবে না। কারুর কাছে ওর নালিশ নেই, সব বোঝা ওর নিজের ঘাড়েই থাক।

আর দারিয়া—গাড়ি আর বলদ নিয়ে বাইরে ঘুরে আসার পর ওর সবটুকুই বদলে গেছে। শ্বশুরের সঙ্গে ওর খিটিমিটি ক্রমে বেড়েই চলেছে। ইলিনিচ্‌নার দিকে মোটেই নজর নেই। নিতান্ত অকারণে সকলের সঙ্গে ঝগড়া। অসুখের নাম করে ফসলতোলার কাজে হাত লাগায় না। ভাবটা যেন আর কটা দিনই বা সে আছে মেলেখফ বাড়িতে।

পান্তালিমনের চোখের ওপর দিয়ে গোটা পরিবার উচ্ছন্নে যেতে বসেছে। একলা পড়ে গেছে শুধু ও আর বুড়ী। দেখতে দেখতে পরিবারেব বাঁধন টুটে গেল কিছু ভাবতে পারার আগেই। সে নিবিড়তা কোথায় গেল সম্পর্কের! কথাবার্তায় ক্রমেই বেশী করে বিরক্তি আব শত্রুতাব ভাব ফুটে উঠেছে। সেই আগেব দিনের মতো আর একসঙ্গে টেবিল ঘিবে বসা হয় না একটা নিটোল পারিবারিক প্রীতিসম্পর্ক নিয়ে, এখন বসে নেহাতই যেন কয়েকজন মানুষ দৈবাৎ একজায়গায় মিলেছে বলে।

এসবেরই মূলে রয়েছে যুদ্ধ: পান্তালিমন সেটা ভালো রকমই বুঝতে পারে। দুনিয়া ওর বাপ-মায়েব ওপর ক্ষুব্ধ তাব কারণ মিশ্‌কা কশেভয়কে ওব বিয়ে করার সাধে বাদ সেধেছিল তারাই, অথচ ওই একটি মানুষ যাকে দুনিয়া ভালোবেসেছিল তাব কুমারী হৃদয়ের সবটুকু আবেগ উজাড় করে দিয়ে। চাপা স্বভাবের মেয়ে নাতালিয়াও নীরবে আর গোপনে যন্ত্রণা সয়ে যাচ্ছে আকসিনিয়ার সঙ্গে গ্রিগর নতুন করে জড়িয়ে পড়েছে বলে। পান্তালিমন সবই দেখতে পায়। কিন্তু পরিবারের আগেব শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পাবে না সে কোনমতেই। সত্যি বলতে কি, যা ঘটে গেছে তারপর আর নিজের মেয়েকে সে একটা গোঁয়ার বলশেভিকের হাতে তুলে দিতে পারে না, তাছাড়া, যদি বা সে বিয়েতে মত দিত তাতেই বা লাভ হত কতটুকু—জামাই হতভাগা তো কোথায় দাবড়ে বেড়াচ্ছে লড়াইয়ের মাঠে, তারপর তো আবার লালফৌজ—সোনায় সোহাগা। গ্রিগরেব ব্যাপারটাও তাই: অফিসারের উর্দিখানা যদি না থাকত তো পান্তালিমন তাকে দেখিয়ে দিত মজা। এমন শিক্ষা দিত যে আস্তাখফদেব বাড়িতে আব হ্যাংলা দৃষ্টি দিয়ে বেড়াতে হত না গ্রিগবকে। কিন্তু যুদ্ধই পণ্ড করে দিয়েছে সব—নিজের মনমতো সংসারটা দেখাশোনা করার সব সম্ভাবনা কেড়ে নিয়েছে বুড়োর হাত থেকে। যুদ্ধ ওর সব্বনাশ করল। আগের সেই কাজের উৎসাহ নষ্ট হয়ে গেছে, হারিয়েছে নিজের বড়ো ছেলেকে। পরিবারের মধ্যে যুদ্ধই ধরিয়ে দিয়েছে ঘূণ—দ্বন্দ্ব আর বিশৃঙ্খলা। পাকা গমের ক্ষেতের ওপর ঘনিয়ে-আসা ঝড়ের মতো ওর জীবনের আকাশেও ছেয়ে আছে

যুদ্ধ। তবু তো ঝড়ের পর গমের ফসল আবার তোলে মাথা, নতুন সূর্যের কিরণে আবারও ঝলমল করে তা। কিন্তু বুড়ো বুঝি আর মাথা তুলতে পারবে না। মনে মনে একেবারে হাল ছেড়ে দিয়েছে ও। হোক গে যা খুশী।

সেনাপতি সিদোরিনের হাত থেকে পুরস্কার পাবার পর উল্লসিত হয়ে উঠেছিল দারিয়া। সভা থেকে ফিরল আনন্দে অধীর হয়ে। চোখে ঝিলিক তুলে নাতালিয়াকে দেখাল মেডেলটা।

নাতালিয়া অবাক হয়ে বললে, ওটা তুমি পেলে কেমন করে?

আমার ইভান ইভানোভিচ্ ভাইটির কল্যাণে। কুত্তীর বাচ্চা শান্তিতে থাক। আর এটি হল পিয়োত্রার জন্য।—বলে সগর্বে কড়কড়ে ডন-সরকারী নোটের তাড়াটা সে খুলে ধরল।

কিন্তু এরপরেও মাঠে গেল না দারিয়া। পান্তালিমন ওকে খাবার বয়ে নিয়ে যাবার জন্য বলেছিল কিন্তু মুখের ওপর সাফ জবাব দিয়ে বসল ও

—আমায় ঘরে থাকতে দাও বাবা, এতটা ঘুরে এসে বড় হয়রান হয়ে পড়েছি।

বুড়োর মুখখানা আঁধার হয়ে যায়। ঝাঁঝালো জবাবটাকে একটু নরম করবার জন্য দারিয়া আবার ঠাট্টার ঢঙে বলে

—আজকের দিনটায় আমাকে জোর করে মাঠে ঠেলে পাঠাতে চাইলে যে পাপ হবে তোমার। আজকের দিন আমার ছুটি।

বুড়ো রাজী হয়ে বললে, বেশ, খাবার আমিই নিয়ে যাব। তবে, টাকাটার কী হবে।

—টাকাটার আবার কী হবে?—অবাক হয়ে ভুরু উঁচোয় দারিয়া।

—বলছি, টাকাটা দিয়ে কী করবে ঠিক করেছ?

—সে আমার দায়। কী করব সে আমিই বুঝব।

—কিন্তু ও টাকা তো কী বলতে চাও, টাকা তোমাকে পিয়োত্রার জন্য দিয়েছে না?

—দিয়েছে আমাকে, ও টাকার ওপর তোমার হাত নেই।

—কিন্তু তুমি তো এ পরিবারেরই লোক?

—হ্যাঁ। পরিবারের লোক হলেই বা তোমার কী? টাকাটা কি তুমি নিজের ভোগে লাগাবে নাকি?

—না, পুরো টাকাটার কথা বলছি না। তবে পিয়োত্রা তো আমাদেরও ছেলে, বল? বুড়ী আর আমি দুজনেই ভাগ পেতে পারি।

বুড়োর দাবি বাধা হল নিতান্তই দুর্বল কণ্ঠে, দারিয়া সজোরে দাবিয়ে দিলে তাকে। শান্ত গলায় বিদ্রূপ করে বললে:

—কিছুই দেব না তোমাকে। একটি পাই পয়সাও না। এতে তোমার

ভাগ কিছুই নেই। যদি থাকত তাহলে তোমার হাতেই দিত। আর ভাগ-বাঁটরা নিয়ে অত লাফ-ঝাঁপই বা কীসের? ভাগের কথা তো কেউ বলেনি। আমার টাকার জন্য তোমার হাত বাড়াতে হবে না, টাকা তুমি পাবে না।

পান্তালিমন একবার শেষ চেষ্টা করে।

—আমাদের সঙ্গে থাক, আমাদের খাও। তার মানে সবকিছুই মিলেমিশে ভোগ করা দরকার। যে যার নিজের কোলে ঝোল টানতে শুরু করলে শৃঙ্খলা থাকবে কোথায়? আমি তা হতে দেব না।

কিন্তু এততেও চিঁড়ে ভিজল না—দারিয়া তার এই শেষ চেষ্টাও অগ্রাহ্য করে উড়িয়ে দিল। ছুকান কাটার মতো হেসে বললে:

—তোমার সঙ্গে তো আমার বিয়ে হয়নি বাবা। আজ তোমাদের সঙ্গে আছি, কাল হয়তো আমার বিয়ে হয়ে যাবে, তখন আমার ওপর যেন নজর দিয়ো খুশী হয়ে! আর, আমার খোরাকীর জন্য টাকা দিতে আমার বয়েই গেছে। দশ বছর তোমার সংসারে ঘানি টেনেছি, শিরদাঁড়া সোজা করিনি।

পান্তালিমন চটেমটে চেঁচিয়ে ওঠে, ওরে হতচ্ছাড়ী শয়তানী। তার নিজের জন্য কামাই করেছিস তুই!—আরো কী কী যেন সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললে, কিন্তু দারিয়া আর শোনবার জন্য দাঁড়ায় না। ঘাগরার কিনারাটা উঁচিয়ে বুড়োর নাকের ডগা দিয়ে সোঁ করে ঘুরে চলে গেল অন্দর মহলে। তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে চাপা গলায় বললে, বুড়ো ভুল জায়গায় হাত বাড়িয়েছিল।

আলোচনার এইখানেই ইতি। আর সত্যি কথাই, দারিয়া সে জাতের মেয়ে নয় যে বুড়োর ধমকানিতে নিজের হক ছেড়ে দেবে।

মাঠে যাবার জন্য তৈরি হয় পান্তালিমন। কিন্তু যাবার আগে অল্প একটু কথা হল ইলিনিচ্‌নার সঙ্গে।

বললে, দারিয়ার ওপর একটু নজর রেখো।

—কেন গো, নজর রাখার কী হল?—অবাক হয়ে বুড়ী বললে।

—মানে, হঠাৎ যদি হাতছাড়া হয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়, আর সঙ্গে আমাদের জিনিসপত্তর কিছু নিয়ে যায়। আমার তো মনে হয় এমনি-এমনি পাখ্‌না মেলেনি ও পাখি··· । বেশ বোঝা যাচ্ছে কোনো ছোকরা নাগর জুটিয়েছে, একদিন সময় বুঝে গলায় ঝুলে পড়বে।

নিঃশ্বাস ফেলে ইলিনিচ্‌না সায় দেয়—যা বলেছ হয়তো তাই। গাঁয়ের সীমানার নিচু জাতের মেয়েদের মতো থাকে—কিছুই তার ভালো লাগে না। কিছুই মনমতো নয়। আজকাল তো আমাদের সকলের থেকে আলাদাই ওর ওঠা-বসা সব কিছু। তা যতই চেষ্টা কর না বাপু। একবার পেয়ালা ভাঙলে তা জোড়া দেওয়া শক্ত।

—আবার তাকে জোড়া লাগাবার চেষ্টাই বা কেন! বোকা বুড়ী, যদি

সে চলেই যেতে চায় তো আটকাবার কথাও ভেবো না। যাক চলে। অনেক হয়রানি হয়েছে ওকে ঘাঁটাতে। পান্তালিমন গাড়িতে উঠে বসে। বলদ হাঁকাবার সঙ্গে সঙ্গে বাকি কথাটুকু সেরে ফেলে: ও কাজ এড়াবার চেষ্টা করছে, মাছির হাত থেকে কুকুর যেমন নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে, তেমনি। এদিকে তালে আছে সবসময় ভালো জিনিসটায় ভাগ বসাবার আর ফুর্তি করার। এখন তো পিয়োত্রা নেই, ঈশ্বর তার আত্মাকে শান্তি দিন, এখন আর এসব আপদ সংসারে রাখাই বা কেন। ওটি তো মেয়েমানুষ নয়, একটি নোংরা ব্যায়রাম বিশেষ।

বুড়োবুড়ীর ধারণা কিন্তু ভুল। দারিয়া মোটেই নতুন করে বিয়ে করার কথা ভাবছিল না। বিবাহিত জীবনের কথাই তাব মাথায় ছিল না। ওর মনে ছিল অন্য একটি বোঝা। ..

* *

সেদিন সাবাদিনটাই সে মিলেমিশে, ফুর্তি কবে কাটিয়েছে। এমন কি পযসা নিয়ে ঝগডাও দমাতে পারেনি ওকে। অনেকক্ষণ ধবে আয়নার সামনে ঘুবেফিবে দেখল নিজের চেহারা, ঘুবিয়েফিরিযে দেখল পদকটাও। পাঁচবার পোশাক পবল, পাঁচবাব বদলাল, দেখল কোন্ জামাটাব সঙ্গে ওব ডোবাদার 'জর্জ' ফিতে মানায় ভালো। তামাশা কবে বলল: এবাব আবো কিছু ক্রস্ বাগাতে হয়।—তাবপর ইলিনিচ্নাকে ডাকল শোবার ঘবে। বুড়ীর হাতের মুঠোয় দুটো কুড়ি-রুবলের নোট গুঁজে নিজেব বুকের ওপর হাতটা উত্তপ্ত হাতে চেপে ধবল সে। ফিসফিস কবে বলল: এ টাকাটা পিয়োত্রার কল্যাণের জন্য। ওর নামে উপাসনার ব্যবস্থা কোবো আর গির্জায় কিছু শিবনি তৈরি কবে পাঠিও।* —বলতে বলতে কেঁদে ফেলল সে। কিন্তু মিনিটখানেক বাদে জলভরা চোখ নিযেই সে খেলতে লাগল মিশাংকার সঙ্গে, পশমেব শালটা ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে লাগল ওব কাঁধে আর এমনভাবে হাসতে লাগল যেন আগে সে কখনো কাঁদেইনি, সারা জীবনেও যেন চোখেব জলেব নোনতা স্বাদ সে পায়নি।

দুনিয়া মাঠ থেকে ফিবতে আরো উচ্ছল হয়ে উঠল দারিয়া। ওকে বলতে লাগল কেমন কবে মেডেলটা দেয়া হল, জেনারেল সাহেব কেমন গম্ভীর গলায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাও নকল করে শোনাল সে। তারপব নাতালিয়ার দিকে তাকিয়ে রঙ্গ কবে চোখ মটকে গম্ভীর মুখে দুনিয়াকে শুনিয়ে দিলে—শিগগিরই সেণ্ট-জর্জ পদকপ্রাপ্তা একজন অফিসারের বিধবা পত্নী হিসাবে সে, অর্থাৎ শ্রীমতী দারিয়া স্বয়ং অফিসার-পদে উন্নীত হবে এবং একদল বুড়ো

* গির্জাব স্মৃতি-উপাসনায় তখনকার দিনে যব, চাল আর মধু কিসমিস দিযে শিবনি বানিযে পাঠানাব বেওয়াজ ছিল।

কসাককে পরিচালনা করার ভার পড়বে তার ওপর। নাতালিয়া বসে-বসে বাচ্চাদের জামা রিফু করছিল আর হাসি চেপে রেখে শুনছিল দারিয়ার কথা। কিন্তু দুনিয়া তখন একেবারে তাজ্জব বনে গেছে। হাত জোড় করে জিজ্ঞেস করলে :

—দোহাই দারিয়া। ও দারিয়া। বাজে গল্প নয় তো বল, যিশুর দিব্যি? বুঝতে পারছি না তোমার কোন্‌টা বানানো, আর কোন্‌টা সত্যি। ঠিক করে বলই না ছাই সব কথা।

—বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথা? তাহলে তুই সত্যি-সত্যিই হাঁদা মেয়ে। ঠিক যা হয়েছে তাই বলছি তো। অফিসাররা তো সবাই লড়াইয়ে, বুড়োদের কে শেখাবে কেমন করে মার্চ করতে হয়, সেপাই হলে কী-কী করতে হয়? সবুর কর না, আমার হেপাজতে আসুক না বেটা বুড়োর দল, দেখিয়ে দেব কীভাবে ওদের চালাতে হয়।—রান্নাঘরের দিকের দরজাটা দারিয়া ভেজিয়ে দিলে যাতে শ্বশুর না ওদিক থেকে দেখে ফেলে। তারপর চট করে ঘাগরার প্রান্তটা দু-পায়ের ফাঁকে মালকোচা দেবার মতো গুঁজে পেছন থেকে তা এক হাতে টেনে ধরল। আ ঢাকা হাঁটুজোড়া ওর চকচকে দেখাচ্ছিল। সেই অবস্থায় ঘরের ভেতর দিয়ে মার্চ করতে করতে সে দুনিয়ার সামনে এসে থমকে দাঁড়াল, বাশভারী গলায় হুকুম দিলে বুড়োর দল, অ্যাটেন্‌শন। মাথা উঁচু কর। বা দিকে গোল হয়ে ঘোর।

দুনিয়া আর সামলাতে পারলে না হো হো করে হেসে উঠল দু হাতে মুখ ঢেকে। ওর হাসির ফাঁকে ফাঁকে ওদিক থেকে নাতালিয়া বললে

—উঃ ঢের হয়েছে। যত সব অকাজের কাণ্ড।

—ও, এ বুঝি অকাজ হল? আর তোমার জীবনে কোন সুকাজটা করেছ শুনি? একটু হাত পা না মেললে এ বাড়িতে পড়ে থেকে যে একেবারে পচে যাবে।

কিন্তু দারিয়ার উচ্ছ্বাস যে-ভাবে আচমকা শুরু হয়েছিল, সেই ভাবেই দপ করে নিভে গেল। আধঘণ্টা বাদে নিজের কামরায় ফিরে এল সে। রাগ করে বুক থেকে অলক্ষুণে পদকটা ছিঁড়ে সিন্দুকের মধ্যে ছুঁড়ে দিল। তারপর গালে হাত রেখে অনেকক্ষণ জানালার ধারে বসে রইল। রাতে কোথায় না কোথায় যেন বেরিয়ে চলে গেল, আর ফিরল সেই ভোরে মোরগ ডাকার সময়। এরপর চারদিন সে একটানা খাটুনি খাটল খামারে।

* * *

এদিকে ঘাস কাটার অবস্থা আর কহতব্য নয়। মুনিষের অভাব। একদিনে চার একরের বেশী কাটা যায় না। কাটা ঘাস বৃষ্টিতে ভেজে,

তাতে আরো কাজ বাড়িয়ে দেয়: আঁটিগুলো খুলে ছড়িযে দিতে হয় রোদে। একসঙ্গে পালা করে রাখতে না রাখতেই ফের শুরু হয় জোর বৃষ্টি, সন্ধ্যে থেকে ভোর অবধি চলে শরৎকালের মতো একটানা। তারপর পরিষ্কার আবহাওয়া। পুবালী বাতাস বয়, স্তেপের মাঠে আবার কড়কড় করে ওঠে ঘাস-কাটা কল। কালো হয়ে ওঠা ঘাসের গাদা থেকে একটা মিঠে-তেতো গন্ধ ভেসে আসে ছাতা-ধরার মতো। কুয়াশায় ঢাকা স্তেপের প্রান্তর, তারই মাঝে-মাঝে মাথা জাগিয়ে থাকা টিলাগুলোর অস্পষ্ট ছায়ারেখা। আবছা নীল কুয়াশার ভেতর দিয়ে যেন একটু-একটু ফুটে বেরোয় পাহাড়ী খাদের নীল গর্ত, দূরের খানাডোবার ওধার থেকে জেগে ওঠে বেতসের সবুজ মাথাগুলো।

চারদিনের দিন দারিয়া মাঠ থেকে সোজা সদরে যাবার জন্য তৈরি হয়। দুপুরবেলায় যখন অবসর নেবার জন্য সবাই খামারের চালার নিচে বসেছে তখন নিজের মতলবটা ব্যক্ত করলে দারিয়া।

বিরক্তি আর বিদ্রূপ-মেশা গলায় পান্তালিমন জিজ্ঞেস করলে:
—এত তাড়াহুড়ো কিসের? রোববার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পার না?

—আমার কাজ রয়েছে, সবুর করা চলবে না।

—এক দিনও নয়?

দাঁতে দাঁত চেপে দারিয়া জবাব দেয়. না।

—তা, যখন তর সইছে না একদমই, এত গরজ, বেশ তো যাও না। কিন্তু, সে কী এমন জরুরী কাজ যে তোমাকে যেতেই হবে? সে-কথা আমরা জানতে পারি কি?

—অতো বেশী জেনে ফেললে যে অকালে পরমায়ু ফুরিয়ে যাবে।

যেমন বরাবর হয়ে থাকে, দারিয়া আর কথা বাড়ায় না। পান্তালিমন বিরক্ত হয়ে থুতু ফেলে। আর বেশী প্রশ্ন করে না।

পরদিন জেলা সদর থেকে ফেরার পথে দারিয়া তাতারস্কের বাড়ি হয়ে এল। বাড়িতে শুধু ইলিনিচনা আর বাচ্চারা ছিল। মিশাৎকা ছুটে আসছিল তার খুড়ীর দিকে, কিন্তু দরিয়া তাকে গম্ভীরভাবে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে শাশুড়ীকে জিজ্ঞেস করলে:

—নাতালিয়া কোথায় মা?

—সব্‌জি বাগানে। আলুখেতে জল দিচ্ছে। ওকে তোমার কী দরকার? বুড়ো বুঝি ডেকে পাঠিয়েছে? পাগল হয়ে গেল নাকি? বুড়োকে বলে দাও আমি এই কথা বলছি।

—কেউ ডেকে পাঠায়নি। ওর সঙ্গে আমার একটু কথা ছিল।

—হেঁটে এলে নাকি?

—হ্যাঁ।

—আমাদের মুনিষদের কাজ শেষ হবে তাড়াতাড়ি ?

—কালই হয়তো শেষ হবে।

—কিন্তু একটু সবুর, কোথায় দৌড়চ্ছো ফের ? বৃষ্টিতে কী অনেকটা ফসল নষ্ট হল ? —বুড়ী কাতরভাবে প্রশ্ন করে আর দারিয়া সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় পিছু পিছু ছুটে আসে।

—না, না, তেমন বেশী নয়। আচ্ছা, আমি চলি, হাতে সময় নেই ·।

—বাগান থেকে ফেরার সময় একবার এসো, বুড়োর জামাটা নিয়ে যেও। শুনলে বাছা··· ?

দারিয়া যেন শুনতে পায়নি এমনি ভান করে চলল গোয়াল ঘরের দিকে। নদীর ধারে ঘাটের সিঁড়ির কাছে এসে থামল সে। তারপর আধ-বোজা চোখে তাকিয়ে রইল ডনের সবুজ বিস্তারের দিকে। নদীর তাজা ভিজে হাওয়ায় কাঁপন ধরিয়ে দিলে ওর শরীরে। নদীর ধার দিয়ে হেঁটে বাগানের দিকে চলল দারিয়া।

ডনের ওপর দিয়ে একটা কেমন হাওয়া বইছে, চক্কোর দিচ্ছে গাঙচিলের দল। ঢালু পাড় বেয়ে অলস-মন্থরভাবে গুঁড়ি মেরে উঠছে জল। ওদিকে সূর্যের নিচে অল্প-অল্প ঝিকমিক করছে খড়িমাটির টিলাগুলো, স্বচ্ছ নীলচে বেগুনী কুয়াশার মোড়ক দেওয়া। নদীর ওপারের বর্ষা-ধোয়া বনটাকে দেখাচ্ছে তরতাজা সতেজ সবুজ—যেমনটা হয় বসন্তের গোড়ার দিকে।

পা দুটো দপদপ করছিল। জুতোজোড়া খুলে দারিয়া জলে পা ধুয়ে নিল। অনেকক্ষণ বসে রইল নদীর পাড়ে তপ্ত কাঁকরের ওপর। হাতের তেলোয় সূর্যটাকে আড়াল করে কান পেতে শুনতে লাগল গাংচিলের আকুতিভরা ডাক,—জলের একটানা ছলাৎ ছলাৎ শব্দের তালে। এই নৈঃশব্দ্য আর গাংচিলের বুকফাটা কান্না ওর চোখে জল এনে দিল। যে দুর্ভাগ্য আজ এমন অপ্রত্যাশিতভাবে এসে পড়েছে ওর জীবনে, এখন যেন তা আরো দুর্বিষহ আর তিক্ত হয়ে উঠল।

* * * *

নাতালিয়া অতি কষ্টে পিঠ সোজা করে ওয়াট্‌ল্‌-লতার বেড়ার ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ছিল। এমন সময় দারিয়ার ওপর নজর পড়তেই ও এগিয়ে গেল।

—আমার খোঁজে এসেছিলে, দাশা ?

—তোমার কাছে এসেছি নিজের ঝামেলা নিয়ে ···

পাশপাশি বসে দুজনে। নাতালিয়া ওড়না সরিয়ে চুলটা গুছিয়ে নেয়। উৎসুক হয়ে তাকিয়ে থাকে দারিয়ার দিকে। গত কয়েকদিনে

দারিয়ার চেহারায় যে পরিবর্তন ঘটেছে অবাক হয়ে তা-ই দেখে ও: গাল দুটো বসে গেছে, কালচেপানা। কপালে গভীর ভাঁজের রেখা। চোখের মধ্যে একটা জ্বরো-জ্বরো ভাবের সোদ্বেগ চাউনি।

—ব্যাপার কী তোমার? মুখটা দেখি একেবারে কালো হয়ে গেছে। —দরদভরা গলায় প্রশ্ন করে নাতলিয়া।

—আমার জায়গায় হলে তোমারও মুখ কালো হত। —জোর করে হাসে দারিয়া, তারপর চুপ করে যায়। —তোমার কি অনেকটা কাজ বাকি আছে এখনো?

—সন্ধ্যে নাগাদ শেষ করে ফেলব। কিন্তু তোমার ব্যাপার কী বলো তো?

দারিয়া অস্থিরভাবে খানিকটা থুতু গিলে ফেলে তাড়াতাড়ি জবাব দেয় ভোঁতা গলায়:

—বলছি তোমাকে। আমার অসুখ হয়েছে একটা খারাপ ব্যায়রাম। এই শেষবার বেড়াতে গিয়ে বাধিয়ে ফেললাম।... এক হতভাগা অফিসারের কাছ থেকে।

ভয়ে ভাবনায় হাত দুটো রগড়ে নাতালিয়া বললে, তাহলে ফুর্তির মাশুল দিয়েছ বলতে হবে।

—হ্যাঁ, তা দিয়েছি বটে। এখন কিছু বলারও নেই, কারো নামে নালিশ করারও নেই। এ আমার নিজেরই গোস্তাকি। শয়তানটা আমার সঙ্গে জমিয়ে ফেলল, ভজিয়ে ভাজিয়ে। হতভাগার দাঁতগুলো সাদা চকচকে হলে কি হবে ভেতরটা একেবারে ঘূণধরা। —আর এখন আমি তো সাবাড়।

—হারে হতভাগী! এখন কি হবে? কী করবে এখন ঠিক করেছ?— চোখ দুটো বড়ো বড়ো করে দারিয়ার দিকে তাকিয়ে রইল নাতালিয়া। দারিয়া নিজের পায়ের দিকে চেয়ে থেকে খানিকটা ধাতস্থ হয়ে আগের চেয়ে শান্তভাবে বলতে লাগল:

—ফেরার পথেই একটু একটু লক্ষ্য করতে শুরু করেছিলাম বুঝলে। প্রথমে ভাবলাম, হয়তো এমনি। জান তো মেয়েমানুষের কতরকম ঝামেলা হয়। গতবার বসন্তকালে এক বস্তা ময়দা তুলতে গিয়ে তিন হপ্তা সমানে মাসিক চলল। অবিশ্যি এবার বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা ঠিক এক রকম নয়। লক্ষণগুলো ধরা পড়ল। কাল সদরে গিয়েছিলাম ডাক্তার দেখাতে, লজ্জায় মরে যাবার কথা। কিন্তু এখন তো যা হবার হয়েই গেছে। ... সতী মেয়ের পুরস্কার জুটে গেল।

—সেরে ওঠ এখন যে করে হোক, তবে একটু লজ্জার ব্যাপার হল, এই। এ ব্যায়রাম নাকি ভালো করা যায় শুনেছি।

—না ভাই, আমার যা অসুখ তা সেরে ওঠার নয়। —দারিয়া

কাষ্ঠহাসি হেসে এই প্রথম একবার জলজলে চোখ তুলে চাইলে—আমার সিফিলিস্‌ হয়েছে। এর আর কোনো ওষুধ নেই। শুনে নাক সিঁটকোলে তো······। ঠিক বুড়ী আম্ব্রোনোখা মাসীর মতো।—তাকে কখনো দেখেছ?

—এখন কী করবে?—কাঁদো-কাঁদো গলায় নাতালিয়া বললে। চোখদুটি ওর জলে ভরে উঠেছে—।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল দারিয়া। একটা ভুট্টার ডাঁটির সঙ্গে জড়িয়ে-থাকা গোল ফুল ছিঁড়ে চোখের খুব কাছে নিয়ে দেখতে লাগল। ছোট্ট ফুলের পেলব, গোলাপী কিনারাওলা পাপড়ি কী হালকা পাতলা, যেন টেরই পাওয়া যায় না হাতে, রোদে-জ্বলা মাটির ভারী সোঁদা গন্ধ তা থেকে। দারিয়া এমনভাবে উদ্‌গ্রীব উৎসুকভাবে চেয়ে থাকে ফুলটার দিকে যেন আগে আর কখনো এই অতি-চেনা মামুলী একটা ফুল সে দেখেনি। তারপর হাওয়ায়-শুকিয়ে-ওঠা ফাট-ধরা মাটির ওপর সাবধানে ফুলটাকে রাখে সে। বলে:

—কী করব তাই বলছ? সদর থেকে ফিরতে ফিরতে সারাপথ কেবলি ভেবেছি আর মতলব ঠাউরেছি। আত্মহত্যা করব: সেই ঠিক হবে। দুঃখের কথা, কিন্তু ওছাড়া উপায়ই বা কী। যদি অসুখ সারাবার চেষ্টা করি, তাতে লাভ নেই কিছু। গাঁয়ের সবাই ঠিক জেনে ফেলবে। তখন আমার দিকে আঙুল দেখাবে, মুখ ফিরিয়ে হাসবে। এখন আমার এই অবস্থায় কে আমাকে চাইবে বল? চেহারা খারাপ হয়ে যাবে। একেবারে শুকিয়ে যাব, জ্যান্ত অবস্থায় পচব। সে আমার দরকার নেই গো!—এমনভাবে বলতে থাকে দারিয়া, যেন নিজের মনেই আলোচনা করছে সমস্যাটা নিয়ে। নাতালিয়া প্রতিবাদ জানিয়ে হাত নাড়ে কিন্তু সেদিকে নজর নেই দারিয়ার। ভিয়েশেনস্কায় যাবার আগে ভেবেছিলাম যদি খারাপ অসুখ থাকে সারিয়ে নেব। সেইজন্যই শ্বশুরকে টাকাটা দিইনি। ভাবলাম ডাক্তারদের দিতে হতে পারে, কাজে লাগবে। কিন্তু এখন মন বদলেছি। আর বিরক্তও ধরে গেছে সব কিছুতে। অসুখ সারাতে চাই না।

দারিয়া মদ্দ মানুষের মতো বিশ্রীরকম একটা গালাগাল ছেড়ে থুতু ফেলল। বড় বড় চোখের পাতায় লেগে-থাকা দু ফোঁটা জল মুছল হাতের পেছন দিক দিয়ে।

—কী সব যাতা বলছ । ভগবানের ভয় নেই তোমার । নিচু গলায় নাতালিয়া বললে।

—ভগবান! ভগবানকে আমার দরকার কিসে এখন! সারা জীবন তিনি তো আমার বাদই সাধলেন· ·। হাসল দারিয়া। এক লহমার সেই দুষ্টুমিভরা তির্যক হাসির মধ্যে নাতালিয়া খুঁজে পেল সেই

পুরানো দারিয়াকে।—এ করো না, সে করো না। সবাই পাপের ভয় দেখায় শেষ বিচারের দিনের কথা বলে। অনেক হয়েছে, আর নয়, নাতালিয়া। কাউকেই আমার সহ্য হয় না। নিজেকে শেষ করে দিতে আমার কোনো কষ্ট হবে না। আমার কোন মায়াই নেই, না সামনে, না পেছনে। এমন কেউ নেই যার জন্য আমার বুক ভেঙে যাবে। তবে যা বলছি তা সত্য।

নাতালিয়া তর্ক করে বোঝাতে চেষ্টা করে দারিয়াকে। মন থেকে আত্মহত্যার কথা মুছে ফেলতে বলে কিন্তু দারিয়া প্রথমে অন্যমনস্কভাবে শুনতে থাকলেও শেষে সামলে নিয়ে হঠাৎ রাগ করে বলতে থাকে :

—ছাড় দিকি নাতালিয়া ওসব। আমি এখানে তোমার ওকালতি শুনতে আসিনি। আমি এসেছিলাম আমার নিজের ঝামেলার কথা বলতে আর সাবধান করে দিতে যাতে তোমার ছেলেপিলেরা আজ থেকে আর আমার কাছ না ঘেঁষে। আমার ব্যারামটা ছোঁয়াচে, ডাক্তাররা তাই বলে। আমি চাই না ওরা আমার কাছ থেকে এ ব্যারাম বাধাক। সেটা দেখতে পাও না, বোকা কোথাকার। আর বুড়ীকে এসব কথা তুমিই বোলো, আমার সাহসে কুলচ্ছে না। তাই বলে, আমি কিন্তু এখনই গলায় ফাঁস দিচ্ছি না। সে-কথাও ভেবো না। তার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে আরো কিছুদিন বাঁচতে হবে। ফুর্তি করে নিতে হবে, তারপর বিদায় নেব। আমরা কী জাতের মানুষ তা তো জানো। যতক্ষণ না মরণে টান পড়ে ততক্ষণ চলতে থাকি অন্ধের মতো। যে জীবনটা কাটিয়ে এলাম সেটাই দেখ না। অন্ধের মতোই চলেছি এতদিন। তারপর যখন ভিয়েশেন্‌স্কা থেকে ডনের ধার দিয়ে আসতে লাগলাম আর ভাবতে লাগলাম এসবই তো শিগ্রি ছেড়ে চলে যেতে হবে, তখন যেন চোখ খুলে গেল। তাকালাম ডনের দিকে, তিরতির করছে ঢেউ, রোদ পড়ে খাঁটি রুপোর মতো এমন ঝকঝক করছে আর নাচতে লেগেছে যে তাকালে চোখে ধাঁধা লাগে। চারদিক চেয়ে দেখতে থাকি মরি মরি কী সুন্দর শোভা। অথচ আগে কোনো দিন চোখ মেলেও দেখিনি।—দারিয়া বে-শরমের মতো হাসে। তারপর চুপ করে যায়। হাতের মুঠো শক্ত করে চেপে ঠেলে-ওঠা কান্নাটাকে রুখে আবার বলতে শুরু করে আগের চেয়ে উঁচু গলায়—রাস্তায় আসতে আসতেই তো কবার কেঁদেছি। গাঁয়ের কাছে এসে দেখি বাচ্চাকাচ্চার দল নদীতে চান করছে। ওদের দিকে তাকাতে বুকটা কেমন ভারী হয়ে উঠল হঠাৎ। বোকার মতো হাউ হাউ করে কাঁদলাম। বালির ওপর পড়ে রইলাম দু'ঘণ্টা। যদি স্থির হয়ে ভাবি তাহলে আর মরা অতো সহজ মনে হয় না…।

উঠে দাঁড়িয়ে ঘাগরাটা ঝাড়ল দারিয়া। তারপর অভ্যাস মতো মাথার ওড়নাটা ঠিক করে নিল।

—মরার কথা ভাবলে শুধু আনন্দ হয় এইটুকু জেনে যে পরপারে গিয়ে পিয়োত্রার দেখা পাব আবার। তখন বলব, 'ওগো, এবার ফিরিয়ে নাও তোমার অসতী স্ত্রীকে।'—বরাবরকার মতো একটা ব্যঙ্গাত্মক ভাঁড়ামির ভঙ্গি করে দারিয়া বললে, কিন্তু, ওখানে তো সে আর আমাকে মারতে পারবে না, স্বর্গে ঝগড়াটে লোকদের জায়গা নেই, কেমন কিনা? যাকগে, এবার বিদায় হই, নাতালিয়া বোনটি! মাকে কিন্তু বলতে ভুলো না অসুখের কথাটা।

নাতালিয়া বসে রইল পাতলা ময়লা দুটো হাতের তেলোয় চোখ ঢেকে। পাইন-কাঠের টুকরোয় জমে-ওঠা রজনের মতো ওর আঙুলের ফাঁকে চিকচিক করছিল চোখের জলের কয়েকটা ফোঁটা। দারিয়া লতা-জড়ানো ফটকটা অবধি গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে সাদা-মাটা গলায় বললে :

—আজ থেকে আমি আলাদা থালা-গেলাসে খাব। মাকে বলে দিও। ও হ্যাঁ, আরেকটা কথা : তাকে বোলো যেন বাবাকে ঘৃণাক্ষরেও কিছু না জানায়। নয়তো বুড়ো পাগল হয়ে যাবে, আমাকে বাড়ি থেকে খেদিয়ে দেবে। তাহলে তো সোনায় সোহাগা। এখন সোজা খেতের কাজে চললাম। আসি তাহলে।

* * * * *

পরদিন স্তেপের মাঠ থেকে চাষীরা ফিরল। দুপুরের খাওয়া হয়ে যাবার পর খড়গুলো গাড়িতে তুলতে শুরু করবে ঠিক করেছে পান্তালিমন। বলদগুলোকে ডনের ধারে জল খাওয়াতে নিয়ে গেল দুনিয়া। আর খাবাবের ব্যবস্থা করতে লাগল ইলিনিচনা আর নাতালিয়া।

দারিয়া খেতে আসে সবার শেষে। এক কোণে বসে। ইলিনিচনা একটা ছোট প্লেটে কপির ঝোল এগিয়ে দেয় ওর সামনে, একটা চামচে আর এক টুকরো রুটিও দেয়। আর সকলের জন্য বরাবরকার মতো একটা প্রকাণ্ড বারোয়ারী গামলায় ঝোল ঢেলে দেয়।

পান্তালিমন অবাক হয়ে গিন্নির দিকে তাকায়, চোখের ইশারায় দারিয়ার প্লেটটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করে :

—ও আবার কী? ওর ঝোলটা আলাদা ঢেলে দিলে যে? ও কী আমাদের জাত ছেড়েছে?

—তোমার অতো মাথাব্যথা কেন? গেলো না যেমন গিলছ।

দারিয়ার দিকে বুড়ো কৌতুক করে চেয়ে হেসে বলে :

—ওহো! বুঝেছি! মেডেল পেয়েছে বলে আর সকলের সঙ্গে খেতে

ওর মন চাইছে না! কী ব্যাপার দারিয়া? আমাদের সঙ্গে এক গামলায় খেতে বুঝি নাক কুঁচকে আসে?

—না, নাক সিঁটকোইনি আমি। খাব না একসঙ্গে।—ধরা গলায় জবাব দেয় দারিয়া।

—কেন বল তো?

—গলায় অসুখ করেছে।

—তাতে আর এমন কী হয়েছে?

—ভিয়েশেন্‌স্কা গিয়েছিলাম ডাক্তার দেখাতে। ডাক্তার বললে আলাদা থালা-বাসনে খেতে।

—আমারও একবার গলায় ঘা হয়েছিল, কিন্তু আমি তো বাপু আর সবার থেকে আলাদা হইনি, আর ভগবানের আশীর্বাদে আমার ব্যারাম আর কাকুকে ধরেওনি। তাহলে তোমার গলায় কেমনধারা অসুখ কবল?

ফ্যাকাশে হয়ে যায় দারিয়া। হাত দিয়ে ঠোঁট মুছে চামচেটা নামিয়ে রাখে। স্বামীর ফোপরদালালিতে চটে গিয়ে ইলিনিচ্‌না চড়া গলায় ধমক লাগায়:

—ও মেয়েমানুষটাকে অমন জ্বালাতন করছ কেন? তোমার জন্য খেতে বসেও শান্তি নেই। লেগে আছে ছিনে জোঁকের মতো, রেহাই নেই।

পান্তালিমন বিরক্ত হয়ে খেঁকিয়ে ওঠে—কিন্তু এসব ব্যাপার কিসের জন্য? করগে যা নিজের খুশী তোমার, আমার বয়েই গেল।

রাগের মাথায় এক চাম্‌চে গরম ঝোল গলায় ঢেলেছিল বুড়ো। মুখ পুড়ে যেতে সারা দাড়িময় ঝোলটা উগরে দিয়ে সে একেবারে পাগলের মতো গজরাতে লাগল:

—হতভাগার ঝাড় পরিবেশনও করতে জানিস না। একেবারে উনোন থেকে ঝোল উঠিয়ে খেতে দিয়েছে দেখ।

—খেতে বসে বকবকর না করলে মুখ পুড়ত না।—ইলিনিচ্‌না সান্ত্বনা দেয়।

বাপের কাণ্ড দেখে দুনিয়া প্রায় হেসেই ফেলেছিল আর কি। মুখখানা লাল টকটকে, দাড়ি থেকে কপি আর আলুর টুকরো ছাড়িয়ে বের করছে। কিন্তু আর সবাই এমন গম্ভীর যে ও নিজেকে সামলে নিয়ে চোখ ফিরিয়ে রইল আরেক দিকে, পাছে বেমক্কা হেসে ফেলে।

দুপুরের খাওয়ার পর বুড়ো আর তার দুই ছেলে-বউই গাড়ি নিয়ে রওনা হল খড় আনবার জন্য। পান্তালিমন একটা লম্বা উকোন-ঠ্যাঙা দিয়ে খড় তুললে গাড়ির ওপর, আর নাতালিয়া সেই সোঁদা-গন্ধওয়ালা খড়ের পালা জড়ো করে পা দিয়ে মাড়িয়ে তা সমান করলে। একসঙ্গে মাঠ থেকে ফিরল ও আর দারিয়া। পান্তালিমন তখন তার বুড়ো বলদগুলো নিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে অনেকদূর এগিয়ে গেছে।

টিলার ওধারে সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। তেতো সোমরাজের গন্ধ উঠছে ফসল-কাটা স্তেপের মাঠ থেকে। সন্ধ্যার দিকে সে গন্ধ আরো জোরালো হল বটে তবে একই সময় একটু হালকা আর মিষ্টিও হয়ে উঠল তা। সারাদিনে যে দম-আটকানো ঝাঁঝালো ভাবটা ছিল এখন আর তা নেই। গরমটাও কমের দিকে। বলদগুলো নিজের খুশীতে চরে বেড়াচ্ছিল। ওদের খুরের ঘষায় গ্রীষ্মদিনে মরশুমী পথের ধুলো উঠে আশেপাশের কাঁটাগাছের গোড়ায় জমা হচ্ছে। কাঁটাগাছের মাথায় ছড়ানো বাসরেরী ফল আগুনের মতো ডগডগে দেখায়। ওপর দিয়ে মৌমাছি ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফিঙের দল উড়ে গেল দূরের স্তেপের পুকুরগুলোর দিকে পরস্পরকে ডাকতে ডাকতে।

দারিয়া মাথা নিচু করে বসে দুলছিল গাড়ির তালে তালে। কনুইয়ে ভর দিয়ে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিল নাতালিয়ার মুখের দিকে। ভাবনায় বিভোর হয়ে নাতালিয়া তাকিয়ে রয়েছে সূর্যাস্তের দিকে। প্রশান্ত স্বচ্ছ মুখখানার ওপর তামাটে আলোর লালিমা। দারিয়া ভাবছিল—'নাতালিয়া কিন্তু বেশ সুখী। স্বামী আছে, ছেলেপুলে আছে, এর বেশী আর কিছু ওর চাহিদাও নেই। বাড়ির সবাই ভালোবাসে ওকে। কিন্তু আমি তো সাবাড় হয়ে গেছি। আমি মরলে কেউ এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলবে না।'—মনে মনে দারিয়ার ঈর্ষা হচ্ছিল জায়ের ওপর। নাতালিয়াকে একটু খোঁচা দেবার, ওর মনে একটু কষ্ট দেবার ইচ্ছা জেগে উঠল দারিয়ার মনে হঠাৎ। দারিয়া কেবল একাই কেন লড়বে হতাশার বিরুদ্ধে, ভাববে কেন সব সময় নিজের বিধ্বস্ত জীবনের কথা, সইবে যারে নিষ্ঠুর যন্ত্রণা? আরেকবার নাতালিয়ার দিকে চট করে চোখ বুলিয়ে খুব ভালোমানুষের মতো সে বললে

—নাতালিয়া, তোমায় একটা গোপন কথা বলতে চাই।

—নাতালিয়া তখুনি জবাব দিলে না। সূর্যাস্তের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ও ভাবছিল অনেকদিন আগেকার কথা। তখন সে গ্রিগরের বাগ্‌দত্তা। ওকে দেখতে ওর বাড়িতে এসেছিল গ্রিগরি। ফির যাবার সময় বিদায় দিতে ফটক অবধি এসেছিল নাতালিয়া। সেদিনও সূর্যাস্তের এই রাঙা আগুনই ছিল, এমনিভাবেই পশ্চিমের আকাশে ছড়িয়ে ছিল অস্তমিত সূর্যের আলোকিত আভা, বেতবনের আড়ালে ডাকছিল কাকের দল। গ্রিগর এক দিকে কাত হয়ে জিনে বসে ঘোড়া চালিয়ে চলে গেল। একটা আনন্দময় উত্তেজনা নাতালিয়ার চোখে জল এনে দিয়েছিল, তারই আড়াল দিয়ে সে চেয়ে রইল গ্রিগরের দিকে, পীনোন্নত কুমারী বুকে হাত দিয়ে সে অনুভব করতে লাগল হৃৎপিণ্ডের সজোর স্পন্দন। দারিয়া হঠাৎ নীরবতা ভেঙে দিতে নাতালিয়া বিরক্ত হল, অনিচ্ছাভরে জিজ্ঞেস করল:

—গোপন কথাটা তোমাকে বলতেই হবে কেন শুনি?

—আমি একটা পাপ কাজ করেছি।··মনে আছে গ্রিগর কবে লড়াই থেকে ছুটি নিয়ে ফিরেছিল? সেদিন সন্ধ্যায়, মনে পড়ছে, আমি গরু দুইছিলাম। ঘরের ভেতর যেতে শুনি আকসিনিয়া ডাকছে আমাকে। ও তো আমাকে ডেকে নিয়ে এই ছোট্ট আংটিটা দিলে, জোর করেই গছিয়ে দিলে—অনামিকার সোনার-আংটিটা ঘুরিয়ে দেখায় দারিয়া, ফের বলে—তারপর আমাকে সাধাসাধি করতে লাগল—গ্রিগরকে ওর কাছে পাঠাবার জন্য। এর মধ্যে আমার স্বার্থ কিছু ছিল না অবিশ্যি। যাক গ্রিগরকে তো বললাম। সমস্তটা রাত সেদিন সে মনে আছে? সে বলেছিল কুদীনভ এসেছে বলে ওকে কুদীনভের সঙ্গে থাকতে হয়েছিল আলাপ-আলোচনার জন্য? সে-সব বাজে ধাপ্পা। আসলে ও ছিল আকসিনিয়ার সঙ্গে।

নাতালিয়া হতভম্বের মতো ফ্যাকাশে মুখ করে বসে আছে, আর নিঃশব্দে একটা শুকনো লবঙ্গ খুঁটছে আঙুল দিয়ে।

—আমার ওপর রাগ কোরো না নাতাশা। তোমাকে বললাম বলে দুঃখ হচ্ছে।—নরম গলায় বলতে বলতে দারিয়া নাতালিয়ার চোখের দিকে তাকাতে চেষ্টা করে।

নাতালিয়া নীরবে চোখের জল সামলে নেয়। এমন আচমকা এত বড় একটা আঘাত ওর ওপর এসে পড়েছে যে জবাব দেবার ক্ষমতা নেই ওর। দুঃখবিকৃত মুখটা লুকোবার জন্য মাথা ঘুরিয়ে নেয় সে।

গাঁয়ের ভেতর ঢোকার সময় দারিয়া নিজের ওপরেই বিরক্ত হয়ে ভাবতে লাগল: শয়তান কাঁধে ভর করেছিল, নইলে ওকে কেন খোঁচাতে গেলাম। এখন পুরো একটি মাস ধরে খালি কাঁদবে। কী দরকার ছিল আমার ওকে জানাবার। এসব গরুদের অন্ধ হয়ে থাকাই ভালো।—আগের কড়া কথা-গুলোকে একটু নরম করবার জন্য এবার সে বললে:

—তাই বলে একেবারে ভেঙে পোড়ো না যেন। দুঃখ করার কী আছে এমন? আমার আপদ যে তোমার চেয়েও বেশী, তবু আমি কেমন বুক ফুলিয়ে চলি। তাছাড়া শয়তানই জানে সে সত্যি সত্যি আকসিনিয়ার সঙ্গে ছিল, না কুদীনভের সঙ্গে দেখা করতেই গিয়েছিল। আমি ওর পিছু নিইনি। ধরা না পড়লে চোর বলি কেমন করে?

নাতালিয়া ওড়না দিয়ে চোখের কোণা মুছে নিচু গলায় বললে—আমি তখুনি আন্দাজ করেছিলাম।

—আন্দাজই যদি করেছিলে তবে জিজ্ঞেস করনি কেন তাকে? আঃ তুমি একটা অপদার্থ! আমি হলে ওর আর নিষ্কৃতি ছিল না! এমন ফাঁদে ফেলতাম ওকে যে একেবারে হয়রান করে ছেড়ে দিতাম।

—আমার ভয় ছিল বুঝি বা যা সত্যি তা জেনে ফেলি।······সহ্য করা

সোজা মনে কর তুমি ?—আবেগে তোতলামি এসে যায় নাতালিয়ার। চোখ দুটো চকচকে হয়ে ওঠে—তুমি হয়তো…সেভাবে পিয়োত্রার সঙ্গে কাটিয়ে থাকতে পার।…কিন্তু যখন মনে পড়ে…যখন মনে পড়ে…কীভাবে আমার দিনগুলো কেটেছে…কীভাবে কাটাতে হয়েছে…এখনও মনে হলে আমার ভয় লাগে।

যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাবে দারিয়া উপদেশ দিলে—যাক্‌গে এখন ভুলে যাও ওসব।

—এ জিনিস যে ভোলবার নয় দারিয়া। একটা অদ্ভুত ভাঙা গলায় নাতালিয়া বলে উঠল।

—আমি হলে ভুলে যেতাম। সামান্য ব্যাপার নিয়ে অত কীসের!

—তুমি তোমার ব্যারামটাকে ভোল।

দারিয়া হেসে ফেলল।

—ভুলতে পারলে তো ভালোই ছিল. কিন্তু এ হতচ্ছাড়া জিনিস ভুলতে দিলে তো আমাকে! শোনো নাতাশা। তুমি যদি বলো সমস্ত ব্যাপারটা আকসিনিয়ার কাছ থেকে টেনে বের করি। সে আমাকে ঠিক বলবে। নয়তো জিভ খসে যাক আমার। এমন মেয়েমানুষ কেউ নেই যে চুপ করে থাকবে আর পিরিতের মানুষের সব কথা চেপে যাবে। আমি তো আমার নিজের ব্যাপারটা দিয়েই বুঝি।

—দরকার নেই তোমার দূতিয়ালিতে আমার। এর মধ্যেই যথেষ্ট উপকার করেছ। -শুকনো গলায় জবাব দেয় নাতালিয়া—অন্ধ তো আর নই। কেন এসব আমাকে বললে সে আমার জানা আছে। আমার ব্যথায় ব্যথিত হয়ে যে এসব তুমি স্বীকার করনি সে আর বলতে হবে না। আসলে তুমি আমাকে আরো অসুখী করতে চাও এই তো

—ঠিকই বলেছ।—নিঃশ্বাস ফেলে দারিয়া মেনে নিলে কথাটা—কিন্তু নিজেই বিচার করে দেখ সব ভোগান্তি কি শুধু আমারই হবে?

গাড়ি থেকে নেমে দারিয়া বলদের দড়ি নিজের হাতে নিয়ে অলস ভাবে চলা জানোয়ারগুলোকে উতরাইয়ের রাস্তায় খেদিয়ে নিয়ে চলল। ওদের বাড়ির রাস্তার মুখে এসে দারিয়া বললে :

—নাতালিয়া লক্ষ্মীটি। একটা কথা শুধু তোমাকে জিজ্ঞেস করতে চাই।…তোমার স্বামীকে কি তুমি সত্যই খুব ভালোবাস?

—আমার যতটা সাধ্যে কুলোয়।—অনির্দিষ্টভাবে জবাব দিলে নাতালিয়া।

দারিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেললে—তাহলে তুমি সত্যিই ভালোবাস! কিন্তু আমি তো কাউকে তেমন করে ভালোবাসিনি জীবনে। আমি ভালোবেসেছি কুকুরের মতো, যেমন জুটে গেল তেমনি। যদি আবারো নতুন করে বাঁচতে পারতাম, তাহলে অন্য মানুষ হয়ে যেতাম।

গ্রীষ্মের স্বল্পায়ু গোধূলির পরেই এল কালো রাত। অন্ধকারের মধ্যে ওরা উঠোনে পালা করে রাখল বিচালি। মেয়েরা কাজ করে যাচ্ছে মুখ বুজে। দারিয়াকে উদ্দেশ করে পান্তালিমন হাঁকডাক করলেও দারিয়া কোনো পালটা জবাব দিলে না।

॥ পাঁচ

উস্ত্‌মেদ্‌ভেদিৎসা থেকে পলায়মান শত্রুসৈন্যদেব সবেগে ধাওয়া করে ডনফৌজ আর উজানী ডন বিদ্রোহীদের মিলিত বাহিনী উত্তরের দিকে ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে। শাশ্‌কিনে এসে নয়-নম্বর লালফৌজ চেষ্টা করছিল কসাকদের ঠেকাতে, কিন্তু ঘাঁটি ছেড়ে হটে যেতে হল ওদের। আরেকবার পশ্চাদপসরণ করে প্রায় জাবিৎসিন রেলপথ অবধি চলে এল ওরা—একবারও শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারল না কোথাও।

গ্রিগর লড়াইয়ে যোগ দিয়েছিল তার ডিভিশনের সেপাইদের নিয়ে। জেনারেল স্তুতলভের ব্রিগেড এক পাশ থেকে আক্রান্ত হয়েছিল, গ্রিগর তাকে যথেষ্ট সাহায্য করলে। ইয়েৎমাকভের ঘোড়সওয়ার ফৌজকে হুকুম দিয়ে লড়াইয়ে পাঠিয়েছিল গ্রিগর। তারা প্রায় দুশো লালফৌজী সৈনিককে বন্দী করেছে, চারটে মেশিনগান আর এগারোটা গোলাবারুদের গাড়ি দখল করেছে।

সন্ধ্যা নাগাদ গ্রিগর শাশ্‌কিনে এল এক-নম্বর ফৌজের কয়েকজন কসাককে নিয়ে।

ডিভিশন সেনাপতিমণ্ডলীর দখল করা বাড়িটার কাছেই একদল বন্দী জমাট ভিড় করে দাঁড়িয়ে। সুতীর জামা আর পাতলুনে ওদের সাদা ধব্‌ধবে দেখাচ্ছে। ওদের পাহারা দিচ্ছিল আধ কোম্পানি কসাক। বেশির ভাগ বন্দীর পায়েই বুট নেই। কাপড় খুলে নেয়ার ফলে শুধু অন্তর্বাসটাই সম্বল। আগাগোড়া সাদার মধ্যে শুধু এখানে ওখানে একেকটা সব্‌জে খাকী নোংরা উর্দির দেখা পাওয়া যায় ভিড়ের মধ্যে।

বন্দীদের দিকে আঙুল দেখিয়ে প্রোখর জাইকভ বলে উঠল,—দেখেছ, সব একেবারে রাজহাঁসের মতো সাদা!

গ্রিগর লাগাম টেনে ঘোড়াটাকে একপাশে ঘুরিয়ে নেয়। কসাকদের ভিড়ের মধ্যে ইয়েরমাকভকে খুঁজে পেয়ে ও গলা উঁচিয়ে বললে :

—ওহে একটু কাছে এস। লোকের আড়ালে গিয়ে লুকোচ্ছ কেন?

হাতের মুঠোয় মুখ চেপে কেশে ইয়েরমাকভ ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে এল। সামান্য কালো গোঁফের তলায় জখম ঠোঁটের ওপর জমাট রক্তের চাপ। ডান গালটা ফোলা, টাট্‌কা ছড়ে যাওয়ায় নীল্‌চে দাগ। হামলার সময় পুরো কদমে ছুটতে গিয়ে ওর ঘোড়াটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়েছিল—। একেবারে পনেরো ফুট দূরে পাথরের মতো ছিটকে গিয়ে ইয়েরমাকভ উপুড় হয়ে পড়েছিল একটা ফসলী খেতের নরম মাটির ওপর। জমিটা এ-মরশুমে পতিত রাখা হয়েছিল। ইয়েরমাকভ আর তার ঘোড়া একই সঙ্গে লাফিয়ে খাড়া হয়ে উঠল। এক মিনিটের মধ্যে ইয়েরমাকভ আবার জিনের ওপর। মাথায় টুপি নেই, গা বেয়ে রক্ত ঝরছে, কিন্তু খোলা তলোয়ার হাতে ফের ও ছুটল পাহাড়ের ঢাল বেয়ে, কসাক ঘোড়সওয়ারদের বন্যাস্রোতের প্রথম সারিতে এগিয়ে যাবার জন্য।

গ্রিগরের পাশাপাশি এসে সে অবাক হয়ে যাবার মতো বললে—লুকোতে যাব কেন?—লড়াইয়ের আগুন এখনো ওর চোখে, রক্তে রাঙা। কিন্তু একটু অ[illegible]ভ হয়ে সে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিলে।

গ্রিগর রাগ করে বললে, কী দুষ্কর্ম করেছ তা তুমিই জান! আমার পেছন পেছন আসছিলে কেন?

—কী দুষ্কর্মের কথা বলছ তুমি? এখন আর হেঁয়ালি করে কথা বোলো না, মাথা ঘামাবার ইচ্ছে নেই মোটেই। আজ ঘোড়া থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়েছি…।

বন্দীদের দিকে চাবুক দেখিয়ে গ্রিগর বললে, ও কাজ তোমার?

ইয়েরমাকভ ভান করল যেন ওদের সে আগে দেখেইনি। যার-পর-নাই অবাক হয়ে বললে :

—এই দেখ। কুকুরের বাচ্চাগুলো। হতভাগা বদমায়েসের দল। ওদের একেবারে কাপড় খুলে নিয়েছে। কিন্তু করল কখন একাজ? বিশ্বাসই হয় না যে। এই তো মাত্র মিনিটখানেক আগে কড়া হুকুম দিয়ে গেলাম যেন ওদের গায়ে একেবারে হাত না দেয়। আর এরই মধ্যে। হতভাগা গুলোকে একেবারে ন্যাংটা করে ছেড়েছে।

—এখন আর শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা কোরো না। এসব অভিনয় কীসের? ওদের কাপড় খুলতে তুমি হুকুম দিয়েছিলে?

—ভগবান রক্ষে করুন! তোমার কি মাথা খারাপ হল, গ্রিগর পান্তালিয়েভিচ?

—আমার আদেশের কথা মনে আছে?

—মানে, এদের সম্পর্কে…

—হ্যাঁ, এদের সম্পর্কেই!

—তা কেন মনে থাকবে না, নিশ্চয় মনে আছে। প্রত্যেকটা কথা মুখস্থ। পাঠশালায় যেমন পদ্য মুখস্থ করতাম তেমনি।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাসে গ্রিগব। জিনের ওপব ঝুঁকে ইয়েরমাকভের তলোয়ারের বেল্ট্টা চেপে ধবে। এই দুঃসাহসী বে-পরোয়া সেনাধ্যক্ষটিকে ও সত্যিই খুব ভালোবাসে।

—খারলাম্পি! অত ঢাকাঢাকি কীসের? কেন তুমি এসব করতে দিলে? কপিলভের জায়গায় যে নতুন কর্নেলকে বসানো হয়েছে সে তো রিপোর্ট করবে, তখন তোমাকেই জবাব দিতে হবে যে। ব্যাপারটা নিশ্চয়ই সুখের হবে না। কেবল সওয়াল আর জেরা।

ইযেরমাকভ গম্ভীর হয়ে জবাব দিলে—আমি বরদাস্ত করতে পারিনি পান্তালিয়েভিচ। ওরা সব নতুন জামাই সেজে বসে আছে, উস্ত্‌মেদভেদিৎসা থেকে ওদের নতুন কাপডচোপড দিয়েছে, এদিকে আমাব সেপাইদেব পবনে গামছা। ঘবেও তাদের এমন কিছু নেই। তাছাডা, পেছনে একবার চালান হযে গেলে ওদেব এমনিও তো কাপডচোপড থাকত না। আমবা ওদেব সঙ্গী করব, আর কাপড কেডে নেবে খিডকির ইঁদুবগুলো। না বাবা, তাব চেয়ে আমার সেপাইরাই পরুক এগুলো। জবাবদিহি করতে হয করব, কিন্তু তাতে আমার বড কিছু পরিবর্তন হবে না। আমাকে ধরতে এস না তুমি। আমি এব কিছুই জানি না, এতটুকুও দাযী নই আমি, ব্যস।

বন্দীদেব ভিডের কাছে এসে পডল ওবা। চাপাগলায় কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যায়। পাশেব দিকে যারা ছিল তারা ঘোডসওযারদের পথ ছেডে দেয়। ভয় আর উদ্বেগভরা একটা থমথমে চাউনি ওদেব চোখে।

লালফৌজেব একজন সেপাই গ্রিগরকে কমাণ্ডাব হিসাবে চিনতে পেরেছিল। গ্রিগরের সামনে এগিযে এসে হাত দিয়ে তার ঘোডাব রেকাবটা ধরে সে বললে:

—কমরেড কমাণ্ডার। আপনার কসাকদের বলুন অন্তত আমাদেব জোব্বাকোটগুলো ফিবিয়ে দিক। আমাদের উপর নিদেনপক্ষে ওইটুকু দয়া করুন। রাতে যেরকম ঠাণ্ডা, পরনে একগাছি সুতো নেই—দেখতেই পাচ্ছেন তো।

ইয়েরমাকভ কর্কশ কণ্ঠে জবাব দিলে—ওরে ইঁদুব, এখন ভর গরমেব দিন, বরফের ঘা লাগবার ভয় কী!—ঘোডা দিয়ে গুঁতিযে লোকটাকে একপাশে ঠেলে সে গ্রিগরের দিকে ফিরলে—তুমি চিন্তা কোরো না। ওদের জন্য কিছু পুবনো কাপড়চোপডের ব্যবস্থা করে দেব।… এখন

যা, হট্, বাহাদুর লড়াকু সব! কসাকদের সঙ্গে না লড়ে বরং তোরা পাতলুনের উকুন বাছ।

সেনানী-দপ্তরে বন্দী কোম্পানি-কমাণ্ডারকে জেরা করা হচ্ছিল। নতুন প্রধান সেনাপতি কর্নেল আন্দ্রিয়ানভ পুরনো মার্কিন-কাপড়ে ঢাকা একটা টেবিলের ধারে বসে। আন্দ্রিযানভ বয়স্ক লোক। থ্যাবড়া নাক, রগের কাছের চুল অনেকটা সাদা। কানদুটো বড় বড়, ছেলেমানুষের মতো অতিরিক্ত খাড়া। টেবিলের দুহাত সামনে দাঁড়িয়ে আছে লালফৌজের কমাণ্ডার। বন্দীর জবানবন্দী সেনানীদপ্তরেরই একজন কাপ্তেন, সুলিন টুকে নিচ্ছে। আন্দ্রিয়ানভের সঙ্গে একই ডিভিশনে সে রয়েছে।

লালফৌজের কমাণ্ডার দীর্ঘকায়। গোঁফজোড়া লালচে, ধবধবে সাদা চুল ছোট করে কদম ছাঁটে ছাঁটা। গেরুয়া রঙ-করা মেঝেয় খালি পায়ে দাঁড়িয়ে একবার এ-পা একবার ও-পা করছে, আর মাঝে মাঝেই দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে কর্নেলের ওপর। কসাকদের দয়ায় ওর পরনে এখন শুধু হলদে কোরা ফৌজী কামিজটা। ওর নিজের পাতলুন কেড়ে নিয়ে তারা ওকে দিয়েছে ধুকড়ি তালি-বসানো একটা রংজ্বলা ডোরাদার পায়জামা। গ্রিগর টেবিলের কাছে যেতে ওর নজরে পড়ল বন্দী তার উলঙ্গ দেহটাকে তাড়াতাড়ি কোনো রকমে ঢাকবার চেষ্টা করছে পেছন ছেঁড়া পায়জামাটা টেনে গায়ের সঙ্গে জড়িয়ে।

চশমার ফাঁক দিয়ে চট করে একবার লোকটার দিকে তাকিয়ে কর্নেল জিজ্ঞেস করলে, অবলভ প্রদেশের সামরিক কমিসারিয়েট, অ্যাঁ?

—আজ্ঞে।

—গেল বছরের শরৎকালে?

—শরতের শেষ দিকে।

—মিছে কথা বলছ।

—আমি সত্যি কথাই বলছি।

—আবার বলছি তুমি মিছে কথা বলছ। লোকটা শুধু কাঁধ জোড়া উঁচু করে, কোনো জবাব দেয় না। কর্নেল গ্রিগরের দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপভরে একবার বন্দীর দিকে ইশারা করে দেখায়:

—এই যে, এসে একবার এঁর তারিফ কর। আগে ছিলেন সম্রাটের ফৌজ, আর এখন হয়েছেন বলশেভিক, দেখতেই পাচ্ছ। ধরা পড়ে এখন আমাদের বোঝাতে চাইছে লালদের সঙ্গে নাকি নেহাতই দৈবক্রমে ভিড়েছিল, ওকে নাকি জবরদস্তি ফৌজে ভর্তি করা হয়েছিল। মিছে কথাটুকু বলবে যে, সেও ইস্কুলের মেয়েদেরই মতো, না পারে ঢাকতে না পারে সাজিয়ে বলতে, ভাবে আমরা বুঝি তা বিশ্বাস করব। কিন্তু দেশের বিরুদ্ধে বেইমানি করেছে এটুকু স্বীকার করার মতো সাহস নেই··· ভয় পায় বেটা বদমায়েস!

কথা বলতে কষ্ট হয় লোকটার, তবু সে বলে :

—বুঝতে পারছি কর্নেল, একজন বন্দীকে অপমান করার মতো যথেষ্ট সাহস আপনার রয়েছে।⋯ ⋯

—বদমায়েসের সঙ্গে আমি কথা বলি না!

—কিন্তু আমাকে যে বলতেই হবে।

—খুব সাবধান! একেবারে গায়ে হাত তুলে অপমান করতে বাধ্য কোরো না আমায়!

—আপনি যেখানে রয়েছেন সেখান থেকে তা করা খুব শক্ত নয়। তাছাড়া আরো বড় কথা হল, ওতে আপনার বিশেষ কোনো ঝুঁকিও নিতে হবে না।

গ্রিগর এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি। টেবিলের ধারে বসে বন্দীর দিকে চেয়ে আছে। ওব মুখে সহানুভূতির হাসি। লোকটা রাগে ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছিল। গ্রিগর মনে-মনে তুষ্ট হয়ে ভাবে—কর্নেলকে দিব্যি বসিয়ে রেখেছে!—আন্দ্রিয়ানভের মাংসল, কালসিটেপড়া গালদুটোর দিকে চেয়ে বেশ একটা বিদ্বেষভরা আনন্দ অনুভব করে গ্রিগর।

প্রথম দেখার মুহূর্ত থেকেই গ্রিগর তার নতুন সহকারী সেনাধ্যক্ষটির ওপর বিরূপ। আন্দ্রিয়ানভ হল সেই শ্রেণীব অফিসার যারা বিশ্বযুদ্ধের আমলে লডাইয়ের ময়দানই চোখে দেখেনি। চালাকি করে পেছনে থেকেছে বরাবর, আর প্রভাবশালী অফিসার আর তাদেব আত্মীয়-কুটুম্বদের নিয়ে কলকাঠি নেডেছে পেছনে বসে, প্রাণপণে আঁকড়ে থেকেছে নিরাপদ সামরিক পদগুলো। গৃহযুদ্ধের আমলেও সে নানা কৌশল খাটিয়ে লডাইয়ের পেছনের এলাকায় নভোচেরকাসে কাজ বাগিয়েছিল। রণাঙ্গণে যেতে হল শুধু তখনই যখন আতামান কাস্‌নভকে ক্ষমতা থেকে সরানো হয়েছে।

আন্দ্রিয়ানভের সঙ্গে গ্রিগর দুটো রাত কাটিয়েছে—এর মধ্যেই সে অফিসারটির নিজের মুখ থেকে শুনেছে সে নাকি খুব ভক্তিমান লোক। ভগবানের লীলাখেলার কথা বলতে গেলেই তার চোখ জলে ভরে ওঠে, আর তার বউটি নাকি যাকে বলে বউয়ের মতো বউ। নাম তার সোফিয়া আলেকজান্দ্রভ্‌না। সহকারী আতামান ফন গ্রাব স্বয়ং একবার তাকে বিয়ে করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন। স্বর্গত পিতৃদেবের যে জমিদারী ছিল সেখানকার অনেক সুখ-দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করেছে সে। তারপর কর্নেল পদ পাবার জন্য নিজেকে কত কাঠখড পোড়াতে হয়েছে তাকে! ১৯১৬ সালে কোন্ সব হোমরা চোমরাদের সঙ্গে দহরম-মহরম করতে হয়েছিল। গ্রিগরকে সে এই জানিয়েছে যে তার সবচেয়ে প্রিয় খেলা হচ্ছে হুইস্‌ট্, সব পানীয়ের মধ্যে সেরা জাতের পানীয় কামিন্ পাতা থেকে চোলানো কনিয়্যাক, আর সমস্ত সামরিক পদের মধ্যে সবচেয়ে লাভজনক পদ হল সামরিক রসদ সরবরাহকারীর পদ।

কানের কাছে বন্দুকের আওয়াজ হলেই কর্নেল আন্দ্রিয়ানভ কেঁপে ওঠে। নেহাত প্রয়োজন না হলে ঘোড়ায় চাপে না, লিভার খারাপের দোহাই পাড়ে। সদর দপ্তরে প্রহরীর সংখ্যা বাড়াবার জন্য সে ক্রমাগত তাগাদা দিতে থাকে। কসাকদের ওপর বিতৃষ্ণা সে চেপে রাখতে পারে না, বলে—ওরা তো সব ১৯১৭ সালে বেইমানি করেছিল। সেই থেকে সে 'নিচুপদের' প্রত্যেকটা কর্মচারীর ওপর হাড়ে চটা, কোনো বাছবিচার এর মধ্যে নেই। ওর মতে "কেবল অভিজাতশ্রেণীই রাশিয়াকে বাঁচাতে পারে", আর প্রসঙ্গক্রমে জানিয়ে দেয় যে ওরও কুলীন বংশে জন্ম। গোটা ডন প্রদেশের মধ্যে একমাত্র আন্দ্রিয়ানভ পরিবারই প্রাচীনত্বে আর মান-মর্যাদায় সবার সেরা।

লোকটার প্রধান দুবলতা যে বাচালতা, তাতে সন্দেহ নেই। ওর বাচালতা হল সেই বিশেষ শ্রেণীর বাক্যবাগীশ নিবোধ লোকগুলোর মতো যারা সারা-জীবন শুধু ছোট-বড নানান জিনিসের সম্পর্কে হালকা আর অন্তঃসারশূন্য মতামত জাহির করেই খালাস, যাদের বার্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে বসে বুড়োটে, বলগাহীন আর বিশ্রী ধরনের বাক্-বাহুল্য।

এই ধাতের বিস্তর মানুষ দেখেছে গ্রিগর। এদের সে মনেপ্রাণে ঘৃণাও করে। আন্দ্রিয়ানভকে যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে সে। দিনমানে সেটা সম্ভবপরও হয়। কিন্তু রাতে বিশ্রামের যোগাড় করতেই আন্দ্রিয়ানভ ওকে খুঁজে বের করে। তাড়াতাড়ি বলে, রাতে একসঙ্গেই থাকব তো? জবাবের অপেক্ষা না করেই বলতে শুরু করে আবার: আপনিই বলুন ভাই, পদাতিক ফৌজের হামলায় কসাকদের ওপর ভরসা করা চলে না, অথচ আমি যখন মহামহিম সম্রাটের অফিসার ছিলাম······অ্যাই, বাইরে কে আছ আমার তোরঙ্গ আর বিছানাটা নিয়ে এস তো।—গ্রিগর প্রথমে চিৎ হয়ে পড়ে চোখ বোজে, আর দাঁতে দাঁত চেপে শোনে। তারপর তাচ্ছিল্য দেখিয়ে একটানা বকতে থাকা লোকটার দিকে ইচ্ছে করেই পেছন ঘুরিয়ে শোয় জোব্বাকোট মুড়ি দিয়ে। নিবাক আক্রোশে ক্ষেপে গিয়ে মনে-মনে ভাবে: একবার আমার বদলির হুকুমটা পেলেই এ বেটার মাথায় এমন বাড়ি কষাব যে না-হোক এক হপ্তার মধ্যে আর মুখ দিয়ে রা কাড়বে না।—আন্দ্রিয়ানভ ফের জিজ্ঞেস করে, ডিভিশন কমাণ্ডার কি ঘুমিয়ে পড়লেন? গ্রিগর চাপা গলায় জবাব দিলে, হ্যাঁ ঘুমিয়ে পড়েছি। —আজ্ঞে এখনো কথাটা শেষ হয়নি, আরেকটু শুনুন।—ফের চলতে লাগল গল্প। ঝিমুতে ঝিমুতে গ্রিগর ভাবে ইচ্ছে করে বেটারা এই তোতাপাখিটাকে আমার ঘাড়ে চাপিয়েছে। ফিট্‌জেলাউরভ নিশ্চয় চুপ করে বসে ছিল না উঃ, এমন পচা মাল নিয়ে কারবার করবে কার সাধ্যি?—ঘুমিয়ে পড়ার আগটুকুতেও ওর কানে এসে বাজতে থাকে কর্নেলের খনখনে গলার আওয়াজ —টিনের ছাতে একটানা বৃষ্টির চড়বড়ে শব্দের মতো।

* *

বন্দী লালফৌজী-কমাণ্ডারের হাতে বাচাল কর্নেলটিকে নাজেহাল হতে দেখে গ্রিগরের এমন উৎকট আনন্দ হওয়ার আসল কারণটাই হল এই।

আন্দ্রিয়ানভ খানিকক্ষণ বেশ চুপ মেরে ছিল চোখদুটো আধবোজা করে। খাড়াখাড়া কানের বড় বড লাতিদুটো টকটকে রাঙা হয়ে উঠেছে। তর্জনিতে ভারী সোনার আংটি গলানো ফুলো ফর্সা হাতখানা টেবিলের ওপর কাঁপছে।

রাগে চুপসে যাওয়া গলায় সে বলে উঠল, শোন্, এই বেজন্মা কুত্তা। তোর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করব বলে তোকে এখানে আনিনি, সে কথা যেন মনে থাকে। এটুকু তো বুঝিস যা কিছুই ঘটুক তোর রেহাই নেই কোনো মতে?

—সেটুকু বেশ বুঝতে পারি।

—হ্যাঁ, বুঝলেই মঙ্গল! তাছাড়া তুই ইচ্ছে করে লালদের সঙ্গে জুটেছিলি কি জোর করে তোকে ফৌজে নেয়া হয়েছিল তাতে আমার বয়েই গেছে। ওতে কিছু আসে যায় না—আসল কথা হল একটা মিথ্যা অহঙ্কারে তুই কথা কইতে চাইছিস না…

—আপনার আর আমার মর্যাদাবোধ যে একেবারে আলাদা সে তো দেখাই যাচ্ছে …

—তার কারণ তোর ইমান বলে কিছু অবশিষ্ট নেই, সোদ্দা কথা।

—যেভাবে আমার সঙ্গে আপনি ব্যবহাব করছেন তাতে আপনারই কোনো দিন ছিল বলে সন্দেহ হয়!

—বড তাডাতাডি মরণকে ডেকে আনবার শখ হয়েছে মনে হচ্ছে।

—আর বাডিয়ে লাভ কী? আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করবেন না, সে ক্ষমতা আপনার নেই।

কাঁপা হাতে সিগাবেট কেস্‌টা খুলে আন্দ্রিয়ানভ একটা সিগারেট বের করে ধরিয়ে নেয়। তাডাতাডি গোটা দুই টান দিয়ে আবাব ফিরে তাকায় বন্দীর দিকে।

—তাহলে প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকাব করছ?

—আমার কথা তো সবই আপনাকে বলেছি।

—চুলোয় যাও। আমি তোমাব ব্যক্তিত্বের ধার ধারি না। এই প্রশ্নটার জবাব দাও:

—সেরেব্রিয়াকভো স্টেশন থেকে নতুন কোনো ফৌজ আমদানি করেছিলে কিনা?

—বলেছি তো জানি না।

—নিশ্চয় জান তুমি।

—বেশ! যদি তাতেই খুশী হন তো জানি, কিন্তু বলব না।

—চাবকাবার হুকুম দিলে আপনিই বেরিয়ে আসবে কথা।

বাঁ হাতে গোঁফ ছুঁয়ে দিব্যি আত্মস্থভাবে হেসে বন্দী বললে, আমার সন্দেহ আছে।

—কামিশিন্স্কি রেজিমেণ্ট কি এ লড়াইয়ে যোগ দিয়েছিল?

—না।

—কিন্তু তোমাদের বাঁ দিকটাতে তো ঘোড়সওয়ার ফৌজের হেপাজতে ছিল: সেটা কোন রেজিমেণ্ট?

—ক্ষান্তি দিন! আবার বলছি এসব প্রশ্নের জবাব আমি দেব না।

—কী করতে চাও এখুনি ঠিক কর: হয় এখ্নি মুখ খোল আর নয়তো দশ মিনিটের মধ্যে দেয়ালের ধারে দাঁড করাবার ব্যবস্থা করছি, কুত্তা কাঁহাকা বল শিগ্গির!

আচম্কা সতেজ উদাত্ত কণ্ঠ উঁচু পর্দায় চড়িয়ে বন্দী জবাব দিলে:

—ওরে বুড়ো গর্দভ, তোর অনেক কথাই শুনলুম! নির্বোধ! আমার হাতে পড়লে তোকে আর এভাবে জেরা করতুম না……

আন্দ্রিয়ানভ ফ্যাকাশে হয়ে পিস্তলের খাপে হাত দেয়। গ্রিগর ধীরে-স্থস্থে উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলে বারণ করার ভঙ্গিতে ইশারা করে:

—অনেক হয়েছে থাক! অনেক আলাপ করেছ, ওতেই হবে। তোমরা যে দুটিতেই রগ-চটা তা দেখতে পাচ্ছি।…দুজনে বফা করতে পারনি। কিন্তু তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। ব্যস, আলোচনার কী আছে। নিজের দলের খবর ফাঁস না করার যুক্তি ওর আছে। সত্যি বলতে কী, লোকটা খাসা! এমন ভাবে বুক চিতিয়ে দাঁড়াবে এ আমি ভাবতেই পারিনি।

বৃথাই পিস্তলেব খাপের বোতাম খুলবার চেষ্টা করে আন্দ্রিয়ানভ, আর ফুলতে থাকে: না, আমাকে হুকুম দিন তো এখুনি…।

—না হুকুম তোমায় দিচ্ছি না!—খুশীভরা গলায় বলতে বলতে টেবিল অবধি এগিয়ে গ্রিগর বন্দীকে আড়াল করে দাঁড়ায়।—একজন বন্দীকে খুন করায় বাহাদুরি নেই। যেরকম অবস্থায় পড়েছে লোকটা, পেছনে লাগতে লজ্জা হয় না তোমার? হাতিয়ার নেই, বন্দী মানুষ, পরনের কাপড়টুকুও কেড়ে নিয়েছ, আর এদিকে হাত তুলছ তার ওপর…।

—সরে দাঁড়ান! বদমাশটা আমায় অপমান করেছে!—জোর করে গ্রিগরকে ঠেলে দিয়ে আন্দ্রিয়ানভ পিস্তল বের করে।

চট করে জানলার দিকে ফিরে দাঁড়ায় বন্দী। হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগার মতো সে কাঁধ কোঁচকায়। গ্রিগর হাসিমুখে তাকিয়ে থাকে কর্নেলের দিকে। পিস্তলের বাঁট চেপে ধরে কর্নেল বেয়াড়াভাবে সেটাকে একবার হাতের ওপর নাচিয়ে নিয়ে নলের মুখটা ফের নিচু করে সরে গেল।

—ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করার ইচ্ছে আমার নেই···।—দম নিয়ে শুকনো ঠোঁট চেটে ধরা গলায় বললে কর্নেল।

গোঁফের নিচে ঝিকিয়ে ওঠা হাসিটাকে চাপা দেবার কোনো চেষ্টা না করেই গ্রিগর বললে

—সে চেষ্টা করলেও লাভ হত না! ভালো করে দেখ তোমার পিস্তলে গুলি নেই। সকালে টেবিল থেকে তুলে একবার উঁকি দিয়ে দেখেছিলাম। ভেতরে একটা বুলেটও ছিল না, মনে হয় মাস দুয়েক সাফও করা হয়নি। নিজের জিনিসপত্রের ওপর তেমন যত্ন নাও না তুমি।

আন্দ্রিয়ানভ চোখ নামিয়ে আঙুল দিয়ে রিভলবারের ঘরটা ঘুরিয়ে নিয়ে হেসে বললে

—চুলোয় যাক। কিন্তু কথাটা আপনি ঠিকই বলেছেন। ক্যাপ্টেন স্থলিন এতক্ষণ নীরবে সব লক্ষ্য করছিল ঠোঁটের কোণে কৌতুকের হাসি নিয়ে। বিবরণীটা টোকা শেষ হলে কাজ গুটিয়ে রেখে সে বেশ খুশীভরা গলায় বললে

—সেমিয়ন পলিকার্পোভিচ আন্দ্রিয়ানভ, তোমায় আমি কতবার বলেছি তুমি তোমার হাতিয়ারগুলোর বড় অযত্ন কর। আজকের ব্যাপারে আরেকবার প্রমাণ হল যে আমার কথাই ঠিক।

আন্দ্রিয়ানভ ভুরু কুঁচকে চেঁচিয়ে উঠল

—অ্যাই, ফালতু সেপাই কেউ আছে? এদিক।

দুজন আবদালী আর শান্ত্রীদের নায়ক সামনের ঘর থেকে এগিয়ে এল।

আন্দ্রিয়ানভ বন্দীর দিকে ইশারা করে বললে একে নিয়ে যাও।

লোকটা ঘুরে গ্রিগরের দিকে সোজা চেয়ে নীরবে মাথা নোয়ালে। তারপর এগিয়ে গেল দরজার দিকে। গ্রিগরের যেন মনে হল লোকটির লালচে জুলফির আড়ালে একটা প্রচ্ছন্ন কৃতজ্ঞতার হাসি ফুটে উঠল।

লোকগুলোর পায়ের আওয়াজ দূরে চলে যেতে আন্দ্রিয়ানভ এবার ক্লান্তিভরে চশমাজোড়া খুলে সযত্নে কাঁচদুটো পরিষ্কার করতে লাগল ছোট একটুকরো স্যাময় চামড়া দিয়ে। তারপর ভাঙা-ভাঙা গলায় বললে

—ও হারামজাদাকে খুব জোর বাঁচিয়ে দিলেন। অবিশ্যি ভালমন্দ আপনার নিজের বিবেকের কাছে। কিন্তু ওর সামনে আমার পিস্তলের কথাটা তুলে কেন আমায় এমন বেকুব বানালেন?

গ্রিগর সান্ত্বনা দেবার সুরে বললে

সে তো এমন কিছু দুর্ভাগ্যের কথা নয়।

—তা হয়তো নয়, কিন্তু আপনার অমনটা করা উচিত হয়নি। অবিশ্যি এটা ঠিক যে আমি ওকে মেরেও ফেলতে পারতাম। একটা নোংরা জীব ওই লোকটা। আপনি আসার আগে অবধি আধঘণ্টা লড়েছি। কী

সাংঘাতিক মিছে কথাই বলে আর এড়াবার চেষ্টা করে, বেমালুম ধাপপা মেরে যাচ্ছিল বাজে খবর দিয়ে। যখন হাতেনাতে ধরলাম তখন একেবারে মুখ বুজে থাকল। বলে কি শত্রুর কাছে সামরিক গোপন তথ্য ফাঁস করতে নাকি ওর অফিসারের মর্যাদায় বাধে। কুত্তীর বাচ্চাটা যখন নিজেকে বলশেভিকদের হাতে বেচে দেয় তখন ওর অফিসারী মর্যাদার কথা মনে ছিল না। আমি বলি কি ওকে আর ওদের আর দুজন পাণ্ডাকে চুপেচাপে সাবাড় করে দিই। আমরা যে খবরটা বের করতে চাই সে তো এমনিতেও পাবার জো নেই। সব বেটা ঘোড়েল পাজী, ওদের বাঁচিয়ে রাখবার তো কোনো কারণ দেখি না। আপনার কী মনে হয়?

—কী করে জানলে যে ওই কোম্পানির কমাণ্ডার? —প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করে গ্রিগর।

—ওর নিজেরই লালফৌজের এক সেপাই বেইমানি করে বলে দিয়েছিল।

—আমি বলি কি সেই লোকটাকে গুলি করে মার আর কমাণ্ডারদের ছেড়ে দাও।—গ্রিগর সরাসরি আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে তাকায় আন্দ্রিয়ানভের দিকে।

কর্নেল কাঁধ কোঁচকায়, বাজে রসিকতায় যেমন লোকে হাসে তেমনি করে হাসে [illegible]।

—না। কিন্তু সত্যি সত্যি বলুন তো, আপনার মতটা শুনি।

—কেন, ওই যা বললাম।

—মাপ করবেন। কিন্তু কী যুক্তিতে বললেন কথাটা?

—কোন যুক্তিতে? রুশ ফৌজের মধ্যে শৃঙ্খলা আর বাধ্যতা বজায় রাখতে হবে না? কাল যখন আমরা শুতে গেলাম তখন, কর্নেল, তুমিই তো খুব বড় গলায় বললে বলশেভিকদের ঠাণ্ডা করে দেবার পর কেমন-ধারার শৃঙ্খলা ফৌজের মধ্যে ফিরিয়ে আনবে। যাতে করে ছোকরা সেপাইদের মধ্যে লাল রোগের চিহ্নও না থাকে। আমি পূর্ণ একমত ছিলাম, মনে আছে তো?—গ্রিগর গোঁফে তা দিতে দিতে কর্নেলের মুখের ক্রমাগত বদলাতে থাকা ভঙ্গিটুকু লক্ষ্য করে। সতর্কভাবে বলে চলে: কিন্তু এখন তুমি কী বলছ? তুমি যে ফৌজের শৃঙ্খলা ভাঙবারই পথ করছ! সেপাইদের ধারণা হবে তারা ইচ্ছে করলেই অফিসারদের সঙ্গে বেইমানি করতে পারে। বেশ ভালো শিক্ষাই দেয়া হবে যাহোক! কিন্তু ধর আমরা নিজেরা যদি এমন অবস্থায় পড়তাম তাহলে? মাপ কর। তোমার সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না।

গ্রিগরের দিকে ভালো করে তাকিয়ে শুকনো গলায় আন্দ্রিয়ানভ বলে: আপনার যা অভিরুচি।—ও আগেই শুনেছিল এই বিদ্রোহী সেনানায়কটির নীতি, আদর্শ, সব তার নিজস্ব। বেয়াড়া প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু

তার কাছ থেকে এতটা সে প্রত্যাশা করেনি। সে শুধু বললে: বন্দী লাল সেনাপতিদের সঙ্গে তো এমন ব্যবহারই বরাবর আমরা করে আসছি, বিশেষ করে প্রাক্তন অফিসারদের ক্ষেত্রে। আপনার ধারণাটা আমার কাছে নতুন লাগল…। এমন একটা সহজ মামুলি ব্যাপারে আপনার মতামতটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

—যখন সুবিধা পেয়েছি লড়াইয়ের ময়দানে মেরেছি ওদের। কিন্তু অকারণে বন্দীদের তো গুলি করে মারিনি কখনো।—মুখ কালো করে জবাব দেয় গ্রিগর।

আন্দ্রিয়ানভ সায় দেয়, বেশ তো, তাহলে ওদের পেছন দিকেই পাঠিয়ে দেয়া যাক। হ্যাঁ আরেক ঝামেলা: সারাতভ এলাকায় কয়েকজন বন্দী চাষী, জোর করে পল্টনে ঢোকানো হয়েছিল তাদের—তারা আবার আমাদের দলের হয়ে লড়তে চায়। আমাদের তিন নম্বর পদাতিক ফৌজে তিনশো সেপাই কমতি আছে। আপনি কি মনে করেন সাবধানে বাছাই করে জনকয়েক বন্দী স্বেচ্ছাসেবককে সে কাজে ঢোকান যাবে? ফৌজী দপ্তর থেকে এ সম্পর্কে আমাদের ওপর পাকাপাকি হুকুম দেয়া আছে।

গ্রিগর সরাসরি জানিয়ে দেয়, আমার ফৌজে আমি একটি চাষীকেও নেব না। কসাকদের দিয়ে দল বোঝাই কর।

আন্দ্রিয়ানভ তর্ক জুড়তে চায়, শুনুন, ঝগড়ার কিছু নেই। ডিভিশনে কেবল কসাকরাই থাকুক এই আমার কাম্য, আমি তা বুঝতে পারি। কিন্তু আজ নিতান্ত দায়ে পড়েই বন্দীদের বাদ দিতে পারা যাচ্ছে না। এমনকি স্বেচ্ছাবাহিনীতেও বন্দীদের দিয়ে একেকটা ফৌজ গড়া হয়েছে।

গ্রিগর পাল্টা জবাব দিলে, তারা যা খুশী করুক, আমি চাষীদের নেব না। এ সম্পর্কে আর কোনো কথার প্রয়োজন নেই।

একটু বাদেই গ্রিগর পশ্চাদ্‌বর্তী এলাকায় বন্দীদের পাঠানো সম্পর্কে নির্দেশ দেবার জন্য বেরিয়ে গেল। খাবার সময় আন্দ্রিয়ানভ গলার আওয়াজে একটু উত্তেজনা মিশিয়ে বললে:

—আমরা দুজনে তেমন মিলেমিশে চলতে পারব বলে তো একেবারেই মনে হচ্ছে না।…

—গ্রিগর উদাসীনভাবে জবাব দিলে, আমিও সেই কথাই ভাবছিলাম। —স্থলিনের হাসিটাকে আমলের মধ্যেই না এনে সে আঙুল দিয়ে প্লেট ঘেঁটে একটুকরো সেদ্ধ মাংস টেনে তুললে। তারপর এমন একটা 'বাঘের-খিদে' নিয়ে সে শক্ত হাড়খানা চিবোবার যোগাড় করলে যে স্থলিনও ওর সঙ্গে-সঙ্গে যেন হাড় চিবানোর কষ্টেই মুখ বিকৃত করতে লাগল। মুহূর্তের জন্য একবার চোখদুটোও বুজে ফেলল সে।

* * *

দুদিন বাদে পেছু-হটা লালফৌজকে ধাওয়া করে নিয়ে যাবার ভার নিলে সেনাপতি সাল্‌নিকভের ফৌজীদল। গ্রিগরকে জরুরী তলব দিয়ে ডাকা হল সদর দপ্তরে। ডন ফৌজের সর্বাধিনায়ক বিদ্রোহী বাহিনীকে ভেঙে নতুনভাবে বিভক্ত করার যে হুকুম দিয়েছেন সেটা তাকে জানিয়ে দিলে সেনানীমণ্ডলীর অধিনায়ক। লোকটা সুপুরুষ, বয়স্ক। বেশী ভূমিকা না করে সে বললে :

—লালফৌজের সঙ্গে ঘরোয়া লড়াইয়ের আমলে আপনি খুব সাফল্যের সঙ্গে ডিভিশন চালিয়েছেন। কিন্তু আজ আমরা আপনার হাতে ডিভিশন তো দূরের কথা, একটা রেজিমেন্টের ভার দিতেও ভরসা পাই না। আপনার সামরিক শিক্ষা নেই। তাছাড়া রণাঙ্গন যেমন ছড়িয়ে পড়েছে আজকাল, আর লড়াইয়ের কেতাকানুনও বর্তমানে যেমন হয়েছে তাতে অত বড় একটা জঙ্গী ইউনিট চালাবার মতো ক্ষমতা আপনার নেই। সে কথা আপনি মানেন ?

গ্রিগর জবাব দেয়, তা মানি। আমি নিজেই ডিভিশনের ভার ছেড়ে দেবার জন্য অধীর হয়ে উঠেছিলাম।

—আপনি যে নিজের ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেখেননি সেটা অত্যন্ত সন্তোষের কথা। আজকালকার ছোকরা অফিসারদের মধ্যে এ-গুণটি দুর্লভ। যাক তাহলে : রণাঙ্গণের অধিনায়কের হুকুমে আপনাকে উনিশ নম্বর রেজিমেন্টের চার নম্বর স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডারের পদ দেয়া হল। সে রেজিমেন্টটা এখন এখান থেকে প্রায় পনেরো মাইল দূরে, ভিয়াজনিকভ গাঁয়ের কাছাকাছি রয়েছে। আজই গিয়ে রেজিমেন্টে খবর দিন, কিংবা নিদেনপক্ষে কাল। কিছু বলতে চাইছেন মনে হচ্ছে ?

—আমার ইচ্ছে ছিল রসদ দপ্তরে যোগ দেবার।

—সে অসম্ভব। আপনাকে লড়াইয়ের ময়দানে দরকার হবে।

—দু দুটো যুদ্ধে চোদ্দবার জখম হয়েছি।

—ও কথার কোনো মানে নেই। আপনি তরুণ, স্বাস্থ্য ভালোই মনে হয়। এখনো লড়াই করার ক্ষমতা রয়েছে। জখমের কথা বলছেন, জখম কোন্ অফিসারটার নেই বলুন ? আপনি যেতে পারেন এখন। শুভেচ্ছা নিন।

* * * *

বিদ্রোহী বাহিনীকে যখন ভেঙে ফেলার ব্যবস্থা হল তখন, হয়তো-বা উজানী ডন কসাকদের মধ্যেকার অবশ্যম্ভাবী বিক্ষোভটাকে চাপা দেবার জন্যই, উস্ত্‌মেদ্‌ভেদিৎসা দখল করার সঙ্গে-সঙ্গে অনেক সাধারণ কসাক সেপাইকে রাতারাতি কমিশনবিহীন অফিসারের পদ দেয়া হল, সার্জেন্টদের তোলা হল এনসাইন্ পদে আর যে-সব অফিসার বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল তাদের

পুরস্কার দিয়ে পদোন্নতি ঘটানো হল। গ্রিগরও নেক নজর এড়ায়নি। তাকে দেয়া হল ক্যাপ্টেন পদ। একটা ফৌজী হুকুমনামায় লালফৌজের সঙ্গে যুদ্ধে তার অতুলনীয় বীরত্বের কথা স্মরণ করে অধিনায়কদের তরফ থেকে কৃতজ্ঞতা জানানো হল।

কয়েকদিনের মধ্যেই বিদ্রোহী রেজিমেণ্টগুলোকে ভেঙে দেবার কাজ শুরু হয়ে যায়। ডিভিশন আর রেজিমেণ্টের অশিক্ষিত নায়কদের জায়গায় বসানো হয় জেনারেল আর কর্নেলদের। অভিজ্ঞ অফিসারবা কোম্পানি-কমাণ্ডারের পদে বাহাল হয়; গোলন্দাজ আর সেনানীমণ্ডলীর অধিনায়কদের একেবারে হটিয়ে নতুন লোক আসে আর সাধারণ কসাক সেপাইদের বিভিন্ন ডন রেজিমেণ্টে ভিড়িয়ে দেয়া হয়। দানিয়েৎ নদীর লড়াইয়ের কালেই এই রেজিমেণ্টগুলোর লোকজন অনেকখানি কমে গিয়েছিল।

* * * * *

বিকেলের দিকে গ্রিগর তার ডিভিশনের কসাকদের জড়ো করে। বিদ্রোহী ফৌজকে ভেঙে দেবার ঘোষণাটা জানিয়ে দিয়ে সে বিদায় সম্ভাষণ জানায়:

—কসাক ভাইসব! আমার বিরুদ্ধে তোমরা কোনো বিরূপ মনোভাব পোষণ কোরো না। আমরা একসঙ্গে খেটেছি, প্রয়োজনের খাতিরে বাধ্য হয়েছিলাম খাটতে। কিন্তু আজ থেকে আমাদের আলাদা হয়ে থেকে নিজের দুঃখের ভার বইতে হবে। বড় কথা হল নিজেদের মাথাটাকে বাঁচিয়ে রাখা, লালরা যেন মাথাটা ফুটো না করতে পায়। আমাদের মগজে হয়ত তেমন বস্তু নেই, কিন্তু শুধু শুধু সে-মাথা পেতে যেন বুলেট ঠেকাতে না যাই। এখনও সে-মাথার দরকার হবে চিন্তা করার জন্য, এরপর কী করা কর্তব্য তা বেশ করে ভেবে বের করার জন্য ...।

কসাকরা একটা হতাশ নীরবতা নিয়ে শুনছিল কথাগুলো। যখন ওর শেষ হল তখন সবাই একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করে দিল—উত্তেজনায় ভারী ওদের গলার আওয়াজ।

—তাহলে কি আবার সেই আগের মতোই?

—এখন আমরা যাই কোথায়?

—ওরা আমাদের দিয়ে যা খুশী তাই করাতে চায়, শুয়োরের দল!

—আমরা দল ভাঙতে চাই না! এ আবার কী নতুন গ্যাঁড়াকল হল?

—এ তো দেখছি ভাই নিজেরা এক হয়ে নিজেদের ঘাড় ভাঙা।

—মহাপ্রভুরা আবার আমাদের নিংড়োবেন মনে হচ্ছে।

—ঠেলা সামলাও! ওদের যা মুরোদ, এখন আমাদের খাটিয়ে মারবে।...

যতক্ষণ না সবাই চুপ করে ততক্ষণ সবুর করে গ্রিগর। তারপর বলে:

অত চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে কোনো লাভ হবে না। আগে কমাণ্ডারদের হুকুম নিয়ে কথাবার্তা চলত, প্রতিবাদ চলত, সে সব দিন এখন ভুলে যাও। নিজেদের আস্তানায় গিয়ে ঢোকো। আর জিভও বেশী নেড়ো না, নয়তো আজকাল যা অবস্থা—কোর্টমার্শাল হয়ে যেতে পারে, কিংবা সাজা ফৌজে ঢুকিয়ে দেবে।

কসাকরা ফৌজী কায়দায় সারি বেঁধে এসে গ্রিগরের সঙ্গে করমর্দন করে। বলে:

—বিদায় পান্তালিয়েভিচ! আমাদের সম্বন্ধেও তুমি কিছু উল্টো ভেব না।

—অজানা অচেনা লোকেদের খবরদারিতে কাজ করা আমাদের পক্ষে বড় সোজা কাজ হবে না।

—আমাদের ছেড়ে দেয়া তোমার ঠিক হল না। ডিভিশনে ভার ছেড়ে দিতে রাজী হওয়া তোমার উচিত হয়নি।

—মেলেখফ, তোমাকে না পেয়ে আমাদের খারাপ লাগবে। নতুন কমাণ্ডাররা তোমার চেয়ে শিক্ষিত হতে পারে, তাতে আমাদের কিছু সুরাহা হবে না। বরং বোঝা আরও বাড়বে, মুশকিল সেইখানেই।

কিন্তু ... কসাক—স্কোয়াড্রনের মধ্যে সেই একমাত্র ভাঁড় আর বাচাল মন্তব্য করলে

—ওদের বিশ্বাস কোরো না তুমি, গ্রিগর পান্তালিয়েভিচ! নিজেদের কাজ কর চাই নতুন মনিবের কাজ কর ব্যাপার সেই থোড়-বড়ি খাড়া, যদি না তাতে মনের সায় থাকে।

সে রাতে ইয়েরমাকভ আর অন্য সব কসাকদের সঙ্গে বসে গ্রিগর ঘর-চোলাই ভদকা খেল। পরদিন সকালে প্রোখর জাইকভকে নিয়ে ঘোড়া ছোটাল উনিশ নম্বর রেজিমেণ্টকে ধরবার জন্য।

স্কোয়াড্রনের ভার হাতে নিয়ে সেপাইদের সঙ্গে চেনাপরিচয় হবার আগেই তার তলব পড়ল রেজিমেণ্ট কমাণ্ডারের কাছে। তখন সবে ভোর। গ্রিগর ঘোড়াগুলো তদারক করে, এদিক-ওদিক একটু ঘুরে আধঘণ্টা বাদে এল খবর করতে। ও ভেবেছিল রেজিমেণ্টের কমাণ্ডারটি বোধহয় খুব কড়া নিয়মবাগীশ লোক, ওকে একটু চাঙ্গা করার চেষ্টা করবে। কিন্তু কমাণ্ডার ওকে বেশ সদয়ভাবেই আপ্যায়ন করলে: তারপর, স্কোয়াড্রন কেমন মনে হচ্ছে? ভালোই, কী বল?— জবাবের অপেক্ষা না করে গ্রিগরকে ছাড়িয়ে চোখের দৃষ্টি দূরে নিবদ্ধ করে ফের বললে:

—বুঝলে বন্ধু, আজ একটা বড় দুঃখের খবর তোমায় দিতে হচ্ছে। ...তোমার বাড়িতে একটা দারুণ দুর্ভাগ্যের ব্যাপার ঘটে গেছে। ভিয়েশেন্‌স্কা থেকে কাল রাতে এই তার এসেছিল। তোমাকে একমাস ছুটি মঞ্জুর করছি, পরিবারের যা করণীয় সব সেরে এস।

এখুনি চলে যেতে পার তুমি।

বিবর্ণ হয়ে গ্রিগর বলে: দেখি টেলিগ্রামটা।

ভাঁজ কবা কাগজটা খুলে সে পড়ে তারপর হঠাৎ-ঘেমে-ওঠা হাতে সেটাকে মুচড়ে ধরে। একটু চেষ্টা করে নিজেকে সামলে নেয়। কথা বলতে গিয়ে মোটেই তোতলায় না সে:

—আমি একেবারে ভাবতেই পারিনি। যাওয়াই ভালো। বিদায়!

—তোমার পাশটা নিতে ভুলো না।

—নিশ্চয়। ধন্যবাদ। ভুলব না।

দরজার সামনে লম্বা পা ফেলে এগিয়ে আসে সে, দৃঢপদক্ষেপে, তলোয়াবটা বরাবরের মতো সোজা চেপে ধরে রাখে, কিন্তু বাবান্দা থেকে নামতে গিয়ে হঠাৎ যেন আর তার নিজেব পাযের শব্দই কানে ঢোকে না, বুকের মধ্যে সঙিনের খোঁচার মতো একটা তীব্র যন্ত্রণা জেগে ওঠে অচম্‌কা।

সিঁড়ির শেষে ধাপে ও হোঁচট খায়। বাঁ হাতে নড়বড়ে রেলিংটা চেপে ধরে, আব ডান হাতে তাডাতাডি উর্দিব গলাব বোতাম খোলে। এক মিনিটের জন্য দাঁডিয়ে বুক ভবে নিবিড কবে নিশ্বাস নেয, কিন্তু সেই সময়টুকুর মধ্যেই যেন ওর সমস্ত বেদনা ওকে মাতাল করে তোলে। যখন রেলিং থেকে হাত ছাডিয়ে নিয়ে যেখানে ঘোডাটা বেঁধে রাখা হযেছিল সেই ফটকটার কাছে যায় তখন সে রীতিমতো টলতে টলতে চলেছে ভারী পা ফেলে।

॥ ছয় ॥

দারিয়ার সঙ্গে কথা বলার পর কয়েকদিন ধরে নাতালিয়া যেন ক্রমাগত যন্ত্রণা ভোগ করেছে ঘুমের ঘোরে বুকচাপা স্বপ্ন আর ঘুম থেকে

জেগে ওঠার ব্যর্থ প্রয়াসের মধ্যে। কোনো একটা ছলছুতো করে প্রোখর জাইখফের বউয়ের সঙ্গে দেখা করবার কথা ভেবেছিল সে—বিদ্রোহী ফৌজের পশ্চাদপসরণের সময় গ্রিগর কীভাবে ভিয়েশেন্‌স্কায় কাটিয়েছিল, আকসিনিয়ার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করত কিনা ইত্যাদি জানবার জন্য। ওর স্বামীর দুষ্কর্ম সম্পর্কে ভাল করে খবর নেয়াই হল উদ্দেশ্য, কারণ দারিয়ার কাহিনীতে ওর বিশ্বাস নেই, অবিশ্বাসও একেবারে ছিল না।

জাইকফের বাড়িতে এসে যখন ও উঠল আনমনা হাতে একগাছি ডাল দোলাতে দোলাতে, তখন সন্ধ্যে অনেকখানি গড়িয়ে গেছে। দিনের কাজ সাঙ্গ করে প্রোখরের বউ বসেছিল ফটকের ধারে।

নাতালিয়া বললে, এই যে, সেপাই-বউ! আমাদের বাছুরটাকে দেখেছ?

—মঙ্গল হোক, বাছা! না, দেখিনি তো।

—উঃ এমন টো-টো করতে পারে হতভাগাটা! বাড়িতে যদি দুদণ্ড থাকে। এখন কোথায় খুঁজি বল তো?

—সবুর, একটু বসে যাও। এসে পড়বে ঠিকই। একটু সূর্যমুখীর বিচি চিবুবে।

নাতালিয়া গিয়ে ওর পাশটিতে বসে। শুরু হয় মেয়েলী গালগল্প।

নতালিয়া জিজ্ঞেস করে, তোমার সেপাইয়ের খবর কিছু পেলে?

—একদম না। শয়তানটা যেন একেবারে হাওয়া হয়ে গেছে। তোমার সেপাইটি কিছু খবর দিয়েছে?

—না। গ্রিশা বলেছিল লিখবে, কিন্তু আজ অবধি একটা চিঠি দেয়নি। আমাদের ফৌজ নাকি উস্তমেদ্‌ভেদিৎসার উপরে শুনি, কিন্তু আর কিছু তো জানি না।

নাতালিয়া আলোচনাটা ঘুরিয়ে নিয়ে সম্প্রতি ডন নদী পার হয়ে সেপাইরা যে পেছু হটেছিল সেই কথা তোলে। তারপর সাবধানে ভিয়েশেন্‌স্কার কথা তোলে, জিজ্ঞেস করে সেপাইরা ওখানে কী করেছিল, গাঁয়ের কেউ সেখানে ছিল কিনা। প্রোখরের চতুর বউটি বুঝে ফেলে নাতালিয়া কেন তার কাছে এসেছে। সে জবাবও দেয় ঘুরিয়ে, ছোট ছোট কথায়।

গ্রিগরের কথা ওর স্বামী ওকে সবই জানিয়েছে, কিন্তু জিভ সুড়সুড় করলেও তার কিছু বলতে সাহস হয় না। প্রোখর ওকে শাসিয়ে রেখেছিল ওর মনে পড়ে:—আমার কথা খেয়াল রাখিস: যা-যা বললাম তার একটি কথাও যদি ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করিস তাহলে হাড়িকাঠে তোর মাথা ঠেসে ধরে জিভ একহাত টেনে কুপিয়ে উড়িয়ে দেব, হ্যাঁ। যদি এসবের একটি কথাও গ্রিগরের কানে যায় সে আর আমায় আস্ত

রাখবে না। ভালো করে তোতে-আমাতে ঘরই শুরু করা গেল না, এরই মধ্যেই তুই আমায় ভোগা দিতে লেগেছিস। একেবারে মাটির মতো মুখ বুজে থাকবি……।

নাতালিয়া সব ধৈর্য হারিয়ে সোজা প্রশ্ন করে—তোমার প্রোখর আকসিনিয়া আস্তাখভাকে দেখেনি ভিয়েশেন্‌স্কায় ?

—কোন দুঃখে ? তোমার ধারণা ওর সেদিকে নজর দেবার সময় ছিল ? সত্যি বলছি মিরনোভ্‌না, আমি কিছুই জানি না, তুমিও আর কিছু জিজ্ঞেস কোরো না আমায়। আমার ওই পাকা-চুলো শয়তানটার মাথামুণ্ডু নেই। জানে শুধু দুটো কথাই—'দাও' আর 'নাও'।

বিদায় নিয়ে আসবার পর আরো বিক্ষুব্ধ আর তিতো-বিরক্ত হয়ে উঠল নাতালিয়া। কিন্তু এবার আর তার চোখ বুজে থাকার কথা নয়, নিজেই গিয়ে আকসিনিয়ার সঙ্গে দেখা করবার জন্য পাগল হয়ে ওঠে সে। পাশাপাশি বাড়িতে থেকে এ ক'বছর প্রায়ই ওদের দেখাসাক্ষাৎ ঘটত। পথে দেখা হলে দুজন দুজনকে নীরবে নমস্কার করে, মাঝে মাঝে কুশল প্রশ্ন, ব্যস। আগে একদিন গেছে যখন ওরা সম্ভাষণ তো জানাতই না, ঘৃণাভরা চোখে দুজন দুজনকে দেখত। সেদিন আর এখন নেই। ওদের পারস্পরিক শত্রুতার সেই প্রথম ধারটুকু ক্ষয়ে গেছে। আকসিনিয়ার কাছে যাবার সময় নাতালিয়া তাই আশা করেছিল সে নিশ্চয় তাকে তাড়িয়ে দেবে না বা অন্য আজেবাজে কথা তুলবে না, সরাসরিই গ্রিগরের কথা বলবে। ভুল হয়নি নাতালিয়ার।

বিস্ময়টুকু চাপা দেবার চেষ্টা না করেই আকসিনিয়া নাতালিয়াকে তার শোবার ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। পর্দা টেনে দিয়ে, আলোটা জ্বালিয়ে সে জিজ্ঞেস করল

—তারপর কী মনে করে এখানে ?

—ভালো কিছু মনে করে কি আর তোমার কাছে আসি

—শুনতে তো ভালো লাগছে না কথাটা। গ্রিগর পান্তালিয়েভিচের কিছু হয়েছে নাকি ?

আকসিনিয়ার প্রশ্নের মধ্যে এমন একটা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ হয়ে পড়ে যাতে করে সব বোঝা হয়ে যায় নাতালিয়ার। মাত্র একটি কথায় নিজেকে একেবারে মেলে ধরেছে আকসিনিয়া, ওর বাঁচার প্রেরণা, ওর শঙ্কা, সবকিছু। এর পর আর গ্রিগরের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা জিজ্ঞেস করবার অর্থ হয় না। তবু নাতালিয়া চলে গেল না। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে বল্‌ল

—না, আমার স্বামী বেঁচেবর্তে আছে, ভালোই আছে, ভয় নেই তোমার।

—ভয় আমার নয়, কেন, কী বলতে চাও? ওর স্বাস্থ্য নিয়ে তো তোমার দুর্ভাবনা, আমার নিজেরই ঝামেলার শেষ নেই।—সহজভাবে বলে বটে আকসিনিয়া কিন্তু বেশ টের পায় মুখটা ওর রাঙা হয়ে উঠছে, চট্‌ করে টেবিলের দিকে সরে যায় সে।

আগন্তুকের দিকে পিঠ ফিরিয়ে সে অনেকটা সময় নেয় বাতির পলতে ঠিক করে বসাতে, যদিও আলোটা বেশ ভালই দিচ্ছিল ওতে।

—তোমার স্তেপানের কোনো খবর পাও?

—এই কদিন আগে খবর দিয়েছে।

—স্বাস্থ্য টাস্থ বেশ ভালো আছে তো?

—মনে তো হয়। কাঁধ উঁচু করে আকসিনিয়া। এবারও সে ভান করতে পারে না, চাপা দিতে পারে না নিজের সত্যিকারের মনোভাব। স্বামীর ব্যাপারে ওর উদাসীনতা এত প্রত্যক্ষ যে অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাসে নাতালিয়া।

—তার সম্পর্কে তেমন চিন্তা তোমার নেই দেখছি। যাক সে তোমার নিজের ব্যাপার। আমি যে জন্য এসেছি সারা গাঁয়ে বাজে গল্প রটে গেছে গ্রিগর নাকি ফের তোমার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করছে। যখন সে বাড়ি ফেরে তখন তুমি নাকি দেখাসাক্ষাৎ কর। এ কি সত্যি?

—ভালোলোকের কাছেই এসেছ দেখছি জিজ্ঞেস করতে।—ঠাট্টার সুরে বলে আকসিনিয়া—ধর, আমিই যদি জিজ্ঞেস করতাম এ সত্য কিনা?

—সত্যি কথা বলতে ভয় পাও তুমি।

—না, পাই না।

—তাহলে বল, যাতে আর নিজেকে আমার কষ্ট দিতে না হয়। যা নয় তাই নিয়ে কেন নিজেকে বিব্রত করি?

আকসিনিয়া চোখদুটো ঘোঁচ করে ভুরু উচোয়। তীব্রস্বরে বলে, আমার কাছে তুমি দয়া পাবে মনে কোরো না। তোমার আমার মধ্যে সম্পর্কটা হল এইরকম যখন আমি দুঃখে পড়ি, তুমি হাস, আর তোমার কষ্ট দেখে আমি মজা পাই। কারণ আমরা যে একটি মানুষের ওপর ভাগ বসিয়েছি, তাই না? যাক তোমাকে আমি সত্য কথাই বলছি যাতে তুমি সময় থাকতে জানতে পার। ঘটনাটা সবই সত্যি, ওরা বাজে কথা বলেনি।

আবার গ্রিগরকে জিতে নিয়েছি আমি, এবার আর তাকে হাতছাড় হতে দেব না, প্রাণপণে সেই চেষ্টা করব আমি। আর এখন তুমি কী করবে বল? আমার ঘরের জানালা ভাঙবে? আমার বুকে ছুরি বসাবে?

গাছের নরম ডালটা হাতের মধ্যে বাঁকিয়ে একটা গিঁট পরিয়ে চুল্লীর দিকে ছুঁড়ে দেয় নাতালিয়া। তারপর অস্বাভাবিক দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দেয়

—আমি এখন তোমার কোন অপকার করব না। গ্রিগর না ফেরা

অবধি সবুর করব আমি। তার সঙ্গে কথা কইব, তারপর দেখব তোমাদের দুটিকে নিয়ে কী করা যায়। আমার দুটি ছেলেমেয়ে। তাদের আর আমার নিজের সপক্ষে কীভাবে দাঁড়াতে হয় সে আমি দেখে নেব।

হেসে আকসিনিয়া জবাব দেয় :

—তাহলে আপাতত আমি নির্ভয়ে থাকতে পারি, কী বল ?

বিদ্রূপটা গায়ে না মেখে নাতালিয়া আকসিনিয়ার কাছে গিয়ে তার জামার হাতটা ছুঁয়ে বললে :

—আকসিনিয়া। সারা জীবন তো আমার পথের কাঁটা হয়ে রইলে। কিন্তু আজ আর আমি সেই সেবারের মতো তোমার পায়ে ধরে সাধব না। মনে আছে তো ? তখন আমার বয়েস ছিল অল্প, বোকাও ছিলাম। ভেবেছিলাম : ওকে অনেক করে বোঝাব, তাহলে ওর দয়া হবে, মনটা ভিজবে, শেষে গ্রিগরকে ছেড়ে দেবে। কিন্তু এবার আর সেটি নয়। একটা জিনিস শুধু আমি জানি : তুমি ওকে ভালবাস না, নেহাত অভ্যাসের বশেই ওকে তুমি কামনা কর। আমি যেমন ওকে ভালোবাসি, তেমন কি তুমি কখনো ভালোবেসেছ ওকে ? আমার সন্দেহ আছে। তুমি লিস্ত্‌নিস্ত্‌স্কির সঙ্গে ভালোবাসার খেলা খেলেছ, কার সঙ্গে খেলনি বলতে পার ? ভ্রষ্টা মেয়েমানুষ! কোনো মেয়ে যখন কাউকে ভালোবাসে তখন সে এমন করে না।

ফ্যাকাশে হয়ে যায় আকসিনিয়া। নাতালিয়াকে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

—আমাকে সে কখনো এ কথা বলে গাল দেয়নি। কিন্তু তুমি দিলে!

এতে তোমার মাথা ঘামাবার কী আছে ? বেশ তো, আমি নয় খারাপ, তুমি ভালো। তারপর, কী বলবে ?

—ব্যস্ ব্যস্। রাগ কোরো না। আমি এখন যাচ্ছি। সত্যি কথা বললে তাই ধন্যবাদ।

—আমাকে আর কষ্ট করে ধন্যবাদ দিতে হবে না। আমার সাহায্য ছাড়াই তুমি জানতে পেতে। একটু দাঁড়াও। তোমার সঙ্গে বেরুব, জানলার খডখডি টেনে দিতে হবে।

দরজার মুখে এসে আকসিনিয়া দাঁড়াল। বলল :

—ঝগড়া না করে শান্তিতে বিদায় নিচ্ছি আমরা,—সেটা ভালোই লাগল। কিন্তু পড়শি ভাই, ভবিষ্যতের কথা যদি বল তো সে হবে অন্যরকম। তোমার যদি ক্ষমতা থাকে, তাকে কেড়ে নিও। কিন্তু যদি সে জোর না থাকে, রাগ কোরো না। তুমি যেমন দিতে পারবে না আমিও তেমনি নিজের ইচ্ছায় তাকে ছেড়ে দিতে পারব না। আমি এখন ছোট খুকিটি নই। আমাকে যদিও ভ্রষ্টা বলে গাল দিলে আমি তোমাদের দারিয়া নই।

সারা জীবনে কখনো আমি এ-ধরনের ব্যাপার নিয়ে কোনো খেলা খেলিনি। তোমার ছেলেপুলে থাকতে পারে, কিন্তু আমার কাছে সে সেই ·····।—কেঁপে ওঠে আকসিনিয়ার গলা, গাঢ়, আরো ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে—দুনিয়ায় শুধু ওর জন্যই আমার যত ভাবনা। ওই আমার প্রথম, ওই আমার শেষ। কিন্তু আর ওকে নিয়ে কোনো কথা নয়। যদি বেঁচে ফিরে আসে, যদি ভগবান্ তাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচান, তাহলে সে নিজেই বেছে নেবে······।

* *

সে-রাতে ঘুমোতে পারলে না নাতালিয়া। পরদিন সকালে সে ইলিনিচ্‌নার সঙ্গে তরমুজ খেত নিড়োতে গেল। কাজের মধ্যেই সহজে সব কিছু সয়ে থাকা যায় লক্ষ্য করল সে। শুকনো ঝুরঝুরে বেলেমাটির চাপড়াগুলোর ওপর শক্ত হাতে কোদাল কোপাতে গিয়ে কেবল যে একটা চিন্তাই ওর মনটাকে দখল করে রাখতে পারল তা নয়। মাঝে মাঝে বিশ্রাম নেবার জন্য পিঠ সিধে করতে হয়, মুখ থেকে ঘাম মুছে ফেলে একঢোক জল খেয়ে নিতে হয়।

হাওয়ার ঝাপটায় এলোমেলো ছেঁড়া সাদা মেঘ ভাসতে ভাসতে মিলিয়ে যাচ্ছে নীল আকাশের বুকে। লাল-গন্‌গনে মাটিকে পুড়িয়ে দিচ্ছে সূর্যের আগুন। পুব দিক থেকে বর্ষণের আভাস। মাথা না তুলেই নাতালিয়া টের পায় কখন মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ল সূর্যটা। ক্ষণিকের জন্য পিঠে একটা ঠাণ্ডার ছোঁয়া লাগে ; একটা ধূসর ছায়া পাগলপারা ছুটে যায় বাদামী উষ্ণ মাটির ওপর দিয়ে, তরমুজের লতানো আঁকড়ার জট ডিঙিয়ে। সে ছায়ায় ঢাকা পড়ে টিলার ঢালু পাড় ছেয়ে ছড়িয়ে থাকা তরমুজগুলো, গরমে ঝিমিয়ে নুয়ে-পড়া ঘাস আর পাখির মল-ছিটোনো হথর্ন, কাঁটাঝোপ [illegible] তাদের [illegible] কার ফল। তিতিরের বুক ফাটা ডাক যেন আরো জোরালো শোনায় আর স্কাইলার্কের মিষ্টি গান আরো স্পষ্ট হয়ে কানে আসে, এমনকি উষ্ণ-ঘাসের বুক কাঁপানো হাওয়াকেও যেন মনে হয় অতটা গুমোট নয়। কিন্তু তারপরেই পশ্চিম মুখো মেঘের ধোঁয়াটে সাদা আবরণ ভেদ করে মেঘের জাল ছিঁড়ে সূর্য আবার মাটির বুকে ঢেলে দেয় সোনালী কিরণ-বন্যা। অনেকটা দূরে কোথাও, ডন পাড়ের নীল পাহাড় ডিঙিয়ে সেই ছায়া তখনো এগিয়ে চলেছে মেঘের পেছু-পেছু মাটি হাতড়াতে হাতড়াতে। তারপর আবার তরমুজ খেতে গন্‌গনে হলদে দুপুর রোদের আসর বসে, দিগন্তে কাঁপে তরল ধোঁয়াটে কুয়াশা। আরো পোড়া কড়কড়ে গন্ধ ওঠে মাটি আর ঘাস থেকে।

দুপুর বেলায় পাহাড়ের ধারে একটা ঝরণার কাছে গিয়েছিল নাতালিয়া, এক কলসি বরফ-ঠাণ্ডা জল নিয়ে ফিরল সে। ইলিনিচ্‌নার সঙ্গে প্রাণভরে

খেল সে জল। হাত ধুয়ে রোদে বসল দুজনে খেতে। ইলিনিচ্না রুমাল বিছিয়ে তাতে পরিষ্কার করে রুটি কেটে রেখেছে। থলি থেকে চামচে আর একটা পেয়ালা বের করে জামার তলা থেকে একটা সরু-গলা সোরাই বের করল টক দুধের—রোদ থেকে বাঁচাবার জন্য আড়াল করে রেখেছিল।

নাতালিয়া খেল খুব কম। শাশুড়ী জিজ্ঞেস করলে :

—কদিন থেকে কেমন যেন একটু বদলে গেছ লক্ষ্য করছি।···· গ্রিশা আর তোমার মধ্যে কিছু গোলমাল হয়েছে নাকি ?

নাতালিয়ার শুকনো ঠোঁটদুটো করুণভাবে কেঁপে ওঠে :

—আবার সে আকসিনিয়ার সঙ্গে মিশছে, মা।

—সে কী···তুমি কেমন করে জানলে ?

—কাল আকসিনিয়ার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।

—সে হতচ্ছাড়ি স্বীকার করেছে ?

—হ্যাঁ।

ইলিনিচ্না চুপ করে ভাবে। রেখাচিহ্নিত মুখটা গম্ভীর হয়ে ওঠে। ঠোঁটের দুটো কোণা বেঁকে গিয়ে থমথম করে।

—হয়তো নেহাত গুমোর দেখাচ্ছে হতভাগীটা ?

—না মা, ব্যাপারটা সত্যি। কেন সে অমন ···

—গ্রিশার ওপর তুমি নজর রাখনি··।—বুড়ী বাজিয়ে দেখার মতো বলে—অমনি ধরনের সোয়ামিকে চোখে চোখে রাখতে হয় যে।

—কিন্তু নজর কেমন করে রাখব বল ? ওর বিবেকের ওপর আমার ভরসা ছিল।····· ওকে কি আমার আঁচলে বেঁধে নিয়ে বেড়াব নাকি ?—তিক্তভাবে হাসে নাতালিয়া, প্রায় শোনাই যায় না এমনিভাবে বলে—সে তো আর মিশাৎকা নয় যে পাহারা দিয়ে বেড়াতে হবে। যথেষ্ট চুল পেকেছে, কিন্তু আগের ব্যাপার কিছুতেই ভুলতে পারছে না···।

ইলিনিচ্না চামচে ধুয়েমুছে পেয়ালাটা মেজে নিলে, তারপর সেগুলো থলিতে ভরা হয়ে যাবার পর বললে :

—এইটুকুই তোমার ঝামেলা ?

—তুমি কী অদ্ভুত মা। এইটুকু ঝামেলাতেই একজনের জীবন তো বিষিয়ে উঠতে পারে।

—এখন কী করবে ভেবেছ ?

—কী করতে পারি ? ছেলেপুলে নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে যাব। আর ওর সঙ্গে থাকব না আমি। আকসিনিয়াকে নিয়েই সে ঘর করুক্ না ··· এর মধ্যেই আমার যথেষ্ট যন্ত্রণা হয়েছে।

ইলিনিচ্না নিশ্বাস ফেলে বললে, যখন জোয়ান বয়েস ছিল তখন আমিও তাই ভাবতুম রে। আমার সোয়ামিটি যে একটি আস্ত কুকুর ছিল

তাতে কোন সন্দ নেই। ওর জন্য কত যে কষ্ট সয়েছি সে কহতব্য নয়। তবে নিজের মানুষকে ছেড়ে থাকা বড় চাট্টিখানি কথা নয়; তা ছাড়া এতে লাভই বা কতটুকু? আরেকটু ভেবে দেখ তুমি, তাহলে নিজেই বুঝতে পারবে। আর বাপের কাছ থেকে ছেলেদের সরিয়ে নিয়ে যাবেই বা কী করে? না না, ওসব বাজে কথা। অমন কথাও মনে ঠাঁই দিও না। আমি তা হতে দেব না!

—কিন্তু মা, ওর সঙ্গে আমি আর থাকব না। তাই শুধু শুধু কষ্ট করে আর বোকো না।

—'কষ্ট করে বোকো না' মানে?—কথাটায় বিরক্ত হয়েছে ইলিনিচ্‌না—তুই কি আমার মেয়ে নোস্, অ্যাঁ? তোদের দুটো হতভাগার জন্য আমার দুঃখু হয় কিনা বল্? আর এই কথা তুই বলতে পারলি তোর মা এই বুড়ী মানুষটাকে? বলেছি এসব ভাবনা ছাড়ান দে, ব্যস্ চুকে গেল। বাঃ! উনি ভাবছেন: বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। কিন্তু যাবে কোন্ চুলোয়? ছাই গুষ্টির কে আছে যে তোকে চাইবে? তোর বাপ নেই, বাড়ি পুড়েছে, ভগবানের অশেষ দয়া যে তোর মা অন্যের ঘরে ঠাঁই পেয়েছে: অথচ তবু তুই তার কাছেই যাবি সঙ্গে আমার নাতি নাতনীগুলোকে নিয়ে? না বাছা, সেটি হচ্ছে না। গ্রিশ্‌কা ফিরে এলে যা করতে হয় করব। কিন্তু এখন আর একটি কথাও নয়। আমি শুনতে চাই না, শুনব না!

এতদিন ধরে নাতালিয়ার বুকে যে ব্যথা জমে উঠেছিল এখন হঠাৎ তার বাঁধ ভেঙে গেল অসহ্য কান্নায়। মাথা থেকে রুমালটা সে খুলে ফেলল, শুকনো নিষ্করুণ মাটির ওপর উপুড় হয়ে পড়ে মাটিতে বুক রেখে একটানা কেঁদেই চলল ডুকুরে ডুকরে।

ইলিনিচ্‌না বুড়ী বুদ্ধিমতী, যথেষ্ট তার মনের বল। যেখানে বসেছিল সেখান থেকে সে নড়েনি একচুলও। খানিক বাদে বাকি দুধটুকু সমেত সোরাইটা সে ফের জামা দিয়ে জড়িয়ে একটা ঠাণ্ডা জায়গায় সরিয়ে রাখল, তারপর একটা পেয়ালায় জল ঢেলে সে নাতালিয়ার পাশটিতে বসল। সে জানত এমন শোকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা নেই। সে এও জানত যে এসব ক্ষেত্রে শুকনো চোখ আর ঠোঁট চেপেরাখার চেয়ে চোখের জল ঢের ভালো। নাতালিয়াকে সে কাঁদতে দিলে যতক্ষণ না তার কান্নার শেষ হয়, তারপর সংসারের কাজে ক্ষয়ে-যাওয়া তার হাতখানা রাখলে পুত্রবধূর মাথায়। কালো নিবিড় চুলে হাত বুলিয়ে একটু কঠিন গলায় বললে:

—নাও, অনেক হয়েছে! চোখের জল সবটুকু আর খরচ কোরো না, খানিকটা রেখে দিও আরেক সময়ের জন্য! নাও এক ঢোক জল খেয়ে নাও দিকি।

শান্ত হয় নাতালিয়া। এখনো কাঁধ জোড়া থেকে-থেকে শিউরে উঠছে কান্নার দমকে, সারা শরীর কাঁপছে। হঠাৎ সে লাফিয়ে উঠে ইলিনিচ্‌নাকে একপাশে ঠেলে দেয়। পুবদিকে মুখ ফিরিয়ে চোখের-জল মাখা হাতদুটো জোড় করে সে তাড়াতাড়ি কান্নাভরা গলায় প্রার্থনা জানাতে থাকে :

—হে ঈশ্বর! আমার আত্মাকে সে যন্ত্রণা দিয়ে মেরেছে। এভাবে আর বেঁচে থাকতে শক্তিতে কুলোচ্ছে না আমার। ভগবান্ ওকে তুমি শাস্তি দাও, অভিশাপ দাও! ওকে তুমি মেরে ফেলো! আর যেন ও না বাঁচে, আর যেন আমায় কষ্ট না দেয়!

একটা কালো ঘোরালো মেঘ পুব দিক থেকে গড়িয়ে আসছিল। গুরু-গুরু ডাক। আসন্ন প্রলয় বিরাট মেঘের স্তূপ ভেদ করে একটা জ্বলন্ত সাদা বিজলির ঝিলিক মোচড় দিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ল আকাশের গায়ে। বাতাসে সর্‌সর্ আওয়াজ তুলে পশ্চিমে হেলে পড়েছে ঘাসগুলো। পথের ঝাঁঝালো গন্ধের ধুলো উড়িয়েছে সে বাতাস। একেবারে মাটি অবধি নুয়ে পড়ছে সূর্যমুখীর মাথাগুলো বীজের বোঝা নিয়ে। হাওয়ায় এলোমেলো হয়ে যায় নাতালিয়ার অগোছালো চুল, ওর কান্নাভেজা মুখখানা শুকিয়ে যায়, ওর পায়ের সঙ্গে জড়িয়ে যায় আটপৌরে ছাইরঙা ঘাগরার কিনারা।

ইলিনিচ্‌না খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে ওর ছেলের বউয়ের মুখের দিকে চেয়েছিল একটা অহেতুক শঙ্কা নিয়ে। কালো ঝড়ো মেঘটা ততক্ষণে মাথার ওপর চলে এসেছে—সেই মেঘের সামনে নাতালিয়াকে মনে হতে লাগল এক অপার্থিব ভয়ঙ্কর প্রাণীর মতো।

দেখতে দেখতে বৃষ্টি এসে পড়ে ওদের ওপর। ঝড়ের আগে শান্ত ভাবটা ছিল মাত্র কয়েক মুহূর্ত। তেরছা হয়ে নিচে নামতে নামতে একটা চিল আর্তনাদ করে ওঠে উৎকণ্ঠিত ভাবে। একটা মেঠো ইঁদুর তার গর্তের কাছে এসে শেষবারের মতো শিস্ দিয়ে ডাকে। প্রচণ্ড দম্‌কা হাওয়া ইলিনিচ্‌নার মুখের ওপর এক মুঠো মিহি ধুলো ছুঁড়ে সোঁ সোঁ করে ছুটে যায় স্তেপের মাঠের ওপর দিয়ে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করে বুড়ী। মুখখানা তার মড়ার মতো ফ্যাকাশে। আসন্ন ঝড়ের গজরানির মধ্যে সে চিৎকার করে বলতে থাকে :

—তুমি কী বলছ? ঈশ্বর মঙ্গল করুন! কার মরণ ডেকে আনছ গো তুমি?

—হে ঈশ্বর তুমি শাস্তি দাও তাকে! শাস্তি দাও ভগবান!—হাওয়ার টানে আকাশের গায়ে স্তূপাকার হয়ে ওঠা বিপুল দুরন্ত মেঘের সমারোহের দিকে পাগল চোখে তাকিয়ে তারস্বরে চেঁচায় নাতালিয়া। মাঝে মাঝে চোখ ধাঁধানো বিজলির চমক জাগছে মেঘে।

একটা শুকনো গর্জন করে বাজ ভেঙে পড়ল স্তেপের বুকে। ভয়ে দিশাহারা হয়ে ইলিনিচ্‌না ক্রুশপ্রণাম করে। কোনরকমে এগিয়ে গিয়ে নাতালিয়ার কাঁধ চেপে ধরে।

—হাঁটু গেড়ে বোসো! নাতালিয়া, শুনতে পাচ্ছ?

নাতালিয়া শূন্য দৃষ্টি মেলে তাকায় শাশুড়ীর দিকে। তারপর অসহায়ভাবে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে।

ইলিনিচ্‌না কর্তৃত্বের স্বরে বলে, ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাও। তোমার প্রার্থনা যেন তিনি গ্রহণ না করেন সেই মিনতি জানাও। কার মরণ চাইছ তুমি, তোমার ছেলেপুলের বাপের? সে যে মহাপাতক হবে……ক্রুশপ্রণাম কর। মাথা ঠেকাও মাটিতে। বল: হে প্রভু, আমি যে পাপী, আমার সব অপরাধ ক্ষমা কর!

নাতালিয়া ক্রুশপ্রণাম করে ফ্যাকাশে ঠোঁট নেড়ে বিড়বিড় করে কী যেন বলে। দাঁতে দাঁত চেপে কোনো রকমে কাত হয়ে শুয়ে পড়ে।

* * *

বর্ষাস্নানান্তে স্তেপের প্রান্তর হয়ে উঠেছে আশ্চর্য সবুজ। দূরের এক জলাশয় থেকে ডন নদী অবধি ছড়িয়ে পড়েছে একটা উজ্জ্বল মেঘধনুর অর্ধবৃত্ত। পশ্চিম প্রান্তে এখনও শোনা যায় মেঘের গম্ভীর গুরুগুরু ডাক। নালাগুলোর মধ্যে পাহাড়ী ঘোলা জলের স্রোত নেমেছে কলকল করে। পাহাড়ের ঢল বেয়ে ছোট ছোট জলের সফেন ধারা সবেগে ছুটেছে ডনের দিকে তরমুজ বাগান ছাপিয়ে বৃষ্টির তোড়ে ছেঁড়া পাতা, মাটি থেকে শিকড় শুদ্ধ ওপড়ানো ঘাস আর রাইয়ের ছেঁড়া শীষ সব ভেসে চলেছে সেই ধারায়। তরমুজ খেতের ওপর থিতিয়ে বসছে তেলতেলে নরম পলিমাটি, জমা হচ্ছে ফুটি আর তরমুজের আঁকড়াগুলোর আশেপাশে। গরমকালের মরশুমী পথ ধরে উন্মত্ত হয়ে ছুটেছে জলের ধারা গাড়ির চাকার গভীর দাগ ধরে ধরে। বাজ পড়ে আগুন ধরে যাওয়া এক গাদা খড় জলছিল দূরের খাড়া পাহাড়ের বাঁকে। লালচে-বেগুনী ধোঁয়ার স্তম্ভ খাড়া হয়ে উঠে আকাশের গায়ের মেঘধনুটাকে প্রায় ছোঁয়-ছোঁয়।

নোংরা পিছল রাস্তায় খালি পা টিপে-টিপে ওরা দুজন গাঁয়ের পথে চলেছে ঘাগরা উঁচু করে। ইলিনিচ্‌না বলে:

—তোমরা বড্ডো ছেলেমানুষ—একটুতে মুষড়ে পড়, সত্যি বলছি! একটু কী হল না হল, অমনি মাথা খারাপ। আমার বয়েসে আমি যে ভাবে কাটিয়েছি সেরকম হলে তোমরা যে কী করতে! সারা জীবনে গ্রীশা তো একবারও তোমার গায়ে হাত তোলেনি, তবু তোমার মন উঠল না। বলছ চলে যাবে, অমনিভাবেই কাটাবে। এই তো তাকে একবার বিদায় করে দিলে, ফের আবার পাগল হয়ে উঠলে, কী যে করলে না তাতো জানিনে বাবা।

এমনকি ভগবানকেও ডেকে আনলে এই নোংরা ব্যাপারে।......আচ্ছা তুমিই বলো এমন কি আলো, বাছা? আমি মস্ত জোয়ান ছিলাম, আমায় বেব্‌ভাটি আমাকে মারতে-মারতে মেরেই ফেলত। আর মারত অকারণেই, কোথাও কিছু নেই, এমনিতেই। মারার মতো কিছুই হয়তো করিনি। নিজেই বিশ্রী ব্যবহার করে ঝাল ঝাড়ত আমার ওপর। রাত ভোর করে বাড়ি ফিরত আর আমি কান্নাকাটি করে চেঁচিয়ে গালমন্দ করলে খুশীমতো পিটত আমায় ধরে।......রাস্তাখানেক হয়তো সর্বাঙ্গে আমার কালসিটে পড়ে থাকত। তবু এসব মুখ বুজে সয়েছি, ছেলেপুলেদের মানুষ করেছি, একবারও চেষ্টা করিনি সরে যাবার। গ্রিশ্‌কার গুণগান আমি করছি না, কিন্তু অমন একটা ছেলের সঙ্গে আর কিছু না-হোক ঘর করতে তুমি পার। ওই সাপিনীটা না থাকলে গাঁয়ের সেরা কসাক হত গ্রিশ্‌কা। সেই ডাইনিটাই গুণ করেছে ওকে নির্ঘাত।

নিজের মনে কী ভাবতে ভাবতে হেঁটে চলেছে নাতালিয়া। খানিক বাদে সে বললে :

—মা, আর এসব নিয়ে আলোচনা থাক। গ্রিগর ফিরুক তারপর দেখা যাবে কী করব। হয়তো নিজের ইচ্ছেতেই বেরিয়ে যাব। নয়তো সেই ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে আমায়। কিন্তু আপাতত তোমাদের ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি না।

ইলিনিচ্‌না খুশী হয়ে বললে, হ্যাঁ এই কথাটা এতক্ষণ কেন বলনি! ঈশ্বর করুন সব যেন ভালোয় ভালোয় শেষ হয়। তোমাকে সে বাড়ি থেকে তাড়াবে না কখনো, ওকথা মনেও স্থান দিও না। তোমাকে আর ছেলেপিলেদের ও কত যে ভালোবাসে। ও কখনো সে কথা কানে তুলবে ভেবেছ? কথ্‌খনো না।· আকসিনিয়ার জন্য সে তোমাকে ছাড়বে না; সে তা করতে পারে না। আর ঝগড়াঝাঁটি তো বড় বড় ঘরেও লেগে আছে! বেঁচেবর্তে যদি ফিরে আসে তো···।

—ওর মরণ আমি চাই না · রাগের মাথায় মুখে এসে গিয়েছিল।···আর আমায় ওকথা বলে খোঁটা দিও না···মন থেকে তাড়াতে পারি না তাকে, কিন্তু তবু আমার জীবনটাকে বিষিয়ে দিয়েছে ও।

—ওরে বাছা আমার! আমি কি আর তা জানি না রে? তবে যেন ঝোঁকের মাথায় কিছু করে বোসো না। এখন যাক গে এসব কথা। বুড়োকে যেন ঘুণাক্ষরেও কিছু বোলো না। এসব ব্যাপারে তার থাকার দরকার নেই।

—একটা কথা তোমাকে বলতে চাই।···ঠিক এখুনি বলতে পারছি না গ্রিগরের সঙ্গে একসঙ্গে থাকা আমার চলবে কিনা। তবে ওর ছেলেপুলে আর পেটে ধরতে চাই না আমি। এমনকি যে দুটি আছে তাদের নিয়ে যে কী করব তা জানি না।···কিন্তু এদিকে আমার পেটেও যে একটি রয়েছে মা—।

—কয়াস হল ?

—এই তিন মাসে পড়েছে।

—কিন্তু এখন আর উদ্ধার কোথায় ? চাও বা না-চাও ছেলে পেটে রাখতেই হবে।

নাতালিয়া দৃঢ় গলায় বললে, না রাখব না। আজই যাচ্ছি বুড়ী মা কাপিতোনোভ্‌নার কাছে। সে আমাকে ব্যবস্থা করে দেবে।—অন্ত অনেক মেয়েকে সে এমনি করেছে।

—সে কী, তুমি ছেলে নষ্ট করবে ? নির্লজ্জ বেহায়া অমন কথা তুমি মুখে আনতে পারলে ?—রেগে পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে ইলিনিচ্‌না নিজের হাত মোচড়াতে লাগল। আরো কিছু সে বলতে চেয়েছিল, কিন্তু পেছনে গাড়ির চাকার আওয়াজ হল। কাদার মধ্যে ঘোড়ার খুরের ছপছপ শব্দ। কে যেন ঘোড়াকে উদ্দেশ করে হাঁক পাড়ল।

ইলিনিচ্‌না আর নাতালিয়া রাস্তা ছেড়ে সরে দাঁড়ায় উঁচুতে তোলা ঘাগরায় কিনারাটা ছেড়ে দিয়ে। মাঠ থেকে ফিরছিল বুড়ো বেস্‌খ্‌লেভ্‌নভ্‌। ওদের পাশাপাশি আসতেই তেজী ঘুড়ীটার রাশ টেনে ধরল সে।

—ও মেয়েরা গাড়িতে উঠে পড। তোমাদের ঘরে পৌঁছে দিই। শুধু শুধু কেন কাদা হাঁটকে চলেছ ?

—ধন্যবাদ আগিয়েভিচ্‌। টিপে-টিপে হেঁটে পায়ে একেবারে ফিক ধরে গেছে।—খুশী হয়ে ইলিনিচ্‌না বললে। প্রশস্ত গাড়িটার মধ্যে সেই প্রথম আসন দখল করে বসল।

* * * *

খাওয়া-দাওয়ার পর ইলিনিচ্‌না নাতালিয়ার সঙ্গে একটু কথা বলবে ভাবল। ছেলে নষ্ট করার কোনো কারণ নেই সেইটে ওকে বোঝানো দরকার। থালা বাসন ধুতে ধুতে সে সবচেয়ে লাগসই যুক্তিগুলো আওড়াতে লাগল নিজের মনে। এমনকি এও ভাবল যে পান্তালিমনকে নাতালিয়ার মতলবের কথা জানিয়ে তার সাহায্য নিলে হয়। শোকে পাগল হয়ে এমন একটা বোকামির কাজ যাতে সে না করে তাই বোঝাক পান্তালিমন ছেলের বউকে। কিন্তু যতক্ষণ সে ঘর-দোর গুছোচ্ছিল সেই ফাঁকে নিঃশব্দে তৈরি হয়ে নাতালিয়া বেরিয়ে পড়েছে ঘর ছেড়ে।

খানিকবাদে ইলিনিচ্‌না জিজ্ঞেস করল, দুনিয়াকে—নাতালিয়া কোথায় রে ?

—একটা পুঁটলি নিয়ে বেরিয়ে গেল যে।

—কোথায় গেল ? কী বলে গেল ? কেমন পুঁটলি ?

—তা কেমন করে জানব মা ? একটা পরিষ্কার ঘাগরা আর কী যেন ওড়নায় জড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল একটাও কথা না বলে।

হতভাগী!—দুনিয়াকে অবাক করে দিয়ে ইলিনিচ্‌না অসহায়ভাবে কান্নায় ভেঙে পড়ে। বেঞ্চিটায় বসে পড়েছে সে।

—কী হল মা? ঈশ্বর মঙ্গল করুন! কাঁদছ কেন তুমি?

—তোর নিজের চরকায় তেল দে ভেঁপো মেয়ে। এসবে তোর কাজ কী? কিন্তু কিছু সে বলে যায়নি? তুই বা কেন আমায় বললি না যখন যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিল?

বিরক্তির সুরে দুনিয়া জবাব দিলে:

—তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না। কেমন করে জানব তোমাকে খবর দেয়া দরকার ছিল? সে তো আর চিরকালের মতো যায়নি? গেছে বোধ হয় মাকে দেখতে। কিন্তু তুমি কেন চোখের জল ফেলছ তা তো মাথায় ঢুকছে না আমার।

কখন নাতালিয়া ফিরবে দারুণ উদ্বেগ নিয়ে সেই অপেক্ষায় থাকে ইলিনিচ্‌না। স্বামী গালাগালি আর তম্বিগম্বি করবে সেই ভয়ে তাকে আর কিছু না জানানোই ঠিক করেছিল সে।

বেলা ডুবতে স্তেপের মাঠ থেকে গরু ভেড়াগুলো ঘরে ফিরল। গ্রীষ্মের স্বল্পস্থায়ী গোধূলি। গ্রামের বাতি একেকটা জ্বলে উঠছে দূরে দূরে। কিন্তু নাতালিয়ার দেখা নেই এখনো। মেলেখফ পরিবারের সবাই খেতে বসেছে। উৎকণ্ঠায় ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে ইলিনিচ্‌নাকে। সিমাই পরিবেশন করছিল সে, শব্‌জি তেলে ভাজা পেঁয়াজে রসানো, ঘরে তৈরি সিমাই। বুড়ো নিজের চাম্‌চেটা তুলে নিয়ে তাতে বাসী রুটির টুকরো ভেঙে নেয়। তারপর সেটাকে চালান করে দাড়িঘেরা মুখের গহ্বরে। টেবিলের ধারে আর যারা বসেছিল তাদের দিকে উদাসীনভাবে চেয়ে বুড়ো জিজ্ঞেস করে:

—নাতালিয়া কোথায়? ওকে টেবিলে ডেকে আননি কেন?

—সে বেরিয়েছে।—নিচু গলায় জবাব দেয় ইলিনিচ্‌না।

—বেরিয়েছে, কোথায়?

—নিশ্চয় মায়ের কাছে গেছে, তারপর ওখানেই থাকবে বোধহয় রাতটা।

—থাকাথাকি অনেক হয়েছে। বয়েস হল, আর এটুকু জ্ঞান ওর নিশ্চয় আছে।······বিড়বিড় করে পান্তালিমন বিরক্তি প্রকাশ করে।

বরাবরকার মতো বিশেষ মনোযোগ আর উৎসাহ সহকারেই বুড়ো খায়। মাঝে মাঝে টেবিলের ওপর উল্টো করে চামচেটা রেখে সে আড়চোখে পাশে-বসা মিশাৎকার দিকে তাকায় আর কর্কশ গলায় বলে: খোকা একটু ঘুরে বোস্‌। দেখি মুখটা মুছে দিই। তোর মা-টা হল লক্ষ্মীছাড়া, তোদের একটু দেখবার লোকও নেই রে।···নাতির ছোট কচি লাল ঠোঁটদুটো সে মুছে দেয় নিজের প্রকাণ্ড কালো কড়া-পড়া হাতের তেলো দিয়ে।

ওরা নিঃশব্দে খেয়ে টেবিল ছেড়ে ওঠে। পান্তালিমন হুকুম দেয় :

—বাতি নেভাও। অত তেল নেই ঘরে, লোকসান করে লাভ নেই।

—দরজায় খিল দিয়ে দেব ? জিজ্ঞেস করে ইলিনিচ্‌না।

—হ্যাঁ।

—কিন্তু নাতালিয়ার কী হবে ?

—যদি আসে, সাড়া দেবে। হয়তো ভোর অবধিই টহল দিয়ে বেড়াবে, আজকাল তো দিব্যি ফ্যাশানও হয়েছে তার' তুই বুড়ী ওকে অত আস্কারা দিবিনে! বেশ বুদ্ধি যাহোক, রাত করে বেরিয়েছেন বেড়াতে। …সকালে আমি শুনিয়ে দেব। দারিয়ার রাস্তা ধরেছে……।

কাপড় না ছেড়েই শুয়ে পড়ে ইলিনিচ্‌না। আধঘণ্টা শুয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, নিঃশব্দে পাশ ফেরে। উঠে বেরিয়ে কপিতোনোভ্‌নার কাছে যাবে ভেবেছে এমন সময় জানালার নিচে শোনে পায়ের আওয়াজ, টেনে-টেনে চলা, টলতে-থাকা। চট করে এমনভাবে লাফিয়ে ওঠে বুড়ী যা তার এ-বয়সের পক্ষে সহজ নয়। তাড়াতাড়ি ছুটে সিঁড়ি-দরজার কাছে গিয়ে খিল খুলে দেয়।

নাতালিয়া মড়ার মতো ফ্যাকাশে। সিঁড়ির রেলিং ধরে আস্তে আস্তে উঠে আসছে। পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় তার বসে-যাওয়া গাল, চোখ আর যন্ত্রণায় কুঁচকে ওঠা ভুরু দুটো স্পষ্ট নজরে পড়ে। ভীষণরকম জখম কোনো জন্তুর মতো টলতে টলতে হেঁটে আসছিল সে। যেখানে পা রাখছে সেইখানেই কালচে রক্তের দাগ পড়ে যাচ্ছে।

ইলিনিচ্‌না নিঃশব্দে তাকে জড়িয়ে ধরে দরজার ভেতরে টেনে আনল। দরজার কপাটে পিঠ রেখে নাতালিয়া চাপা ঘড়ঘড়ে গলায় বললে :

—সবাই শুয়ে পড়েছে তো ? মা, পেছনের ওই রক্তগুলো মুছে দাও। ·· দেখেছ, দাগ পড়ে গেছে ।

ঠেলে ওঠা কান্না চেপে ইলিনিচ্‌না প্রায় চেঁচিয়েই উঠল, এ কী করেছ তুমি ?

হাসতে চেষ্টা করে নাতালিয়া, কিন্তু করুণভাবে বিকৃত হয়ে ওঠে ওর মুখখানা।

—চেঁচিও না মা · ওরা সবাই জেগে যাবে। যাক, আপদ বিদায় করেছি। …এবার মনটা ঠাণ্ডা হয়েছে আমার। তবে বড্ডো রক্ত পড়ল।…বলির পশুর মতো গলগল করে রক্ত বেরিয়ে যাচ্ছে দেহ থেকে। ·· তোমার হাতটা দাও মা। · মাথা ঘুরছে।

দরজায় খিল দেয় ইলিনিচ্‌না। তারপর যেন এক অচেনা বাড়িতে এমনিভাবে কাঁপা হাতে অনেকক্ষণ ধরে হাতড়াতে থাকে, অথচ অন্ধকারে ভেতরের দরজার হাতলটার নাগাল পায় না। পা টিপে টিপে নাতালিয়াকে

শোবার বড়ো ঘরটার মধ্যে নিয়ে আসে। দুনিয়াকে জাগিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দেয়। দারিয়াকে ডেকে আলোটা জ্বালে।

রান্নাঘরের দরজাটা খোলা। ভেতর থেকে পান্তালিমনের একটানা নাকের গর্জন শোনা যাচ্ছে। ছোট্ট পলিউশ্‌কা মিষ্টি করে ঠোঁটটা চেটে কী যেন বিড়বিড় করে বললে ঘুমের ঘোরে। শিশুর নিশ্চিন্ত নিবিড় ঘুম যে কত গভীর!

ইলিনিচ্‌না যখন বালিশ ফুলিয়ে বিছানাটা তৈরি করে দিচ্ছে, নাতালিয়া তখন একটা বেঞ্চিতে বসে টেবিলের ধারে মাথাটা ঠেকিয়ে রেখেছে ক্লান্তি ভরে। দুনিয়া ঘরে আসতে চাচ্ছিল কিন্তু ইলিনিচ্‌না তাকে ধমকে দিলে:
—চলে যা, নির্লজ্জ বেহায়া মেয়ে। এদিকে আসিস্‌নি! তোর নাক গলাবার ব্যাপার নয়!

ভুরু কুঁচকে একটা ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে সিঁড়ি দরজার দিকে এগোল। নাতালিয়া অতি কষ্টে মাথা তুলে বললে:

—বিছানা থেকে পরিষ্কার চাদরটা সরাও।...একটুকরো চট্‌-টট্‌ যা হয় বিছিয়ে দাও .....আমি জানি নষ্ট হয়ে যাবে...... ।

ইলিনিচ্‌না বলে, চুপ কর! কাপড ছেড়ে শুয়ে পড! খুব খারাপ লাগছে? একটু জল এনে দিই?

—ভয়ানক দুর্বল বোধ হচ্ছে।...একটা পরিষ্কার কাপড আর জল দাও।..

একটু চেষ্টা করে নাতালিয়া উঠে দাঁড়াল। স্খলিত পায়ে এগিয়ে গেল বিছানার দিকে। এতক্ষণে ইলিনিচ্‌নার নজরে পডেছে ওর ঘাগরাটা রক্তে ভেজা, ভারি হয়ে সাপ্‌টে জড়িয়ে ধরেছে ওকে। ঠিক বৃষ্টিতে ভেজার মতো নাতালিয়া যখন নিচু হয়ে ঘাগরার কিনারাটা নিংডে দিতে লাগল তখন বুড়ী সভয়ে চেয়ে রইল ওর দিকে। নাতালিয়া কাপড ছাডতে লাগল।

ইলিনিচ্‌না সবিস্ময়ে বলে, উঃ এত রক্ত পড়ছে, মরে যাবে যে!

নাতালিয়া পোশাক ছাড়ে আর চোখ বুজে তাড়াতাড়ি নিঃশ্বাস নিতে থাকে পাগলের মতো। বুড়ী একবার ওর দিকে তাকিয়ে মনটাকে স্থির করে নিয়ে রান্নাঘরে ঢোকে। খানিকক্ষণ চেষ্টা করে পান্তালিমনকে অবশেষে ঘুম থেকে তোলে সে:

—নাতালিয়া অসুস্থ। খুব খারাপ অবস্থা, মারাও যেতে পারে।..ওগো এখুনি উঠে ঘোড়া জুতে নিয়ে ভিয়েশেনস্কায় চলে যাও ডাক্তার ডাকতে।

—বাঃ বেশ মজার ব্যাপার যাহোক। কী হয়েছে নাতালিয়ার? কিসের অসুখ করল তার? রাত-বিরেতে এমনভাবে টো-টো করে বেড়ানোর ফল হবে না?...

বুড়ী সংক্ষেপে বুঝিয়ে দেয় কী হয়েছে। পান্তালিমন উন্মাদের মতো বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে। হাঁটতে হাঁটতেই পাতলুনের বোতাম আঁটে। লম্বা লম্বা পা ফেলে ছোটে শোবার ঘরের দিকে।

—ওরে হতভাগী কুত্তী। ওরে কুত্তীর বাচ্চি। কী করেছিলি, অ্যাঁ? বাধ্য হয়ে করেছেন ও কর্ম! শেখাচ্ছি তোমাকে মজা……

—আরে, পাগল হলে নাকি তুমি? যাচ্ছ কোথায়? ওখানে ঢুকো না, তোমাকে ওর দরকার নেই…মাঝখান থেকে ছেলেপুলেগুলোকে জাগিয়ে দেবে দেখছি। উঠোনে গিয়ে তাড়াতাড়ি ঘোড়া জোতো গাড়িতে!—বুড়োকে আটকাতে চেষ্টা করেছিল ইলিনিচ্‌না। কিন্তু তাকে গ্রাহ্য না করেই বুড়ো শোবার ঘরের দরজার কাছে গিয়ে লাথি মেরে খুলে দেয়।

—বাঃ বেশ কাজ করেছিস্, শয়তানের বেটি!

দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে গজরাতে থাকে বুড়ো।

—অমন কাজ কোরো না। বাবা, ভগবানের দোহাই, চলে যাও, ভেতরে এস না তুমি! —তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে নাতালিয়া। চাদরটা তুলে নিয়ে সে বুকের ওপর চেপে ধরেছে।

ভয়ানক গালিগালাজ করতে করতে পান্তালিমন কোট, টুপি আর জিনের সাজ খোঁজে। এত দেরি করতে থাকে সে যে দুনিয়া আর সামলাতে পারে না। রান্নাঘরে ছুটে গিয়ে বাপের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে। চোখে ওর জল উপচে উঠেছে।

—শিগগির বেরিয়ে পড। কী হাতড়ে বেড়াচ্ছ গুবরেপোকার মতো? নাতালিয়া মারা যাচ্ছে আর এদিকে দশ ঘণ্টা করছ তৈরি হতে! আর বলে কিনা বাপ। যদি না যেতে চাও, সে কথা বললেই পার। আমিই না হয় ঘোড়া জুতে নিয়ে ভিয়েশেনস্কায় যাচ্ছি!

—দেখ আস্পদ্দা। বলি তোর শেকলটা ছিঁড়ল কিসে। অ্যাঁ? তোর মতো হতচ্ছাড়ির কাছ থেকে হুকুম নিতে হবে নাকি? এই আরেকজন এলেন তাঁর বাপের ওপর গলাবাজি করতে, ইল্লুতে বদমাশ! —বলেই পান্তালিমন বীর দর্পে কোটটা ভাঁজ করে নিজের মনে বিড়বিড় করে বকতে বকতে বেরিয়ে গেল উঠোনের দিকে।

বুড়ো বেরিয়ে যাবার পর সারা বাড়িটা যেন একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। দারিয়া মেঝে মুছতে লাগল দুরুম-দারুম করে চেয়ার বেঞ্চি সরিয়ে। ইলিনিচ্‌না দুনিয়াকে শোবার ঘরে ঢুকতে দিয়েছিল। সে নাতালিয়ার মাথার কাছে বসে ওর বালিশটা গুছিয়ে দিল, ওকে জল খেতে দিল। ইলিনিচ্‌না মাঝে মাঝে পা টিপে-টিপে পাশের ঘরে গিয়ে ঘুমন্ত শিশুগুলোকে দেখে আসছে, তারপর শোবার ঘরে ফিরে এসে নাতালিয়ার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে গালে হাত রেখে একেকবার মাথা নাড়ছে অসহ্যভাবে।

চুপচাপ শুয়ে নাতালিয়া। ঘামে ভেজা জটপাকানো চুলে মাথাটা

বালিশের ওপর এপাশ-ওপাশ করছে একেকবার। আধঘণ্টা বাদে-বাদে ইলিনিচ্না ওকে আস্তে আস্তে উঁচু করে ধরে নিচে থেকে ভিজে চাদর সরিয়ে ফের পরিষ্কার চাদর পেতে দিচ্ছে।

প্রতি ঘণ্টায় দুর্বল হয়ে পড়ছে নাতালিয়া। মাঝরাতের পর একবার চোখ খুলে সে জিজ্ঞেস করলে :

—একটু বাদেই বুঝি আলো হবে ?

—না মা, এখনো দেরি আছে।—বুড়ী ওকে সান্ত্বনা দিয়ে মনে মনে ভাবে : তার মানে আর বাঁচবার আশা নেই। ছেলেপিলেদের একবার চোখের দেখা না পেয়ে চলে যেতে মন চাইছে না।

যেন ওরই আন্দাজকে সত্যি প্রমাণ করবার জন্য নাতালিয়া ধীরে ধীরে বললে :

—মা, মিশাৎকা আর পলিউশ্‌কাকে একটু জাগিয়ে দেবে……?

—কেন বাছা ? কেন ওদের আর দুপুর রাতে কষ্ট দেবে ? তোমাকে দেখলে ভয় পেয়ে কাঁদতে শুরু করে দেবে।…কেন; জাগাতে হবে কেন বাছা ?

—ওদের একটু দেখতে চাই……বড্ডো খারাপ লাগছে।

—ঈশ্বর করুণা কর। কী বলছ তুমি বাছা ? এই তো এখুনি বাবার সঙ্গে ডাক্তার এসে পড়বে। সেই সারিয়ে তুলবে তোমাকে। তুমি বরং একটু ঘুমোবাব চেষ্টা কর মা, কী বল ?

—কোন্ ঘুম ঘুমাব ? একটু যেন বিরক্তির আভাস নাতালিয়ার জবাবে। এরপর খানিকক্ষণ আর সে কথা বলে না, নিশ্বাস আগের চেয়ে স্বাভাবিক হয়ে আসে।

ইলিনিচ্না নিঃশব্দে বেরিয়ে সিঁড়ির ওপর এসে কান্নার বাঁধ ভেঙে দেয়। পুবদিকে সামান্য আলোর রেখা আভা দিয়েছে। এমনি সময় সে আবার ঘরে ফিরে আসে লাল ফোলা-ফোলা মুখ নিয়ে। দরজায় আওয়াজ হতে নাতালিয়া চোখ খুলে আবার জিজ্ঞেস করে :

—এখুনি বুঝি আলো হবে ?

—ভোর হচ্ছে।

—কম্বল দিয়ে পাটা আমার ঢেকে দাও। দুনিয়া ওর পায়ের ওপর একটা কম্বল ফেলে দুপাশে ভালো করে গুঁজে দেয়। নাতালিয়া ওর দিকে কৃতজ্ঞ চোখে তাকিয়ে ইলিনিচ্নাকে কাছে ডেকে নেয়। বলে :

—মা আমার পাশে একটু বোসো। দুনিয়া, দারিয়া একটুক্ষণের জন্য বাইরে যাও তোমরা। মার সঙ্গে একটু একা কথা বলতে চাই। ··ওরা কি গেল ?—চোখ না খুলেই জিজ্ঞাসা করে সে।

—হ্যাঁ।

—বাবা এখনো ফেরেননি?

—ফিরবে এখুনি। খুব খারাপ লাগছে কি?

—না। তেমন কিছু নয়।···আমি যা বলতে চাচ্ছিলাম···মা আমি তো আর বাঁচব না। সেটা বেশ টের পাচ্ছি নিজের বুকের মধ্যেই। এত রক্ত বেরিয়ে গেল শরীর থেকে, কী ভয়ানক! দারিয়াকে বোলো যখন উনোনে আগুন দেবে তখন যেন অনেকটা জল চাপায়।··· তোমরাই নাইয়ে দিও আমাকে। বাইরের লোক চাই না···

—নাতালিয়া। ক্রুশপ্রণাম কর বাছা! কেন মরণের কথা বলছ? ঈশ্বর করুণাময়! তুমি ভালো হয়ে যাবে।

দুর্বল একটা ভঙ্গিতে শাশুড়ীকে চুপ করতে ইঙ্গিত করে নাতালিয়া বলে:

—আমাকে বাধা দিও না,··· ··কথা বলতে এমনিতেই বড়ো কষ্ট হচ্ছে। বলছিলাম কি মাথাটা যে আবার ঘুরতে শুরু করল।···জলের কথা তো বলেছি, তাই না? কিন্তু একটু জোর আনতে হবেই······ কপিতোনোভ্না কাজটা সেরেছিল অনেক আগেই, সেই যখন খাবার সময় গিয়ে হাজির হই তখনই।··তারপর যা হল, বড়ো ভয় পেয়ে গিয়েছিল বেচারী বুড়ী। অনেক, অনেক রক্ত পড়ল এখন টেনেটুনে সকাল অবধি যদি বাঁচি ···বেশী করে জল ঢেলো· মরার সময় পরিষ্কার হতে চাই। ···মা, আমাকে সেই সবুজ ঘাগরাটা দিও, সেই যেটার পাড়ে নকশা তোলা। গ্রিশ্কা ওইটে ভারি পছন্দ করত।···আর আমার পপ্লিনের জামাটা ·ওপরের তোরঙ্গের মধ্যে আছে। ডান দিকের কোণে, ঠিক শালটার নিচে। ·আর মারা যাবার পর যেন আমাকে আমার ঘরের লোকদের কাছে নিয়ে যায়।··তুমি মাকে খবর দাও, যেন এখুনি এসে পড়ে। ···তার কাছে বিদায় নিতে হবে। নিচে থেকে চাদরটা সরিয়ে নাও। একেবারে ভিজে গেছে।···

নাতালিয়ার পিঠের নিচে হাত দিয়ে ওকে একটু উঁচু করে ধরে ইলিনিচ্না চাদরটা বের করে নিয়ে আরেকটা চাদর বিছিয়ে দিলে কোনো রকম। নাতালিয়া অতিকষ্টে ফিসফিস করে বললে:

—আমাকে পাশ ফিরিয়ে দাও ·এক পাশে। বলতে বলতে জ্ঞান হারাল সে।·

* * * * *

জানালার ভেতর দিয়ে কপোত ধূসর ভোরের উঁকি। দুনিয়া একটা বালতি ধুয়ে নিয়ে গাই দুইতে চলে গেল উঠোনে। জানলাটা একেবারে খুলে দিলে ইলিনিচ্না। সঙ্গে সঙ্গে টাটকা রক্ত আর পোড়া মোমবাতির গন্ধে ভারাক্রান্ত ঘরখানা তাজা হয়ে উঠল গ্রীষ্ম প্রভাতের সতেজ

ঠাণ্ডায়। জানলার বাইরে ঝড়ে-পড়া চেরী-পাতার গায়ে শিশিরের ফোঁটা জমেছিল চোখের জলের মতো। বাতাসের ঝাপটায় সে জল মুছে যাচ্ছে। জানলা দিয়ে আসছে ভোরের পাখীর প্রথম কাকলি, গোরুর হাম্বা ডাক আর থেকে থেকে রাখালের চাবুকের সপাত সপাত শব্দ।

নাতালিয়ার জ্ঞান ফিরে আসে। চোখ খুলে শুকনো রক্তহীন ফ্যাকাশে ঠোঁটদুটো চাটে জিভের ডগা দিয়ে, তারপর একটু জল চায়। আর ছেলে-মেয়ে কিংবা মায়ের কথা বলছে না সে। সব যেন ওর কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, চিরকালের মতো চলে যাচ্ছে।

ইলিনিচ্না জানলা বন্ধ করে বিছানার কাছে এগিয়ে যায়। এক রাতের মধ্যে কী ভয়ানক পরিবর্তন হয়ে গেছে নাতালিয়া। আগের দিনটিতেও সে ছিল ফলন্ত যৌবনদীপ্ত আপেল গাছটির মতো—সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী, সবলা; আর এখন ওর গালদুটো ডনপাড়ের পাহাড়ের চকখড়ির চেয়েও যেন সাদা, ঠোঁটের সেই অদ্ভুত সতেজ ভাবটি আর নেই, কেমন যেন পাতলা হয়ে গেছে, ফাঁক-হয়ে-থাকা দুপাটি দাঁত থেকে যেন সরে যেতে চাইছে। শুধু রয়ে গেছে সেই ঔজ্জ্বল্যটুকু, কিন্তু তারও ভাব এখন আলাদা! একটা নতুন, অদ্ভুত ধরনের শঙ্কিত চাউনি শুধু জেগে উঠেছে সে-চোখে যখন এককেবার সে কোনো অজ্ঞাত প্রয়োজনে নীলচে চোখের পাতাজোড়া তুলে ঘরের আশপাশ দেখে নিয়ে এক লহমার জন্য স্থির দৃষ্টি মেলে ধরছে নাতালিয়ার দিকে।

* * * * * *

ভোর নাগাদ ফিরল পান্তেলিমন। রাত জেগে জেগে ডাক্তারের চোখের পাতা ভারী, টাইফাস্ আর জখমের অসংখ্য রুগী দেখে দেখে ক্লান্ত। শরীরটা একবার টান করে তারান্তাস্ গাড়ি থেকে তিনি নামলেন, আসন থেকে পুলিন্দা নিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকলেন। সিঁড়িতে উঠবার সময় ক্যানভাসের বর্ষাতিটা খুলে রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে লোমশ হাত জোড়া ধুলেন। দুনিয়া একটা জগ থেকে জল ঢেলে দিচ্ছিল তার হাতে। উনি ভুরুর তলা দিয়ে দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে একবার চোখও টিপলেন। তারপর শোবার ঘরে ঢুকে নাতালিয়ার কাছে প্রায় মিনিট দশেক দাঁড়ালেন। আগেই সবাইকে বের করে দিয়েছিলেন ঘর থেকে।

পান্তেলিমন আর ইলিনিচ্না রান্নাঘরে এসে বসল।

শোবার ঘর ছেড়ে বেরুবার সময়ই চাপা গলায় বুড়ো জিজ্ঞেস করে, কেমন আছে ও এখন?

—খারাপ…।

—নিজের ইচ্ছে করে এই কাজ করেছিল ?

—ওর নিজেরই বুদ্ধিতে।—ইলিনিচ্‌না প্রশ্নটা এড়িয়ে যায়।

ডাক্তার দরজার ফাঁক দিয়ে উস্কোখুস্কো চুলওয়া মাথাটা বের করে হুকুম দিলেন, গরম জল, শিগগির।

জল গরম হবার সময় উনি রান্নাঘরে এলেন। বুড়ো পান্তালিনের নীরব প্রশ্নের জবাবে শুধু হতাশভাবে হাত নাড়লেন।

—দুপুর নাগাদ বোধহয় শেষ হয়ে যাবে। অসম্ভব রক্ত বেরিয়ে গেছে তো। কিছুই করাব নেই এখন। গ্রিগর পান্তালিয়েভিচকে খবব দিযেছেন ?

কোনো জবাব না দিয়ে পান্তালিমন তাড়াতাড়ি সিঁড়িব দরজার দিকে যায়। দারিয়া দেখে বুড়ো চালাঘরের ছাঞ্চির নিচে মাড়াই কলটাব কাছে গিয়ে এক রাশ ঘুটের ওপর মাথাটা রেখে হাউ-হাউ করে কাঁদছে।

আবো আধঘণ্টা রইলেন ডাক্তার। খানিকক্ষণ সিঁড়িতে বসে সকালের উঠন্ত বোদে ঝিমুতে লাগলেন। সামোভারে জল ফুটবার সময আবাব শোবার ঘরে ঢুকলেন তিনি। নাতালিযাকে একটা ক্যাম্ফাব ইঞ্জেকৃশন্ দিয়ে ফের বেবিয়ে এসে একটু দুধ চাইলেন। উদ্গাত হাইটাকে চাপা দিযে দুগ্লাশ দুধ খেযে তিনি বললেন .

—এখুনি আমাকে ফেরত নিযে চল। ভিয়েশেন্স্কায আমার জন্য রুগী জখমী সব বসে আছে। এখানে আমার করাবও কিছু নেই। কোনো আশা তো দেখি না। গ্রিগব পান্তালিযেভিচের জন্য আমি সবকিছুই কবতে রাজী, সত্যি কথা বলতে কি আমাব ক্ষমতার বাইরে এখন। প্রযোজনের সময় আমরা যা করতে পাবি সে যৎসামান্য। অসুস্থকে শুধু সাবিয়ে তুলতেই পারি, কিন্তু মবাকে তো বাঁচাতে শিখিনি। আর তোমাদের এই মেযেটি এমন বিশ্রীরকম জখম হযেছে যে বাঁচলে ও কি নিযে বেচে থাকবে সেইটেই সমস্যা। সাংঘাতিক বকমভাবে নাড়িটা ছিঁড়ে গেছে, তার আর কিছু অবশিষ্ট নেই। আমাব মনে হয বুড়ী লোহার চিম্‌টে ব্যবহাব করেছিল। আমাদেবই জ্ঞানের অভাব। এ থেকে মুক্তি পাবার কী উপায আছে।

পান্তালিমন তাবান্তাস গাড়িতে ঘোড়াব জন্য কিছু ঘাস ফেলে দারিযাকে বললে

—একে পৌছে দিয়ে এস। ডনের পাড়ে এসে ঘুড়ীটাকে একটু জল খাওযাতে ভুলো না।

ডাক্তারকে সে টাকা দিতে যাচ্ছিল কিন্তু ভদ্রলোক সবাসবি অস্বীকার করলেন। বুড়োকে লজ্জা দিযে বললেন

—টাকার কথা বলতে আপনার লজ্জা হওয়া উচিত ছিল পান্তালিমন

প্রকোফিয়েভিচ! আমার আপন জন, আর আপনি কিনা টাকা দিতে চাইছেন আমাকে! না, সরিয়ে নিন। কী জন্য আপনি দেবেন। অনুরোধের কোন প্রয়োজন নেই। যদি আপনার ছেলের বউকে দাঁড় করিয়ে দিতে পারতাম তাহলে অবিশ্যি অন্য কথা।

সকাল প্রায় নয়টা নাগাদ নাতালিয়া অনেকটা সুস্থ বোধ করতে থাকে। গা ধুয়িয়ে দিতে বলে সে। দুনিয়া ওর সামনে আয়না ধরে, সে চুল আঁচড়ায়। আশেপাশের প্রিয়জনদের দিকে চেয়ে জলজলে চোখে জোর করে একটু হাসির ভাব আনে :

—এই তো এবার সেরে উঠেছি! কিন্তু সত্যি বড় ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ভাবলাম বুঝি শেষ হয়ে গেলাম।...কিন্তু ছেলেমেয়েরা এতক্ষণ ধরে ঘুমোচ্ছে কেন? দুনিয়া, গিয়ে দেখে এস তো ওরা জেগেছে কিনা।

নাতালিয়ার মা লুকিলিচ্‌না ওর ছোট বোন আগ্রিপিনাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। মেয়েকে দেখে বুড়ী কেঁদে ফেলে। কিন্তু নাতালিয়া বারবার করে বলতে থাকে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে :

—কেন কাঁদছ মা তুমি? আমি তো এখন ততটা খারাপ বোধ করছি না।...তুমি তো আমাকে কবর দিতে আসনি, কী বল? উঃ কেন কাঁদছ তাই বল না?

আগ্রিপিনা মাকে একটু খোঁচা দিতে কারণটা আন্দাজ করে, লুকিনিচ্‌না তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে সান্ত্বনা দিয়ে বলে :

—কেনরে, তুই কী ভেবেছিস বাছা? আমি বোকা কিনা, তাই কাঁদছিলাম। তোকে দেখে বুকটা কেমন করে উঠল· কত বদলে গেছিস্ রে ··।

মিশাৎকার গলা আর পলিউশকার হাসির আওয়াজ কানে যেতেই নাতালিয়ার গালে যেন রক্তের আভা জাগল।

সে বললে,' ওদের এখানে নিয়ে এস। তাড়াতাড়ি ডাক! জামা-টামা পরে পরবে'খন।

প্রথমে এল পলিউশ্‌কা। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে ছোট হাতের মুঠো দিয়ে ঘুম চোখ রগড়াতে লাগল।

নতালিয়া হেসে বললে, তোব মা যে অসুখে পড়েছে। আযরে আমার ধন, কোলের কাছে আয়।

বাড়ির বড়োদের সবাইকে গম্ভীর হয়ে বেঞ্চে বসে থাকতে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল পলিউশ্‌কা। মার কাছে গিয়ে বিরক্তির স্বরে বললে :

—আমাকে জাগিয়ে দাওনি কেন তুমি? ওরা সব এসেছে কেন মা?

—ওরা সব আমায় দেখতে এসেছে।...কিন্তু তোকে জাগাব কেন বল তো?

—তোমাকে জল এনে দিতাম, কাছে বসতাম ··

—আচ্ছা, গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে চুল আঁচড়ে প্রার্থনা করে তারপর আয়, এখানে বোস্‌· ·

—কিন্তু তুমি সকালে খেতে উঠবে না ?

—জানি না। বোধ হয় না।

—তাহলে তোমার খাবার এনে দেব এখানে। ঠিক হবে তো মা ?

—এক্কেবারে ওর বাপের মতো। তবে মনটা ওর তার মতো নয়, এর আরো নরম।···নাতালিয়া ম্রিয়মাণ হাসি হেসে বলে। মাথাটা পেছনে হেলিয়ে কম্বলখানা টেনে নেয় পায়েব ওপর, বুঝি বা শীত করছে তার।

ঘণ্টাখানেক বাদে ওর অবস্থা খারাপের দিকে যায়। ছেলেদের ইশারায় কাছে ডেকে বুকে জড়িয়ে ধরে, ওদের মাথার ওপর ক্রুশ এঁকে চুমু দেয় দুজনকে। তারপর মাকে বলে যেন বাচ্চাগুলোকে তারই সঙ্গে নিয়ে যায়। লুকিনিচ্‌না ওদের আগ্রিপিনার জিম্মায় রেখে মেয়ের কাছে ফিরে আসে।

নাতালিয়া চোখ বুজে প্রলাপ বকার মতো বলতে থাকে :

—ওভাবে তাকে দেখতে পারি না তো ·।—তারপর হঠাৎ যেন মনে পড়েছে এমনিভাবে ধড়মড় করে উঁচু হয়ে উঠে বলে, মিশাৎকাকে ফিরিয়ে আন।

জলভরা চোখে আগ্রিপিনা ছেলেটিকে কামরার ভেতর ঠেলে দেয়! রান্নাঘরে বসে নীরবে কাঁদতে থাকে সে।

মেলেখফ পরিবারের আর সব লোকেদের মতোই গম্ভীর থমথমে মুখে ভয়েভয়ে ঘরে ঢোকে মিশাৎকা। ওর মায়ের মুখে যে আমূল একটা পরিবর্তন এসেছে তার ফলে তাকে অন্য মানুষ মনে হচ্ছে, চিনতেই পারা যাচ্ছে না। নাতালিয়া ছেলেকে কাছে টেনে নিলে, ে র পেলে ওর বুকটা ভয়নক ঢিপঢিপ করছে ফাঁদে আটকানো চড়ুই পাখির মতো।

—আরেকটু কাছে আয় বাবা! খোকারে!—বললে নাতালিয়া।

ওর কানে-কানে কী যেন বলে নাতালিয়া ওকে ঠেলে সরিয়ে দিলে তারপর জিজ্ঞাসু চোখে ছেলেব মুখের দিকে তাকালে। কাঁপতে-থাকা ঠোঁটদুটো চেপে জোর করে একটা করুণ যন্ত্রণাদীর্ণ হাসি মুখে ফুটিয়ে বললে :

—ভুলে যাবি না তো ? বলবি তো তাকে ?

—আমি ভুলব না।—মায়ের হাতের একটা আঙুল নিজের ছোট্ট উষ্ণ হাতের মুটোয় এক মুহূর্তে সজোরে চেপে ধরে সে। তারপর ছেড়ে দেয়। বিছানার কাছ থেকে সরে আসার সময় কোন কারণে পা টিপে-টিপে চলে আসে দুহাতে ভার সামলে।

দরজা অবধি ওকে লক্ষ্য করে নাতালিয়া, তারপর নিঃশব্দে দেয়ালের দিকে ফেরে।

দুপুরেই মারা যায় সে।

॥ সাত ॥

লড়াইয়ের ময়দান থেকে বাড়ি ফেরবার পথে দুদিন যে গ্রিগরের মাথায় কত চিন্তা, কত স্মৃতি ঘুরপাক খেতে লাগল তার আর হিসেব নেই। ভারাক্রান্ত মন আর নাতালিয়ার জন্য অবিরাম চিন্তা নিয়ে স্তেপের প্রান্তরে একা থাকতে হবে এই ভয়ে সে সঙ্গে এনেছিল প্রোখর জাইথফকে। ওদের স্কোয়াড্রনের ঘাঁটি সেই গ্রামটা থেকে বেরিয়ে আসামাত্র গ্রিগর শুরু করল লড়াইয়ের গল্প—অস্ট্রিয়ার রণাঙ্গনে কীভাবে লড়েছিল বারো নম্বর রেজিমেণ্টের হয়ে, কেমন করে রুমানিয়াতে অভিযান চালিয়েছিল আর জার্মানদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল সে। এক টানা কথাই বলে চলেছে, রেজিমেণ্টের বন্ধুরা সব কী কী আজব কাণ্ডকারখানা করত সেই সব মনে করছে আর হাসছে।···

প্রথম প্রথম গ্রিগরের এই অস্বাভাবিক বাচালতায় হতভম্ব হয়ে প্রোখর ওর দিকে অবাক হয়ে আড়চোখে তাকাচ্ছিল। কিন্তু পরে যখন বুঝল গ্রিগরের অতীতের বোঝা থেকেই মুক্তি পাবার চেষ্টা করছে, তখন সেও নিতান্ত জোর করে আলাপটা যাতে চালু থাকে সেই চেষ্টা করতে লাগল। চেরনিগভ হাসপাতালের সেই সব দিনের কথা বলতে বলতে প্রোখরের একবার নজর পড়েছিল গ্রিগরের দিকে। দেখল ওঁর কালচে গালদুটো বেয়ে অশ্রুর ধারা নেমেছে। প্রোখর সসম্ভ্রমে কয়েক গজ পেছিয়ে গেল। প্রায় আধঘণ্টা ধরে পেছন পেছন ঘোড়া চালিয়ে এল। তারপর আবার পাশাপাশি এসে কতগুলো মামুলী অর্থহীন বিষয় নিয়ে অলাপ জুড়বার চেষ্টা করল সে। কিন্তু গ্রিগরের মনই ছিল না গল্প করার। অগত্যা দুজন দুপুর অবধি চুপচাপ পাশাপাশি চলল রেকাবে রেকাব ঠেকিয়ে।

গ্রিগর মরিয়া হয়ে ছুটছিল। গরম সত্ত্বেও ও ঘোড়া চালিয়েছে জোর কদমে। মাঝে মাঝে শুধু একেকবার সাধারণ হাঁটার মতো মন্থর করে আনছে বেগটা। বেলা দুপুরের আগে আর ঘোড়া থামায় না সে। সূর্যের খাড়া রোদে তখন অসহ্য পোড়া গরম। একটা উঁচু পাহাড়ের ধারে এসে সে ঘোড়া থেকে নামে। ঘোড়াটাকে ছেড়ে দেয় ঘাস খেতে। ছায়ার মধ্যে গিয়ে মাথা নিচু করে শরীরটাকে মেলে দেয় সে। যতক্ষণ না গরম খানিক কমে ততক্ষণ শুয়েই থাকে। ঘোড়াগুলোকে ওরা অবশ্য দানা খেতে দিয়েছিল, কিন্তু ওদের খাওয়াবার সময়ের ধার ধারছে না গ্রিগর মোটেই। ঘোড়াগুলো দীর্ঘ পথ চলায় অভ্যস্ত হলে কী হয়, প্রথম দিনের শেষেই তাদের পাঁজরা বসে গেল, সকালের দিকে যে অক্লান্ত উৎসাহ ওদের ছিল এখন আর তা নেই। প্রোখর বিরক্ত হয়ে ভাবতে লাগল—ঘোড়াগুলোকে এভাবে বোকার মতো হয়রান করতে হয়। কাকে দেখেছ এমন করে ঘোড়া চালাতে? ওর আর কী ভাবনা। এখন এ জানোয়ারটাকে খাটাচ্ছে, দরকার হলেই আরেকটাকে যোগাড় করে নেবে যখন খুশী। কিন্তু আমি পাব কোথায়? ঘোড়াগুলোকে দাবড়ে মেরে ফেলবে, তারপর বাকি পথটা যেতে হবে হেঁটে হেঁটে, কিংবা কোন বলদ গাড়িতে চেপে।

পরদিন সকালে আর চুপ করে থাকতে পারল না। গ্রিগরকে শেষমেষ বলেই ফেলল :

—তোমার নিজের ঘোড়া বলে তো কেউ কোনোদিন মনেও করবে না। না হলে এমনিতরো দিন নেই রাত নেই না-বিশ্রাম কেউ ঘোড়া দাবড়ায়? ঘোড়াগুলোর কী হাল হয়েছে দেখেছ। সন্ধ্যের সময় অন্তত ভালো করে একটু দানাপানি দেয়া যাক, কী বল?

অন্যমনস্কভাবে জবাব দিল গ্রিগর, চালাও চালাও, পেছন পড়ে থাকলে চলবে না।

—তোমার সঙ্গে আমি তাল রাখতে পারছি না। ঘোড়া আমার শেষ হয়ে গেল। একটু বিশ্রামও পাব না?

কোন জবাব দিলে না গ্রিগর। প্রায় আধঘণ্টা একটিও বাক্যবিনিময় না করে ওরা চলতে লাগল। তারপর প্রোখর একটু জোরের সঙ্গেই জানিয়ে দিলে :

—ওদের একটু দম নিতে তো দেওয়া যাক। আমি কিন্তু এভাবে আর ছুটব না। শুনতে পাচ্ছ?

—চাবুক কষাও। চাবুক কষাও।

—কিন্তু চাবুক কষিয়ে আর কতক্ষণ চলব? যতক্ষণ না খুর খসে পড়ে?

—তর্ক করো না?

—একটু দয়া কর গ্রিগর পান্তালিয়েভিচ্! আমি আমার ঘোড়াটাকে এভাবে মারতে চাই না, কিন্তু ব্যাপার যা দাঁড়াচ্ছে……

—বেশ, থাম তাহলে। নিকুচি করেছে। ভালো ঘাস পাওয়া যায় এমন একটা জায়গা খুঁজে বের কর।

* *

খপেরস্ক অঞ্চলের সমস্ত জেলা ঘুরে সেই টেলিগ্রাম অবশেষে যখন গ্রিগরের কাছে পৌছয় তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। নাতালিয়ার কবর হবার তিনদিন পর সে বাড়িতে এসে পৌছল। ফটকের সামনে ঘোড়া থেকে ও নামতেই দুনিয়া ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকে। গ্রিগর ওকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে লম্বা পা ফেলে এগোয়। ভুরু কুঁচকে বলে:

—ঘোড়াটাকে বেশ খানিকটা হাঁটিয়ে আন তো আর অমন করে কেঁদো না!—প্রোখরের দিকে ফিরে সে হুকুম দিলে: বাড়ি চলে যাও। যদি দরকার পড়ে ডেকে পাঠাব।

মিশাৎকা আর পলিউশ্কার হাত ধরে ইলিনিচ্না সিঁড়িতে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

গ্রিগর ওদের দুহাতে জড়িয়ে ধরে কাঁপা কাঁপা গলায় বললে:

—কাঁদিসনি রে। চোখে জল কেন? ওরে আমার বাছারা! তোরা তাহলে মাকে হারালি? ওরে থাম্ থাম্ ··তোর মা যে আমাদের বড় ফাঁকি দিয়ে গেল ·

কিন্তু ঘরের ভেতর বাপের সঙ্গে কথা কইতে গিয়ে ওর নিজের পক্ষেই কঠিন হয়ে উঠল কান্না চেপে রাখা।

—রাখতে পারলাম না রে···।—বলেই পান্তালিমন সঙ্গে সঙ্গে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সিঁড়ি-দরজার দিকে চলে গেল।

ইলিনিচ্না গ্রিগরকে নিয়ে শোবার ঘরে ঢোকে, তাকে নাতালিয়ার কথা বলে। বুড়ী সবটুকু খুলে বলতে চায়নি, কিন্তু গ্রিগর প্রশ্ন করলে:

—পেটে ছেলে রাখবে না এমন মতলব তার মাথায় এল কী করে? তুমি জানো?

—হ্যাঁ জানি।

—কী?

—সে তোমার ওই। ওরই সঙ্গে দেখা করেছিল আগের দিন। আকসিনিয়া তাকে সব ঘটনা বলে দেয়।

গ্রিগর ভয়ানক লাল হয়ে ওঠে—ও! এই ব্যাপার! চোখ নামিয়ে নেয় সে।

যখন ও বেরিয়ে আসে আগের চেয়ে যেন বয়স্ক আর ফ্যাকাশে দেখায় ওকে। খেতে বসে নিঃশব্দে ওর নীলচে চোখ দুটো কেঁপে কেঁপে ওঠে। ছেলেমেয়েগুলোকে কিছুক্ষণ আদর করে ওদের হাঁটুর ওপর বসায়। তারপর পুলিন্দা থেকে এক টুকরো কাল্চে ময়লাটে মিছরি বের করে হাতের তেলোর ওপর রেখে ছুরি দিয়ে টুকরো করে। অপরাধীর মতো হেসে বলে:

—তোদের জন্য এইটুকুই মাত্র আনতে পেরেছি।…এই তো তোদের বাপ।…নে, এবার উঠোনে গিয়ে দাদুকে ডেকে আন্ তো।

ইলিনিচ্না বললে, কবরটা দেখে আসবি নাকি?

—পরে যাব এক ফাঁকে।…মৃতের চোখে অপরাধ নেই।…মিশাৎকা আর পলিউশ্কা কেমন আছে? ভালো তো?

—প্রথম দিন তো খুবই কেঁদেছিল, বিশেষ করে পলিউশ্কা।…কিন্তু এখন যেন মনে হয় ওরা একটা বুঝ-সমঝ করে নিয়েছে। আমাদের সামনে আর মায়ের কথা-টথা বলে না। তবে কাল রাতে শুনছিলাম মিশাৎকার চাপা কান্না। মাথাটা বালিশে গুঁজে রেখেছিল যাতে কেউ শুনতে না পায়।…কাছে গিয়ে শুধোলাম: কীরে বাছা? উঠে এসে আমার কাছে শুবি? জবাব দিলে: ঠিক আছে ঠাকুমা। ঘুমের ঘোরে বোধ হয় কেঁদে উঠেছিলাম: ⌣, তুমি ওদের সঙ্গে কথা বল, একটু আদর করি। কাল সকালে সিঁড়ির কাছে দুজনে কথা বলছিল শুনলাম। পলিউশ্কা বলছিল: মা আবার ফিরে আসবে আমাদের কাছে। মার বয়েস তো কম, আর কম বয়েসে কেউ মরেও না।—এখনো ওরা অবুঝ, কিন্তু বড়দের মতোই ওদের ছোট্ট বুকও খাঁ-খাঁ করে তো। তোমার বোধহয় খিদে পেয়েছে, বেসো, কিছু জোগাড় করি তোমার জন্য। অমন মুখ বুজে আছ কেন?

শোবার ঘরে যায় গ্রিগর। ওর ভাব দেখে মনে হয় জীবনে এই প্রথম বুঝি সেখানে ঢুকেছে: খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে চারিদিকে, তারপর ওর নজর এসে ঠেকল বিছানার ওপরে। তৈরি বিছানায় বালিশগুলো ফুলিয়ে রাখা হয়েছে। এই বিছানাতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল নাতালিয়া, শেষ কথাগুলো সে উচ্চারণ করেছিল ওইখানেই। ও কল্পনা করতে লাগল নাতালিয়া ছেলেমেয়েদের কাছে বিদায় নিয়ে ওদের চুমু দিচ্ছে, হয়তো বা ওদের মাথার ওপর ক্রুশও এঁকে দিয়েছিল। টেলিগ্রামে তার মৃত্যুর খবর পেয়ে যেমন হয়েছিল আরেকবার সেই তীক্ষ্ণ ছুঁচলো একটা ব্যথা ওর বুকে বেজে ওঠে, কানটা যেন ভোঁ-ভোঁ করতে থাকে।

ঘরের প্রত্যেকটা ছোটখাটো জিনিস মনে করিয়ে দিচ্ছে নাতালিয়াকে। ওর মনে নাতালিয়ার স্মৃতিও ক্ষয় পাবার নয় অথচ তা যন্ত্রণামথিত। কোনো কারণে সে এক এক করে প্রত্যেকটা ঘর দেখে, তারপর তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এক রকম ছুটেই চলে যায় সিঁড়ির দিকে। ওর বুকের ভেতর

সেই যন্ত্রণাটা ক্রমেই যেন বেশী করে বাজতে থাকে। কপালে ওর ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমে উঠছে। বাঁ দিকের বুকটা হাত দিয়ে সজোরে চেপে ধরে ও সিঁড়ি দিয়ে নামছে আর ভাবছে হতচ্ছাড়ি, বুড়ী ঘুড়ীটা এর মধ্যেই ক'টা পাহাড় ডিঙিয়ে চলে গেছে।

দুনিয়া ওর ঘোড়াটাকে উঠোনের মধ্যে হাঁটাচ্ছিল। গোলাঘরের কাছে এসে ঘোড়া আর বাশ মানতে চায় না, থেমে পড়ে মাটি শোঁকে, গলা লম্বা করে ওপরের ঠোঁট টেনে নিয়ে হলদে দাঁতের পাটিদুটো বের করে দেখায়। তারপর নাক ঝেড়ে পেছনের পা-দুটো অদ্ভুত রকম বাঁকায়। দুনিয়া লাগাম টেনে ধরলেও জানোয়ারটা গ্রাহ্য করে না, শুয়ে পড়ার যোগাড় করে।

আস্তাবল থেকে পান্তালিমন চেঁচায়, ওটাকে গড়াতে দিসনি রে। দেখতে পাচ্ছিস না জিন চড়ানো আছে? আগে জিন খুলে দিসনি কেন রে হাবা?

গ্রিগর নিজের বুকের মধ্যে তোলপাড় তখনো টের পাচ্ছিল। তাড়াহুড়ো না করে সে ঘোড়ার কাছে এসে জিনটা খোলে, কাষ্ঠহাসি হেসে দুনিয়াকে বলে

—বাবা এখনো চেঁচায় আগের মতো?

—যথাপূর্বং।—হেসে জবাব দেয় দুনিয়া।

—আরো কিছুক্ষণ ঘোড়াটাকে হাঁটাও, বোনটি।

—এই তো বেশ ঝরঝরে হয়ে উঠেছে। তবে বলছ যখন আরেকটু ঘোরাচ্ছি।

—যদি ওর একটু গড়াবার ইচ্ছে হয় দাও না গড়াতে, বাধা দিও না।

—আচ্ছা দাদা তোমার খুব দুঃখ হচ্ছে?

—কেন হবে না?—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জবাব দেয় গ্রিগর।

একটা অনুকম্পার অনুভূতিবশে দুনিয়া ওর কাঁধে চুমো দেয়, তারপর চোখে জল আসবার উপক্রম হতেই সে তাড়াতাড়ি ঘুরে ঘোড়াটাকে গরুদের খাটালের দিকে নিয়ে যায়।

গ্রিগর ওর বাপের কাছে যখন আসে তখন সে খেটেখুটে আস্তাবলের নাদি সাফ করছে।

বুড়ো বললে, তোমার ঘোড়ার জন্য একটু গুছিয়ে দিচ্ছি জায়গাটা।

—আমায় বললে না কেন? নিজেই সাফ করে নিতাম।

—বাঃ বেশ কথা। কেন, আমি কি পারি না? আমি বাবা হয়রান হবার মানুষ নই। এখনো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে খানিকটা চলতে পারি। কাল একটু রাই বুনতে বেরুব ইচ্ছে আছে। তুমি কি কয়েকদিন থাকবে?

—মাসখনেক।

—বাঃ ভালোই হল। খামারের দিকে যাবে নাকি? কাজের মধ্যে থাকলে অনেকটা ভালো লাগবে তোমার।

—আমি আগেই সেকথা ভেবেছিলাম।

বুড়ো উকোনঠ্যাঙাটা ছুঁড়ে ফেলে জামার আস্তিনে মুখের ঘাম মুছে রহস্যময় কণ্ঠে বললে :

—চলো ঘরের ভেতর যাই, তুমি একটু কিছু মুখে দাও! এর হাত থেকে আর মুক্তি কোথায় বলো ··মানে এই শোকতাপের কথা। পালিয়েও বাঁচবে না, মরেও বাঁচবে না এ থেকে। এই রকমই জিনিস ·।

টেবিল সাজিয়ে ইলিনিচনা একটা পরিষ্কার তোয়ালে দেয় গ্রিগরকে। আবার মনে পড়ে গ্রিগরের—আগে নাতালিয়াও এমনি করে যত্ন করত আমার। মনের ভাবটাকে লুকোবার জন্য ও সাগ্রহে খেতে শুরু করে। বুড়ো যখন ভাঁড়ার থেকে ঘর-চোলাই ভদ্‌কা এনে হাজির করে খড় দিয়ে গলা-বাঁধা একটা কুঁজোয় করে, তখন গ্রিগর সকৃতজ্ঞ নয়নে একবার তাকায় বাপের দিকে।

পান্তালিমন গম্ভীর গলায় বলে, যে চলে গেছে তাকে স্মরণ করে এস আমরা পান করি—ঈশ্বরের ক্রোড়ে সে শান্তি লাভ করুক।

দুজনে একেক গ্লাস করে খায়। সবুর না করেই বুড়ো আবার গ্লাসদুটো ভরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে :

—এক বছরের মধ্যে পরিবারের দু-দুজন গেল। আমাদের এ বাড়ির ওপর যমের নেক নজর পড়েছে।

গ্রিগর বলে, বাবা, এসব কথা আর নয়।

এক চুমুকে দ্বিতীয় গ্লাস শেষ করে গ্রিগর অনেকক্ষণ ধরে একটুকরো শুকনো মাছ চিবোয়। নেশাটা কতক্ষণে মাথায় চড়ে সেই অপেক্ষায় থাকে যাতে মনের অশান্তিটা ওর চাপা পড়ে।

পান্তালিমন তখন জাঁক করে বলছে, রাই খুব ভালোই হয়েছে এ বছর। আমাদের ফসল এবার সকলের সেরা।—এই অহঙ্কারটুকুর মধ্যে, বাপের গলার এই আওয়াজটুকুর মধ্যে গ্রিগর সন্ধান পায় একটা কষ্টকৃত কৃত্রিমতার।

—কিন্তু গম কেমন হল?

—গম? বরফ পড়ে গোড়ার দিকে একটু ক্ষতি হয়েছিল বটে, তবে একেবারে মন্দ নয়, ফসল হবে মাঝামাঝি। কিন্তু যবটা—আর সবাই ভালো করলেও আমরা কপালের দোষে কিছুই করতে পারিনি। তবে আমি খুব বেশী চাইওনি। চারদিকে এমন ধ্বংসকাণ্ড, তার মধ্যে ফসল দিয়ে করবে কী? বিক্রি করতে পারবে না, জালায় ভরে রাখতে পারবে না। লড়াই যখন এদিকে আসবে তখন তো বন্ধুরাই সব কেড়ে-কুড়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু তুমি চিন্তা কোরো না। এবছরের ফসল ছাড়াও আমাদের যা রয়েছে তাতে স্বচ্ছন্দে দুটো বছর যাবে। ঈশ্বরের দয়ায় আমাদের গোলাঘর ঠাসা, অন্য জায়গায়ও কিছু কিছু আছে···।—বুড়ো ধূর্তের মতো চোখ টিপে বললে,

দারিয়াকে জিজ্ঞেস করে দেখ কতোটা মাটিতে পুঁতে রেখেছি দুর্দিনের কথা ভেবে! তা, গর্তটা প্রায় তোমার মাথা সমান হবে, আর হাত দুটো ছড়ালে তোমার যা হয় প্রায় তার আধাআধি চওড়া, কানায় কানায় ঠাসা! যা দিনকাল পড়েছে, তাইতেই গরিব হয়ে পড়লাম, তাহলেও এখন খানিকটা গুছিয়ে নিতে পেরেছি·· !—বুড়ো হাসলো মাতালের মতো। কিন্তু পরক্ষণেই বেশ আত্মমর্যাদার সঙ্গে দাড়িতে হাত বুলিয়ে গম্ভীর ভারিক্কি গলায় বললে: তুমি হয়তো তোমার শাশুড়ির কথা ভাবছ। তা আমিও অবিশ্যি তাকে ভুলিনি, অসময়ে তাদের সাহায্য করেছি। সে মুখে 'রা'টি করার আগেই তার ঘরে পৌঁছে দিয়েছি এক গাড়ি গমের দানা, ওজনও করে দেখিনি। তোমার নাতালিয়া বড় খুশী হয়েছিল, শুনে তো কেঁদেই ফেলেছিল সে। আরেকবার গেলাসে ঢেলে দেব নাকি খোকা? এখন তো তুইই আমার একমাত্র সম্বল।

টেবিলের ওপর গেলাসটা ঠেলে দিয়ে গ্রিগর বললে, আচ্ছা, দাও।

এমন সময় মিশাৎকা ভয়ে ভয়ে এগিয়ে আসতে লাগল টেবিলের দিকে। বাপের হাঁটুর ওপর উঠে সে কোনো রকমে বাঁহাতখানা দিয়ে গ্রিগরের কাঁধ জড়িয়ে তার ঠোঁটে প্রাণভরে একটা চুমু দিল।

গ্রিগর খুব বিচলিত হয়ে জিজ্ঞেস করলে এটা কিসের জন্য বাবামাণি? —ছেলের জল-ভরা চোখের দিকে ওর নজর পড়ল। নিশ্বাস চেপে রইল যাতে ছেলের মুখে ভদ্‌কার গন্ধ না ঠেকে।

মিশাৎকা নিচু গলায় জবাব দিলে:

—মা যখন শোবার ঘরে অসুখ হয়ে পড়ে ছিল তখনো তো বেঁচে ছিল, আমাকে কাছে ডেকে বললে: তোর বাবা যখন আসবে তখন আমার হয়ে চুমু দিবি আর বলবি যেন তোদের ওপর দয়ামায়া দেখায়। আরো যেন কী বলেছিল, আমি ভুলে গেছি

গ্রিগর গেলাস রেখে জানলার দিকে মুখ ফেরাল। ঘরের মধ্যে একটানা অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা।

পান্তালিমন নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলে, আরো একটু খাবে নাকি?

—আমার দরকার নেই।—জবাব দিয়ে গ্রিগর ছেলেকে হাঁটু থেকে নামিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে সিঁড়ির দিকে চলে গেল।

ইলিনিচ্‌না ছুটল উনোনের দিকে।—একটু দাঁড়া খোকা। মাংসটা খাবিনে? মুরগির ইস্টু, পিঠে আছে।—কিন্তু গ্রিগর ততক্ষণে পেছন থেকে সজোরে দরজা ভেজিয়ে দিয়েছে।

উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে ঘুরে একবার গরুর খাটাল, একবার আস্তাবল দেখে বেড়ায় গ্রিগর। ঘোড়াটা নজরে পড়তে ও মনে মনে ভাবে: একটু চান করিয়ে নিয়ে এলে হয়। চালাঘরের ছাঞ্চির নিচে গিয়ে দাঁড়ায় ও।

মারাই কলের পাশে স্যাখে পাইন কাঠের চিলতে, এক টুকরো বাঁকা তক্তা পড়ে আছে। ও বুঝতে পারল নাতালিয়ার শবাধার তৈরি করেছিল ওর বাপ এখানে। তাড়াতাড়ি বাড়ির সিঁড়ির কাছে ফিরে আসে।

ছেলের ইচ্ছা মেনে নিয়ে পান্তালিমন তাড়াতাড়ি মাড়াইকলে ঘোড়া জুতে ছোট এক পিপে জল উঠিয়ে রাখলে পাটাতনের ওপর। রাতে সে আর গ্রিগর মিলে খামারের দিকে রওনা হল।

* * *

নাতালিয়ার প্রতি গ্রিগরের বিশেষ এক ধরনের ভালোবাসা বলেই শুধু নয়, কিংবা ছ'বছর ধরে দুজনে একসঙ্গে বাস করেছে বলেও নয়, নাতালিয়ার মৃত্যুর জন্য নিজেকেই দায়ী মনে করছিল গ্রিগর। যদি নাতালিয়া ওর কথামতো ভয় দেখিয়ে সত্যিসত্যিই ছেলেপুলে নিয়ে ওর মায়ের সঙ্গে গিয়ে থাকত, যদি সে অবিশ্বস্ত স্বামীর প্রতি ঘৃণা নিয়ে আলাদা হয়ে থেকেই মারা যেত তাহলে হয়ত গ্রিগর এই ক্ষতির বোঝাটা এত গভীরভাবে অনুভব করত না, অনুশোচনায় ওর মনটা এতখানি দগ্ধ হত না নিঃসন্দেহেই। কিন্তু ওর মা বলেছে নাতালিয়া ওকে সবকিছুর জন্যই ক্ষমা করে গেছে, শেষ মুহূর্ত অবধি ভালোবেসেছে ওকে, ওর কথাই বলেছে। এইটুকু জানা হয়েছে বলে ওর দুঃখ যেন আরো বেড়ে গেল, ক্রমাগত তিরস্কারের বোঝা ওর বিবেককে আরো ভারাক্রান্ত করে তুলল যেন। এক নতুন আলোয় ও অতীতের দিনগুলোকে আর নিজের আচরণকেও বিচার করতে বাধ্য হল সে।

একটা সময় গেছে যখন নিরাসক্ত উদাসীনতা ছাড়া এমন কি খানিকটা বিদ্বেষ ছাড়া আর কোনো অনুভূতিই ওর ছিল না স্ত্রীর প্রতি। কিন্তু এ ক'বছর বেশ একটু অন্যরকম মনে হত, যেন। ওর আচরণের এই পরিবর্তনের প্রধান কারণ ছিল ছেলেপুলে। ইদানিং কয়েক বছরে ওর মনে যে গভীর পিতৃত্ববোধ জেগেছে বরাবর এ জিনিসের অস্তিত্ব তো ছিল না। লড়াই থেকে যখন অল্প কদিনের ছুটিতে বাড়ি ফিরত তখন ওদের আদর করত, বুকে জড়িয়ে ধরত। তবে সেটা নিছক কর্তব্যবোধ থেকে। একটা সবিস্ময় অবিশ্বাস নিয়েই ও লক্ষ্য করত নাতালিয়া আর ওর আবেগ-মত্ত মাতৃস্নেহের প্রকাশকে। এই ক্ষুদে দস্যি প্রাণীগুলোকে কেউ যে এমন করে আত্মভোলা হয়ে ভালোবাসতে পারে এও কিছুতেই বুঝে উঠতে পারত না। নাতালিয়া যখন রাত জেগে ওদের বুকের দুধ দিত তখনো অনেকবার রেগে গিয়ে গ্রিগর বিদ্রূপের স্বরে বলেছে: অমন পাগলের মতো লাফিয়ে ওঠ কেন বল তো? ওরা ক্যাঁ কোঁ করার আগেই দেখি তুমি উঠে বসে আছ। হাত পা ছুঁড়ুক, চেঁচাক না একটু। চোখের

জলে ওদের সোনা ঝরছে না নিশ্চয়ই!—ছেলেরাও ওর প্রতি কম উদাসীন ছিল না, অবিশ্যি। কিন্তু বড় হতে হতে বাপের উপর ওদের টানও বিলক্ষণ বেড়ে গেল। ওদের ভালোবাসা গ্রিগরের মনে সাড়া জাগায়, ওদের প্রতি গ্রিগরের যে অনুভূতি তা যেন প্রসারিত হয় ওদের মায়েরও দিকে।

আকসিনিয়ার সঙ্গে বিচ্ছেদ হবার পর গ্রিগর ওর স্ত্রীকে ছাড়ার কথা তেমন করে আর ভাবেইনি। আকসিনিয়া ওর সন্তানদের মায়ের স্থান নেবে এও কখনোই ভাবতে পারতো না, এমন কি দুজন যখন একসঙ্গে হত তখনো নয়। ওদের দুজনের সঙ্গেই অবশ্য থাকতে রাজী ছিল সে, দুজনকে তার নিজের মতো দুরকমভাবে ভালোবেসে। কিন্তু এখন স্ত্রীকে হারিয়ে হঠাৎ যেন আকসিনিয়ার কাছ থেকেও সে দূরে সরে গেছে। আর আকসিনিয়ার বিরুদ্ধে একটা পুঞ্জীভূত রাগ যেন অকস্মাৎ জমে উঠেছে। ও-ই তো বেইমানি করে ওদের সম্পর্কের কথা ফাঁস করে দিয়ে নাতালিয়াকে ঠেলে দিয়েছিল মৃত্যুর দিকে।

দুঃখটা ভুলবার ও যতই চেষ্টা করুক, যখন খামারে কাজ করে তখনও ঘুরে ফিরে এই চিন্তাই জাগে ওর মনে। খেটে খেটে নিজেকে হয়রান করে ফেলে, মাড়াই কলের আসন ছেড়ে নামতে চায় না, তবু মনে পড়ে নাতালিয়াকে। কেবলই স্মরণপথে জাগে দুজনের মধ্যে বহুদিনের পুরনো সব ছোটখাটো ঘটনার কথা, তুচ্ছ সব আলাপের কথা। জোর করে একবার যদি ইচ্ছাকল্পিত স্মৃতির বাঁধনটা খুলে দেয় অমনি যেন ওর সামনে আরেকবার ভেসে ওঠে সেই জীবন্ত হাস্যোজ্জ্বল নাতালিয়ার ছবি। মনে পড়ে যায় ওর দেহকাণ্ড, ওর হাঁটার ধরন, বিশেষ ভঙ্গিতে ওর চুল বাঁধা, ওর হাসি আর গলার আওয়াজটুকু।

তৃতীয় দিনে ওরা বার্লির ফসল তুলতে শুরু করে। ভরা দুপুরে প্যান্টালিমন ঘোড়াগুলোকে রুখলে গ্রিগর মাড়াইকলের আসন থেকে নেমে আসে। প্যাটাতনের ওপর খাটো উকোনঠ্যাঙাটা রেখে সে বলে:

—ঘণ্টাখানেকের জন্য বাড়ি ঘুরে আসি বাবা?

—কেন রে?

—ছেলেগুলোকে একটু দেখে আসি·····।

বুড়ো সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে বললে, বেশতো, যা না এর মধ্যে কিছুটা লাদাই করে রাখা যাবে।

গ্রিগর তখুনি কল থেকে নিজের ঘোড়াটা খুলে নিয়ে রওনা হল সদর রাস্তার দিকে হলদে মুড়ো ঘাসের গোছাগুলোর ওপর দিয়ে। নাতালিয়ার গলার আওয়াজ ওর কানে ভাসছিল: ওকে বলিস যেন তোদের আদর যত্ন করে। চোখ বুজে হাতের লাগামটা ছেড়ে দিয়ে ও গভীরভাবে ভাবতে থাকে, ঘোড়াটাকে চলতে দেয় তার নিজের খুশীমতো।

ঘন নীল আকাশে অল্প অল্প হাওয়া ছড়ানো মেঘ প্রায় নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে। মুড়ো ঘাসের ওপর দিয়ে দাঁড়কাকগুলো লাফিয়ে বেড়াচ্ছে আধখানা ডানা মেলে। ওরা দল বেঁধে বিচালির গাদার ওপর বসে। সন্ত পালক গজানো বাচ্চাগুলো এখনো ভালো করে ডানায় ভর দিতে শেখেনি। ধাড়ি কাকগুলো ওদের ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে খাওয়াচ্ছে। ফসল কাটা মাঠের ওপর কাকেদের কর্কশ ডাক এক অবিশ্রান্ত কোলাহলেব মধ্যে মিশে যায়।

গ্রিগরের ঘোড়া পথেব ধার দিয়ে চলবার চেষ্টা করছে। আর মাঝে মাঝে এক আধ গোছা ঘাস ছিঁড়ে নিয়ে চিবুচ্ছে। ঢিলে লাগাম লোহাটা দাঁতে টুংটুং আওয়াজ করছিল। দু দুবার দূরে অন্য ঘোড়া দেখে থেমে পড়ে. সে ডেকেছে। এমন সময় গ্রিগরও সম্বিত পেয়ে তাড়াতাড়ি ঘোড়াটাকে দাবড়াতে থাকে আর উদাস শূন্য চোখে তাকায় স্তেপের দিকে। ধুলোভরা রাস্তা মাঝে মাঝে একেকটা হলদে খড়ের গাদা, পাকা মকাইয়ের সব্‌জে বাদামী একেক ফালি জমি।

গ্রিগর বাড়ি পৌছাতেই গোমড়া-মুখো ক্রিস্তোনিয়া এক অপরূপ মূর্তিতে এসে দেখা দিল। গরম সত্ত্বেও সে ইংলিশ কাপড়েব উর্দি আর চওড়া ঘোড়সওয়ারী ব্রিচেস্ পরেছে। একটা প্রকাণ্ড সন্ত-চাঁছা অ্যাশ্‌কাঠের লাঠিতে ভর দিয়ে সে ঘরের মধ্যে ঢুকল। গ্রিগবকে সম্ভাষণ জানাল:

—এলাম তোমার সঙ্গে দেখা করতে। তোমাব দুর্ভাগ্যের কথা শুনেছি। নাতালিয়া মিরনোভ্‌নার তাহলে কবর হয়েছে?

প্রশ্নটা যেন কানেই যায়নি এমনি ভান করে গ্রিগর জিজ্ঞেস করে, ফ্রন্ট থেকে ফিবলে কী ভাবে?—ক্রিস্তোনিয়াব বেয়াড়া গোছেব সামান্য কুঁজো চেহারাটা তৃপ্তিব সঙ্গে লক্ষ্য করছিল সে।

—জখম হয়েছিলাম, সেবে উঠবাব জন্য বাড়ি পাঠিয়েছে। এক সঙ্গে দুটো বুলেট পেটের মধ্যে ঢুকেছিল। এখনো ভেতরেই রয়ে গেছে। এই তো মনে হয় যেন পেটের নাড়িব মধ্যেই। নিকুচি করেছে। এই জন্যই লাঠি ব্যবহার করছি বুঝলে?

—ওরা তোমায় ঘায়েল করল কোথায়?

—বালাশভের কাছে?

—আমাদেব ফৌজ কি বালাশেভ দখল কবেছিল? গুলি লাগল কি করে?

—আমরা হামলা করেছিলাম। মনে হয় বালাশেভ আমরা দখলও করেছিলাম।

—বেশ। তো কোন্ রেজিমেন্টে তুমি ছিলে, গাঁয়ের আর কে-কে তোমার সঙ্গে ছিল শুনি? বোসো না; সিগারেট খাবে?

গ্রিগর একটা নতুন মুখ দেখতে পেয়ে খুশীই হয়েছিল। একজনের সঙ্গে অন্তত কথা বলা যাবে যে ওর পরিবারের বাইরে, ওর দুঃখে মাথা ঘামাবার যার

দরকার নেই। ক্রিস্তোনিয়া কিছুটা বিবেচনাবোধ দেখাল, আন্দাজ করে নিল ওর সমবেদনায় গ্রিগরের কোন প্রয়োজন নেই। খুশী হয়ে অথচ ধীরে-ধীরে ও বলতে শুরু করে কীভাবে বালাশভ দখল হয়েছিল, কীভাবে ও জখম হল। প্রকাণ্ড একটা চুরুট মুখে দিয়ে ও মোটা ভরাট গলায় বলতে লাগল :

—সূর্যমুখীর ক্ষেতের ভেতর দিয়ে তো আমরা পায়ে হেঁটে চলেছি। ও দিকে লালফৌজ মেশিনগান আর কামান চালিয়েছে সমানে, রাইফেলও আছে বলাই বাহুল্য। আমাকে সহজে নিশানা করে ফেলল, আর সকলের মধ্যে আমি তো মুরগির দলে হাঁসের মতো—যত নিচুই হই না কেন গোটা বপুখানাই চোখে পড়ে। ব্যস্ ওরাও তখন……মানে বুলেটগুলোই আমাকে বেছে নিল আর কি! তাও ভালো যে আমি সোজা সিধে হয়ে চলছিলাম, যদি নিচু হতাম তো একেবারে মগজ ফুটো! মনে হয় বুলেটগুলো একবার ব্যবহার করা, তবু যখন লাগল, সারা পেটখানা আমার মোচড়াতে শুরু করেছে, দুটো গুলিই এমন গরম যেন সদ্য উনোন থেকে ছোঁড়া। যেখানে গুলি বিঁধেছিল সেখানে হাত দিলুম, ভেতর থেকেই বেশ টের পাচ্ছিলাম—দুটো টিউমারের মতো চামড়ার নিচে একসঙ্গে এওাশ ওপাশ চলে বেড়াচ্ছে। আঙুল দিয়ে ছুঁয়েছিলাম, তারপরেই বোধহয় অজ্ঞান হয়ে পড়ি। আমি ভাবলাম : এ কি বাজে রসিকতা। চুলোয় যাক্ এসব ঠাট্টা! তার চেয়ে চুপচাপ পড়ে থাকি, নয় তো আবার কোত্থেকে এর চেয়েও মারাত্মক কিছু ছুটে আসুক আর এফোঁড় ওফোঁড় করে দিক আমাকে। তো, আমি ওইখানেই পড়ে রইলাম। আর হাত দিয়ে আন্দাজ করতে লাগলাম……মানে ওই বুলেটগুলো। এখনো রয়েছে পাশাপাশি। ভয় পেয়ে গেলাম, ভাবলাম যদি ধরো কোনো ভাবে পেটের মধ্যে ঢুকে যায়, তারপর? পেটের নাড়ির ভেতর দিয়ে চলে বেড়াবে, তখন ডাক্তার কী ভাবে খুঁজে পাবে? তা ছাড়া এঁতো কিছু আরামের কথা নয়। মানুষের শরীর, আমারটাও ধরো নরম তো হাজার হলেও। বুলেটগুলো পেটের মধ্যে ঘুরপাক খাবে, তারপর যখন আমি হাঁটবো তখন ডাকঘরের ঘণ্টার মতো ঠং ঠং করবে। একেবারে খতম করে ছাড়লে আমায়। শুয়ে একটা সূর্যমুখীর মাথা ছিঁড়ে নিয়ে বীচি চিবোতে থাকি বটে কিন্তু ভয়ও পেয়েছি তখন জবর। আমাদের সেপায়ের সারি এদিকে এগিয়ে গেছে। বালাশভ দখল করার পর সেখানে আমারও তলব পড়ল। তারপর তিশান্‌কার জঙ্গী হাসপাতালে পড়ে রইলাম। সেখানকার ডাক্তারটা চালিয়াৎ, চড়ুইয়ের মতো ফরফর করে। খালি জিজ্ঞেস করে—বুলেটটা বের করে দেব নাকি পেট কেটে? কিন্তু আমি শুয়ে কেবল ভাবি।……তাকে বলি : আচ্ছা ডাক্তার সায়েব, ওগুলো কি আমার পেটের মধ্যে হজম হয়ে যেতে পারে? সে বলে—না, তা পারে না। তখন আমি ভাবি, তা হলে বাবা বের করতে দিচ্ছি না!

ওসব খেলা আমার জানা আছে। কেটে বের করে দেবে, তারপর ঘাটা ভালো করে শুকোবার আগেই ফের পাঠিয়ে দেবে রেজিমেণ্টে। আমি বললুম না স্তর, আমি বের করতে দেব না। ওগুলো ভেতরে থাকলেই আমার ভালো লাগবে। বাড়ি নিয়ে গিয়ে বউকে দেখতে চাই, তা ছাড়া এমন কিছু ওজন নয় যে আমার অসুবিধা হবে। ডাক্তার তো মনের সুখে আমায় গালিগালাজ করলে, তবে এক হপ্তার ছুটিতে বাড়ি আসার অনুমতিও পেলাম।

এই অকৃত্রিম কাহিনীটা শুনে গ্রিগর হেসে প্রশ্ন করলে :

—কোন্ রেজিমেণ্টে তুমি আছ হে ?

—চার নম্বর।

—গাঁয়ের আর কে আছে তোমার সঙ্গে ?

—বেশ ক'জন : আনিকুস্কা, বেস্খে্ব্নফ্, অকিমকল্ভিদিন, সেম্কা মিরশ্নিকফ্, তিখন গরব্চফ।

—আর কসাকদের খবর কি ? ওরা গাঁইগুঁই কিছু করে না ?

—মনে হয় অফিসারদের ওপর ওরা হাড়ে চটা। এমন কতকগুলো শুয়োরকে ঘাড়ের ওপর চাপিয়েছে যে বাঁচোয়া নেই। আর সববাই প্রায় রুশ ; ওদের মধ্যে কসাক একজনও নেই।

বলতে বলতে ক্রিস্তোনিয়া ওর উর্দির খাটো আস্তিনটা নামিয়ে ইংলিশ ব্রিচেসের চোস্ত কাপড়টায় হাত বুলিয়ে নিল, যেন ওযে এমন সুন্দর কাপড় পড়ছে তা ওর নিজেরই বিশ্বাস হয় না।

চিন্তিতভাবে সে বলে, কিন্তু জান এক জোড়া বুট পেলাম না আমার মাপের। ইংরেজদের দেশে যারা থাকে তাদের এমন পুরুষ্টু পা-ই নেই।····· আমরা গম বুনি, রুটি খাই। কিন্তু আমার মনে হয় ইংলণ্ডে ঠিক রুশিয়ারই মতো কেবল রাই খেয়েই থাকে। না হলে অমন খুদে খুদে পা কেন হবে ? ওরা আমাদের পুরো কোম্পানিকে কাপড় জুতো দিয়েছে, খোশবু সিগ্রেট দিয়েছে। কিন্তু তাহলেও কিছু উন্নতি নেই ·····।

—কেন, খারাপ কিসে ?—উৎসুক হয়ে গ্রিগর জিজ্ঞেস করে।

—বাইরে বাইরে সবই ভালো, ভেতরে ঘুণ। জানো কসাকরা লড়াই ছেড়ে দিতে চাইছে আবার। কী ফয়দা হবে এই যুদ্ধে ? ওরা বলছে খপেরস্ক অঞ্চলের ওপাশে আর যাবে না।

ক্রিস্তোনিয়াকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে গ্রিগর খানিকক্ষণ কী ভেবে স্থির করে—এক হপ্তা এখানে থেকে তারপর লড়াইয়ে ফিরে যাব। এখানে থাকলেই দুর্গতি।—সন্ধ্যে অবধি বাড়িতে রইল সে। ছেলেবেলাকার কথাগুলো মনে পড়ছে ওর। মিশাৎকাকে নলখাগড়া দিয়ে একটা হাওয়া কল বানিয়ে দিল, একটা ঘোড়ার বালামচি দিয়ে চড়ুই-ধরা ফাঁদ বানাল। মেয়ের জন্য চাকাওয়ালা একটা ছোট খাঁচা তৈরি করে দিল অতি কৌশলে—চাকাটা ঘোরে, মাঝখানের

ভাণ্ডা বেশ সুন্দর করে রঙ করা। নেকড়া দিয়ে পুতুলও বানাতে চেষ্টা করেছে ও। কিন্তু সেটা আর হয়ে ওঠেনি, দুনিয়াকে শেষ অবধি হাত লাগাতে হয়েছে।

বাচ্চারা ওর মতিগতিতে প্রথমটা তেমন আস্থা রাখতে পারেনি, গ্রিগর আগে কখনো এত মনোযোগ তো দেয়নি ওদের ওপর। কিন্তু পরে আর এক মিনিটও ওকে ছেড়ে থাকতে চায় না। একেবারে বিকেলের দিকে গ্রিগর যখন মাঠে ফিরে যাবার জোগাড় করছে তখন মিশাৎকা কেঁদেকেটে জানিয়ে দিলে :

—তুমি সব সময় ওই রকম! একটু এসেই তারপর ফের চলে যাও আমাদের ছেড়ে।· ·· নাও তোমার ফাঁদ, হাওয়া-কল, সব নিয়ে যাও! সব নিয়ে যাও, আমি কিচ্ছু চাই না।

গ্রিগর ওর প্রকাণ্ড হাতের মুঠোয় ছেলের ছোট্ট দুটি হাত তুলে নিয়ে বললে :

—বেশ তো, তাই যদি হয় তাহলে এক কাজ করা যাক্। তুমি তো কসাক, আমার সঙ্গে চলো ঘোড়ায় চেপে খামারে যাবে। আমরা বার্লি তুলব গাদা করব। আর তুমি বসে থাকবে দাদুর সঙ্গে ওই মাড়াই-কলটার ওপর, ঘোড়া চালাবে বসে, কেমন। ঘাসের মধ্যে কতো গঙ্গাফড়িং পাবে! পাহাড়ের ধারে দেখবে। তবে পলিউশ্কা ঘরে থাকবে দিদার সঙ্গে। ওর তাতে আপত্তি নেই। ওতো মেয়ে, ওর কাজ হল ঘর ঝাঁট দেয়া, ছোট গামলায় করে ডন থেকে দিদার জন্য জল বয়ে আনা, যত সব মেয়েদের কাজ। কেমন রাজী তো? মিশাৎকা দারুণ খুশীতে উপচে পড়ে, হ্যাঁ, হ্যাঁ!—কী হবে তা কল্পনা করে চোখ দুটো চকচক করতে থাকে ওর।

ইলিনিচ্না আপত্তি করতে চেষ্টা করে, কোথায় নিয়ে যাবিরে ওকে? কী জানি বাবা তোর কী ইচ্ছা! কোথায় ঘুমুবে? ওখানে কে দেখবে ওকে বল্? যদি ঘোড়াগুলোর কাছে গিয়ে লাথি-টাথি খায়, যদি সাপে কাটে! যাস্নে ধন তুই বাপের সঙ্গে। বাড়িতে থাক।—নাতির দিকে ফেরে বুড়ী।

কিন্তু মিশাৎকার ছোট-ছোট চোখ হঠাৎ যেন বেয়াড়া রকম জ্বল্জ্বলে হয়ে ওঠে—ওর দাদু বুড়ো চটে গেলে যেমন হয় ঠিক তেমনি। ছোট হাত দুটো মুঠো করে সে কাঁদো কাঁদো গলায় চেঁচিয়ে ওঠে :

—দিদা তুমি চুপ কর। আমি যাবই, যা খুশী হোক।

হেসে গ্রিগর ছেলের হাত ধরল। ইলিনিচ্নাকে সে বোঝাল :

—ভয় নেই, আমার সঙ্গে ঘুমোবে। আস্তে আস্তে ঘোড়া হাঁটিয়ে আনব, ও পড়বে না। মা ওকে জামা পরিয়ে দাও, ঘাবড়িও না। আমি দেখব যাতে ওর কিছুটি না হয়, কাল সন্ধ্যায় ঠিক আস্ত ফিরিয়ে আনব।

এইভাবে বন্ধুত্ব গড়ে উঠল গ্রিগর আর মিশাৎকার মধ্যে।

* * * *

তাতারস্কে যে তিনদিন ওর কেটেছে তার মধ্যে গ্রিগর মাত্র তিনবার দেখেছে আকসিনিয়াকে, তাও আবার কয়েক লহমার জন্য। সহজাত বুদ্ধি আর কৌশলে আকসিনিয়া এড়িয়ে গেছে ওকে। ও একটু বোঝে যে এখন গ্রিগরের নজরে ওর না আসাই সবচেয়ে ভালো। মেয়েমানুষের স্বাভাবিক জ্ঞানেই গ্রিগরের মনোভাব আন্দাজ করতে পারে, বুঝতে পারে গ্রিগরের প্রতি ওর আকর্ষণের যে-কোনো অসতর্ক আর অকালোচিত প্রকাশই ওকে গ্রিগরের চোখে হেয় করে তুলবে, ওদের সম্পর্কটিকে ঘোরালো করে করে তুলবে। গ্রিগর কখন নিজে থেকে ওর সঙ্গে কথা বলে সেই প্রতীক্ষায় রইল ও। গ্রিগরের বিদায়ের আগের দিনে এলো সেই মুহূর্ত। খামার থেকে এক-গাড়ি ফসল নিয়ে ফিরছিল সে বেলাশেষে, মাঠের শেষে প্রথম যে পথটা পড়ে সেইখানে গোধূলির আলোয় দেখা হল আকসিনিয়ার সঙ্গে। বেশ খানিকটা দূরে থাকতেই আকসিনিয়া ওকে নমস্কার করে একটু ক্ষীণ হাসি হাসল। ওর হাসিতে একাধারে স্পর্ধা আর উদ্বেগ। নমস্কারের জবাব দিল বটে গ্রিগর কিন্তু নীরবে এড়িয়ে যেতে পারল না ওকে।

অজ্ঞাতসারেই ঘোড়ার লাগাম টেনে তাড়াতাড়ি চলার গতি খানিকটা কমিয়ে গ্রিগর জিজ্ঞেস করল : কেমন চলছে ?

—ভালোই। ধন্যবাদ, গ্রিগর পান্তালিয়েভিচ।

—তোমার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়-না যে, কী ব্যাপার ?

—খামারের কাজে যাই। একাই সব দিক সামলাতে হচ্ছে তো।

মিশাৎকা গ্রিগরের সঙ্গে বসেছিল গাড়িতে। হয়ত সেই কারণেই গ্রিগর ঘোড়া থামায়নি আর, কথাবার্তাও বাড়ায়নি। বেশ কয়েক গজ ঘোড়া হাঁকিয়ে যাবার পর একবার একটা ডাক শুনতে পেয়ে সে ঘুরল। আকসিনিয়া বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে।

—গাঁয়ে বেশ ক'দিন থাকবে ? একটা তেজী ফুলের পাপড়ি ছিঁড়তে ছিঁড়তে প্রশ্ন করলে আকসিনিয়া।

—যে কোনো দিন চলে যেতে পারি।

মুহূর্তেকের জন্য যেভাবে আকসিনিয়া ইতস্তত করলে তাতে বোঝা গেল আরো কিছু জানবার ইচ্ছা ছিল ওর। কোনো কারণে সে চেপে গেল। হাতটা নেড়ে তাড়াতাড়ি পা চালালো বারোয়ারী উঠোনের দিকে, একবারও ফিরে তাকালো না আর।

॥ আট ॥

মেঘে ঢাকা আকাশ। ঝিরঝির ধারায় বৃষ্টি পড়ছে—চালুনিতে ছাঁকার মতো মিহি। মাঠের এখানে ওখানে ছড়িয়ে থাকা কচি পাতা, মুড়ো ঘাস আর বুনো কাঁটাঝোপগুলো বৃষ্টিতে চিকচিক করছে।

গ্রাম থেকে এত তাড়াতাড়ি বিদায় নিতে হল বলে ভয়ানক চটে গিয়েছিল প্রোখর। নীরবে সে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলেছে, রেজিমেণ্ট অবধি ফিরে আসার মধ্যে সারা রাস্তায় সে সামান্যই কথা বলেছে গ্রিগরের সঙ্গে। একটা ছোট গ্রাম পার হয়ে আসতে তিনজন কসাকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সার বেঁধে আসছিল ওরা গোড়ালি দিয়ে ঘোড়াগুলোকে গুঁতোতে গুঁতোতে আর নিজেদের মধ্যে মহা উৎসাহে আলাপ করতে করতে। ওদের মধ্যে একজন বয়স্ক, মাথায় লাল চুল, পরনে চাষীদের মতো ছাইরঙা ঘরে-বোনা কোট। গ্রিগরকে চিনতে পেরে সে চড়া গলায় সঙ্গীদের বললে, আরে ভাই, ওই তো মেলেখফ না?—গ্রিগরের কাছে এসে লোকটা তার প্রকাণ্ড লাগাম রুখলো।

—নমস্কার জানবেন গ্রিগর পান্তলিয়েভিচ।

—নমস্কার।—জবাব দিলে গ্রিগর। কোথায় এই কালো দাড়িওয়ালা গোমড়া-মুখো লোকটাকে সে দেখেছিল মনে করার বৃথাই চেষ্টা করে।

লোকটা যে সম্প্রতি এনসাইনের পদে উঠেছে তা বেশ বোঝা যায়। সাধারণ কসাক সেপাই বলে কেউ ভুল না করে তাই জোব্বাকোটের ওপরেই নতুন পদচিহ্ন সেলাই করে নিয়েছে।

সোজা গ্রিগরের সামনে এসে হাতটা বাড়িয়ে সে বললে, আমাকে চিনতে পারছো না?—মুখ থেকে ভদ্‌কার গন্ধ গ্রিগরের নাকে ঠেকে। আনকোরা এনসাইন্‌টির মুখখানা বোকার মতো আপন খুশিতে ঝলমল করছে। কুতকুতে নীল চোখ জ্বলছে, লাল গোঁফের নীচে ঠোঁটদুটো হাসিতে মোচড় খেয়ে চাষীদের কোট-পরা এই অফিসারটির অদ্ভুত চেহারা দেখে মজা লাগে গ্রিগরের। হাসি চাপবার চেষ্টা না করে সে জবাব দেয়:

—না চিনতে পারছি না। যখন সেপাই ছিলেন যখন হয়তো দেখে থাকব। অল্প কিছুদিন হল এনসাইন হয়েছেন?

—ঠিক বলেছেন! মাত্র এক হপ্তা হল নতুন পদটা পেয়েছি। কিন্তু আমাদের দেখা হয়েছিল বোধ হয় কুদীনভের দপ্তরে, ব্লাগোভেশ্‌চেনিয়েতে। আমাকে আপনি একটা ঝামেলা থেকে বাঁচিয়েছিলেন, মনে পড়ে? হেই ত্রিফন! আস্তে চল, আমি আসছি এখুনি!—অন্য কসাকদের উদ্দেশ করে সে চেঁচায়। ওরা খানিকটা দূরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কিছুক্ষণ চেষ্টা করে গ্রিগরের মনে পড়ল এই লাল-চুলো এন্‌সাইনটির সঙ্গে ওর প্রথম সাক্ষাতের কথা। কুদীনভ তখন এ লোকটার সম্বন্ধে বলেছিল: গুলি করার সময় কিছুতেই তাক্ ফসকায় না, রাইফেল দিয়ে ছুটন্ত খরগোস পর্যন্ত মেরে দিতে পারে, হন্যে হয়ে লড়ে, স্কাউটও খুব ভালো, কিন্তু বুদ্ধিতে একেবারে দুগ্ধপোষ্য। বিদ্রোহের সময় লোকটা একটা কোম্পানি পরিচালনা করেছিল, অনেক ভুলভ্রান্তিও করেছিল। কুদীনভ ওর কড়া ব্যবস্থা করতে চেয়েছিল কিন্তু গ্রিগর মাঝখানে পড়ে মাফ করিয়ে দেয়। কোম্পানি কম্যাণ্ডারের পদ ছাড়তে হয় তাকে।

গ্রিগর জিজ্ঞেস করলে, আসছেন লড়াইয়ে ময়দান থেকে?

—হ্যাঁ। নভোখপেরস্ক ছুটিতে যাচ্ছি। আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম একশো মাইল পথ ডিঙিয়ে। আমার স্মরণশক্তি খুব গ্রিগর পান্তেলিয়েভিচ! একটু যদি সেবা করি আপনার, ফেরাবেন না দয়া করে। আমার তল্পির মধ্যে দু-বোতল নির্জলা মাল আছে। খুলব নাকি এখানেই?

সরাসরি নিষেধ করলে গ্রিগর, কিন্তু লোকটা একটা বোতল উপহার হিসেবে দিতে সেটা সে নিলে।

এনসাইন খুব জাঁক করে বললে, থাকতেন যদি সেখানে আপনি। কতো জিনিস যে পেয়েছে কসাকরা আর অফিসাররা। আমি বালসাভেও ছিলাম। জায়গাটা দখল করে সিধে রেলওয়ের দিকে যাই, দেখি তিনটে ঠাসা গাড়ি দাঁড়িয়ে। সমস্ত লাইনে ট্রাকের ভিড়। একটা ট্রাকে কেবল চিনি, আরেকটাতে উর্দি, বাকিটাতে নানান জিনিস। কিছু কিছু কসাক প্রায় চল্লিশ রকমের কাপড়-চোপড় নিয়েছে। তারপর যখন ইহুদিগুলোকে ধোলাই দিতে গেলাম, সে এক দেখবার জিনিস। আপনি হলে হাসতেন। আমাদের আধা-কোম্পানিতে একজন ইহুদি-ধরা ছিল। সে প্রায় আঠারোটা ঘড়ি যোগাড় করে, তার মধ্যে দশটাই সোনার। সবগুলো সে বুকে ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল লাখপতি ব্যবসাদারের মতো। আর আংটি যা পেয়েছিল সে আপনি গুনে শেষ করতে পারতেন না! একেক আঙুলে দুটো তিনটে করে…।

গ্রিগর লোকটার ঠাসা জিন থলিটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলে:

—আর ওটার মধ্যে কী আছে?

—কেন…এই হরেক রকম চীজ।

—তাহলে আপনিও লুঠের বখরা নিয়েছেন?

—তা যা খুশী বলতে পারেন…কিন্তু লুট আমরা করিনি, এ আমাদের হকের জিনিস। আমাদের রেজিমেণ্টের কমাণ্ডার বললে: 'শহর এখন তোমাদের হাতে, দুদিন যা খুশী কর।' আর অন্যদের চেয়ে আমি খারাপ হলাম কিসে? আমি যা কানুন মাফিক জিনিস তাই নিয়েছি, যা হাতের কাছে পেয়েছি। অন্যরা তো আরো খারাপ কাজ করেছে।

—[illegible] লড়িয়ে সব!—বিরক্ত হয়ে গ্রিগর এনসাইনের দিকে তাকিয়ে বললে: আপনাদের মতো চীজেরা সব সদর রাস্তার পুলের তলায় ঘোরাঘুরি করে, কিন্তু লড়াই আপনারা করেন না! যুদ্ধটা আপনাদের কাছে লুঠের ব্যবসা। যতোসব ইতরামো! নতুন কারবার জুটিয়েছেন বেশ। কিন্তু একদিন যে এইজন্য আপনাদের আর আপনার কমাণ্ডারদেরও ছাল ছাড়িয়ে নেবে সেকথা মনে হয় না?

—কী জন্য?

—যা করছেন সব কিছুর জন্য।

—কিন্তু ছাল ছাড়াবে কে?

—কোনো উপরওয়ালা।

লোকটা সব্যঙ্গ হাসি হেসে বললে:

—কিন্তু তারা তো সবই সমান! আমরা মাল নিই জিনের থলি আর গাড়িতে, ওঁরা পুরো একেকটা ট্রেন বোঝাই করে নিয়ে যান।

—কেন, আপনি নিজে দেখেছেন?

—নিজে দেখিনি! আমি নিজে এমনি একটা মাল ট্রেন পৌছে দিয়ে এসেছি ইয়ারিৎস্কোয়। একটা গোটা গাড়ি বোঝাই রূপোর থালা-বাসন, পেয়ালা চামচে। কয়েকজন অফিসার চেপে ধরেছিল: "কী আছে হে ওতে? আমাদের দেখাও।" যখন বললাম এ হল অমুক জেনারেলের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, তখন তারা সরে পড়ল।

—সে জেনারেলটা কে?—চোখদুটো ঘোঁচ করে অস্বস্তিভরে ঘোড়ার লাগামজোড়া নাচাতে নাচাতে গ্রিগর বললে।

লোকটা ধূর্তের মতো হেসে জবাব দিলে:

—তার নাম তো ভুলে গেছি।…কী যেন? মনেও হচ্ছে না ছাই। নাঃ, মনে করতে পারছি না। কিন্তু আপনার রাগ করার কোনো কারণ নেই গ্রিগর পান্তালিয়েভিচ। ঈশ্বরের দিব্যি, সবাই এই কাজ করছে। অন্যদের তুলনায় আমি তো তাও নেকড়ের দলে ভেড়ার বাচ্চার মতো। আমি নিয়েছি যৎসামান্য। আর সবাই রাস্তার মধ্যিখানে লোকদের ধরে ন্যাংটো করে কেড়ে নিয়েছে সবকিছু, যেখানেই ইহুদি

মেয়েদের পেয়েছে বলাৎকার করেছে। ওসব কাজে আমি কিন্তু যাইনি। আমার নিজের বিবাহিতা স্ত্রী আছে আর স্ত্রীও কি যেমন-তেমন! মেয়েমানুষ তো নয়, মদ্দ ঘোড়া! না, আমার ওপর আপনার রাগ করার কোনো কারণ নেই। একটু সবুর করুন। আপনারা এখন যাচ্ছেন কোথায়?

গ্রিগর নির্লিপ্তভাবে মাথা ঝুঁকিয়ে লোকটাকে নমস্কার জানাল। তারপর ঘোড়া চালিয়ে দিয়ে প্রোখরকে হুকুম করল:

—আমার পেছনে পেছনে এস!

রাস্তায় আরো অনেক কসাকের সঙ্গে দেখা হল যারা লুঠ নিয়ে চলে আসছিল, একজন, দুজন কিংবা দল বেঁধে। অনেক সময় জোড়া-ঘোড়ার গাড়ি নিয়েও আসছিল, মালপত্র তেরপল দিয়ে ঢেকে অথবা কম্বল বেঁধে। গরমকালের নতুন উর্দি আর লালফৌজী খাকী পাতলুন পরে কসাকরা গাড়িগুলোর পেছন-পেছন রেকাবের ওপর খাড়া হয়ে ঘোড়া চালিয়ে আসছে। ধুলোমাখা রোদপোড়া মুখগুলো ওদের খুশীতে উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত। কিন্তু গ্রিগরকে দেখলেই ওরা যত তাড়াতাড়ি পারে পাশ কাটিয়ে চলে যায় নিঃশব্দে, টুপির ডগায় হাত ঠেকায় ফৌজের কড়াকড়ি আইন বজায় রেখে, তারপর গ্রিগরের সঙ্গে যখন ওদের ব্যবধানটা বেশ বেড়ে ওঠে তখনই শুধু নিজেদের মধ্যে আলাপ শুরু করে।

একবার দূরে লুঠের মাল বোঝাই একটা গাড়ি ঘোড়সওয়ারদের চালিয়ে নিয়ে যেতে দেখে গ্রিগর তামাশা করে বললে: বেনিয়ার দল চলেছে ভাখো!

কিন্তু যাদের সঙ্গে পথে ওদের দেখা হচ্ছিল তাদের সবাই যে অমনি লুঠের মাল নিয়ে বাড়িতে যাচ্ছিল তা নয়। একটা গ্রামের কুয়োর কাছে এসে ঘোড়াদের জল খাওয়ার জন্য দাঁড়াতে ওদের কানে এল পাশের বাড়ি থেকে গানের আওয়াজ। পরিষ্কার দরাজ গলার স্বরে মনে হয় একজন তরুণ কসাক গান গাইছে।

এক গামলা জল বয়ে আনতে আনতে প্রোখর বললে, কোনো সেপাইকে বোধহয় বিদায় জানাচ্ছে।—আগের সন্ধ্যায় যে বোতলটা ওরা পরখ করেছিল তারই ফলে প্রোখরের আজ একটু ফুর্তির মেজাজ এসে পড়েছে। তাই তাড়াতাড়ি ঘোড়াদের জল দিয়ে সে হাসতে হাসতে কথাটা তুললে:

—তোমার কী মনে হয় পান্তালিযেভিচ? গিয়ে ওদের দলে ভিড়ব আমরাও? হয়তো আমাদের ভাগ্যেও একেক পাত্তর জুটে যাবে। বাড়ির চালা তো দেখছি খড়ের, তাহলেও মনে হয় ওরা পয়সাওয়ালা লোক।

তরুণ কসাকটাকে কীভাবে বিদায় দেওয়া হচ্ছে গ্রিগর তা গিয়ে

দেখতে রাজী হল। বেড়ার খুঁটিতে ঘোড়া বেঁধে সে আর প্রোখর উঠোনের মধ্যে ঢুকল। একটা চালার ধারে দাঁড়িয়ে আছে চারটে ঘোড়া। লোহার কড়ায় কানায় কানায় ভরা ওট নিয়ে একটি ছোকরা বেরিয়ে এল গোলাঘর থেকে। গ্রিগরের দিকে একবার তাকিয়ে ছেলেটা ঘোড়াগুলোর দিকে এগিয়ে গেল। বাড়ির এক কোণ থেকে তখন গানের কলি ভেসে আসছে। খুব চড়া কাঁপা কাঁপা পুরুষালী গলায় কে গাইছে :

নাই সে পথে মানুষ ঘোড়া, কেবল পথ ধূ ধূ
কসাকী ফৌজ এগিয়ে কেবল চলেছে শুধু
সবার শেষে ছুটছিল তেজীয়ান কার ঘোড়া
আহা হঠাৎ পড়ল খসে তাহার জিন জোড়া
—ওদের চলার পথে পথে
জন-মানুষ নাইকো কোনোখানে…

একটা মোটা ঘ্যাসঘেঁসে গলা শেষ কথাগুলো একবার আউড়ে নিয়ে মিশে যাচ্ছে চড়া গলাটার সঙ্গে। তারপরেই আরো অনেকগুলো গলা একসঙ্গে জুটছে আর গানটা চলছে বাজসিক কায়দায়, সবিস্তারে সকরুণ আবহাওয়ায়। গায়কদের গানে কোনোরকম বাধা জন্মাবার ইচ্ছা ছিল না গ্রিগরের। তাই সে প্রোখরের আস্তিনটা ছুঁয়ে কানে কানে বললে :

—একটু সবুর। ওরা যেন তোমায় দেখতে না পায়। শেষ করতে দাও।

—এটা বিদায়ের ব্যাপার নয়। ইয়েলানাস্কার কসাকরা সবসময় এই রকমই গায়। কিন্তু গান সত্যিই গাইতে জানে বেটারা।—তারিফের সুরে প্রোখর বললে, সেই সঙ্গে বিরক্ত হয়ে থুতুও ফেললে : রকম দেখে মনে হচ্ছে যেন ওর নেশা করার ইচ্ছাটা পূরণ হবে না।

কোন এক কসাক যুদ্ধে গিয়ে কী ভুল করেছিল সেই ফিরিস্তি দিয়ে শেষ অবধি চলল মিঠে চড়া সুরের গানখানা :

—নাই সে পথে মানুষ ঘোড়া কেবলি পথ ধূ ধূ
কসাকী ফৌজ এগিয়ে চলে শুধু।
সবার শেষে ছুটছিল কার তেজীয়ান এক ঘোড়া
আহা হঠাৎ পড়ল খসে তাহার জিন জোড়া।
ডান কানেতে ঝুলছে তাহার লাগাম-রাশের দড়ি
পায়ের সাথে জড়ায় তাহার বেড়ি।
তার পেছনে ছুটছিল এক ছোকরা ডন কসাক,
তারস্বরে করে সে হাঁকডাক—
'ওগো আমার লক্ষ্মী সোনা পক্ষীরাজের ছা
আমার পানে একবারটি চা
তুই ছাড়া মোর নেই যে গতি, মারবে দুশ্‌মনেরা।…'

গানে তন্ময় হয়ে গ্রিগরি বাড়ির চুনকাম-করা দাওয়ার ধারে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ঘোড়ার ডাক বা রাস্তায় চলা গাড়ির ক্যাঁচরকোচ্ শব্দ কিছুই কানে যাচ্ছে না ওর।

গান শেষ হতে গায়কদের একজন কেশে বলল

—আমাদের যখন ভর্তি করা হয় তখন আমরা এভাবে গাইনি কিন্তু। যাকগে, যাতে ভালো হয় তাই হোক। কিন্তু রাস্তায় চলবার জন্য সেপাইদের আরো কিছু দেয়া উচিত, মানে মেয়েমানুষ। ঈশ্বরের দয়ায় খেলাম আমরা ভালোই, তবে রাস্তায় দাঁতে কাটবার মতো কিছু তো নেই আমাদের ·।

গ্রিগরের সম্বিত ফিরে আসতে সে কোণের দিকটায় হেঁটে যায়। দরজার নিচের সিঁড়িতে চারজন ছোকরা কসাক বসেছিল। ওদের চার পাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে পাড়াপড়শী মেয়ে-বড়ী কাচ্চাবাচ্চার দঙ্গল। শ্রোতারা কেঁদে কেটে ওড়নার খুঁট দিয়ে চোখের জল মুছছে। গ্রিগর সিঁড়ির কাছে গিয়ে শুনল লম্বা পানা কালো-চোখওয়ালা এক বড়ী আস্তে আস্তে টেনে টেনে কথা বলছে। শুকনো মুখটাতে এক কঠিন সৌম্য দেবীপটের মতো সৌন্দর্য। বড়ী বলছিল

—ওরে বাছারা! কী সুন্দর আর কী দুঃখের গান যে তোরা গাইলি! তোদের সকলেরই তো মা আছে নিশ্চয়, তারাও বোধহয় ছেলের কথা ভেবে আর লড়াইয়ে কেমন করে তারা প্রাণ দিচ্ছে ভেবে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়, তাই না রে!

—এমন সময় গ্রিগর সবাইকে সম্ভাষণ জানাতে বুড়ী তার দিকে হলদে চোখদুটো মেলে হঠাৎ যেন রেগে আগুন হয়ে বললে

—আর আপনি, কর্তা, এইসব ফুলের মতো নিষ্পাপ ছেলেগুলোকে ঠেলে দিচ্ছেন মরণের দিকে? ওদের আপনি লড়াইয়ের ময়দানে পিষে মারছেন।

গ্রিগর কী যেন ভাবতে ভাবতে জবাব দিলে আমরা নিজেরাই যে নিজেদের পিষে মারছি।

অজানা একজন অফিসার এসে পড়াতে অপ্রতিভ হয়ে কসাকরা চট্‌পট্ উঠে দাঁড়িয়েছিল। সিঁড়ির ওপর খাবারের প্লেটগুলো পা দিয়ে সরিয়ে ওরা উর্দি, রাইফেলের ফিতে, বেল্ট্, সব ঠিকঠাক করে নিল। ওদের মধ্যে যে সবচেয়ে বড়ো তারও বয়েস বছর পঁচিশেকের বেশী নয়।

গ্রিগর ওদের সতেজ সুতরুণ চেহারাগুলোর দিকে চোখ বুলিয়ে জিজ্ঞেস করে, তোমরা কোত্থেকে আসছ?

হাসিভরা চোখ, নাক বোঁচা এক ছোকরা ইতস্তত করে জবাব দিলে—এক রেজিমেন্ট থেকে··· ·

—না, আমি বলছি কোথায় তোমাদের জন্ম, দেশ কোথায়? তোমরা তো এ জেলার লোক নও, তাই না?

—আমরা ইয়েলানস্কার লোক ছুটিতে এসেছি হুজুর।

ছেলেটির গলা শুনে গ্রিগর বুঝতে পারল এই ওদের প্রধান গায়ক। হেসে ও জিজ্ঞেস করলে :

—তুমিই তো আসল গানটা গাইছিলে না ?

—হ্যাঁ।

—তোমার গলাটি তো খাসা। কিন্তু গান গাইছ কেন ? মনের খুশিতে ? দেখলে তো তোমাকে মাতাল মনে হয় না!

ঢ্যাঙা ফর্সা মতো একজন যুবক, কপালের ওপর একগোছা ধুলোমাখা চুল, কালচে গালের ওপর লাল আভা ; আড়চোখে সে বুড়ীর দিকে তাকিয়ে অপ্রতিভ হাসি হেসে অনিচ্ছাসত্ত্বেও জবাব দিলে :

—খুশির কারণ আমাদের আর কী থাকতে পারে বলুন ? প্রয়োজনের তাগিদেই আমরা গান গাই। এ তল্লাটে তো তেমন আরাম নেই। ভালো খাওয়া জোটে না—শুধু এক প্রস্থ রুটি, ব্যস্। তাই মাথায় এল গানের ফন্দিটা। যেই গাইতে শুরু করি, মেয়েরা ছুটে আসে শুনতে ; আরম্ভ করে দিই শোকের গান. ওদের মনে ঘা লাগে, ঘর থেকে চর্বি এনে দেয় বাটি ভরে দুধ এনে দেয়। ভালো ভালো খাবার··· ।

—আমরা সব পাদ্রির মতো, ক্যাপ্টেন! গান গেয়ে ভিখ্ মাগি !—বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে বলে গায়ক ছেলেটি। হাসিতে কুতকুতে হয়ে ওঠে ওর কৌতুকভরা চোখদুটো।

কসাকদের একজন বুক পকেট থেকে একটা তেলচিটে কাগজ বের করে গ্রিগরের সামনে ধরলে। বললে :

—এই আমাদের ছুটির মঞ্জুরি।

—আমার ওতে কী দরকার ?

—আপনি ভাবতে পারেন আমরা ফৌজ থেকে পালিয়েছি।

গ্রিগর একটু বিরক্ত হয়ে বললে, যখন কোনো পিটুনি ফৌজীদলের সঙ্গে দেখা হবে তখন বরং ওটা দেখিও।—কিন্তু তারপরেই বিদায় নেবার সময় গ্রিগর ওদের উপদেশ দিলে, রাত করে ঘোড়া চালিয়ে দিনের বেলায় কোথাও বিশ্রাম নিও। তোমাদের ও-কাগজে কোনো কাজ হবে না, যদি ভালো কথা শুনতে চাও। ওটাতে কী শীলমোহর দেয়া আছে ?

—আমাদের স্কোয়াড্রনের কোনো শীলমোহর নেই।

—বেশ, তবে কালমিকদের হাতে যদি ডাক্তার বাড়ি না যেতে চাও তো আমার কথাটি মনে রেখো।

* * *

গাঁ ছেড়ে প্রায় তিন মাইল দূরে, একটা ছোট জঙ্গল ছাড়িয়ে শ তিনেক গজ দূরে যেখানে বনটা এসে পথের ধারে শেষ হয়েছে সেখানে গ্রিগর

আবার দেখলে দুজন ঘোড়সওয়ারকে। এগিয়ে আসছে। তারা থমকে দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত চেয়ে রইল ওর দিকে তারপর বোঁ করে বনের মধ্যে ঢুকল।

প্রোখর মন্তব্য করে, ওদের সঙ্গে কাগজপত্র নেই। দেখলে তো কী ভাবে চট্ করে গাছের আড়ালে চলে গেল? এখন দেখছি দিনদুপুরেই পালাচ্ছে হতভাগাগুলো।

সেদিন আরো অনেকজনই এই ভাবে গ্রিগর আর প্রোখরকে দেখে রাস্তা ছেড়ে তাড়াতাড়ি সট্‌কে পড়তে লাগল। একজন বয়স্ক কসাক পায়ে হেঁটে চুপি চুপি আসছিল বাড়ির দিকে। সূর্যমুখীর ক্ষেতের ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ে সে আলের ধারে খরগোশের মতো ঘাপটি মেরে রইল। পাশ কাটিয়ে. যাবার সময় প্রোখর রেকাবে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে চেঁচিয়ে উঠল:

—ওহে পড়শী, ওভাবে কি লুকোতে হয়। মাথাটা তো লুকিয়ে রেখেছ, ওদিকে তোমার পাছা দেখা যাচ্ছে যে।

—রাগের ভান করে সে আবো চেঁচাল, বেরিয়ে এস, অ্যাই! দেখি তোমার কাগজপত্র।

কসাকটা লাফিয়ে উঠে মাথা নিচু করে ছুটতে লাগল সূর্যমুখী ক্ষেতের ভেতর দিয়ে। প্রচণ্ড হেসে প্রোখর লোকটাকে তাড়া করবার জন্য ঘোড়া দাবড়ায় আর কি। গ্রিগর ওকে থামিয়ে বললে:

—বোকার মতো কোরো না! চুলোয় যা'ক হতভাগা, দৌড়তেই থাক ওইভাবে যতক্ষণ না দম ফুরোয়। ভয়েই মারা পড়বে লোকটা……।

—ভুল ধারণা তোমার! কুকুর লেলিয়েও ওকে ধরতে পারবে না। অন্তত দশ মাইল না ছুটে ও থামছে না। সূর্যমুখী ক্ষেতের ভেতর দিয়ে কীভাবে ছুট লাগাল দেখলে না? এমনি সময় মানুষের যে কোথা থেকে এত শক্তি আসে কে জানে।

ফৌজের পলাতকদের সম্পর্কে এমন ঢালাও কতকগুলো মন্তব্য সে করলে যা মোটেই শ্রুতিসুখকর নয়। বললে:

—ঘোড়া চালাচ্ছে কীভাবে সব! ঠিক নেকড়ের মতো! কেমন করে ওরা চালাচ্ছে বল দেখি? তুমি দেখে নিও পান্তালিয়েভিচ, শিগগিরই হয়তো দেখব তুমি আর আমিই শুধু লড়াইয়ের ময়দানে ঠেকা দিচ্ছি।

যতই ওরা রণাঙ্গনের কাছাকাছি আসতে থাকে ততই গ্রিগরের নজরে পড়ে ডন ফৌজের হতাশার চিহ্ন। মনোবল ওদের নষ্ট হতে শুরু করেছে এমন সময় যখন আরো বিদ্রোহী-বাহিনী-পুষ্ট হয়ে ফৌজ সবে উত্তর রণাঙ্গনে বিরাটতম সাফল্য অর্জন করতে শুরু করেছিল! এরই মধ্যে ফৌজের যা হাল তাতে নতুন কোনো চূড়ান্ত অভিযান শুরু করে শত্রুর

রক্ষাব্যূহ চূর্ণ করা তো দূরের কথা, ভালো রকম আক্রমণ হলে তাই ঠেকাতেই এরা হিমসিম খাবে।

জেলাকেন্দ্র আর গ্রামগুলোতে যেখানে রণাঙ্গনের মজুত সেপাইদের আস্তানা সেখানে তো অফিসাররা একটানা পানোৎসব করে চলেছে। লুঠের সম্পত্তিতে ঠাসা মালগাড়িগুলো সব আর্তনাদ করছে, এখনো তাদের পেছনের এলাকায় পাঠানো যায়নি। ফৌজের মধ্যে শতকরা ষাটভাগের বেশী সেপাই নেই। কসাকরা খুশিমতো ছুটিতে চলে যাচ্ছে। স্তেপ অঞ্চলে ভ্রাম্যমান কালমিক পিটুনি ফৌজগুলোর এমন সাধ্য নেই যে এই বন্যাব মতো ব্যাপক ফৌজ-ত্যাগকে রুখতে পারে। সারাতভ প্রদেশের অধিকৃত গ্রামগুলোতে কসাকরা এমন আচরণ করছে যেন কোন বিদেশী রাজ্যে তারা বিজেতা হিসেবে ঢুকেছে। জনসাধারণের সম্পত্তি লুঠ, মেয়েদের বলাৎকার, মজুত শস্য ধ্বংস, গরু ভেড়া মেরে ফেলা, কিছুই বাদ যায়নি। সদ্য গোঁফ গজানো ছেলে-ছোকরা, পঞ্চাশের ওপর বয়েশের বুড়ো, সবাইকেই ভর্তি করা হচ্ছে ফৌজে। সামনের ফৌজী কোম্পানিগুলোর মধ্যে খোলাখুলিই আলোচনা চলে যুদ্ধে সেপাইদের অনিচ্ছা নিয়ে। আর ভবোনেঝেব দিকে যে সব ফৌজ এগিয়ে চলেছে তাদের কসাক সেপাইবা তো সরাসবিই অফিসারদের হুকুম মানতে অস্বীকার করছে। গুজব শোনা যায় সামনের বণাঙ্গন সারিতে নাকি অফিসার হত্যার ঘটনা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

* * * *

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সঙ্গে গ্রিগর সে-রাতের মতো আশ্রয় নেয় বালাশভেব কাছেই একটা গ্রামে। নতুন ভর্তি বুড়োদেব নিয়ে গড়া চার নম্বর মজুত কোম্পানি আর তাগানরগ রেজিমেণ্টেব একটা স্যাপার কোম্পানি এখন এ অঞ্চলের প্রত্যেকটা বাড়ি দখল করে রয়েছে। আস্তানার খোঁজে অনেকক্ষণ ঢুঁড়ে বেড়ালো গ্রিগর। রাতটা সে অবশ্য মাঠেই কাটিয়ে দিতে পারত যেমন তারা প্রায়ই করে। কিন্তু এদিকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। প্রোখরও ম্যালেরিয়ায় কাঁপতে শুরু করেছিল। তাই মাথাটাকে অন্তত বাঁচবার মতো আস্তানা ওদের খুঁজে পেতে হবেই। গাঁয়ে ঢোকার পথে একটা সাঁজোয়া গাড়ি কামানের গোলার ঘায়ে অচল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল প্রকাণ্ড পপ্‌লার ঘেবা একটা বাড়িব কাছে। ঘোড়ায় চেপে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় ও দেখল গাড়ির সবুজ গায়ে এখনো পড়তে পারা যাচ্ছে লেখাটা : "ঘৃণ্য শ্বেতরক্ষী মুর্দাবাদ!" তার নিচে একটা নাম : "ক্রোধাগ্নি।" বাড়ির উঠোনে খুঁটিতে বাঁধা ঘোড়াগুলো নাক ঝাড়ছিল। মাঝস্বর গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। বাড়ির পেছনের বাগানে আগুন জ্বালানো হয়েছে, গাছের সবুজ মাথা ঘেঁসে ধোঁয়া উড়ে যাচ্ছে। আলোর আভায় কসাক মূর্তিগুলোকে আগুনের আশেপাশে

ঘুরতে দেখা যাচ্ছিল। বাতাসে জ্বলন্ত খড়ের আর পোড়া শুয়োরের লোমের গন্ধ।

ঘোড়া থেকে নেমে গ্রিগর বাড়ির ভেতর যায়।

লোকজনে ঠাসা একটা নিচু ছাতওয়ালা কামরায় ঢুকে ও জিজ্ঞেস করে—এ বাড়ির মালিক কে?

—আমি। কী চাই?—চুল্লির পাশে হেলান দিয়ে গাঁট্টাগোট্টা একজন চাষী গ্রিগরের দিকে চোখ ঘুরিয়ে তাকাল, কিন্তু জায়গা থেকে নড়ল না।

—রাতটা এখানে কাটাতে পাবি? দু'জন রয়েছি আমরা।

বেঞ্চিতে শুয়ে একজন বুড়ো কসাক বিরক্তিভরা গলায় খেঁকিয়ে উঠল: এমনিতেই যা অবস্থা এখানে, তরমুজের বিচির মতো গাদাগাদি।

মনিব তাচ্ছিল্যের স্বরে বললে: আপত্তি নেই আমার, তবে এর মধ্যেই অনেক ভিড় জমেছে।

—সে কোনোরকমে জায়গা করে নেব'খন। বৃষ্টির মধ্যে কি বাইরে থাকা যায় বলুন?—গ্রিগর জিজ্ঞেস করে, আমার সঙ্গে একজন অসুস্থ আর্দালি আছে।

বেঞ্চিতে শুয়ে থাকা কসাকটা একবার কাতরে উঠে মেঝেতে পা রাখল, তারপর গ্রিগরের দিকে চেয়ে একেবারে অন্য সুরে বললে:—কর্তা, এ বাড়ির লোকজন ছাড়াও আমরা চোদ্দজন আছি দুটো কামরার মধ্যে, আর তিন নম্বর কামরায় আছেন অফিসাররা।

কাঁচা পাকা দাড়িওয়ালা আরেকজন কসাক, কমিশনহীন অফিসার মনে হয় পদকচিহ্ন দেখে, খানিকটা সৌহার্দ্যপূর্ণ কণ্ঠে বললে: হয়তো আপনি ওদের সঙ্গে কোনোরকমে ব্যবস্থা করে নিতে পারবেন।

—না, আমি বরং এখানেই থাকব। খুব বেশী জায়গার আমার দরকার নেই, মেঝেতেই শোব। আপনাদের বিরক্ত করব না।—গ্রিগর তার জোব্বা-কোট খুলে হাতের তেলোয় চুলটা সমান করে নিয়ে বসে টেবিলের ধারে। প্রোখর যায় ঘোড়া দুটোকে দেখতে।

খানিক বাদে গ্রিগর গেল সিঁড়ি দরজার দিকে। তেরছা পাতলা বৃষ্টির ছাট এসে লাগছে ওর মুখে। প্রশস্ত উঠোনটা বিজলির চমকে আলোকিত হয়ে ওঠে,. সে আলোয় দেখা যায় ভিজে বেড়া বাগানের গাছে চকচকে ফলগুলো। সিঁড়ি দিয়ে নামতে ওর কানে আসে গলার আওয়াজ।

সিঁড়ি দরজার কাছে একটা দেশলাই-কাঠি জেলে কে যেন জিজ্ঞেস করল, অফিসাররা কি এখনো বোতল চালাচ্ছে?

চাপা রাগের সঙ্গে একটা অস্পষ্ট, বুজে আসা গলা জবাব দিলে:

—ওরা প্রাণ ভরে খাক।......যতো প্রাণে চায় খাক তারপর যা আসবে ওদের ওপর তা আসবেই।

* * * *

১৯১৮ সালের মতো এবারও ডন ফৌজ খপেরস্ক নদী পার হবার সঙ্গে-সঙ্গে সব উদ্দীপনা হারিয়ে বসল। উত্তর ডনের বিদ্রোহী কসাকরা, এবং খানিকটা পরিমাণে খপেরস্কের কসাকরাও, ডন প্রদেশের সীমানা পেরিয়ে আর লড়তে রাজী হচ্ছিল না। ওদিকে আবার টাটকা ফৌজের মদত পেয়ে লালরক্ষীরা এখন এমন একটা এলাকায় তৎপর হয়ে উঠেছে যেখানে সাধারণ মানুষ ওদের সমর্থক—তাই ওদের প্রতিরোধ হয়ে উঠতে থাকে আরো জোরদার। ফের পেছ-পা হয়ে আত্মরক্ষার লড়াইয়ে সামিল হতে কসাকদের আপত্তি তো ছিলই না বরং ডন ফৌজের কর্তাদের হাজার ধমকানিতেও ওদের আর আগের মতো জানপ্রাণ দিয়ে লড়তে বাধ্য করানো যাচ্ছিল না কিছুতেই, যদিও লাল-ফৌজের তুলনায় ওদের বাহিনী এখন আরো বেশী শক্তিশালী। অথচ কদিন আগেও ওরা ওদের নিজেদের এলাকায় মরিয়া হয়ে লড়েছে। নয় নম্বর লাল-ফৌজী বাহিনীর সাম্প্রতিক যুদ্ধে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়ে এখন সম্বল মাত্র ১১,০০০ সঙিন, ৫,০০০ তলোয়ার, ৫২টা কামান। এদিকে কসাক ফৌজে মোট ১৪,৪০০ সঙিন, ১০,৬০০ তলোয়ার আর ৫৩টা কামান।

বাহিনীর পাশের দিকেই তৎপরতাটা এখন বেশী—বিশেষ করে যেখানে স্বেচ্ছাসেবক-কুবান দক্ষিণী ফৌজের সেপাইরা রয়েছে। একই সঙ্গে সেনাপতি র‍্যাঙ্গেলের পরিচালানায় (শ্বেতরক্ষী) স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ইউক্রেইনের একেবারে কেন্দ্রস্থলে সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে দশ নম্বর লালবাহিনীর ওপর জোর চাপ সৃষ্টি করেছে। প্রচণ্ড যুদ্ধ করে তারা সারাতভের দিকে ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছে। ২৮শে জুলাই তারিখে কুবান ঘোড়সওয়ার ফৌজ একেবারে কমিশন অবধি পৌঁছে এ অঞ্চলের প্রতিরক্ষা ফৌজের একটা বড় অংশকে বন্দীও করেছিল। দশ নম্বর ফৌজের পাল্টা আক্রমণ ফিরিয়ে দেয়া হল। কুবান-তেরেক ঘোড়সওয়ার ডিভিশন অত্যন্ত সাহস দেখিয়ে দশ নম্বর ফৌজের বাঁ পাশে রীতিমতো ঘোরালো অবস্থা করে তোলে, ফলে বাহিনীর কর্তৃপক্ষকে নতুন রণাঙ্গনে সৈন্য সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়। এই সময় দশ নম্বর লালফৌজে ১৮,০০০ সঙিন, ৮,০০০ তলোয়ার, ১৩২টা কামান ছিল আর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ছিল ৭,৬০০ সঙিন ১০,৭৫০ তলোয়ার আর ৬৮টা কামান। এ ছাড়াও শ্বেতরক্ষীদের ট্যাঙ্ক ছিল, অনেকগুলো এরোপ্লেন ছিল যা দিয়ে ওরা পর্যবেক্ষণ চালাত, প্রত্যক্ষ লড়াইয়েও যোগ দিত। কিন্তু ফরাসী বিমান ব্রিটিশ ট্যাঙ্ক ও কামানেও পারল না র‍্যাঙ্গেলের সাফল্য আনতে। কমিশনের ওপরে আর সে এগোতেই পারল না। এ তল্লাটে তখন যুদ্ধ চলেছে ঘোরতর, একটানা, কিন্তু রণাঙ্গনের মধ্যে তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি।

জুলাইয়ের শেষ দিকে লালফৌজ দক্ষিণ রণাঙ্গনের সমগ্র কেন্দ্রভাগ জুড়ে নতুন আক্রমণের জন্য তৈরি হল। এই উদ্দেশ্যে ত্রৎস্কির একটা পরিকল্পনা অনুযায়ী নয় নম্বর আর দশ নম্বর বাহিনীকে একটি একক তড়িৎ ফৌজের মধ্যে মেলানো হল শোরিনের পরিচালনা। সেই সঙ্গে ভরোনেঝ অঞ্চলেও একটা সমান্তরাল আঘাত দেবার পরিকল্পনা করা হল আট নম্বর লালবাহিনীকে ব্যবহার করে।

মূল আক্রমণ শুরু হবার কথা ছিল ১লা থেকে ১০ই আগস্টের মধ্যে। সর্বোচ্চ লালফৌজী কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা অনুযায়ী আট নম্বর আর নয় নম্বর বাহিনীর হামলার সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্ববর্তী এলাকায়ও যুগপৎ তৎপরতা শুরু করার কথা। নয় নম্বর আর দশ নম্বর বাহিনী দরকার মতো সৈন্য সাজিয়ে নিচ্ছে, এমন সময় শ্বেতরক্ষী সেনাপতিরাও ঠিক করল লাল ফৌজের প্রস্তুতিকে তারা ধ্বংস করবে, তাই মামন্তভ্ ফৌজটিকে তারা পুরোদস্তুর গড়ে তুলল। ১০ তারিখে সেনাপতি মামন্তভের পরিচালনায় এই নতুন-গড়া বাহিনী আর আট নম্বর আর নয় নম্বর লালবাহিনীকে ভেদ করে নভোখপেরস্ক থেকে তামভব অভিমুখে রওনা হল।

শ্বেতরক্ষী কর্তারা গোড়ায় স্থির করেছিলেন লালফৌজের পশ্চাৎভাগে শুধু সেনাপতি মামন্তভের ফৌজই হামলা চালাবে না, সেনাপতি কনোভালোভের একটা ঘোড়সওয়ার দলও এ আক্রমণে যোগ দেবে। কিন্তু কনোভালভ ফৌজের এলাকায় আগেই লড়াই শুরু হয়ে গেল, ফলে রণাঙ্গন থেকে তাদের সরিয়ে আনা গেল না। মূল পরিকল্পনায় মামন্তভ আর কনোভালোভের ওপর হুকুম ছিল ওরা সমগ্র ঘোড়সওয়ার ফৌজ নিয়ে কেন্দ্রীয় লাল বাহিনীর পাশে এবং পেছনে প্রচণ্ড আঘাত হানবে, তারপর সাধারণ মানুষের ভেতর থেকে সোভিয়েত-বিরোধী সমস্ত লোককে জুটিয়ে রাশিয়ার কেন্দ্রের দিকে ফৌজী অভিযান চালাবে এবং সে অভিযানকে টেনে নিয়ে যাবে একেবারে মস্কো অবধি।

আট নম্বর লালফৌজে মজুত সেপাইদের সহায়তায় হামলাটা খানিকটা সামলে উঠলেও নয় নম্বর বাহিনীর দক্ষিণপ্রান্তে ভয়ানক চাপ পড়ল। অধিনায়ক শোরিন কোনোরকমে দুই বাহিনীর প্রান্তভাগকে জোড়া দিলেন বটে কিন্তু মামন্তভের ঘোড়সওয়ারদের আটকাতে পারলেন না। মামন্তভের বিরাট ঘোড়সওয়ার বাহিনীর সামনে পড়ে সামান্য লড়াইয়ের পরই লালফৌজের ঘোড়সওয়ার ব্রিগেড ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল।

১৮ তারিখে মামন্তভ তড়িৎগতিতে তাম্বোভ দখল করে বসল। কিন্তু সেজন্য শোরিনের বাহিনীর প্রধান অংশের পক্ষে হামলা শুরু করতে বেগ পেতে হয়নি, যদিও মামন্তভের মোকাবিলা করবার জন্য প্রায় দুটো পদাতিক ডিভিশনকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল। একই সঙ্গে দক্ষিণ

রণাঙ্গনে ইউক্রেইনীয় এলাকায়ও একটা নতুন আক্রমণ শুরু করা হল। শত্রুপক্ষের চাপে কসাক রেজিমেন্টগুলো পেছু হটতে লাগল দক্ষিণ দিকে; প্রত্যেকটা জেলার সীমানায় এসে তারা পালটা আক্রমণ করতে লাগল, ঘুরে দাঁড়িয়ে লড়তে লাগল। আবার ডন কসাকের মাটিতে ফিরে এসে তারা নতুন করে ফিরে পেল তাদের জঙ্গী মেজাজ: আগের চেয়ে ফৌজ-পালানোর পরিমাণ কমে গেল, মধ্য ডন জেলাগুলো থেকে নতুন সেপাই আসতে লাগল। শোরিনের ফৌজ যত বেশী ডন কসাক এলাকায় ঢুকতে লাগল ততই জোরদার আর তীব্র হয়ে উঠতে লাগল ওদের প্রতিরোধ।

ত্রংস্কির অপরিণামদর্শী পরিকল্পনার মারাত্মক ত্রুটি এবার পরিষ্কার হয়ে ধরা পড়তে লাগল। খপার আর ডন নদীর দিকে ক্রমাগত লড়তে-লড়তে এগিয়ে শ্বেতরক্ষীদের তীব্র প্রতিরোধ লঙ্ঘন করে এমন একটা জায়গায় এসে ওরা কর্মব্যস্ত হয়ে রইল যেখানকার মানুষ খোলাখুলিই লালরক্ষীদের বিপক্ষে; তাই শোরিনের বাহিনী যে উদ্যম নিয়ে প্রথম আক্রমণ শুরু করেছিল তা ক্রমেই নষ্ট হয়ে যেতে লাগল। ইতিমধ্যে কাচালিন্‌স্ক্‌ আর কত্‌লুবান জেলায় শ্বেতরক্ষী কর্তারা তিনটে কুবান সৈন্যদল আর ছ নম্বর পদাতিক ডিভিশনকে নিয়ে একটা সবল ভ্রাম্যমান ফৌজীদল গড়ে তুলেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল দশ নম্বর লাল বাহিনী যেটা আর সব বাহিনীর চাইতেও অনেক বেশী সাফল্য অর্জন করে ক্রমেই এগিয়ে আসছে, তাদের আঘাত করা।

নয় ॥

গত বারো মাসে মেলেখফ পরিবারের লোকজন প্রায় অর্ধেক কমে গেছে। পান্তালিমন একদিন বলেছিল ও বাড়ি যমের নেক নজরে পড়েছে, কথাটা মিথ্যা নয়: ওরা নাতালিয়াকে কবর দিয়ে সবে ফিরেছে মাত্র সেদিন, এর মধ্যে 'াবার মেলেকফদের বড়-ঘরখানা ধূপ আর ফুলের গন্ধে ভরে উঠল। গ্রিগর চলে যাবার দশদিন বাদে দারিয়া ডুবে মরেছে ডন নদীতে।

শনিবার দিন খামার থেকে ফিরে ও গিয়েছিল স্নান করতে তুনিয়ার সঙ্গে। রান্নাঘরের বাগানটার ওপাশে কাপড় চোপড় রেখে ওরা অনেকক্ষণ অবধি বসে রইল নরম দলে-যাওয়া ঘাসের ওপর। ভোর থেকেই দারিয়ার মেজাজ ভালো ছিল না, কেবলি বলছিল মাথা ধরেছে, দুর্বল লাগছে। আর মাঝে মাঝে অকারণেই কেঁদে উঠছিল। জলে নামার আগে তুনিয়া খোঁপা করে তিনকোণা একটা রুমালে বেঁধে নিল চুল। দারিয়ার দিকে আড়চোখে চেয়ে সে দুঃখ করে বললে :

—দারিয়া, তুমি কি রোগা হয়ে গেছ! একেবারে হাড় গোনা যায় যে!

—শিগগিরই ভালো হয়ে যাব……।

—মাথা-ধরা কমেছে?

—হ্যাঁ। নে, চান করে নেওয়া যাক, এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে।—ছুটে গিয়ে দারিয়াই প্রথম ঝাঁপ দিল জলে। একেবারে পুরো ডুব দিয়ে নাক মুখ দিয়ে জল বের করে সে। মাঝ-নদী পর্যন্ত সাঁতরে গেল। জোরালো স্রোত এসে ওকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

দারিয়াকে পুরুষের মতো লম্বা এককেটা টানে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় তুনিয়া। কোমর অবধি জলে নেমে সে গা ধোয়, [illegible] [illegible] বুকে, রোদে তেতে ওঠা সবল দুটো নারীসুলভ সুগোল বাহুতে। পাশের বাগানে অব্নিজভের ছেলের বউরা কপিগাছে জল দিচ্ছিল। ওদের কানে গেল তুনিয়া হাসতে হাসতে দারিয়াকে বলছে :

—ও দাশ কা ফিরে এস। কাতলা মাছ ধরে নিয়ে চলে যাবে।

ফিরে আসে দারিয়া। প্রায় গজ কুড়িক এসে মুহূর্তের জন্য সে জলের ওপর কোমর অবধি লাফিয়ে ওঠে, তারপর মাথার পেছনে হাতদুটো ভাঁজ করে সে চেঁচায়, বিদায় বন্ধুরা!—তারপর পাথরের মতো তলিয়ে যায় নদীর গর্ভে।

মিনিট পনেরো বাদে তুনিয়া ফ্যাকাশে মুখে শুধু নিচের ঘাগরাটা মাত্র পরে ছুটতে ছুটতে আসে বাড়িতে।

—মা! দারিয়া জলে ডুবে গেল!—হাঁপাতে হাঁপাতে কোনোরকমে সে বলে কথাগুলো।

পুরো একদিন লেগে গেল বঁড়শি দিয়ে দারিয়ার দেহটাকে উদ্ধার করতে। ভোরবেলায় তাতারস্কের সবচেয়ে বুড়ো আর সবচেয়ে অভিজ্ঞ জেলে আরখিপ্ পেস্কোভাৎকফ দারিয়া ঠিক যে জায়গাটায় ডুবেছিল সেইখানে ছটা বঁড়শির সুতো রেখে দিয়েছিল। পরে পান্তালিমনের সঙ্গে সে বঁড়শি দেখতে গেল। নদীর পাড়ে ছেলেপিলে আর মেয়েদের ভিড়। তাদের মধ্যে তুনিয়াও আছে।

দাঁড়ের হাতল ধরে চার নম্বর সুতোটা টানতেই আরখিপ ডাঙা থেকে প্রায় আট ফুট ভেতরে এগিয়ে গেল। দুনিয়া পরিষ্কার শুনতে পেল বুড়ো চাপা গলায় বলছে, 'এইটেই তো মনে হচ্ছে।'

খুব সাবধানে—বেশ বোঝা গেল রীতিমতো জোর খাটিয়েই সে সুতোটা টানছে; নদীর তলায় যেন গেঁথে গিয়েছে বঁড়শি। তারপর ডান পাড়ে একটা সাদা জিনিস জেগে উঠল, জলের ওপর ঝুঁকে পড়ল দুই বুড়োই। নৌকো কাত হয়ে খানিকটা জলও উঠল। নীরব জনতার কানে পৌঁছাল নৌকোর মধ্যে একটা ভারী দেহ তোলার শব্দ। সবাই যেন শিউরে উঠল হঠাৎ। একজন স্ত্রীলোক কাঁদতে শুরু করল ডুকরে ডুকরে। খানিক দূরে দাঁড়িয়েছিল ক্রিস্তোনিয়া। ছোটদের সে ধমক দিয়ে চেঁচিয়ে বললে, এই, তোরা সব ভাগ্ এখান থেকে। চোখের জলের ভেতর দিয়েই দুনিয়া দেখলে গলুইয়ের ওপর দাঁড়িয়ে আরখিপ্ নিপুণ হাতে নিঃশব্দে দাঁড় বেয়ে এগিয়ে আসছে পারের দিকে। নৌকো মাটি ছোঁয় সশব্দে মিহি খড়ি-মেশানো পলি ভেঙে। দারিয়ার হাঁটুদুটো গোটানো, নিষ্প্রাণ গালটা ভিজে পাটাতনের ওপর লেপ্টে আছে। ফর্সা দেহটা ওর সবে নীল হতে শুরু করেছে, মাংসের ওপর পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে গভীর একেকটা ক্ষত, বঁড়শির চিহ্ন। হাঁটুর ঠিক নিচেই রোগা কাল্চে পায়ের ওপর একটা টাট্কা ছড়ে-যাওয়ার লাল দাগ, অল্প রক্তও বেরুচ্ছে—স্নান করার আগে নিশ্চয় ফিতের বাঁধনটা খুলতে ভুলে গিয়েছিল, ওটা তারই চিহ্ন। একটা বঁড়শির ডগা পায়ের ওপর পিছলে গিয়ে বাঁকা তেরছা মতো রেখা টেনে দিয়েছিল! উদ্‌ভ্রান্ত দুনিয়াই প্রথম নিজের আঙরাখাটা খিম্‌চে ধরে দারিয়ার কাছে গেল, সেলাই-খোলা একটা থলি দিয়ে ঢেকে দিল দারিয়াকে। পান্তালিমন বাঁধা-ধরা নিয়মে চটপট পাতলুন গুটিয়ে নৌকোটাকে ডাঙায় তুলে ফেললে। দু-এক মিনিট বাদে একটা গাড়ি এল, দারিয়াকে নিয়ে যাওয়া হল মেলেখফ বাড়িতে।

ভয় ঘেন্না ত্যাগ করে দুনিয়া ওর মাকে সাহায্য করলে দারিয়ার ঠাণ্ডা লাশটাকে স্নান করাতে, ডনের গভীর স্রোতের বরফ-হিম যেন এখনো গায়ে লেগে রয়েছে। দারিয়ার ঈষৎ স্ফীত মুখটার মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যা অপরিচিত, কঠিন। জলে ডোবার ফলে চোখের মধ্যে একটা ম্রিয়মাণ ঔজ্জ্বল্য। চুলের মধ্যে রুপালী বালির কণা চিকচিক করছে, গালের ওপর ভিজে শেওলার গাঢ় সবুজ সুতো। বেঞ্চির দুপাশে অসহায়ভাবে ঝুলে-পড়া দুটি হাতে এমন ভয়ংকর একটা চিরবিশ্রামের লক্ষণ যে দুনিয়া একবার সেদিকে তাকিয়েই তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নেয়; এই মৃতা স্ত্রীলোকটি আর জীবনপিয়াসী সেই সহাস্যমুখরা দারিয়ার মধ্যে লেশমাত্র মিলও নেই দেখে হতভম্ব আর বিস্মিত হয়ে যায় দুনিয়া। পরেও

যখন ওর মনে পড়ত দারিয়ার স্তন আর পেটের কঠিন আর আঠালো ভাবটা, শক্ত হাত-পায়ের স্থিতিস্থাপকতা, তখন গা কেমন ঘিনঘিন করত, এ সবকিছু ভুলে যাবার আপ্রাণ চেষ্টা করত সে। ভয় হত মরা মানুষটি হয়তো ওর ঘুমের মধ্যে দেখা দেবে, তাই হপ্তাখানেক সে ইলিনিচ্‌নার সঙ্গে এক বিছানায় শুয়েছে, আর বিছানায় যাবার আগে প্রার্থনা করেছে : হে ভগবান, যেন স্বপ্নে ওকে না দেখি! আমাকে রক্ষা কোরো ঈশ্বর!

অবনিজভের বাড়ির মেয়েরা নেহাত শুনে ফেলেছিল "বিদায় বন্ধুরা" বলে দারিয়ার সেই চিৎকার, তা নয়তো ওর কবরটা নির্ঝঞ্ঝাটেই চুপচাপ হয়ে যেত। কিন্তু পাদরী ভিসারিনও যখন শুনলেন এই শেষ চিৎকারটার কথা, যার পরিষ্কার মানে দারিয়া স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করেছে, তখন তিনি সরাসরি জানিয়ে দিলেন আত্মহত্যার মৃতকে তিনি কবর দেবেন না। খেপে উঠল পান্তালিমন।

—কী বলতে চান: কবর দেবেন না মানে? ওর কি ধর্মে দীক্ষা হয়েছিল, না হয়নি?

—আত্মহত্যার মড়া আমি কবর দিতে পারি না। আইনের বাধা আছে।

—তাহলে আপনার মতে ওর মাটি হবে কীভাবে? কুকুরের মতো?

—আমার মত হল গির্জার গোরস্থান ছাড়া যেখানে যেভাবে খুশী কবর হতে পারে, গোরস্থানে সৎ খ্রীষ্টানদের কবর।

—দেখুন, একটু দয়া করুন।—পান্তালিমন সাধাসাধি করে—আমাদের পরিবারে এমন কেলেঙ্কারি কখনো হয়নি।

—আমি পারব না। পান্তালিমন প্রকোফিয়েভিচ, আপনার প্রতি আমার অনেক শ্রদ্ধা আছে, আপনি খাঁটি খ্রীষ্টান। কিন্তু এ আমি পারব না। খবরটা প্রধান পুরোহিতের কানে উঠলে তার ফলাফল ভুগতে হবে আমাকেই।—এক-গুঁয়ের মতো জবাব পাদরীর।

সত্যিই কেলেঙ্কারি। গবেট পাদরীটাকে ভজাবার সব রকম চেষ্টাই করলে পান্তালিমন, আরো বেশী দক্ষিণা দেবে কথা দিলে, খাঁটি নিকোলাস্‌-মার্কা রুবলেই দক্ষিণা দেবে, তাছাড়া ভেট হিসাবে একটা কাচ ভেড়ার বাচ্চা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাতে কোনো কাজ হল না দেখে বুড়ো ধমক দিতে শুরু করল:

—গির্জার গোরস্থানের বাইরে আমিও ওকে কবর দেব না। হেঁজিপেঁজি মেয়ে সে নয়, আমারই নিজের পুত্রবধূ। ওর স্বামী প্রাণ দিয়েছিল লালদের সঙ্গে লড়াইয়ে, সে ছিল একজন অফিসার, আর আপনি আমায় বাজে বাজে কথা শোনাচ্ছেন! না পাদরী মশাই, সে চলবে না, আমার সম্মানের জন্য ওকে আপনার কবর দিতেই হবে। আপাতত আমাদের বড় ঘরটাতেই সে থাকুক, আমি এখুনি জেলা আতামানকে খবর দিচ্ছি। তিনিই আপনাকে বোঝাবেন।

পাদরীকে একটা নমস্কারও না দিয়ে পান্তালিমন বেরিয়ে গেল চড়া মেজাজ দেখিয়ে, ঝপাং করে দরজা ভেজিয়ে। কিন্তু ভয় দেখানোতে কাজ হল: আধ ঘণ্টা বাদে পাদরীর কাছে থেকে একজন খবর নিয়ে এল ভিসারিওন মশাই মিনিট থানেকের মধ্যে আসবেন মন্ত্রপাঠ করতে।

দারিয়াকে ওরা নিয়ম মাফিক পিয়োত্রার পাশেই কবর দিলে। কবর খুঁড়বার সময় জায়গাটা পান্তালিমনের বড় ভালো লেগে গেল, পছন্দসই মনে হল নিজের কবরের জন্যেও। কোদাল চালাতে চালাতে আশেপাশে চেয়ে ভাবতে লাগল, এর চেয়ে ভালো জায়গা সে আর পাবে না, তাছাড়া খুঁজেও লাভ নেই। পিয়োত্রার কবরে সেদিনকার পোঁতা পপলার গাছটার কচি ডালে সর সর করে আওয়াজ হচ্ছিল, আসন্ন শরতের হলদে, ম্রিয়মাণ বিস্বাদ রঙের ছোপ লেগেছে এরই মধ্যে তার পাতার ডগায়। ভাঙা বেড়া আর কবর-গুলোর ফাঁক দিয়ে দিয়ে বাছুরদের পায়ে চলার পথ তৈরি হয়েছে, বেড়ার ওপাশ দিয়ে হাওয়াকলের রাস্তা। মৃতদের আত্মীয়-স্বজনের সদয় হাতে পোঁতা মেপ্‌ল্‌, পপ্‌লার, অ্যাকেশিয়া আর বুনো কাঁটাগাছ সবুজ সতেজভাবে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানাচ্ছে; ওদের ঘিরে প্রচুর লতাপাতার ঝাড, দেখিতে গজানো হলদে সর্ষের ফুল, বুনো ওট্‌, আর শীষ-গজানো পুরোট কুইচ। ক্রুশগুলো আপাদমস্তক নীল গোল ফুলের আদুরে লতা জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জায়গাটা নিঃসন্দেহে আনন্দদায়ক। স্যাঁৎসেঁতে না, শুকনো.........।

কবর খুঁড়তে খুঁড়তে বুড়ো মাঝে মাঝে কোদালটা রেখে ভিজে কাদাটে মাটিতে বসে ধূমপান করছিল আর ভাবছিল মৃত্যুর কথা। কিন্তু সে কাল আর এখন নেই যে বুড়োরা নিজেদের ভিটেতে যেখানে বাপ-দাদারা শেষ আশ্রয় নিয়েছিলেন সেইখানেই নিঃশব্দে মারা যাবে।

দারিয়ার কবরের পর মেলেখফের বাড়ি আরো নিঝুম হয়ে গেল। ওরা গাড়িতে করে ফসল আনে, ফসল ঝাড়াই করে, তরমুজ ক্ষেত থেকে ওদের প্রচুর আমদানি হয়। গ্রিগরের কাছ থেকে খবর আশা করেছিল ওরা, কিন্তু লড়াইয়ে ফিরে যাবার পর থেকে ওর আর কোনো সংবাদই নেই। একাধিকবার বলেছে ইলিনিচনা, শয়তানটা ছেলেপুলেদের খোঁজটা পর্যন্ত নেয় না। ওর বউ মরেছে, এখন আর আমাদের কারুক্কে ওর দরকার নেই...। কসাকরা তখন প্রায়ই লড়াইয়ের ময়দান থেকে ফিরে আসছে তাতারস্কে। গুজব, কসাকরা নাকি বালাখফ রণাঙ্গনে মার খেয়ে ডনের দিকে ফিরছে, সেখানে জলা জায়গার আড়ালে আশ্রয় নিয়ে শীতকাল অবধি আত্মরক্ষার লড়াই চালাবে। কিন্তু শীতকালে যা হবে তা নিয়ে রণাঙ্গনের লোকেরা তো খোলাখুলিই আলোচনা করে, কোনো ঢাকাঢাকি

নেই: 'ডনের জল জমে বরফ হলে লালরা আমাদের ঠেলে নিয়ে যাবে সোজা সাগরের জলে।'

পান্তালিমন এখন মহা উৎসাহে গম ঝাড়াইয়ের কাজে লেগেছে, ডনের আশেপাশের এলাকায় ছড়িয়ে-পড়া এইসব গুজবে ও তেমন কান দিচ্ছে বলে মনে হয় না। কিন্তু যা ঘটছে সে সম্পর্কে ও উদাসীনও থাকতে পারেনি। ইলিনিচ্না আর দুনিয়াকে আজকাল সে প্রায়ই চড়া গলায় ধমকায়। লড়াই ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে শুনে ওর মেজাজ আরো তিরিক্ষি হয়ে উঠতে থাকে। প্রায়ই অবশ্য খামারের জন্য কিছু-না-কিছু নতুন ব্যবস্থা সে করতে বসে, কিন্তু কোনোটাই শেষ পর্যন্ত হয় না, তখন সে রেগেমেগে কাজ ফেলে ছোটে ঝাড়াই আঙিনার দিকে। থুতু ফেলে গালিগালাজ করে গায়ের ঝাল মেটায় সে ওইখানে গিয়ে। দুনিয়ার নজরে এ দৃশ্য পড়েছে একাধিকবার। একদিন একটা জোয়ালি মেরামত করতে বসেছিল বুড়ো। কাজটা মনের মতো হচ্ছিল না, তাই বলা নেই, কওয়া নেই রেগে বুড়ো একটা কুড়োল টেনে নিয়ে জোয়ালিটাকে কুপিয়ে কুপিয়ে একেবারে চেলা করে ফেলল। একটা ঘোড়ার গলাসী মেরামত করতে গিয়েও ঠিক ওই ব্যাপার। একদিন সন্ধ্যায় আগুনের ধারে বসে একটা মোম জালিয়ে [illegible] গলাসীর ছেঁড়া আস্তর সেলাই করতে বসেছে।• হয়তো সুতোটাই নরম ছিল কিংবা বুড়োর হাত কাঁপছিল তাই পটপট করে দুবার ছিঁড়ে গেল সুতোটা। ব্যস আর যায় কোথা। ভয়ানক গালিগালাজ করে পান্তালিমন লাফিয়ে উঠে বসার টুলখানা লাথি মেরে ছিটকে সরিয়ে দিল উনোনের দিকে। তারপর কুকুরের মতো গর গর করে গলাসীর চামড়ার আস্তরগুলো দাঁত দিয়ে কেটে ছিঁড়তে লাগল। তারপর সেগুলোকে মেঝেতে ফেলে মোরগের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে পায়ে দলতে লাগল।

আজ একটু সকাল সকাল শুতে গিয়েছিল ইলিনিচ্না, গোলমাল শুনে সে ভয়ে বিছানা ছেড়ে ছুটে এল। কিন্তু কাণ্ড দেখে মেজাজ গরম করে সে বুড়োকে ধমক লাগাল

—তুমি কি পাগল হলে অ্যাঁ? এই বুড়ো বয়সে? গলাসীটা তোমার কী ক্ষতি করল?

পান্তালিমন পাগলের মতো চোখ করে গিন্নির দিকে চেয়ে গর্জে উঠল

—চোপ রও, অ্যাইসি কি ত্যাইসি।—গলাসীর একটা টুকরো টেনে নিয়ে সে ছুঁড়ল বুড়ীর দিকে।

হাসি চাপতে না পেরে দুনিয়া ছুটে গেল সিঁড়ি দরজার দিকে বন্দুকের গুলির মতো। কিন্তু খানিকক্ষণ দাপাদাপির পর বুড়ো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। রাগের মাথায় গিন্নিকে কী না কী বলে ফেলেছে। তাই ক্ষমা চাইল সে। গলাসীর ছেঁড়া টুকরোগুলোর দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে ঘাড় চুলকোতে

লাগল, ভাবল এখন আর কী কাজে লাগবে সেগুলো। এমনি ধরনের পাগলামি প্রায়ই ঘটতে থাকে, কিন্তু নানা তিক্ত অভিজ্ঞতার পর ইলিনিচ্‌না বুড়োকে বাধা দেবার এক অন্য উপায় খুঁজে পেয়েছে। পান্তালিমন যখনই গালিগালাজ করে ঘরের জিনিস ভাঙতে শুরু করে অমনি বুড়ী নরমভাবেই অথচ বেশ শুনিয়ে-শুনিয়ে বলতে থাকে

—ভাঙ, ভাঙ প্রোকোফিচ্‌। ভেঙে শেষ করে দাও। তুমি আর আমি আরো টাকা রোজগার করে আরো কিনব।—তারপর সে নিজেও ধ্বংসযজ্ঞে হাত লাগাতে চেষ্টা করে। সঙ্গে সঙ্গে পান্তালিমন ঠাণ্ডা হয়ে যায়। মিনিট খানেক ফ্যাল ফ্যাল করে বউয়ের দিকে চেয়ে থেকে কাঁপা হাত দুটো পকেটে পোরে। তামাকের থলিটা বের করে হতভম্ব হয়ে এক কোণায় বসে। চুরুট ধরায় বিপর্যস্ত স্নায়ুগুলোকে সুস্থির করার জন্য, আর মনে মনে নিজের উড়নচণ্ডী মেজাজকে গালাগালি দিয়ে হিসেব কষে কী লোকসানটা সে করেছে।

তিন মাসের বাচ্চা একটা শুয়োর ছানা একবার বেড়া ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকেছিল। পান্তালিমনের সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়ল তার ওপর। লাঠি দিয়ে পিটিয়ে সেটার পিঠ ভেঙে মিনিট পাঁচেক বাদে প্রাণীটা একেবারে বলি হবার পর যখন সে ছুরি দিয়ে তার লোম ছাড়াচ্ছে তখন একবার অপরাধীর মতো মিট মিট করে ইলিনিচ্‌নার দিকে চেয়ে বলে

—জান, এই শুয়োরটা যতো উৎপাত করে বেড়াত। এমনিতেও অ শ্য মরতই। বছরের এ সময়টা ওদের মড়ক লাগে, আমরা তো তার আগেই খেয়ে নিতে পারছি, নয়তো কিছুই থাকত না, তাই না গিন্নি কী বল? তা মুখটা অমন আষাঢ়ের মেঘের মতো ভার করে আছ কেন? শুয়োরটা জাহান্নমেই যাক না। তাও যদি তেমন তেমন শুয়োর হত, একটা পেটুক হতচ্ছাড়া। লাঠি দিয়ে মারবার দরকার ছিল না, শিকনি ফেলেই মরত। হেন জায়গা নেই যেখানে গিয়ে ঢু না মারত, এমনি স্বভাব। তা প্রায় গোটা চল্লিশেক আলুগাছ উপড়েছে ওই ভাবে।

ইলিনিচ্‌না মৃদুভাবে সংশোধন করে দেয় বাগানের সব আলু সাবাড় করে দিলে সবশুদ্ধ তিরিশটার বেশী গাছ থাকত না।

—তা হতে পারে। কিন্তু সত্যি চল্লিশটা থাকলে ও চল্লিশটাই খেয়ে শেষ করত। এমনি স্বভাব। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আমরা বেঁচে গিয়েছি এই দুষমনটার হাত থেকে।—কিছু না ভেবেই জবাব দিলে পান্তালিমন।

* * * *

বাপ বিদায় নেবার পর থেকে ছেলেপিলেগুলোর আর ভালো লাগে না একেবারে। সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকায় ইলিনিচ্‌না ওদের দিকে

তেমন নজর দিতে পারেনি। ওরাও নিজেদের ইচ্ছেমতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে খেলে বাগানের কোণে কিংবা গম ঝাড়াই আঙিনায়। একদিন দুপুরের খাওয়ার পর মিশাৎকা অদৃশ্য হয়ে গেল, ফিরল একেবারে সন্ধ্যার মুখে। সারাদিন কোথায় ছিল ইলিনিচ্‌না জিজ্ঞেস করতে সে বললে ডনের ধারে অন্য ছেলেদের সঙ্গে খেলে বেড়িয়েছে। কিন্তু পলিউশ্‌কা সঙ্গে সঙ্গে সব ফাঁস করে দিল :

—মিছে কথা বলছে ঠাক্‌মা। ও গিয়েছিল আকসিনিয়া মাসীর কাছে।

খবরটায় একটু বিরক্ত আর অবাক হয়ে ইলিনিচ্‌না বললে,—কিন্তু তুমি কী করে জানলে?

—আমি যে দেখলাম ওকে বেড়া ডিঙিয়ে আসতে ও-বাড়ির উঠোন থেকে।

—ও, তাহলে তুমি ওইখানে ছিলে? কীরে, বল্‌ না খোকা। অমন লাল হয়ে উঠলি কেন?

মিশাৎকা সোজা ঠাকুরমার চোখের দিকে চেয়ে জবাব দিলে :

—তোমায় আমি ঠিক বলিনি ঠাকুমা ...আমি ডনের ধারে যাইনি সত্যি আকসিনিয়া মাসীর সঙ্গেই ছিলাম।

—ওখানে গিয়েছিলি কেন?

—আমায় ডেকেছিল, তাই গিয়েছিলাম।

—ছেলেদের সঙ্গে ছিলি বললি কেন?

মিশাৎকা এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে চোখটা তুলে ফিসফিস করে বললে :

—ভেবেছিলাম তুমি রাগ করবে ...

—তোর ওপর রাগ করব কেন রে? না না।

কিন্তু তোকে ওর কিসের প্রয়োজন? ওখানে কী করলি তুই?

—কিছু না। আমাকে দেখতে পেয়ে সে চেঁচিয়ে বলল এই ন এসো! আমি গেলাম। আমাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে বসাল।

মনের উত্তেজনাটা চাপা দেবার চেষ্টা করে অধৈর্যভাবে ইলিনিচ্‌না বললে—অ্যাঁ?

—...আমায় ঠাণ্ডা পিঠে খেতে দিল। তারপর এইটে দিল।—বলে মিশাৎকা পকেট থেকে একটা মিছরির টুকরো বের করে সগর্বে দেখিয়ে ফের রেখে দিল পকেটে।

—কিন্তু তোমাকে ও কী বলল তাই বল? কিছু জিজ্ঞেস করেছিল?

—বলল আমি যেন তার কাছে যাই, দেখা-টেখা করি, কারণ সে খুব একলা, কেউ সঙ্গী নেই। আমাকে খুব যত্ন করবে বলেছে...। আর বলল যেন কাউকে এসব কথা না বলি। তুমি নাকি শুনলে রাগ করবে।

—তাই বলেছে বুঝি!—রাগটা কোনোরকমে চেপে রেখে ইলিনিচ্না বলে, যাক, আর কিছু জিজ্ঞেস করেছিল তোমাকে?

—হ্যাঁ।

—কী জিজ্ঞেস করেছিল? বল্ না মানিক, ভয় কী!

—বলল বাবা এখানে নেই বলে আমার কষ্ট হয় কিনা। আমি বললাম, হ্যাঁ হয়। তারপর জিজ্ঞেস করল কবে বাবা ফিরে আসবে, তার খবর কী, আমি বললাম সেসব আমি জানি না। বাবা যুদ্ধ করছে। তারপর সে আমায় কোলে বসিয়ে একটা পরীর গল্প শোনাল।—মিশাৎকার চোখ দুটো জলজল করে। হেসে বলে: খুব মজার গল্প। ভানিয়া নামে একটা ছেলে, তাকে পিঠে নিয়ে কেমন করে হাঁসের দল উড়ে গেল, তারপর বাবা ইয়াগার গল্প।

মিশাৎকার সব কথা শুনে ঠোঁট বাঁকাল ইলিনিচ্না। শেষে কড়াভাবে বলল:

—ওখানে তোমাকে আর যেতে হবে না, বাছা, এ ভালো নয়। আর ওর কাছ থেকে কোনো উপহার নেবে না। না নেয়াই ভালো, নয় তো তোমার দাদু শুনলে তোমাকে চাবকাবে। ঈশ্বর করুন দাদু যেন এসব খবর না পায়। তাহলে তোমার ছাল ছাড়িয়ে নেবে জেনো। আর যেও না বাছা!

কিন্তু কড়া নিষেধ সত্ত্বেও দুদিন বাদে মিশাৎকা ফের হানা দিল আস্তাখফদের বাড়ি। ইলিনিচ্না সেটা টের পেল মিশাৎকার জামা দেখে সকালে যে ছেঁড়া আস্তিনটা সে সারিয়ে উঠতে পারেনি, এখন সেটা সুন্দর করে রিফু করা। তাছাড়া একটা ছোট নতুন ঝিনুকের বোতাম কলারে চকচক করছে। দুনিয়া গম ঝাড়াই নিয়ে ব্যস্ত ছিল, সারাদিনে সে জামা সেলাইয়ের ফুরসৎ নিশ্চয়ই পায়নি তা ইলিনিচ্না জানে। তিরস্কারের সুরে জিজ্ঞেস করল:

—আবার পড়শিদের বাড়ি গিয়েছিলি?

—হ্যাঁ।—হতভম্ব হয়ে মিশাৎকা বলে, তার পরেই যোগ করে দেয় আর যাব না। ঠাকুমা, আমার ওপর রাগ কোরো না তুমি।

ইলিনিচ্না ঠিক করল আকসিনিয়ার সঙ্গে কথা বলবে। সরাসরি জানিয়ে দেবে যেন মিশাৎকাকে না ঘাঁটায়, ওকে এটা-ওটা দিয়ে আর গল্প বলে যেন ভোলাবার চেষ্টা না করে। বুড়ী ভাবল: নাতালিয়াকে তো এ পৃথিবী থেকে তাড়িয়েছে, এখন শয়তানীটা চেষ্টা করছে ছেলেগুলোর মন ভোলাতে যাতে ওদের অজুহাতে গ্রিগরকে জড়ানো যায়। কী কালসাপিনী রে। নিজের ভাতার বেঁচে থাকতে সে আমার ছেলের বউ হতে চায়। তবে, সে গুড়ে বালি। তাছাড়া এমন পাপের পর গ্রিগর তাকে ডাকবে আবার?

গ্রিগর বাড়িতে থাকতে আকসিনিয়ার সঙ্গে যে দেখা-সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করেনি সেটা ইলিনিচ্‌নার নজর এড়ায়নি—তার মায়ের চোখ, যেমন অন্তর্ভেদী তেমনি সতর্ক, লক্ষ্য সে করেছিল ঠিকই। সে বুঝেছিল—লোকনিন্দার ভয়ে নয়, গ্রিগর আকসিনিয়ার সঙ্গে দেখা করেনি কারণ তাকে সে স্ত্রীর মৃত্যুর জন্যে দায়ী মনে করে। ইলিনিচ্‌নার মনে-মনে ইচ্ছা নাতালিয়ার মৃত্যুর পর গ্রিগর আর আকসিনিয়া যেন চিরকালের মতো আলাদা হয়ে যায়, আকসিনিয়া যেন কোনোদিন মেলেখফ পরিবারে স্থান না পায়।

সেদিনই সন্ধ্যায় আকসিনিয়াকে ডনের স্নানঘাটে দেখে ইলিনিচ্‌না তাকে ডাকলে:

—এই যে এস তো আমার কাছে।· একটু কথা আছে ··

বালতি নামিয়ে রেখে আকসিনিয়া ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে নমস্কার জানায় ইলিনিচ্‌নাকে।

সুন্দর হলেও ইলিনিচ্‌নার দু চক্ষের বিষ ওর মুখখানা। প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে ইলিনিচ্‌না বলতে শুরু করে: ব্যাপার হল, বুঝলে বাছা অন্যের ছেলেপিলে নিয়ে টানাটানি কিসের এত তোমার? ছেলেটাকে কেন ডেকে ডেকে নিয়ে এত কথাবার্তা? ওর জামা তোমাকেই সেলাই করতে বলেছিল কে, এটা-সেটা দাও কেন ওকে? তুমি কী মনে কর ওর মা চলে যাবার পর, ওদের দেখার লোকজন কেউ নেই! তোমাকে না হলে আমাদের চলবে না? তোমার কি বিবেক বলে কিছু নেই? চক্ষুলজ্জার বালাই নেই তোমার?

—কিন্তু আমি কী ক্ষতিটা করেছি? ঠাকুরমা, তুমি এত মেজাজ দেখাচ্ছ কেন?—গরম হয়ে আকসিনিয়াও জবাব দিলে।

—কী ক্ষতিটা করেছ মানে? নাতালিয়ার ছেলেকে ছোঁবার অধিকার আছে তোমার? নাতালিয়াকে কবরে পাঠাবার পর?

—এমন কথা তুমি বললে কী করে ঠাকুরমা? একটু বুঝে শুনে বোলো! তাকে কবরে পাঠিয়েছে কে? সে নিজেই মরণ ডেকে এনেছিল।

—তোমারই জন্য নয় কি?

—আমি তার কী জানি।

—কিন্তু আমি জানি!—উত্তেজিত হয়ে ইলিনিচ্‌না চেঁচায়।

—চেঁচিও না বুড়ী। আমি তোমার ছেলের বউ নই যে আমার ওপর তম্বি করবে। সে জন্য আমার স্বামীই রয়েছে।

—তোমাকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি! তোমার প্রাণের বাসনা কী তাও আমার জানা আছে। আমার ছেলের বউ না হলেও, ছেলের বউ

হবার শখ তোমার ষোল আনা! আগে ছেলেপুলেগুলোকে ভজিয়ে তারপর গ্রিগরকে ফাঁদে ফেলতে চাও। তাই না?

—তোমার পুত্রবধূ হবার গরজ আমার নেই। তুমি কি পাগল হলে বুড়ী? আমার স্বামী যে বেঁচে রয়েছে।

—কথা তো সেইটেই, তুমি একটা স্বামী বেঁচে থাকতেই আরেকটিকে ধরবার তালে রয়েছ!

আকসিনিয়া সত্যিই একটু ফ্যাকাশে হয়ে গিয়ে বলল:

—জানি না তুমি আমার পেছনে লেগেছ কেন। জীবনে কাউকে ধরিনি, ধরবার তালেও আমি নেই। তোমার নাতিকে যা বলেছিলাম··· ক্ষতিটা কি হল তাতে? তুমি ভালো করেই জান আমার নিজের ছেলেপুলে নেই, পরের ছেলে দেখে আনন্দ পাই, তাই ওকে ডেকেছিলাম। তুমি কি ভাব তাকে আমি এটা-সেটা দিয়ে একেবারে রাজা করে দিয়েছি? এক টুকরো মাত্র মিছরি দিয়েছিলাম, যদি সেটাকে তুমি উপহার বলো! তাছাড়া তাকে আমি উপহার দেবই বা কেন খামোখা? ভগবান্ জানেন কী বকবক করছ তুমি!

—ওর মা বেঁচে থাকতে কখনো ওকে ঘরে ডাকনি। আর এখন নাতালিয়া মারা যাবার পর রাতারাতি ভালো মানুষ সেজে গেলে।

—নাতালিয়া বেঁচে থাকতেই ও অনেকবার আমার কাছে এসেছে!—একটুও না হেসে আকসিনিয়া বললে।

—মিছে কথা বোলো না, নিলজ্জ বেহায়া!

—ওকে জিজ্ঞেস কর, তারপর আমায় মিথ্যেবাদী বোলো।

—বয়ে গেছে আমার। ভবিষ্যতে কখনো ওকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে যাবে না বলেদিলাম। আর একথাও যেন মনে ভেবো না যে এইভাবে তুমি গ্রিগরের সু-নজরে থাকবে। ওর বউ তুমি কখনো হবে না, জেনে রেখো সে কথা!

রাগে মুখ বিকৃত করে আকসিনিয়া ধরা গলায় বললে:—মুখ সামলে! গ্রিগর তোমার পরামর্শ নেবে না। অন্যের ব্যাপারে নাক গলাতে এস না তুমি! ইলিনিচ্না আরো কী জবাব দিতে গিয়েছিল, কিন্তু আকসিনিয়া নিঃশব্দে ঘুরে চলে গেল বালতিটার কাছে। বালতি-টানা বাঁকটা কাঁধের ওপর টেনে তুলে, হাঁটবার সময় জল চলকে ফেলতে ফেলতে তাড়াতাড়ি রাস্তা ধরে ওপরে উঠে গেল।

সেদিন থেকে মেলেখফ-বাড়ির কারো সঙ্গে পথে দেখা হলে আকসিনিয়া ওদের নমস্কারও জানাত না, বরং বেশ গর্বভরে নাকের ফুটো ফুলিয়ে গদন্তে পাশ কাটিয়ে চলে যেত। কিন্তু মিশাৎকাকে একলা পেলেই, ভয়ে-ভয়ে চারদিকটা একবার দেখে নিত কেউ কাছেপিঠে আছে কিনা, তারপর ছুটে

ওর কাছে গিয়ে নিচু হয়ে বুকে টেনে নিত। হেসে, কেঁদে, ছেলেটির রোদপোড়া কপালে আর গম্ভীর কালো মেলেখফ-সুলভ ছোট্ট চোখজোড়ায় চুমু খেয়ে, সে ফিসফিস্ করে অসংলগ্নভাবে বলে যেত: ওরে আমার ছোট্ট গ্রিগরিয়েভিচ্! আমার সোনামণি! তোকে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়ে গেলাম যে! তোর আকসিনিয়া মাসীটা একটা বোকা দারুণ বোকা রে! তারপর ওর ঠোঁটে অনেকক্ষণ অবধি লেগে থাকত একটা কাঁপা কাঁপা হাসি, ছোট মেয়ের মতো খুশীতে ঝলমল করত ওর ভিজে চোখদুটো।

সাগর অভিমুখী

॥ এক ॥

অগস্টের শেষে পান্তালিমন ফৌজে ভর্তি হল। হাতিয়ার কাঁধে নিতে পারে তাতারস্কের এমন সমস্ত কসাকই রণাঙ্গনে ছুটেছে ওর সঙ্গে। পুরুষদের মধ্যে খালি যারা যুদ্ধে আহত, কিশোর অথবা জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ তারাই রয়ে গেল গ্রামে। শেষ প্রাণীটি অবধি রেহাই পায়নি এই ব্যাপক সৈন্যসংগ্রহ থেকে, কেবল ছাড়া পেয়েছে তারাই যারা ডাক্তারী কমিশনের মতে নিঃসন্দেহে পঙ্গু।

গ্রামের আতামান মোড়লের কাছ থেকে পঞ্চায়েত বাড়িতে হাজির হবার হুকুম পেয়েই পান্তালিমন তাড়াতাড়ি গিন্নী, নাতি-নাতনী আর দুনিয়ার কাছে বিদায় নিলে। তারপর কঁকাতে কঁকাতে হাঁটু গেড়ে বসে দুবার মাটিতে গড় হয়ে দেবীপটের সামনে ক্রুশ-প্রণাম করে বললে

—বিদায় হই এবার বাছারা। মনে হচ্ছে আর বোধ হয় আমাদের দেখা হবে না। শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে। তোমাদের ওপর আমার হুকুম রইল দিন রাত খেটে ফসল ঝাড়াই শেষ কোরো যাতে বর্ষার আগেই হয়ে যায়। দরকার পড়লে একজন মুনিষ যোগাড় করে নিও। শরতের আগে যদি না ফিরি তো নিজেরাই চালিয়ে নিও। যতটা সাধ্যে কুলোয়। জমি চষে ফেলো শরতের সময়। রাই বুনবে অন্তত দু একর তো বটেই। নজর রেখো বুড়ী, কাজ যেন ঠিকমতো হয়, হাত গুটিয়ে বোসো না। গ্রিগরি আর আমি ফিরি বা না-ফিরি, ফসলের দরকার তোমাদের হবেই। যুদ্ধ তো যুদ্ধই, কিন্তু তাই বলে ঘরে রুটি বাড়ন্ত হলে অবস্থা শোচনীয় হবে। যাক, ঈশ্বর তোমাদের রক্ষা করুন।

বুড়োর সঙ্গে ইলিনিচ্‌না চৌরাস্তার মোড় অবধি এল। শেষবারের মতো দেখল ওকে ক্রিস্তোনিয়ার পাশাপাশি খোঁড়াতে খোঁড়াতে গাড়ির পেছনে ছুটতে। তারপর আঙরাখার খুঁটে চোখ মুছতে মুছতে সে ফিরে এল একবারটিও পেছন পানে না চেয়ে। গম ঝাড়াইয়ের আঙিনায় একরাশ আধ-ঝাড়া গম জমে রয়েছে, উনোনে চাপানো দুধ, সকাল থেকে ছেলে পুলেদের পেটে কিছু পড়েনি, বুড়ীর হাতে এখন অনেক কাজ। তাই সে

রাস্তায় একবারটিও না দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরল। দু-একজন প্রতিবেশীর সঙ্গে দেখা হতে শুধু নীরবে মাথা নুইয়ে নমস্কার জানিয়েছিল সে। একজন দুঃখ জানিয়ে বললে, সেপাইকে তাহলে বিদায় দিলে? জবাবে শুধু ঘাড় নাড়লে ইলিনিচ্না।

* *

কদিন বাদে ইলিনিচ্না ভোরবেলায় গরু দুইয়ে সেগুলোকে রাস্তায় ছেড়ে সবে উঠোনে ফিরেছে এমন সময় ওর কানে এল একটা চাপা গুরু গুরু আওয়াজ। ফিরে তাকিয়ে আকাশে এক টুকরো মেঘও দেখতে পেল না সে।. খানিক বিরতি দিয়ে আবার সেই গর্জনের শব্দ।

বুড়ো রাখাল গরুগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করতে-করতে বললে বাজনা শুনতে পাচ্ছ ঠাকরুন?

—কীসের বাজনা?

—কেন ওই যে ঢাকের বাদ্যি।

—সে তো শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু কীসের তা ঠাহর করতে পারছি না।

—শিগগিরই টের পাবে। গাঁয়ের দুই ওপার থেকে যখন আওয়াজ আসতে শুরু করেছে তখন ব্যাপার বুঝতে আর কষ্ট নেই। ও হল কামানের শব্দ। আমাদের বুড়োদের পিলে চমকে দিচ্ছে ওরা ..

ইলিনিচ্না ক্রুশ প্রণাম করে নিঃশব্দে পাল্লা ফটকটা পেরিয়ে এল।

চারদিন একটানা কামানের গর্জন চলল। ভোর আর বিকেলের দিকেই বিশেষ করে তীব্র হয়ে ওঠে। কিন্তু উত্তর দিকে হাওয়া বইতে শুরু করলে দিনের বেলাতেও শোনা যায় দূর থেকে লড়াইয়ের আওয়াজ। গম ঝাড়াই আঙিনায় মুহূর্তের জন্য কাজে ঢিলে পড়ে, মেয়েরা ক্রুশ প্রণাম করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। প্রিয়জনের কথা স্মরণ করে ওরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানায়। তারপর গম মাড়াইয়ের আঙিনায় আবার চলতে শুরু করে যন্ত্র-কল। ঘোড়া আর বলদগুলোকে হাঁকায় চাষীর ছেলেরা। কর্মব্যস্ত দিন আবার শুরু হয় তার অলঙ্ঘ্য নিয়মে।

আগস্টের শেষ দিন কটা এবার ভারি চমৎকার, আশ্চর্য শুকনো। গ্রামের ভেতর দিয়ে ধুলো-ওড়ানো হাওয়া, সেই সঙ্গে চারদিকে ম ম করছে ঝাড়াই-করা ছাতা-ধরা খড়ের একটা মিষ্টি গন্ধ। নির্দয় সূর্যের তাপ। কিন্তু এরই মধ্যে সবত্র টের পাওয়া যায় আসন্ন শরতের ইশারা। গোরু চরা মাঠে ফ্যাকাশে কপোত ধুসর সোমরাজ অল্প অল্প সাদা দেখায়। ডনের ওপারে পপ্লারের মাথায় হলদে ছোপ। বাগিচায় শরতের আপেলের সুবাস

আরো তীব্র হয়ে উঠেছে। দূরের দিগ্বলয়ে শারদ স্বচ্ছতা। ফসল-কাটা মাঠের ওপর দিয়ে মরশুমী বকের প্রথম ঝাঁক উড়ে চলেছে।

সামরিক রসদ নিয়ে মালগাড়ি চলেছে ডনের পারঘাটার দিকে পশ্চিম থেকে পুবে, হেৎমান মোড়লের সদর রাস্তার ধার দিয়ে। ডন পারের পল্লীগুলোতে বাস্তুহারাদের ভিড। ওরা বলে কসাকরা নাকি লডতে লড়তে পেছু হটছে। কারুর মতে এই পশ্চাদপসারণ ইচ্ছাকৃত, লালফৌজকে ভুলিয়ে ফাঁদে ফেলবার জন্য। ওদের আসল মতলব লালফৌজকে ঘিরে ফেলে খতম করা। তাতারস্কের কিছু লোক চুপি-চুপি সবে পডার যোগাড করে। ঘোড়া বলদদের খাইয়ে, শস্য আর দামী জিনিস সিন্দুকে ভরে রাতারাতি তারা মাটির নিচে পুঁতে ফেলে। পাঁচুই সেপ্টেম্বর যে কামান গর্জন থেমে গিয়েছিল এখন তা আবার জোরালো আর ভয়াবহ হয়ে ওঠে। ডনের ওপারে প্রায় মাইল পঁচিশ দূরে তাতাবস্কের উত্তর-পুবে লডাই চলছিল। পরদিন পশ্চিম দিক থেকেও নদীর উজানে ভেসে আসে কামানেব আওয়াজ। রণাঙ্গন ক্রমেই সরে আসছে নদীর কাছে।

গ্রামবাসীদের অনেকেই চলে যাবার যোগাড করছে দেখে ইলিনিচ্না দুনিয়াকে বোঝালো ওদেরও সরে পড়া উচিত বোধ হয়। কেমন হতভম্ব আর বিমূঢ় হয়ে গেছে ইলিনিচ্না, বাড়ি ঘর খামার নিয়ে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। সব ছেড়ে আর সকলের সঙ্গে চলে যাবে, না বাডিতেই থাকবে? লডাইয়ে যাবার আগে পান্তালিমন ফসল ঝাডাইয়ের কথা বলেছে, জমি চষবার কথা বলেছে, গরু ভেডার কথা বলেছে। কিন্তু লডাই ওদের তাতারস্কের কাছে এলে কী করতে হবে সে উপদেশ তো দেয়নি। শেষে ইলিনিচ্না ঠিক করল দুনিয়া আর ছেলেপিলেগুলোকে ওদের ঘরের সবচেয়ে দামী জিনিসপত্র যা আছে তাই দিয়ে গাঁয়েই একজন লোকের সঙ্গে পাঠিয়ে দেবে, আর সে নিজে থাকবে বাডিতেই। লালফৌজ যদি গ্রাম দখল করে নেয় তবুও।

* * * *

সতেরোই সেপ্টেম্বর রাতে পান্তালিমন আচমকা বাডি এসে হাজির হয়। কাজানস্কা জেলা কেন্দ্রের কাছাকাছি কোনো জায়গা থেকে সে পায়ে হেঁটে এসেছে। ক্লান্ত, মেজাজ তিরিক্ষি। আধঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে সে টেবিলের ধারে এসে বসে। তারপর এমন গোগ্রাসে খেতে শুরু করে যে ইলিনিচ্না ওর জীবনে কোনোদিন ওকে অমন ভাবে খেতে দেখেনি। আধ বালতি পাতলা কপির ঝোল সে সাবাড় করে দেয়, তারপরেই হুমড়ি খেয়ে পডে বজরার পায়েসের থালায়। ইলিনিচ্না অবাক হয়ে হাতে তালি বাজায়।

—হে ভগবান, ও কেমন খাওয়া প্রকোফিচ্। তিন দিন পেটে যেন তোমার কিছু পড়েনি এমনি ভাবখানা।

—হ্যাঁ, সত্যি-সত্যিই পেটে কিছু পড়েছে ভেবেছ। বুড়ো হাঁদা? আজ ঠিক তিন দিন হল দাঁতে কিছু কাটতে পারিনি।

—কেন। ফৌজে কি তাহলে তোমাদের কিছু খেতে দেয় না?

—এমন খাওয়া ওদের কোন শয়তানে খাওয়াবে।—মুখে একরাশ খাবার গুঁজে বেড়ালের মতো ঘরঘর করে জবাব দেয় পান্তালিমন—যা হাতে পাওয়া যায় তাই গেল। কিন্তু চুরি করতে যে এখনো শিখিনি। ছেলে ছোকরাদের আর কী এসে যায়, ওদের তো বিবেক বলে কিছু নেই। এই হতভাগা যুদ্ধে ওরা চুরি ছ্যাঁচড়ামিতে এমন হাত পাকিয়েছে যে আমার তো দেখে আক্কেল গুড়ুম। শেষে অবিশ্যি গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। যা ছ্যাখে তাই হাতায়, তাই সরায়।····· এ তো যুদ্ধ নয়, ভগবানের চাবুক!

—একবারে অতটা তোমার না গেলাই বোধহয় ভালো। কিছু একটা অনাসৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। দেখ না কেমন ফুলে ঢোল হচ্ছ। ঠিক মাকড়-সার মতো।

—চোপরও! একটু দুধ এনে দাও, আর একটুকরো রুটি।

দুর্বল স্বামীর দিকে চেয়ে চোখের জল সামলাতে পারে না ইলিনিচ্‌না।

খাবারের থালা ছেড়ে সে যখন অবশেষে পেছনে হেলান দিয়ে বসেছে তখন ইলিনিচ্‌না জিজ্ঞেস করল, একেবারে ফিরে এলে তো?

এড়াবার মতো জবাব দেয় পান্তালিমন—দেখা যাক্‌·· ··· ।

—বুড়োদের বুঝি ছুটি দিয়ে দিয়েছে?

—কাউকেই ছুটি দেয়নি। কেমন করে দেবে, লালরা তো ডনের কাছে এসে পড়ল বলে। আমি সট্‌কে পড়েছি।

ইলিনিচ্‌না ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করে, কিন্তু তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে না?

—যদি ধরে তবে তো··· ·

—তাহলে তুমি লুকিয়ে থাকবে নাকি?

—তুমি কি ভেবেছিলে আমি বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আর দশদিক দেখে বেড়াব? বাঃ, কী আমার বুদ্ধি রে।—পান্তালিমন বিরক্ত হয়ে থুতু ছোঁড়ে। কিন্তু বুড়ীর ঘ্যানর-ঘ্যানর আর শেষ হয় না:

—ওঃ কী পাপ! একে এত দুঃখু রাখার জায়গা নেই, এবার আবার গ্রেপ্তার হবে তুমি·········

—বেশ তো! রাইফেল কাঁধে স্তেপের মাঠে ঘুরে বেডাবার চেয়ে জেলখানায় থাকা ঢের ভালো।—ক্লান্ত কণ্ঠে বলে পান্তালিমন, আমি তো জোয়ান মানুষটি নই যে দিনে পঁচিশ মাইল মার্চ করব, পরিখা খুঁড়ব, ডবল কদমে হামলা করতে ছুটব, হামা দিয়ে চলব, ফের গুলি থেকে মাথাও বাঁচাব। মাথা বাঁচাক্‌ শয়তানে! আমার এক সাথী ক্রিভায়া রেচ্‌কার লোক, গুলি লাগল এসে তার

বাঁ কাঁধের নিচে, ব্যস, একবারটি সে পা-ও ছুঁড়লে না। এসব দেখে কার আনন্দ হবে বলো।

রাইফেল আর কার্তুজের থলিটা বুড়ো বাইরে নিয়ে চালাঘরে লুকিয়ে রেখে আসে। তবে ইলিনিচ্না যখন ওর ফার কোটটার কথা জিজ্ঞেস করে তখন ও আমতা আমতা করে জবাব দেয়—ছিঁড়ে শেষ হয়ে গেছে। সত্যি বলতে কি আমি ওটা ফেলেই দিয়েছি। শুমিলিন্স্কের ওপাশে ওরা এমন চাপ দিতে শুরু করল যে সবাই যথাসর্বস্ব ফেলে পাগলের মতো পালাতে লাগল। তখন আর কোট-ফোট নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই। কয়েকজনের ভেড়ার চামড়ার কম্বল ছিল, তাও ছেড়ে এসেছে। তাছাড়া কোটের কথা তোমার মাথায় আসেই বা কী করে? তাও যদি সেরকম ভালো হত, ভিখিরিরও পরার যুগ্যি নয়।

আসলে কোটখানা ছিল নতুনই, তবে বুড়ো যা কিছুই বাতিল করে সেটা সব সময় ভালো নয় বলেই করে। এই হলো তার বক্তব্য। নিজেকে সান্ত্বনা দেবার এই এক ফন্দি বুড়োর। ইলিনিচ্না তা জানত, তাই কোট ভালো কি মন্দ তা নিয়ে তার তর্ক করার উৎসাহ ছিল না।

সে রাতে একটা ঘরোয়া বৈঠকে ওরা ঠিক করলে ইলিনিচ্না আর পান্তালিমন শেষ মুহূর্ত অবধি ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাড়িতেই থাকবে, তারা জিনিসপত্র পাহারা দেবে, ফসল পুঁতবে। আর দুনিয়া বুড়ো বলদের জোঁয়ালি আর ঘরের বাক্স-প্যাটরা নিয়ে চিরার ধারে লতিশেভ গাঁয়ে আত্মীয়দের কাছে চলে যাবে।

এ ফন্দিটা পুরোপুরি কাজে লাগানোর সৌভাগ্য ওদের হল না। দুনিয়াকে ওরা পরদিন সকালে বিদায় দিল বটে কিন্তু দুপুরে কালমিক কসাকদের একটা পিটুনি ফৌজ ঢুকলো তাতারস্ক গাঁয়ে। গাঁয়ের কেউ নিশ্চয় পান্তালিমনকে লড়াই থেকে পালিয়ে ফিরতে দেখেছিল, কারণ কালমিকরা এসে পৌঁছবার ঘণ্টাখানেক বাদেই মেলেখফদের উঠোনে ঘোড়া ছুটিয়ে এল। ঘোড়সওয়ারদের দেখামাত্র পান্তালিমন অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে চিলেকোঠায় গিয়ে উঠেছিল। ইলিনিচ্না বেরিয়ে এল আগন্তুকদের সঙ্গে দেখা করতে।

সুঠামদেহ বয়স্ক একজন কালমিক আস্তিনে সার্জেন্টের পদক চিহ্ন আঁটা। ঘোড়া থেকে নেমে ইলিনিচ্নাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে লোকটা ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে জিজ্ঞেস করলে, তোমার বুড়ো কোথায়?

ইলিনিচ্না কড়া গলায় জবাব দিলে, লড়াইয়ে। তা-ছাড়া কোথায় থাকবে?

—বাড়ির ভেতর নিয়ে চল। খোঁজ করে দেখি।

—কিসের খোঁজে?

—তোমার বুড়োকে খুঁজে দেখব। ছি-ছি লজ্জার কথা! বুড়ী মানুষ

হয়ে মিছে কথা বলছ!—তিরস্কারের ভঙ্গিতে তরুণ-দর্শন সার্জেণ্টটি মাথা নেড়ে সাদা ঘন দাঁতের পাটি বের করে হাসে।

—মর আবাগীর বেটা, অমন দাঁত বের করিসনি! বললাম না সে এখানে নেই? তার মানে সে এখানে নেই!

—ঠাট্টা রাখ, এবার বাড়িটা দেখাও দিকি আমাদের। তুমি যদি না দেখাও আমরা নিজেরাই যাব।—বিরক্ত হয়ে কড়া গলায় বললে কালমিকটা। গট গট করে বাঁকা পা দুটো ফেলে ফেলে সে এগিয়ে গেল সিঁড়ি দরজার দিকে।

কামরাগুলো ভালো করে দেখে ওরা নিজেদের মধ্যে কালমিক ভাষাতেই কী সব বলাবলি করতে থাকে। তারপর দুজন যায় খিড়কির দিকে আর বেঁটে-খাটো, •কাল্‌চেপানা, মুখে বসন্তের দাগওলা থাঁদা নাক আরেকজন তার ডোরাদার পাতলুন গুটিয়ে সিঁড়ি-দরজা দিয়ে ঢোকে। হাট খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে ইলিনিচ্‌না দেখল কালমিকটা লাফিয়ে ছাদের বরগা ধরে কায়দা করে ওপরে উঠে গেল। পাঁচমিনিট বাদে সে তবতর করে আবার নিচে নেমে এল। ওর পেছন-পেছন সাবধানে নামছে পান্তালিমন—সারা গায়ে মাটি মাখা, দাড়িতে মাকড়সার জাল জড়ানো। বুড়া জোর করে ঠোঁটদুটো চেপে দাঁড়িয়ে ছিল। ওর দিকে তাকিয়ে পান্তালিমন বললে.

—হতভাগারা শেষ অবধি খুঁজে বের করল আমায়! কেউ নিশ্চয় বলে দিয়েছিল

পাহারা দিয়ে বুড়োকে কারগিন জেলা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে তখন সামরিক বিচার চলছে। ইলিনিচ্‌না খানিকটা চোখের জল ফেলল। তারপর আবার নতুন করে কামানের গর্জন আর ডনের ওপার থেকে পরিষ্কার মেশিনগানের কট্‌কট্‌ আওয়াজ কানে যেতে সে গোলাঘরে ঢুকল ফসলের খানিকটা যাতে অন্তত বাঁচানো যায় সেই আশায়।

* * * * *

চোদ্দজন পলাতক বন্দী হয়ে বিচারের প্রতীক্ষা করছিল। বিচার হল সংক্ষিপ্ত এবং নির্মম। বয়স্ক এক ক্যাপটেন আদালতের প্রধান বিচারক। আসামীদের সে প্রথমে নাম জিজ্ঞেস করলে, তারপর রেজিমেণ্টের নাম, কতদিন পালিয়ে ছিল সেটাও জেনে নিলে। তারপর নিচু গলায় আদালতের অন্য সদস্যদের সঙ্গে কী সলা-পরামর্শ করে রায় জানিয়ে দিলে। তার সহকর্মীদের মধ্যে একজন এক-হাত-খোয়ানো লেফটেন্যাণ্ট, আরেকজন ধামাধরা গোছের দাড়িওলা এক ফুলো-মুখ সার্জেণ্ট। পলাতকদের বেশির ভাগেরই সাজা হল বার্চের ডাল দিয়ে চাবুকের ঘা। বিশেষ করে এই

উদ্দেশ্যেই একটা আলাদা পরিত্যক্ত বাড়ি রাখা হয়েছিল—কালমিকরা সেখানে সাজার হুকুম তামিল করছে। ১৯১৮ সালের মতো এবারেও জঙ্গী ডন ফৌজে পলায়নের পরিমাণ এত বেড়ে গেছে যে প্রকাশ্যে লোকের চোখের সামনে আর চাবুক কষানো চলছে না।

আদালতের ষষ্ঠ আসামী হিসেবে ডাক পড়ল পান্তালিমনের। উত্তেজিত আর ফ্যাকাশে চেহারা নিয়ে সে বিচারকের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে পাতলুনের দুপাশে হাত ঝুলিয়ে।

আসামীর দিকে না তাকিয়ে ক্যাপটেন জিজ্ঞেস করলে. তোমার পদবী?

—মেলেখফ, হুজুব।

—তোমার ভালো নাম, বাপের নাম?

—পান্তালিমন প্রকোফিয়েফ, হুজুর।

কাগজ থেকে চোখ তুলে ক্যাপটেন বুড়োর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। জিজ্ঞেস করল—কোথাকাব লোক?

—ভিয়েশেন্স্কা জেলায় তাতারস্ক গাঁয়ের লোক, হুজুর।

—স্কোয়াড্রন কমাণ্ডার গ্রিগর মেলেখফের বাপ তো নও তুমি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর, ওই আমার ছেলে।

—বার্ধক্যজীর্ণ শরীবটা হয়তো এ যাত্রা চাবুকের হাত থেকে বেঁচে গেল ভেবে মনের জোর ফিরে আসছে পান্তালিমনেব।

পান্তালিমনেব চোপ্‌সানো মুখের ওপর থেকে ক্যাপটেন তার কডা নজরটা না সরিয়েই জিজ্ঞেস করল, শোনো। নিজের জন্য একটু লজ্জাও হয় না তোমার।

এই কথায় বুড়ো আইন-কানুন জলাঞ্জলি দিয়ে বাঁ হাতখানা নিজের বুকের ওপর রেখে কাঁদো-কাঁদো গলায় বললে:

—হুজুর! ক্যাপটেন! দয়া করুন, ঈশ্বরের কাছে আপনাদের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করে কাটাতে দিন বাকি জীবনটা। চাবুকের সাজাটি আর দেবেন না। আমার দু'দুটো বিবাহিত ছেলে বড়টা লালফৌজের হাতে মরেছে। নাতিপুতি রয়েছে আমার, এই খুনখুনে বুড়োকে চাবুকের ঘা কষানো কি এতই দরকার?

—কেমন করে সেপাইগিরি করতে হয় তা আমরা বুড়োদেরও শিখিয়ে দিচ্ছি। তুমি কি ভেবেছিলে ফৌজ থেকে পালানোর জন্য তোমায় মেডেল দেয়া হবে?—সেই হাত-কাটা লেফ্‌টেন্যাণ্ট ফোড়ন কাটে। লোকটার ঠোঁটের কোণাদুটো তিরতির করে নাচছে।

—মেডেল দিয়ে আমি কি করব?...আমাকে আমার রেজিমেণ্টে ফেরত পাঠিয়ে দিন, জান-প্রাণ দিয়ে খাটব।..কীভাবে পালিয়ে এলাম তা আমি নিজেই জানি না। নিশ্চয় আমার ওপর শয়তানে ভর করেছিল।—

পান্তালিমন বিড়বিড করে ওর আকাঁড়া ফসল, খোঁড়া পা আর নষ্ট হতে বসা খামারের কথা শোনাতে থাকে। কিন্তু একবার ইশারা করেই ওকে একদম চুপ করিয়ে দেয় ক্যাপটেন। তারপর লেফ্‌টেন্যান্টের দিকে ঝুঁকে তার কানে কানে কী বলে। লেফটেন্যান্ট মাথা নাড়তে ক্যাপটেন পান্তালিমনের দিকে ফিরে বলে.

—ঠিক আছে। তোমার যা বলবার ছিল সব বলা হয়েছে? তোমাব ছেলেকে আমি চিনি, তার যে এমন বাপ হবে তা দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। ফৌজ থেকে পালিয়েছিলে কবে? এক হপ্তা আগে? বেশ, তুমি কি চাও যে লালফৌজ তোমাদের গাঁ দখল করে তোমাদের ছাল ছাড়িয়ে নিক? ছোকরা কসাকদের সামনে এই নমুনা তুলে ধরছ তুমি? আইন মাফিক. আমাদের উচিত তোমাকে নিন্দা করে দৈহিক শাস্তির হুকুম দেয়া। কিন্তু তোমার ছেলে একজন অফিসার। তারই সম্মানের কথা বিবেচনা করে তোমাকে সে কলঙ্কের হাত থেকে রেহাই দিলাম। তুমিও কি কমিশনহীন অফিসার ছিলে?

—হ্যাঁ। হুজুর।

—কী পদে?

—কর্পোরোল। হুজুব।

ক্যাপটেন গলা চড়িয়ে বললে, সাধারণ সেপাইয়ের পদে নামিয়ে দেয়া হল তোমাকে! এখুনি নিজের রেজিমেণ্টে ফিবে যাও। তোমার কোম্পানি কমাণ্ডারকে জানিও যে জঙ্গী আদালতের বিচাবে তোমার কর্পোরাল পদ কেড়ে নেয়া হয়েছে। এই যুদ্ধে বা আগের যুদ্ধে তুমি কোনো পুরস্কাব পেয়েছিলে? ভাগো এখন'

আনন্দে আত্মহাবা হয়ে পাণ্তালিমন ছুটল। গিজাব চুড়োটা নজরে পড়তেই একবার ক্রুশ প্রণাম সেরে নিল। তাবপর পথঘাটশূন্য পাহাড-টিলা ডিঙিয়ে একেবারে বাড়ির দিকে রওনা হল সে। মাঠের ঘাস জঙ্গলে' ভেতর দিয়ে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে যেতে যেতে সে ভাবে—এবাব আর অমন করে গতের মধ্যে ঢুকে থাকব না' এমন জায়গায় লুকবো যে শয়তানেরও সাধ্যি হবে না খুঁজে বের করবাব। পাবে তো তিন কোম্পানি কালমিক পাঠাক খুঁজতে। দেখা যাবে।

স্তেপের মাঠে এসে তার মনে হল সোজা রাস্তা দিয়ে চলাই বরং ভালো. যাতে ঘোড়ায় চড়ে আসতে আসতে অযথা ওর দিকে কারুর নজর না পড়ে। তাহলে নির্ঘাত ভাববে আমি ফৌজ ছেড়ে পালিয়েছি। কোথায় আবার সেপাইদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, তখন বিচার-টিচারের বালাই না বেখে প্রথমেই ধরে চাবকাবে।—ভাবতে ভাবতে বুড়োর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে কথাগুলো। চষা খেত জমি ছেড়ে সে কলাগাছ-গজানো হেলায় পড়ে

থাকা গরমকালের মরশুমী রাস্তায় নেমে পড়ল। নিজেকে আর এখন তার পলাতক বলে মনেই হচ্ছে না যেন।

যতই ডনের কাছাকাছি আসে, ততই উদ্বাস্তুদের গাড়িগুলোর সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে থাকে ঘন-ঘন। বসন্তকালে বিদ্রোহীদের পেছু-হঠার সময় নদীর বাঁ দিকে যে সব দৃশ্যগুলো ঘটতে দেখা যেত এবারেও তার পুনরাবৃত্তি। ঘরোয়া জিনিসপত্রে ঠাসা মালগাড়ি আর ব্রিচ্‌কাগাড়ি, ঘোড়সওয়ার অভিযানের মতো পালে-পালে গরু সরবে ছড়িয়ে পড়ছে, স্তেপের প্রান্তরে ধুলো উড়িয়ে ছুটছে ভেড়ার পাল। চাকার ক্যাঁচকোঁচ, ঘোড়ার ডাক, মানুষের চিৎকার, অসংখ্য খুরের শব্দ আর সেই সঙ্গে ভেড়ার ডাক, ছেলেমেয়েদের কান্নার একটানা বিরক্তিকর আওয়াজে স্তেপের শান্ত আকাশ বাতাস ভরে উঠেছে।

মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা একজন কসাক পাশের একটা গাড়ি থেকে চেঁচিয়ে উঠল: ও দাদু, কোথায় চললেন? ফিরে যান, লালফৌজ একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল যে।

পান্তালিমন থতমত খেয়ে দাড়িয়ে পড়ে, বেশ কথা বললেন। কোথায় লালফৌজ?

—ডনের ওপারে। ভিয়েশেন্‌স্কার কাছাকাছি এসে পড়েছে। ওদের দলে ভিড়তে যাচ্ছেন নাকি?

লালফৌজ এখনো নদীর ওপারে আছে শুনে আশ্বস্ত হয়ে পান্তালিমন আবার চলতে শুরু করে। সন্ধ্যার মুখে এসে হাজির হয় তাতারস্কে। পাহাড় থেকে নেমে আসবার সময় চারদিকটা খুঁটিয়ে লক্ষ করে সে। গোটা গ্রামখানা খাঁ-খাঁ করছে দেখে অবাক হয়ে যায়। রাস্তায় জনপ্রাণী নেই। না শোনা যায় মানুষের গলা, না গরুর ডাক। কিন্তু একেবারে ওদিকটায় নদীর ধারে লোকজন ছুটোছুটি করছে। কাছে আসতে পান্তালিমনের আর বুঝতে কষ্ট হয় না ব্যাপারটা—ওরা হল সশস্ত্র কসাক, বজরা টেনে আনছে গাঁয়ের দিকে। তাতারস্কের লোকজন পুরোপুরি গ্রাম ছেড়েছে। পান্তালিমনের পরিষ্কার ধারণা জন্মায় এবার সাবধানে পাশের গলিতে ঢুকে লম্বা লম্বা পা ফেলে বাড়ির দিকে এগোয় ও। ইলিনিচ্‌না আর নাতি-নাতনিরা রান্নাঘরে বসেছিল।

—আরে, এ যে দাদু!—ফূর্তিতে চেঁচিয়ে ওঠে মিশাৎকা, দু'হাতে বুড়োর গলা জড়িয়ে ধরে সে।

আনন্দে ইলিনিচ্‌নার চোখে জল আসে। কাঁদতে কাঁদতেই বলে:

—তোমাকে আবার দেখব সে ভরসা ছিল না। ছাখো প্রকোফিচ্‌ তোমার যা মর্জি হয় কর, কিন্তু আমি আর এক মুহূর্তও থাকতে চাই না এখানে। সব পুড়ে-টুড়ে শেষ হয়ে যাক, আমি বাপু খালি ঘরপাহারা

দিতে পারব না। প্রায় প্রত্যেকেই গাঁ ছেড়েছে, আমি শুধু নাতিদের নিয়ে বোকার মতো বসে আছি। এখুনি ঘোড়াটাকে গাড়িতে জুড়ে নিয়ে চল কোথাও চলে যাই। ওরা তোমায় দিল ছেড়ে?

—হ্যাঁ।

—একেবারে?

—একেবারে, যতক্ষণ না ধরা পড়ি!

—যাক্, এখানে তো লুকোতে পারবেও না। আজ সকালে নদীর ওপার থেকে লালফৌজ যখন গোলা ছুঁড়তে আরম্ভ করল, সে কী ভয়ঙ্কর অবস্থা। যতোক্ষণ গোলাগুলি চলল বাচ্চাগুলোকে নিয়ে বসে থাকলাম নিচের ভাঁড়ার ঘরে। কিন্তু এখন ওদের তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। কয়েকজন কসাক এসে দুধ চাইল, আমাদের তারা এখান থেকে চলে যেতে পরামর্শ দিলে।

—কসাক? তারা বুঝি আমাদের গাঁয়ের লোক নয়?—জানলার কাঠে টাটকা বুলেটের ফুটো ভালো করে লক্ষ্য করতে-করতে পান্তালিমন সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলে।

—না, ওরা ভিন্‌দেশী। বোধ হয় খপ্‌রার লোক।

পান্তালিমন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, তাহলে তো আমাদের যেতে হয়।

বিকেল নাগাদ সে ঘুঁটের গাদার নিচে একটা গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে সাত বস্তা গম রেখে ফের সাবধানে গর্ত বুজিয়ে তার ওপর ঘুঁটে গাদা করে রাখল। সন্ধ্যে হতেই সে ঘুড়ীটাকে গাড়িতে জুতে দুটো ভেড়ার-চামড়ার কোট, এক বস্তা ময়দা, বজরা আর একটা ভেড়া গাড়ি মধ্যে তুলে, দুটো গরুই পেছনে বেঁধে নিলে। তারপর ইলিনিচ্‌না আর বাচ্চাদের বস্তার ওপর বসিয়ে বললে:

—এবার তাহলে ভগবানের নাম নিয়ে রওনা হওয়া যাক্।—বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে সে লাগামজোড়া তুলে দিলে বুড়ীর হাতে। ফটকটা বন্ধ করে গাড়ির পাশে পাশে হেঁটে চলল সে একেবারে পাহাড় অবধি, আর কেবলই ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস নিয়ে কোটের আস্তিনে চোখের জল মুছতে লাগল।

* * * * * *

প্রায় কুড়ি মাইল একটানা অভিযান চালাবার পর অবশেষে সতেরোই সেপ্টেম্বর শরিনের ঝটিকা বাহিনী ডনের রণাঙ্গনে এসে পৌছাল। আঠারোই সেপ্টেম্বর উস্ত্‌মেদভেদিৎসা থেকে কাজানস্কা অবধি সমগ্র নদী রণাঙ্গন বরাবর লালফৌজের কামান গর্জে উঠল। সংক্ষিপ্তকালের মধ্যে গোলন্দাজ-বাহিনীর প্রস্তুতি শেষ করে পদাতিক ফৌজ ডনপারের গ্রামগুলো আর

বুকানভ, ইয়েলানস্কা, আর ভিয়েশেন্‌স্কা জেলাকেন্দ্রগুলো দখল করে ফেলল। সেই তারিখেই ডনের বাঁ পাড়ে আর একশো মাইলের মধ্যে কোনো শ্বেতরক্ষী রইল না। কসাক কোম্পানিগুলো পেছু হটে সুশৃঙ্খলভাবে নদী পার হয়ে পূর্ব-নির্ধারিত ঘাঁটিগুলোতে ফিরে আসতে লাগল। নদী পার হবার সব রকম উপায় ওদের হাতে থাকলেও ভিয়েশেন্‌স্কায় সেতুটা প্রায় লালফৌজ দখল করেই নিতে বসেছিল। শেষ মুহূর্তে পুলে আগুন দিয়ে ওরা পালাতে পারলেও অবিশ্রান্ত কামানের গোলাবর্ষণের মধ্যে ওদের বেশ কিছু মানুষ আর ঘোড়া হতাহত হয়।

সেপ্টেম্বরের শেষ অবধি ডনের বাঁ পারের গ্রামগুলো দখলে রেখেছিল নয় নম্বর লালবাহিনীর দুটো ডিভিশন। লালফৌজ আর শ্বেতরক্ষীদের মাঝে যে নদীটার ব্যবধান, এই ঋতুতে তা বড জোর পাঁচশো ফুট চওড়া, একেক জায়গায় তো দুশো ফুটও হবে কিনা সন্দেহ। লালফৌজ নদী পার হবার কোন সক্রিয় চেষ্টা করেনি ; এখানে ওখানে দু-একবার হেঁটে পার হতে গিয়ে ঘা খেয়ে ফিরে গেছে। গোটা এলাকায় প্রায় পক্ষকাল ধবে তুমুল গোলাগুলির বিনিময় চলেছে দু'তরফে। কসাকরা এমন সব উঁচু টিলা দখল করেছে যেখান থেকে নদীর দু'পাড়েই নজর রাখা চলে। নদীর দিকে এগোবার রাস্তায় সমস্ত শত্রুঘাঁটির ওপর তারা গোলাবর্ষণ করেছে, দিনের বেলায় তাদের পাডের কাছেও ঘেঁষতে দেয়নি। কিন্তু যে-সব কসাক কোম্পানি এই এলাকাগুলো দখলে রেখেছিল তাদের মধ্যে সবাই প্রায় বুড়ো কিংবা নাবালক কিশোর, অর্থাৎ দ্বিতীয়শ্রেণীর লড়াকু, তাই তারা ডন পার হবার অথবা নদীর বাঁ তীরে কোনো আক্রমণে লিপ্ত হবার চেষ্টাই করল না।[৫]

ডান পাডে এসে কসাকদের ধারণা হয়েছিল লালফৌজের দখল করা গ্রামগুলো বুঝি জলে পুড়ে খাঁক হয়ে যাবে। কিন্তু ওরা বিস্মিত হয়ে দেখলে বাঁ-পাড়ে সামান্য একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলীও নজরে আসে না। রাতে যে সব গ্রামবাসী নদী পার হয়ে এসেছে তারাও বলছে লালরক্ষীরা নাকি মোটেই কসাকদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করছে না, যতো খাদ্য ওরা হুকুম দখল করছে, তা সে সামান্য তরমুজই হোক কি দুধই হোক, ন্যায্য পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দিচ্ছে সোভিয়েত মুদ্রায়। এ-খবরে কসাকরা খুবই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। ওদের নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল, বিদ্রোহের পর লালফৌজ আর কোনো বিদ্রোহী গ্রামকেই আস্ত রাখবে না, যারা পেছনে রয়ে গেছে তাদের মধ্যে অন্তত পুরুষদের তো নিশ্চয়ই নির্মমভাবে খুন করবে। কিন্তু অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকেও যা খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে তো মনে হয়, লালরক্ষীরা শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষদের স্পর্শও করছে না, বিদ্রোহের মাশুল হিসাবে ওদের ওপর প্রতিশোধ নেবারও কোনো ঝোঁক তাদের নেই।

অক্টোবরের প্রথম দিকে ডনফৌজের প্রধান বাহিনী আবার নতুন করে আক্রমণ শুরু করে। পাভ্লভ্স্কের কাছে জোর করে নদী পার হয়ে তিন নম্বর ডন বাহিনী লাল বাহিনীর ছাপ্পান্ন নম্বর ডিভিশনকে পেছু তাডা করে সাফল্যের সঙ্গে পুবদিকে এগোতে থাকে। তারপরেই ডন পার হয় কনোভালভ্ বাহিনী। এ দলে ঘোডসওয়ার বেশী থাকার ফলে তারা শত্রুঘাঁটির অনেকটা ভেতরে এগোতে সমর্থ হয়, পর পর অনেকগুলো মারাত্মক আঘাতও হানে। একুশ নম্বর লাল পদাতিক ডিভিশন গোড়ায় তিন নম্বর ডন বাহিনীকে রুখলেও শেষ অবধি মিলিত কসাক বাহিনীর চাপে পেছিয়ে পডতে বাধ্য হয়। ১৪ই অক্টোবর এক মরিয়া গোছের লডাইয়ে দু-নম্বর কসাক বাহিনী চোদ্দ নম্বর লাল পদাতিক ডিভিশনকে ধ্বংস করে একেবারে নিঃশেষ করে ফেলার যোগাড় করেছিল। এক হপ্তার মধ্যে ডনের বাঁ পাড থেকে লালফৌজ সরে গেল— একেবারে ভিয়েশেন্স্কা অবধি খালি করে। বিরাট এক অঞ্চল জুড়ে কসাক বাহিনী নয় নম্বর লালফৌজের সৈন্যদের ঠেলে নিয়ে এল লুজেভো থেকে শিরিনকিন-ভরোবিয়কভ্কা বরাবর রণাঙ্গণ অবধি। এর ফলে নয় নম্বর ফৌজের তেইশ নম্বর ডিভিশন বাধ্য হল ভিয়েশেনস্কা থেকে পশ্চিম অভিমুখে ক্রুগ্লভ্স্ক গ্রাম অবধি তাডাতাডি তাদের রণাঙ্গণ সরিয়ে আনতে।

দু'নম্বর কসাক বাহিনীর এই অগ্রগতির প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ক্লেতস্কায়া জেলায় ঘাঁটি করে থাকা এক নম্বর ডন বাহিনীও জোর করে ডন পার হতে বাধ্য করল লালফৌজকে।

লালফৌজের বাঁ দিকে বাইশ ও তেইশ নম্বর ডিভিশন দুটো এবার অবরুদ্ধ হয়ে পডে এমনি অবস্থা। পরিস্থিতিটি বুঝতে পেরে দক্ষিণ পূর্ব রণাঙ্গণের সেনাপতিরা ন'নম্বর ফৌজকে সরে আসার হুকুম দিলেন ইকোরেৎজ্ নদীর মোহনা থেকে বুতুরলিনভ্কা, উসপেন্স্কা, তিশান্স্কা, আর কুমিলঝিন্স্কার কাছে। কিন্তু এ রণাঙ্গনেও টিঁকে থাকতে পারল না লালফৌজ। এককাট্টা হবার ঢালাও হুকুম পেয়ে যে-সব অসংখ্য কসাক কোম্পানি খাডো হয়েছিল তারা এবার ডান তীর থেকে নদী পার হয়ে দ্বিতীয় কসাক বাহিনীর নিয়মিত ফৌজী দলগুলোর সঙ্গে মিলে একটানা দ্রুতগতিতে লালফৌজকে হটিয়ে দিতে লাগল উত্তরের দিকে। ২৪শে থেকে ২৯শে অক্টোবরের মধ্যে শ্বেতরক্ষীরা ফিলোনোভো, পেভোরিনো, আর লভোখপেরস্ক শহর দখল করে নিল। অবশ্য এই সাফল্য খুব বড় রকমের হলেও কসাকদের আর আগের সেই আত্মবিশ্বাস নেই যার জোরে সেবার বসন্তকালে ডন প্রদেশের সীমান্ত অবধি বিজয় অভি-যানে তারা দৃপ্তভাবে এগিয়ে গিয়েছিল। কারণ লডাইয়ের সারিতে থেকে বেশীর ভাগ লোকেরই এ ধারণা পরিষ্কার যে এসব সাফল্য নেহাৎই সাময়িক, শীতের সময় তাদের টিকে থাকার ক্ষমতা হবে না।

দক্ষিণ রণাঙ্গনে স্তালিনের আগমনের পর এবং ডনবাস এলাকার ভেতর

দিয়ে দক্ষিণে অভিযান চালিয়ে দক্ষিণাঞ্চলের প্রতিবিপ্লবকে ধ্বংস করায় স্তালিন-পরিকল্পনা কার্যকরী হবার পর দক্ষিণ রণাঙ্গনের চেহারা সম্পূর্ণ পালটে গেল।

এই পরিকল্পনা উত্থাপন করে স্তালিন লেনিনকে যে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ লিপি পাঠান তা হল এই :

"কয়েকদিন আগে সর্বোচ্চ অধিনায়করা শোরিনকে সাধারণভাবে নির্দেশ দিয়েছেন ডন স্তেপ-অঞ্চলের ভেতর দিয়ে নভোরোসিস্ক-এর দিকে এগোবার জন্য —এমন একটি রণাঙ্গন ধরে যার ওপর দিয়ে আমাদের বিমানচালকরা হয়তো উড়ে যেতে পারেন, কিন্তু আমাদের পদাতিক ও গোলন্দাজদের পক্ষে সে পথ ভাঙা প্রায় অসম্ভব।

"আমাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন এক এলাকার একেবারে মধ্য-ভাগ দিয়ে, সম্পূর্ণ পথঘাটহীন অবস্থার মধ্যে এই (প্রস্তাবিত) নির্বোধ অভিযান যে আমাদের পুরোদস্তুর সর্বনাশই ডেকে আনবে সে আর ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন নেই। বুঝতে কষ্ট হয় না যে কসাক জেলাগুলোতে এই অভিযান শুধু আমাদের বিরুদ্ধে কসাকদের আরো বেশী সুসংহতই করবে, এবং নিজেদের এলাকা রক্ষা করতে গিয়ে তারা দেনিকিনের পাশেই আরো বেশী করে দাঁড়াবে (সাম্প্রতিক ঘটনায় যার প্রমাণ আমরা পেয়েছি)। এ অভিযানের ফলে দেনিকিনই ডনের মুক্তিদাতা হিসাবে পূজিত হবে, দেনিকিনের জন্যই কসাকদের বাহিনী সৃষ্টি হবে। এক কথায় শক্তি বাড়বে শুধু দেনিকিনেরই। এই কারণে ঠিক এখন, এই মুহূর্তেই, বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে আমাদের সাবেকী পরিকল্পনা বাতিল করে (যা কার্যক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই বাতিল হয়েছে) নতুন একটা পরিকল্পনা উপস্থাপিত করা দরকার যাতে প্রধান আঘাত হানা হবে খারকভ ও দানিয়েৎস্ অববাহিকা ধরে রস্তভের দিকে।

"প্রথমত, এর ফলে আমরা জনতার এমন এক অংশকে পাব যারা দুশমন তো নয়ই, বরং আমাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। এর ফলে আমাদের অগ্রগতি আরো সহজ হবে।

"দ্বিতীয়ত, একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রেলপথের যোগাযোগ ব্যবস্থা আমাদের হাতে আসবে (দনিয়েৎস্ রেলপথ), আমরা দখল করতে পারব দেনিকিন ফৌজের রসদ যোগাবার প্রধান পথটি অর্থাৎ ভরোনিয়েঝ-রস্তভ রেলপথ।

"তৃতীয়ত, এই অভিযান দ্বারা আমরা দেনিকিন ফৌজকে বিভক্ত করে ফেলব, স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীকে ঠেলে দেব মাখ্‌নোর গ্রামের মধ্যে, এদিকে আমরা কসাক বাহিনীকে পেছন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলব।

"চতুর্থত, এর ফলে আমরা কসাকদের সঙ্গে দেনিকিনের বিরোধ বাধিয়ে দেবার সুযোগ পাব, কারণ আমাদের অভিযান যদি সফল হয় তাহলে দেনিকিন

স্বভাবতই চাইবে কসাক বাহিনীকে পশ্চিম দিকে ঠেলে দিতে, যা বেশির ভাগ কসাকই সহ্য করবে না।

"পঞ্চমত, আমাদের হাতে আসবে কয়লা; ওদিকে দেনিকিন তা থেকে হবে বঞ্চিত।

"এ পরিকল্পনা গ্রহণে আর কাল বিলম্ব করা উচিত নয়।..

* * * *

অরলভ-ক্রমস্ক রণাঙ্গনে সাধারণ যুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর পরাজয় এবং ভরোনিয়েঝ অঞ্চলে বুদিয়নি অশ্বারোহী বাহিনীর চমকপ্রদ তৎপরতার ফলাফল হল চূড়ান্ত: ১৯১৯ সালের নভেম্বরে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী দক্ষিণ দিকে পশ্চাদপসরণ করল ডন-বাহিনীর বাঁ দিকটাকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রেখে। তার ফলে তাদেরও ঢালাও-ভাবে পেছু হটতে হল।

॥ দুই

ছোট্ট লাতিশেভ গ্রামে সপরিবারে আড়াই হপ্তা নির্বিঘ্নে কাটাল পান্তালিমন। তারপর ওর কানে এল লালফৌজ নাকি ডনের ওপার থেকে হটে গেছে। বাড়ি ফেরবার জন্য প্রস্তুত হয় পান্তালিমন।

তাতারস্ক থেকে মাইল তিনেক দূরে এসে সে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে, বলে:

—এভাবে টিকিয়ে টিকিয়ে চলা আর সহ্য হয় না। আর এই হতভাগা গরুগুলোকে নিয়ে তাড়াতাড়ি চলবেই বা কে! কেন মরতে যে নিয়ে এলাম? দুনিয়া, তোর বলদদুটোকে রোখ্ তো! গরুগুলোকে তোর গাড়ির সঙ্গে বেঁধে নে, আমি চটপট ঘরে গিয়ে উঠি। হয়তো দেখব খালি ছাইয়ের গাদা পড়ে আছে।

দারুণ অধীর হয়ে ছেলেপিলেদের সে নিজের ছোট গাড়ি থেকে দুনিয়ার বড়সড়ো গাড়িটাতে তুলে দেয়, বাড়তি মালপত্রও সরিয়ে দেয়। তারপর গাড়িটা আগের চেয়ে খানিকটা হাল্কা হতে উঁচু-নিচু রাস্তা ধরে

সে তড়বড় করে ছোটে। দু'মাইল পথ চলেই ঘুড়ীটা ঘামতে শুরু করেছে। ওর মনিব আগে তো কখনো এমন নির্দয় ব্যবহার করেনি ওর ওপর। হাত থেকে চাবুক নামায় না, একটানা ঘা কষিয়ে চলেছে।

—ইলিনিচ্‌না ভেতর থেকে গাড়ির বেড়াটা চেপে ধরে ঝাঁকুনির চোটে যন্ত্রণায় ভুরু কুঁচকে বলতে থাকে—ঘুড়ীটাকে যে ছুটিয়েই মেরে ফেলবে! অমন শয়তানের মতো হুড়মুড় করে দৌড়োচ্ছ কেন?

—আমি মরলে তো তোর হাড় জুড়োয়।·····আরে এই শয়তানী! অমন ঘেমে উঠেছিস যে! হয়তো গিয়ে দেখব ঘরের খুঁটিগুলোই শুধু দাঁড়িয়ে আছে······।

—দাঁতে দাঁত চেপে পান্তালিমন বলে।

কিন্তু ওর এ ভয় অমূলক। বাড়িখানা আস্তই দাঁড়িয়ে আছে। তবে প্রায় সবক'টি জানলাই ভাঙা, কব্‌জা থেকে দরজা খসে পড়েছে। বুলেটে ঝাঁঝরা দেয়াল। চারদিকেই একটা অবহেলিত পরিত্যক্ত ভাব। আস্তাবলের একটা কোণা গোলার আঘাতে ধ্বসে পড়েছিল, আরেকটা গোলা দেয়াল ঘেঁষে অগভীর গর্ত সৃষ্টি করেছে। কুয়োর হাঁসকলটা একেবারে দুখণ্ড। যে-যুদ্ধ থেকে পান্তালিমন পালিয়ে এসেছিল সেই যুদ্ধই ওর বাড়িতে ধ্বংসের বীভৎস স্বাক্ষর রেখে চলে গেছে। কিন্তু খপেরস্কের কসাক যারা তাতারস্কে ঘাঁটি করেছিল তারাই বরং আরো বেশী ক্ষতি করেছে খামারবাড়ির। সহজে কাজ সারবার জন্য তারা একটা গোলাঘরের দেয়াল ভেঙেচুরে কড়িবরগাগুলো দিয়ে পরিখার নিচে পাটাতন বানিয়েছিল। পাথরের দেয়াল ফুটো করে মেশিনগান বসাতে গিয়ে পাথর ছড়িয়েছে তারা। ঘোড়াগুলোকে বেধড়ক খাইয়ে বিচালির পাঁজাটা অর্ধেক সাবাড় করেছে। ওয়াট্‌ল্‌-লতার বেড়ায় আগুন লাগিয়েছে। বাইরের রসুইখানার চুল্লিটারও একেবারে দফারফা।

বাড়িঘর উঠোনের অবস্থা দেখে পান্তালিমন তো মাথায় হাত দিয়ে বসল। লোকসান গায়ে না মাখার স্বাভাবিক অভ্যাসটা এবার ওকে ত্যাগ করতে হল। নিকুচি করেছে—এবার আর ওকে বলতে হবে না যে লোকসান কানাকড়িও হয়নি, ভারি বয়ে গেছে ওর! গোলাঘর তো আর সামান্য একটা কোট নয়, সেটা তৈরি করতে বড় কম কিছু ব্যয় করতে হয়নি ওকে।

ইলিনিচ্‌না দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে, মনে হয় না কোনোকালে এটা গোলাঘর ছিল।

পান্তালিমন জোর দিয়ে বলে, গোলাঘর মানে ভালো গোলাঘরই ছিল··। —শেষ করতে পারে না কথাটা সে। হাত নেড়ে ঝাড়াইঘরের ভেতরে ঢোকে।

বুলেট আর গোলার টুকরো লেগে বাড়ির দেয়ালগুলো ঝাঁঝরা, দেখলে মনে হয় পোড়ো বাড়ি, কারুর প্রবেশ সেখানে নিষেধ। ঘরগুলোর মধ্যে বাতাসের শোঁসানি, টেবিলে বেঞ্চে পুরু হয়ে ধুলো জমেছে। আবার সবকিছু গুছিয়ে নিতে বেশ সময় লাগবে।

পরদিনই পান্তালিমন ঘোড়ায় চেপে রওনা হল ভিয়েশেনস্কায়। সেখানে ওর ডাক্তার বন্ধুটিকে ধরে করে একটা সার্টিফিকেট বার করে নিল এই বলে যে পায়ের এক ব্যারামের ফলে কসাক পান্তালিমন প্রকোফিয়েভিচ মেলেখফের হাঁটার ক্ষমতা নেই, তার রীতিমতো চিকিৎসার প্রয়োজন। এই সার্টিফিকেটের জোরে বুড়ো বেঁচে গেল লড়াইয়ে ফিরে যাওয়া থেকে। কাগজটা দিয়েছে সে আতামানের হাতে। এর পর থেকে যখনই ও গাঁয়ের পঞ্চায়েত বাড়িতে যায়, নিজের অবস্থাটা বোঝাবার জন্য একটা লাঠিতে ভর দিয়ে দুটো পা-ই খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে।

সেবার ফিরে আসার পর যতো ঝামেলা আর বিশৃঙ্খলা হল, তাতারস্কের জীবনে কখনো এমন ব্যাপার ঘটেনি। লোকে বাড়ি-বাড়ি ঘুরে নিজেদের জিনিস-পত্র খুঁজে বের করেছে, এমনভাবে লণ্ডভণ্ড করে সব ছড়িয়ে রেখে গিয়েছিল খপেরস্কের কসাকরা। স্তেপের মাঠে, পাহাড়ের ধারে ওরা দল-ছাড়া গোরু-গুলোকে খুঁজে বেড়াতে লাগল। প্রথম যেদিন তাতারস্কের ওপর কামানের গোলা এসে পড়েছিল সেদিনই গাঁয়ের উত্তর দিক থেকে তিন-শো ভেড়া অদৃশ্য হয়ে যায়। রাখালের মতে একটা গোলা ফেটেছিল ঠিক ভেড়ার পালের সামনেই। ভেড়াগুলো তখন ভয়ে মোটা লেজ নাড়তে নাড়তে স্তেপের মাঠের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। গাঁয়ের লোকেরা ফিরে আসার এক হপ্তা বাদে মাইল পঁচিশেক দূরে তাদের সন্ধান পাওয়া গেল। কিন্তু ওদের যখন ফের তাড়িয়ে এনে বাছাই করা হল, দেখা গেল পালের অর্ধেকই নতুন ভেড়া, কানের কাছে কাদের যেন মার্কা দেয়া। আর এদিকে তাতারস্কের প্রায় পঞ্চাশটা ভেড়ার কোন পাত্তা নেই। বোগাতিরিয়েভদের একটা সেলাইকল খুঁজে পাওয়া গেল মেলেখফদের বাগানে। পান্তালিমন তার গোলাঘরের পাতটিনের ছাদখানা আবিষ্কার করল আনিকুশকার ঢেঁকিঘর থেকে। আশেপাশের সব গাঁয়ের এই একই অবস্থা। এর পরেও অনেকদিন অবধি ডনপারের এলাকার গ্রামগুলো থেকে লোকজন এসেছে তাতারস্কে, জিজ্ঞেসাবাদ করে গেছে—একটা চাঁদকপালে লাল গাই দেখেছ নাকি গো, বাঁ শিঙটা একটু ভাঙা?—একটা কচি এঁড়ে বাছুর ঘুরতে ঘুরতে তোমাদের গাঁয়ে এসে পড়েনি তো বাছা?

একটা কেন, অনেকগুলো কচি এঁড়ে বাছুরই কসাকদের ফৌজী রসুইয়ের বড় বড় কড়ায় সেদ্ধ হয়ে রান্না হয়ে গেছে। কিন্তু তবুও আশায় আশায় অনেকে স্তেপের মাঠে ঘুরে বেড়ায় যতক্ষণ না পুরোপুরি বিশ্বাস করতে বাধ্য হয় যে আর তাদের ফিরে পাওয়া যাবে না।

এবার সেপাইগিরি থেকে রেহাই পেয়ে পান্তালিমন বাববাড়ি আর বেড়াটা মেরামত করতে উঠে পড়ে লেগে গেল। ফসল মাড়াইয়ের উঠোনে আকাঁড়া শস্যের গাদা জমে উঠেছে, তারই ভেতর দিয়ে পেটুক ইঁদুরগুলোর আনাগোনা। কিন্তু বুড়ো তবু মাড়াইয়ের কাজে হাত লাগায়নি। খামারটা বেড়াশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে, গোলাঘরের চিহ্নও নেই, খামারের প্রত্যেকটা জিনিসে বিশৃঙ্খলার কলঙ্কচিহ্ন, এর মধ্যে সে কী করে ও-কাজে হাত দেবে? তা ছাড়া, শরতের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছে বিশ্রী আবহাওয়া। মাড়াইয়ের কাজ শুরু করবে এমন সুযোগই নেই।

দুনিয়া আর ইলিনিচনা মিলে বাড়িতে নতুন করে পলেস্তারা লাগায়, চুন-কাম করে। পান্তালিমনকে সাহায্য করে সাময়িকভাবে একটা বেড়া খাড়া করতে এটা ওটা আরো নানান কাজে। কোনো ফিকিরে কাঁচ জোগাড় করে ওরা জানলায় নতুন কাঁচও বসায়। বাইরের রসুইখানাটা, কুয়োটা সব পরিষ্কার করে ফেলে। বুড়ো নিজেই কুয়োর মধ্যে নেমেছিল। ঠাণ্ডা লেগেছিল নিশ্চয়ই। তাই ভর হপ্তা সে ভিজে জামা গায়ে হেঁচে কেশে বেড়িয়েছে। কিন্তু একবার বসে দুবোতল ভদ্‌কা টেনে গরম চুল্লিটার পাশে একবার গড়ান দিয়ে উঠতেই ওর ব্যায়রাম অদৃশ্য হয়ে যায় নিমেষের মধ্যেই।

গ্রিগরের কাছ থেকে এখন অবধি কোনো খবর নেই। একেবারে অক্টোবরের শেষে পান্তালিমন কোনোরকমভাবে জানতে পারল তার খবর। সে ভালোই আছে, ভরোনিয়েরভ প্রদেশের কোথায় যেন ওদের রেজিমেণ্টটা রয়েছে। গ্রিগরের রেজিমেণ্টের এক আহত কসাকের মুখে এ খবর পেয়েছে পান্তালিমন। লোকটা গাঁয়ের ভেতর দিয়েই যাচ্ছিল। বুড়ো দারুণ খুশী হয়ে উঠল খুশীর চোটে ঝাপ্‌ লম্বা থেকে চোলানো আয়ুর্বেদী ভদকার শেষ বোতল-টাও সে সাবাড় করে দিল। তারপর তার মুখে যেন খই ফুটতে লাগল, সারা দিন বকবকানি আর জোয়ান মোরগের মতো বুক ফুলিয়ে চলা। রাস্তায় যাকে দেখে তাকেই বলে

—ওহে খবর শুনেছ? আমাদের গ্রিগর তো ভরোনিয়েরভ দখল করেছে। শুনলাম নাকি তার পদোন্নতিও হয়েছে। আবার একটা ডিভিশন চালাচ্ছে সে, কিংবা কোনো ফৌজী দল। ওর মতো একটা লড়াকু খুঁজে পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয় বাপু! তোমরা তো জানোই।—তারপর বুড়ো শুরু করে একটা গল্প। আনন্দের ভাগ নিতে সকলে গর্ব করুক এমনি একটা তাগিদ অনুভব করে সে।

গ্রামবাসীরা বলে, আপনার ছেলে বাহাদুর বটে।

পান্তালিমন খুশী হয়ে চোখ টেপে।

—আরে বাহাদুর না হয়ে কী ওর উপায় ছিল? কার ছেলে দেখতে

হবে তো! জোয়ান বয়েসে আমিও···গর্ব না করেই বলতে পারি, আমি ওর চেয়ে কম ছিলুম না। নেহাত পা-টাই বাদ সাধল, নইলে এবারও আমাকে টেক্কা দেবার ক্ষমতা ওর হত না। লড়াইয়ে আমাদের মতো বুড়ো লোক আরো থাকলে অ্যাদ্দিনে মস্কো হাতে এসে যেত। কিন্তু এখন একটু বয়ে-সয়ে চলতে হচ্ছে, চাষীগুলোকে তেমন বাগে রাখা যাচ্ছে না।

সেদিন শেষ যে লোকটার সঙ্গে পান্তালিমনের কথাবার্তা হয় সে হল বুড়ো বেসখ্লেব্নভ্। মেলেখফদের বাড়ির কাছ দিয়ে যাচ্ছিল সে। পান্তালিমনের যাই নজরে পড়া অমনি যাবে কোথায়.

—ওহে ফিলিপ আগিয়েভিচ্, থামো থামো। কেমন চলছে? এস না ভেতরে একটু, গপ্পো-সপ্পো করি।

বেসখ্লেব্নভ্ এসে নমস্কার জানায়।

পান্তালিমন বলে, গ্রিশ্কাটা আমার কেমন নাচাচ্ছে সে খবর শুনেছ?

—কেন, কী করল সে আবার?

—একটা ডিভিশনের কর্তা করে দিয়েছে ওকে। এখন তো দণ্ডমুণ্ডের মালিক ও-ই।

—ডিভিশন?

—হ্যাঁ, একটা ডিভিশন।

—ও কথা বোলো না।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আর কার হাতে ভার দেবে, তুমিই বল?

—তাও তো বটে!

পান্তালিমন উৎফুল্ল হয়ে তাকায় সঙ্গীর দিকে, মনের মতো আলোচনা পেয়েই মহা উৎসাহে বলে চলে:

—আমার ছেলেটা সবাইকে তাজ্জব বানিয়ে দিল। সিন্দুক বোঝাই ক্রশ্—কম কথা? আর কতবার যে জখম হয়েছে ত ঠিক-ঠিকানা নেই। অন্য লোক হলে কবে মরে ভূত হয়ে যেত। কিন্তু ওর কাছে ওসব কিছুই নয়, হাঁসের ডানায় জলের মতো। না, ডনের মাটিতে এখনো কসাকের মতো কসাক কিছু রয়েছে বটে।

—তা হয়তো সত্যি, তবে তাদের দ্বারা আমাদের বড় উপকার তো দেখছি না।—বাচাল বলে বুড়ো বেসখ্লেব্নভের দুর্নাম কোনোকালে নেই। সে কী ভাবতে ভাবতে ফের বললে কথাটা।

—ও কথা বলছ কেন? কতোদূর ঠেলে নিয়ে গেছে লালদের তা দেখেছ? একেবারে ভরোনেঝের ওপারে এখন, মস্কোর ওপর গিয়ে পড়ল বলে।

—অনেকটা সময় নিচ্ছে যেন।

—তাড়াহুড়োর কাজ নয় ফিলিপ আগিয়েভিচ্। লড়াইয়ের মধ্যে কোনো কাজ তড়বড় করে হয় না। তাড়াতাড়ির কাজ মানেই জোড়াতালি দেয়া। সবকিছুই ধীরেসুস্থে মানচিত্র দেখে, ছক-মাফিক করতে হবে···সবকিছু বুঝে শুনে। রাশিয়ায় তো চাষী আছে পঙ্গপালের ঝাড়ের মতো, কিন্তু আমাদের মতো কসাক আছে কজন? মাত্র গুটিকত।

—সে সবই ঠিক। কিন্তু মনে হয় আমাদেব সেপাইরা বেশীদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। শীতের আগেই আবার মেহমানরা এসে দেখা দেবে, লোকে তো তাই বলে।

—আজ যদি চট করে ওরা মস্কো দখল করে না নেয় তাহলে লাল সেপাইরা আবার ফিরে আসবে। সেটুকু যা বলেছ ঠিকই।

—কিন্তু মস্কো ওরা নেবে ভেবেছ?

—নিতে হবেই। তবে ভগবানের মর্জি। আমাদের সেপাইদের সে ক্ষমতা আছে নিশ্চয়। কসাকদের শেষ লোকটা অবধি গেছে লড়াইয়ে, পারবে না মনে কর?

—শয়তান জানে। তা তোমার কী হল লড়াইয়ে ইস্তফা?

—লড়াই আমি ভালোই কবি। নেহাত এই ঠ্যাংখানা নিয়ে মুশকিল হল, নইলে দেখিয়ে দিতাম দুশমনকে কীভাবে ঠ্যাঙাতে হয়। আমরা বুড়োরা হলাম শক্ত জাত।

—এই শক্ত জাতের বুড়োরাই নাকি ডনেব ওপারে লালদেব তাড়া খেয়ে এমন ছুট লাগিয়েছিল যে কারুর সঙ্গে এক টুকরো ভেড়াব চামড়াও ছিল না। ওরা একেবারে ন্যাংটো করে ছেড়েছিল। স্তেপের মাঠ নাকি ভেড়ার চামড়ায় হলদে হয়ে গিয়ে ফুল-বাগানের মতো দেখাচ্ছিল একেবারে।

আড়চোখে বেস্‌খ্লেব্‌নভের দিকে তাকিয়ে পান্তালিমন শুকনো গলায় বললে:

—আমার মনে হয় এ সবই মিথ্যা। হয়তো কেউ-কেউ বোঝা হালকা করবার জন্য কাপড়-চোপড় ফেলে দিয়েছিল, কিন্তু এভাবে তিলকে তাল করবার কোনো মানে হয়? ভারী বিরাট ব্যাপার তো · কোটই বল আর ভেড়ার চামড়ার কোর্তাই বল। জীবনের দাম ওর চেয়ে অনেক বেশী···তাই নয় কি, বল? তাছাড়া, কাপড়চোপড় নিয়ে ভালো দৌড়তে পারা সব বুড়োর পক্ষে সম্ভব নয়। এ হতচ্ছাড়া যুদ্ধে বর্জোই কুকুরের মতো লম্বা লম্বা ঠ্যাং চাই। আমার কথাই ধর, অমন পা আমি পাব কোথায় বলো? আর তুমিই বা খামোখা এত উতলা হলে কেন ফিলিপ আগিয়েভিচ? ভগবান মাপ করুন, কিন্তু ওইগুলো তোমার কোন্ কাজে আসবে শুনি?···মানে ওই ভেড়ার চামড়ার কোর্তা? প্রশ্নটা কোর্তার নয়, কোটেরও নয়, কীভাবে দুশমনকে সাবাড় করতে হবে সেইটেই আসল

কথা। তাই নয় কি? যাক্, এবার ওঠ তাহলে; অনেক কথা হয়ে গেল, ইদিকে কাজ পড়ে রয়েছে। বাছুরটা পেয়েছিলে? এখনো খুঁজছ? কোনো পাত্তা পেলে না? আমার মনে হয় খপেরস্কের কসাকরা খেয়ে ফেলেছে: গলায় হাড় বিঁধুক বেটাদের! তবে যুদ্ধ নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না: আমাদের সেপাইরা ওবেটা চাষীদের ঠাণ্ডা করে দেবে।—মহা মাতব্বরের মতো ভঙ্গী করে বুড়ো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলল সিঁড়ির দিকে।

কিন্তু "চাষীদের ঠাণ্ডা করা" তেমন সোজা মনে হল না। কসাকদের শেষ অভিযানটা বিনা লোকসানে সম্ভব হয়নি। ঘণ্টাখানেক বাদেই পান্তালিমনের মেজাজ খারাপ হয়ে গেল দুঃসংবাদ শুনে। কুয়োর একটা পাট বসাতে বসাতে ওর কানে এল একজন স্ত্রীলোক কারুর মৃত্যুতে কেঁদে কেঁদে বিলাপ করছে। আওয়াজটা ক্রমে কাছে এল। পান্তালিমন দুনিয়াকে পাঠাল ব্যাপারটা দেখতে।

—যা তো দৌড়ে দেখে আয় কে মরল।

দুনিয়া খানিক বাদেই খবর নিয়ে ফেরে। ফিলোনব স্ক্ ওয়াড্রন থেকে তিনজন নিহত কসাককে আনা হয়েছে—আনিকুশ্কা, ক্রিস্তোনিয়া, আর গ্রামের শেষ প্রান্তে থাকত এক সতেরো বছর বয়েসের ছোকরা, সে। খবর শুনে হতভম্ব হয়ে পান্তালিমন টুপি খুলে ক্রুশপ্রণাম করে।

ক্রিস্তোনিয়া'র কথা মনে করে সে দুঃখ করে বলে—ঈশ্বর ওদের আত্মাকে অনন্তধামে নিয়ে যান! কী চমৎকার কসাকই না ছিল ক্রিস্তোনিয়া।—পান্তালিমনের মনে পড়ে এই কদিন আগেই সে আর ক্রিস্তোনিয়া একসঙ্গে তাতারস্ক থেকে বেরিয়েছিল সেপাইদের সদর ঘাঁটিতে যাবার জন্য।

আর কাজে মন বসে না পান্তালিমনের। আনিকুশকার বউ এমনভাবে চিৎকার করে কাঁদছে যেন কেউ ওকে খুন করছে। ওর করুণ বিলাপ শুনে বুড়োর মনটা বড়ো দমে যায়। সে কী বুক-ফাটা কান্না! যাতে আর না শুনতে হয় পান্তালিমন তাই বাড়ির মধ্যে গিয়ে পেছন থেকে তাড়াতাড়ি দরজা ভেজিয়ে দেয়। বড়ো ঘরে তখন দুনিয়া কাঁদতে কাঁদতে বলছে ইলিনিচ্নাকে:

—আমি আমি দেখলাম মা গো, আনিকুশকার মাথা প্রায় নেই বললেই হয়, একেবারে গুঁড়ো হয়ে গেছে। উঃ, কী ভয়ানক! আর যা বিশ্রী গন্ধ, এক মাইল দূর থেকেও পাওয়া যায়। কেন তাকে বাড়ি নিয়ে এল ভগবান জানেন! কিন্তু ক্রিস্তোনিয়া চিৎ হয়ে গাড়ির মধ্যে পড়ে ছিল, জোব্বা কোটের নিচে ঝুলছিল পা দুখানা। এমন পরিষ্কার সাদা, এমন ফ্যাকাশে সাদা যে দেখলে মনে হয় তাকে সেদ্ধ করা হয়েছে।—খালি ডান

চোখের নিচে একটা ছোট্ট গর্ত, খুবই ছোট্ট, একটা পাই পয়সার মতোও হবে না, আব কানেব পেছনে বক্তেব চাপ জমাট বেঁধে আছে।

পান্তালিমন সজোরে থুথু ফেলে উঠোনে যায়। কুড়ুলটা আর একটা নৌকাব দাঁড় নিযে খোঁডাতে খোঁডাতে চলে যায ডনের দিকে। মিশাৎকা বাব-বাডিব বস্তুইখানাব কাছে খেলা কবছিল। খাবাব সময তাকে ডেকে বুডো বলে·

—ঠাকুবমাকে বলিস আমি নদীব ওপাবে কাঠ কাটতে গিযেছি। শুনতে পেযেছিস বাছা?

* * * *

ডনেব ওপাবে বন। সেখানে এখন শান্ত শ্রীমযী শবৎ আসন পেতেছে। পপ্‌লাবেব শুকনো পাতা ঝবে পডাব খসখস শব্দ। কাঁটাঝোপগুলোকে মনে হয যেন আগুনেব শিখায জডানো স্বল্প পাতাব ফাঁকে ফাঁকে লাল টকটকে ফল ছোট ছোট আগুনেব জিভেব মতো জ্বলজ্বল কবে। পচা ওক-ছালেব তেতো গন্ধ আব সবকিছুকে ছাপিযে সাবা বনেব মধ্যে ছডিযে পডে। ঘন জট-পাকানো বিলবেবী মাটিতে জডাজডি কবে বযেছে, তাদেব লতিযে-ওঠা ডালেব জাল-বুনোনিব নিচে থোকা-থোকা ধোঁযাটে কপোত-নীল পাকা চেরীফল যেন সুকৌশলে লুকিযে আছে বোদেব আডাল পাবাব জন্য। ছাযার জাযগাগুলোয ভব-দুপুব অবধি শুকনো ঘাসের ডগায শিশিব লেগে থাকে, তাবই একেকটা বিন্দু রুপোব মতো ঝিকমিক করে একটা মাকডসাব জালে। শুধু শান্তিভঙ্গ কবে কাঠ-ঠোকবাব একটানা কটকট শব্দ আব চড়ুইযেব কিচিব-মিচিব।

বনের কঠোব রুদ্র সৌন্দর্য পান্তালিমনেব মনে একটা স্থৈর্যেব ভাব আনে। ঝোপের ফাঁক দিযে দিযে নিঃশব্দে পা ফেলে এগোয সে। ঝবা পাতাব ভিজে চাদবে পা ঘষতে ঘষতে সে ভাবে —এই তো জীবন! সেদিনকার জলজ্যান্ত মানুষ, আজ কিনা তাব প্রাণ নেই। এমনই একজন কসাক শেষে মাবা পডল। মনে হয এই তো মাত্র সেদিনকাব কথা, আমাদের বাডি এল, দেখা করল, দারিযাকে জল থেকে তোলাব সময নদীব পাডে দাঁডিয়ে বইল। হাবে ক্রিস্তোনিয়া! তোব কপালেও শেষে জুটল দুশমনেব বুলেট! আব আনিকুশ্‌কা! কী ফুর্তিবাজ মানুষটাই না ছিল! যেমন মদ খেত তেমনি হাসত। আর এখন একেবারে লাশ!—পান্তালিমনেব মনে পড়ে দুনিয়ার বর্ণনা, আর যখন আপনা থেকেই আনিকুশ্‌কাব হাসিভবা জুলফিহীন পেশল মুখটা উজ্জ্বল হযে ভেসে ওঠে ওর চোখেব সামনে, তখন ও কিছুতেই কল্পনাও করতে পাবে না যে আনিকুশকা এখন প্রাণহীন, ওর মাথা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। বেস্‌খ্লেব্‌নভেব সঙ্গে আলাপের কথা মনে

করে ওর আক্ষেপ হয়—গ্রিগরকে নিয়ে অতো গর্ব করে আমি ভগবানের চোখে অপরাধীই হলাম। হয়তো-বা গ্রিগর নিজেই কোথায় এমনিভাবে পড়ে আছে বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে। ঈশ্বর করুন যেন অমন কিছু না হয়। তাহলে আমরা বুড়োরা বাঁচব কী নিয়ে ?

একটা বাদামী বনমোরগ ঝোপের ভেতর থরথর করে উঠতে পান্তালিমন ভড়কে গিয়েছিল। ছোট পাখিটা কীভাবে কাত হয়ে তীব্র গতিতে পালিয়ে গেল সে তা উদাস দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে আবার এগিয়ে চলল। একটা ছোট বুনো ডোবার ধারে অনেকগুলো ঝোপ ওর বেশ মনে ধরেছিল। কাঠ কাটার যোগাড় করতে লাগল ও। কাজ করতে করতে কেবলই চেষ্টা করছে যাতে কিছু না ভাবতে হয়। একটি বছরে মধ্যে এতগুলি প্রিয়জন আর বন্ধুকে মৃত্যু এসে আঘাত করেছে যে সে-কথা মনে পড়লেই ও বিষণ্ণ হয়ে ওঠে, সারা পৃথিবী নিষ্প্রভ হয়ে যেন একটা কালো কুয়াশার আড়ালে ঢাকা পড়ে। মনের বিষাদ ভাবটা কাটাবার জন্য ও জোরে জোরে বলতে থাকে—ওই ঝোপটা এবার কেটে ফেলি! খুব ভালো ডালগুলো, হ্যাঁ! বেড়া যা হবে, চমৎকার!—অনেকক্ষণ কাজ করবার পর ও কোর্তা খুলে কাঠের চিল্‌তের পাঁজার ওপর বসে বুক ভরে নিঃশ্বাসের সঙ্গে ভিজে পাতার ঝাঁঝালো গন্ধ টেনে নেয়। অনেকক্ষণ অবধি তাকিয়ে থাকে নীলাভ কুয়াশায় মিশে-যাওয়া দূর দিগন্তের দিকে, শরতের শেষ সাজে সাজানো সোনালী টোপরে ঘেরা ঝোপঝাড়গুলোর দিকে। খানিক দূরেই দাঁড়িয়ে একটা মেপলের ঝাড়। সে এক অবর্ণনীয় সৌন্দর্য! অনুষ্ণ শরতের রোদে ঝিকমিক করছে, ডগডগে লাল পাতায়-ছাওয়া ডালগুলো ছড়িয়ে পড়েছে কোনো নন্দনবনের পাখির মতো ডানা মেলে—মনে হয় এই বুঝি মাটি ছেড়ে আকাশে উঠবে। পান্তালিমন অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে তারিফ করে তারপর একবার ডোবার দিকে নজর পড়তেই স্বচ্ছ স্থির জলের মধ্যে দেখতে পায় বড় বড় সব মাছের কালো পিঠ জলের ওপরদিকে এতটা দূর উঠে এসেছে যে তাদের পাখনা আর এঁকে বেঁকে চলা নীলচে লাল লেজগুলোও বেশ স্পষ্ট চোখে পড়ে। মাঝে মাঝে ওরা জলপদ্মের সবুজ পাতাগুলোর আড়ালে অদৃশ্য হয়ে ফের সাঁতরে আসছে পরিষ্কার জলে—বেতসের ভিজে ডুবন্ত পাতাগুলোর ওপর লেজের ঝাপটা মেরে। শরতের আগে ডোবাটা প্রায় শুকিয়ে এসেছে, মাছগুলো ধরবার চেষ্টা করলে সহজেই ধরা যায়। এদিক উদিক একটু খুঁজে পান্তালিমন একটা চটের থলি পেল, তলায় ফুটো, পাশের আরেকটা পুকুরের ধারে পড়েছিল। ডোবার কাছে ফিরে এসে পান্তালিমন পাতলুন খুলে শীতে হি-হি করতে-করতে থলি নিয়ে জলের মধ্যে নেমে পড়ল। থলির নিচের দিকটা চেপে ধরল জলের তলায়। তারপর হাত ঢুকিয়ে দিল ভিতরে, একটা শক্তপোক্ত

মাছ যে হাপুসহুপুস করে ঘাই দিচ্ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই ওর। ওর পরিশ্রম সার্থক হল: তিন-তিনটে কাতলা ধরা পড়েছে, একেকটা ওজনে সের চারেক হবে। কিন্তু বেশীক্ষণ মাছ ধরা চলল না। ঠাণ্ডায় ওর পঙ্গু পা-খানা শিটিয়ে উঠছে। তবু বেশ তৃপ্ত হয়ে সে পা দুটো মোছে। তারপর পাতলুন পরে আবার কাঠ কাটতে শুরু করে শরীরটাকে গরম করবার জন্য। মোটের ওপর দিনটা বেশ ভালোই গেল। সবশুদ্ধ প্রায় সের পনেরোর অমন তিনটে মাছ তো যার-তার কপালে জোটে না! মাছ ধরার সময় ওর মনের বিষণ্ণ ভাবটা কেটে গিয়েছিল। আবার ফিরে এসে বাকি মাছ কটা ধরা যাবে এই আশায় ও থলিটাকে সাবধানে লুকিয়ে রাখল। চওড়া সোনালী বড়সড়ো মাছগুলো ডাঙায় ফেলল খুব সতর্কভাবে চারদিক চেয়ে, যাতে কেউ দেখে না ফেলে। তারপর একটা ডালের সঙ্গে মাছগুলো বেঁধে কাঠের বোঝাটা তুলে ও ধীরে সুস্থে পা বাড়ালো নদীর দিকে।

হাসিমুখে ইলিনিচ্‌নাকে তার মাছের ভাগ্যের কথা বলে বুড়ো। কাতলা-মাছের লালচে তামাটে রঙের তারিফ করে ঘুরে ফিরে। কিন্তু ওর উচ্ছ্বাসের ভাগ নেবার মতো মনের অবস্থা ছিল না ইলিনিচ্‌নার। যারা মারা গেছে তাদের দেখতে গিয়েছিল সে। তারপর ফিরে এসেছে চোখে জল নিয়ে, শোকাচ্ছন্ন মনে।

সে জিজ্ঞেস করে, আনিকুশ্‌কাকে দেখতে যাচ্ছ তো?

—না, আমি যাব না। আগে কি কোনোদিন মরা মানুষ দেখিনি নাকি? জীবনে ও আমি বিস্তর দেখেছি।

—তোমার যাওয়া উচিত। অন্য সবাই অদ্ভুত ভাববে। তারা বলবে তুমি ওদের শেষ সম্মানটুকু দাওনি।

—উঃ আমাকে রেহাই দাও, যিশুর দোহাই! সে আমার কিছু ছেলে-পিলের ধর্মবাপ ছিল না যে তাকে শেষ সম্মান দেখাতে হবে।—বুড়ো ক্ষেপে গিয়ে পাল্‌টা জবাব দেয়।

ওদের শেষকৃত্যে সে যায়নি। খুব ভোরে নদী পেরিয়ে ওপারের বনে গিয়েই সারাটি দিন সে কাটিয়ে দিলে। বনে থাকতেই কানে গিয়েছিল গির্জার ঘণ্টার আওয়াজ। একবার ইচ্ছেও হয়েছিল টুপি খুলে ক্রুশপ্রণাম করার। কিন্তু পরে সে ক্ষেপে গেল পুরুতের ওপরে—এতক্ষণ ধরে ঘণ্টা বাজাবার কোনো মানে হয়? একবার বাজিয়ে ব্যস্ সেরে দিলেই হয়, তা নয় পুরো একটি ঘণ্টা ধরে ঢং ঢং করছে। অতো বাজিয়ে কী লাভটা হবে? লোকের মনে কেবল কষ্ট দেয়া আর অযথা মৃত্যুর কথা ভাবানো। আর যেন এই শরৎকালটাও তেমনি, প্রত্যেকটা জিনিসই মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—ঝরা পাতা, নীল আকাশের বুকে কলকণ্ঠ বলাকার উড়ে যাওয়া, আর মাটি লেপটে থাকা নির্জীব ঘাস।

* * * * *

কোনো রকম বেদনাময় অভিজ্ঞতা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবার সব চেষ্টা সত্ত্বেও পান্তালিমনের কপালে এক নতুন আঘাত জুটল দিন কয়েক বাদেই। একদিন খাওয়া-দাওয়ার পর দুনিয়া জানলার বাইরে তাকিয়ে বলে উঠল :

—আরে, ওরা দেখছি আরেকজন মরা সেপাইকে নিয়ে ফিরছে। জিন আঁটা ঘোড়াটাকে গাড়ির পেছনে বেঁধে রেখে কত আস্তে আস্তে আসছে।···গাড়ি চালাচ্ছে একজন, আর জোব্বাকোটের নিচে ঢাকা লাশটা। লোকটা গাড়ি চালাচ্ছে এদিকে পেছন ফিরিয়ে, বুঝতে পারছি না এগাঁয়েরই লোক কিনা···।—দুনিয়া এক দৃষ্টে চেয়ে ছিল, গাল দুটো ওর কাগজের চেয়েও ফ্যাকাশে হয়ে গেল। অসংলগ্নভাবে ফিসফিস্ করে বলে উঠল ও—কিন্তু, এযে···এযে·।—আচম্‌কা একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে এল গলা থেকে—এযে আমাদের গ্রিশ্‌কা, ওকেই আনছে। ও ঘোড়া তো ওরই!—কাঁদতে কাঁদতে সে ছুটল সিঁড়ির দরজার দিকে।

ইলিনিচ্‌না হাত দিয়ে চোখ ঢেকে টেবিলের ধারে বসে রয়েছে। পান্তালিমন কোনোরকমে বেঞ্চি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগোয় অন্ধের মতো [illegible]টা সামনে বাড়িয়ে।

দরজা খোলে প্রোখর জাইকভ। সিঁড়িতে দুনিয়াকে নেমে আসতে দেখে সে নিরুৎসাহ কণ্ঠে বলে :

—এই যে তোমাদের অতিথ এল। আমরা আসবো তা ভাবতে পারনি বোধহয়। তাই না?

হাত মোচড়াতে মোচড়াতে দুনিয়া ভাঙা গলায় ককিয়ে ওঠে, ওরে দাদারে! আমার দাদামণি গো।

দুনিয়ার চোখের জলে ভেজা মুখটার দিকে তাকিয়ে, আর সিঁড়ির ওপর পান্তালিমনকে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রোখরের এতক্ষণে মনে পড়ল :

—না না, ভয় পেয়ো না, ভয়ের কিছু নেই। ও' বেঁচেই আছে। টাইফাস হয়েছে।

পান্তালিমন ক্লান্তভাবে পিঠটা রাখল দরজার চৌকাঠে।

দুনিয়া হেসে কেঁদে চিৎকার করে বললে, বেঁচে আছে! গ্রিশকা বেঁচে আছে! শুনতে পেয়েছ? ওকে অসুস্থ অবস্থায় বাড়িতে নিয়ে এসেছে। যাও মাকে গিয়ে বল। আচ্ছা, তুমি অমন করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

—ভয় পেয়ো না পান্তালিমন প্রকোভিচ্! ওকে জ্যান্ত ফিরিয়ে এনেছি, তবে কেমন আছে সে কথা আর জিজ্ঞেস কোরো না।—উঠোনের

মধ্যে ঘোড়াগুলোকে টেনে আনতে আনতে প্রোখর তাড়াতাড়ি ওদের আশ্বস্ত করে বললে।

পান্তালিমন এলোমেলো কয়েক পা এগিয়ে ধপ্ করে বসে পড়ল সিঁড়ির ওপর। দুনিয়া ঝড়ের মতো ওর পাশ দিয়ে ছুটল বাড়ির ভেতর, মাকে আশ্বস্ত করতে। প্রোখর সিঁড়ির পাশেই ঘোড়াগুলোকে দাঁড় করিয়ে পান্তালিমনের দিকে তাকায়।

—ওখানে বসে রইলে কেন? একটা কিছু আনো, ওকে বাড়ির ভেতর নিয়ে যাই।

বুড়ো কথাটি বলে না, চুপ করে বসে থাকে। চোখে জল। কিন্তু মুখখানা গম্ভীর, একটি পেশীও কাঁপে না সেখানে। দুবার ক্রুশপ্রণাম করতে হাত তুলল ও, দুবারই হাত নামিয়ে নিল, কপাল অবধি তুলতে পারল না বলে। গলার কাছে কী ঠেলে আসে, ঘড়ঘড় করে ওঠে গলাটা।

প্রোখর নরম স্বরে বলে—তুমি যে ভয়ে আধমরা হয়ে গেছ দেখছি।

॥ তিন

মাসখানেকের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠেছে গ্রিগর। অক্টোবরের শেষে প্রথম বিছানা ছাড়ল সে। ঢ্যাঙা কঙ্কালের মতো রোগা, কামরার আশে-পাশে পায়চারি করে বেড়াল খানিক, তারপর দাঁড়ালো জানালার ধারে।

ধবধবে সাদা তুষার পড়ছে মাটির ওপর, খড়-ছাওয়া ছাদের ওপর, পাতলা ঝিরঝিরে হয়ে। পাশের গলিতে স্লেজ-গাড়ির চাকার দাগ দেখতে পাওয়া যায়। বেড়া আর গাছের ওপর একটা নীলচে ছোপ জমেছে, অস্তগামী সূর্যের কিরণ পড়ে সেগুলো চকচক করছে আর রামধনুর রঙ ছড়াচ্ছে।

জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল গ্রিগর অনেকক্ষণ অবধি, কী ভাবতে ভাবতে একবার হাসল খানিক। হাড়-জাগানো হাতে একবার তা দিল গোঁফে। দেখলে মনে হবে এমন সমারোহময় শীত যেন সে আগে কখনো দেখেনি। ওর কাছে সবই যেন অস্বাভাবিক, তাৎপর্য আর স্নিগ্ধতাপূর্ণ মনে হয়। অসুখের পর ওর দৃষ্টি যেন আরও প্রখর হয়েছে, আশেপাশে

ক্রমেই নতুন জিনিস আবিষ্কার করছে ও অনেককালের চেনাজানা জিনিসের মধ্যেও পরিবর্তন লক্ষ্য করতে শুরু করেছে।

গাঁয়ের মধ্যে আর খামারে যা কিছু ঘটেছে অপ্রত্যাশিতভাবে একটা নতুন ধরনের কৌতূহল জাগছে ওর মনে সেগুলো সম্পর্কে। ওর জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে যেন একটা নতুন গোপন তাৎপর্য জেগে উঠেছে, সবকিছুই আকর্ষণ করছে ওর মনোযোগ। ওর মুখের ওপর একটা সরল শিশুসুলভ হাসির আভাস—সেটা ওর কঠোর মুখাকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত, ওর পশু-সুলভ মুখভাব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, ওর ঠোঁটের কোণায় যে নিষ্ঠুর ভাঁজগুলো রয়েছে তাকে কোমল করে তুলছে তা। ছেলেবেলা থেকে চেনা একেকটা গৃহ-ব্যবহার্য জিনিস মাঝে-মাঝে তুলে নিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে ভুরু কুঁচকে, যেন কোন্ এক সুদূর অচেনা ভিন্‌দেশ থেকে এসে এই প্রথম সবকিছু দেখছে সে। ইলিনিচ্‌না একদিন দারুণ অবাক হয়ে গেল ওকে একটা সুতো-কাটা তকলি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পরীক্ষা করতে দেখে। যে মুহূর্তে ইলিনিচ্‌না ঘরে ঢুকছে সঙ্গে সঙ্গে একটু বোকার মতো মুখ করে সেটা ফেলে সরে দাঁড়ায়।

দুনিয়া ওর রোগা হাড়জিরজিরে চেহারা দেখে হাসি সামলাতে পারে না। শুধু অন্তর্বাসটুকু পরে এক হাতে খসে-পড়া পাতলুনটা উঁচু করে ধরে কুঁজো হয়ে এলোমেলো শুঁটকো পা ফেলে হাঁটে। বসতে গেলে ওর কেবলই ভয় এই বুঝি পড়ে যাবে, হাত দিয়ে কিছু একটা ধরে। কালো চুলগুলো অসুখের সময় বেড়ে গিয়েছিল, এখন পড়ে যাচ্ছে। কপালের ওপর কোঁকড়া ঘনঘন চুল এখন পাতলা হয়ে গেছে।

দুনিয়াকে দিয়ে মাথাটা কামিয়ে নিচ্ছিল ও। বোনের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই দুনিয়ার হাতের ক্ষুর মেঝেতে খসে পড়ে গেল। দুহাতে পেট চেপে ধরে বিছানায় পড়ে তখন তার সে কী হাসি। দম প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড়।

যতক্ষণ না ও প্রাণভরে হেসে নেয় ততক্ষণ ধৈর্য ধরে থাকে গ্রিগর। কিন্তু শেষ অবধি আর চুপ করে থাকতে পারে না ও, কাঁপা কাঁপা দুর্বল সরু গলায় বলে :

—দেখিস, তুই কিন্তু বড়ো যাচ্ছেতাই করছিস! পরে তোর লজ্জা হবে। তুই তো এখন সোমত্ত মেয়ে।—ওর গলার স্বরে একটা আহত ভাব ফুটে ওঠে।

—ওঃ, দাদা! দাদামণি! আমি বরং পালাই ·· আর পারি না! উঃ, কী রকম যে দেখাচ্ছে তোমাকে? ঠিক যেন·· ···হি-হি ·· হুবহু কাগতাড়ুয়ার মতো!—হাসির দমকের ফাঁকে ফাঁকে দু-একটা করে কথা বেরুচ্ছে ওর মুখ থেকে।

—টাইফাসের পরে তোর চেহারাটা কেমন হত দেখতে ইচ্ছে করে আমার! অ্যাই! ক্ষুরটা তুলে নে!

ইলিনিচ্‌না গ্রিগরের পক্ষ নেয়। বিরক্ত হয়ে বলে:

—এত হি-হি করে হাসছিস কেন রে? তুই একটি গাধা!

চোখ মুছে দুনিয়া বলে, কিন্তু ওর চেহারাটি তুমি একবার দেখ মা। মাথাটা ফুলো-ফুলো, ঠিক তরমুজের মতো গোল আর তেমনি কাল্‌চে।……উঃ পারি না!

গ্রিগর বলে, আয়নাটা দাও তো।

ছোট্ট টুকরো আয়নার মধ্যে নিজের চেহারা দেখে নিজেই অনেকক্ষণ ধরে নিঃশব্দে হাসল।

ইলিনিচ্‌না মুখ ভার করে বললে, মাথাটা কেন কামাতে গেলি বাছা? তার চেয়ে বরং যেমন ছিল তেমনি থাকলেই ভালো হত।

—তার মানে একেবারে টাক পড়ে গেলেই ভালো হত?

—এখন যা আছে, তাতেই বা কী ছিরি……

গ্রিগর চটে গিয়ে বলল, ওঃ তোমাকে নিয়ে পারা যাবে না।—বুরুশ থেকে সাবানের ফেনাটা ঝাঁকুনি দিয়ে ফেলবার চেষ্টা করল গ্রিগর।

* *

বাড়ির বাইরে যাবার মতো যথেষ্ট জোর শরীরে পাচ্ছে না গ্রিগর। তাই বেশির ভাগ সময়টাই কাটাচ্ছে ছেলেপিলেদের সঙ্গে। সবকিছু নিয়ে ওদের সঙ্গে কথা চলে ওর, কিন্তু নাতালিয়ার নামটি করে না। তবু, একদিন পলিউশ্‌কা ওর কোলের কাছে এসে জিজ্ঞেস করে:

—বাপি, মা কি আমাদের কাছে ফিরে আসবে না?

—না রে সোনা, ওখান থেকে কেউ ফিরে আসে না।

—কোন্‌খান থেকে? কবর থেকে।

—মরে গেলে কেউ আর ফিরে আসে না।

—কিন্তু মা কি একেবারেই মরে গেছে?

—কেন, মরে তো গেছেই! নিশ্চয়ই মরে গেছে।

—কিন্তু আমি ভেবেছিলাম মার হয়তো খুব ইচ্ছে হবে আমাদের দেখতে। তখন ফিরে আসবে। ····প্রায় শোনা যায় না এমনিভাবে ফিস্‌ফিস করে বলে পলিউশ্‌কা।

শুকনো খস্‌খসে গলায় গ্রিগর বলে, মার কথা আর ভাবিস্‌ না রে বাছা। না ভাবাই ভালো

—না ভেবে কি পারা যায়? কিন্তু ওরা তোমাকে দেখতে আসে না কখনো? একটুখানিকের জন্যও না? কক্ষনো না?

—না। এবার যা তো, পালা, মিশাৎকার সঙ্গে খেল্ গে। —গ্রিগর সরে যায়। অসুখের ফলে ওর মনের জোর কমে গেছে। চোখে ওর জল এসে পড়ছিল। ছেলেপিলেদের কাছে সেটা ঢাকবার জন্য ও অনেকক্ষণ জানলার কাছে দাঁড়িয়ে রইল জানলার কাঁচের ওপর গালটা চেপে রেখে।

ছেলেপিলেদের সঙ্গে লড়াইয়ের গল্প করতে ওর ভালো লাগে না। কিন্তু মিশাৎকা যুদ্ধ হলে আর কিছু চায় না। বাপকে প্রায়ই নানা প্রশ্নে বিব্রত করে, সেপাইরা লড়াই করে কী ভাবে, লালফৌজের লোকরা দেখতে কেমন, ওদের কী দিয়ে মারা হয়, কেন মারা হয়? গ্রিগরের মুখ অন্ধকার হয়ে ওঠে। বিরক্ত হয়ে জবাব দেয়:

—আবার সেই প্যান্‌প্যানানি শুরু হয়েছে? কেন এই লড়াই নিয়ে এত মাথা ঘামাস? তার চেয়ে বরং গরম কাল এলে কী ভাবে বড়শি দিয়ে মাছ ধরবি সেই কথা বল্। তোকে একটা বড়শি বানিয়ে দেব? একবার বাইরের উঠোনে বেরুতে পারলেই তোকে একটা চমৎকার ঘোড়ার চুলের ছিপ-সুতো বানিয়ে দেব দেখিস্।

মিশাৎকা যখনই যুদ্ধের কথা বলে গ্রিগর মনে মনে লজ্জা পায় যেন। ছেলেটার সরল, ঘোরপ্যাচহীন প্রশ্নের কোনো জবাব ওর কাছে নেই। কে জানে কেন? হয়তো বা এসব প্রশ্নের জবাব ও নিজেই খুঁজে পায়নি। কিন্তু মিশাৎকাকে এড়ানো সোজা ব্যাপার নয়: মনে হল খুব মন দিয়ে সে বাপের মতলবের কথা শুনছে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার প্রশ্ন করে বসল:

—বাপি, যুদ্ধে তুমি কাউকে মেরেছ?

—চুপ কর তো, মেলা দিগ্ করিসনি।

—কিন্তু মারতে খুব ভয়ানক লাগে না? ওরা মরলে গা থেকে রক্ত বেরোয়? খুব রক্ত? মুর্গি ভেড়ার চেয়েও বেশী?

—বললাম না এসব কথা আর নয়!

মিশাৎকা এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে চিন্তিতভাবে বলে:

—দাদুকে সেদিন একটা ভেড়া মারতে দেখেছিলাম। আমি ভয় পাইনি। অল্প একটু পেয়েছিলাম, তবে খুব বেশী নয়।

ইলিনিচ্না রেগে বলে, ওকে তাড়িয়ে দে। বড়ো হলে ও হবে আরেক ডাকাত। সত্যিকারের শয়তান! মুখে খালি যুদ্ধের কথা। এ ছাড়া আর কিছু ও জানে না। তোর কি এসব নিয়ে আলাপ করা ঠিক·· ···এই হতভাগা লড়াই নিয়ে? এখানে আয়! এই নে পিঠে, থাক কিছুক্ষণ এই নিয়ে চুপ করে।

কিন্তু যুদ্ধের অস্তিত্বকে ওরা কিছুতে ভুলতে পারে না। যুদ্ধফেরত কসাকরা মাঝে মাঝে আসে গ্রিগরের সঙ্গে দেখা করতে। বলে বুদিয়ানির ঘোড়সওয়ার ফৌজ কী ভাবে সেনাপতি শ্কুরো আর মামন্তভের সেপাইদের সাবাড় করেছে,

অন্যদের কাছে যুদ্ধগুলো কী ভাবে ব্যর্থ হয়েছে, সমস্ত রণাঙ্গনে শুরু হয়েছে পশ্চাদপসরণ। গ্রিবানভ্স্কা আর কারদাইলাতে আরো দুজন তাতারস্ক কসাক মারা পড়েছে। আহত অবস্থায় গিরাসিমর্ভ আখভাৎকিনকে ঘরে ফিরিয়ে আনা হয়েছে আর দ্মিত্রি গলোশ্চেকভ মারা গেছে টাইফাসে। দুটো যুদ্ধে গাঁয়ের যত কসাক মারা গেছে সকলের কথা মনে পড়ে গ্রিগরের। ওর মনে হয় তাতারস্কে বুঝি একটা ঘরও বাকি নেই যেখানে কেউ না কেউ মৃত।

জেলা আতামানের কাছ থেকে গ্রামের মোড়লের কাছে এই মর্মে একটা হুকুম এসেছিল যেন স্কোয়াড্রন সেনাপতি মেলেখফকে খবর দেয়া হয় তাকে আবার ভালো করে পরীক্ষার জন্য এখুনি একটা চিকিৎসা-কমিশনের সামনে হাজির হতে হবে। মোড়ল যখন এ খবর নিয়ে এলো তখনও গ্রিগরের ঘর ছেড়ে বেরুবার মতো ক্ষমতা হয়নি।

গ্রিগর চটে গিয়ে বললে, ওদের লিখে জানিয়ে দাও হাঁটবার মতো জোর পেলে আমি নিজের গরজেই সেখানে যাব। আর মনে করিয়ে দিতে হবে না।

* * *

রণাঙ্গণ ক্রমেই সরে আসছে ডনের দিকে। গ্রামে নতুন করে রব উঠেছে পশ্চাদপসরণের। কদিন বাদে সমস্ত বয়স্ক কসাককে পশ্চাদপসরণে যোগ দেবার জন্য হুকুম জানিয়ে আঞ্চলিক আতামানের এক হুকুমনামা বাজারের চত্বরে পড়িয়ে শোনানো হল।

চত্বর থেকে বাড়ি ফিরে পান্তালিমন গ্রিগরকে হুকুমের কথা জানাল। বলল : এবার কী করা ?

গ্রিগর ঘাড় ঝাঁকুনি দেয়।

—আমরা কী করতে পারি ? আমাদের পেছু হটতেই হবে। হুকুম না পেলেও সবাই যেত।

—আমি শুধু তোমার আমার কথাই বলছি : দুজনে একসঙ্গে যাব, না কি ?

—এক সঙ্গে যাওয়া চলবে না। দুয়েকদিনের মধ্যে আমি ঘোড়ায় চেপে ভিয়েশেনস্কা যাচ্ছি। গিয়ে শুনব কোন ফৌজ সেখান দিয়ে যাবে। তার পর একটা রেজিমেন্টের সঙ্গে যোগ দেব। কিন্তু তোমার কাজ তো উদ্বাস্তু হয়ে পালিয়ে যাওয়া। নাকি কোনো জঙ্গী ফৌজে ঢুকতে চাও ?

পান্তালিমন ভড়কে গিয়ে বললে, রাম কহো! তাহলে সেই বুড়ো গপ্পে বেস্খ্লেব্নফ্টার সঙ্গেই ঘোড়ায় চড়ে যাই। সেদিন আমাকে ডেকেছিল কোম্পানিতে ফিরে যাবার জন্য একসঙ্গে। লোকটা শান্তিপ্রিয়। একটা ভালো ঘোড়াও আছে তার। তাহলে একজোড়া ঘোড়া সাজিয়ে নিয়ে

চলব দুজনে। আমার ঘুড়ীটার তো গায়ে মাংস বলতে কিছু নেই। দৌড় করিয়ে করিয়ে তার এখন মরে যাবার দাখিল। এমন পা ছোঁড়ে যে ভয়ানক হয়ে ওঠে একেক সময়।

গ্রিগর নিজে থেকেই সায় দেয় তার কথায়—বেশ, তাহলে ওর সঙ্গেই যাও। কিন্তু তুমি কীভাবে যাবে সেইটে এবার ভাব। হয়তো আমাকেও একই রাস্তায় যেতে হতে পারে কিনা।

পকেট থেকে দক্ষিণ রুশিয়ার একটা মানচিত্র বের করে সে বাপকে বোঝাতে লাগল কোন্ কোন্ গাঁয়ের ভেতর দিয়ে তাকে যেতে হবে। তারপর সে নামগুলো এক এক করে লিখে যেতে লাগল কাগজে। কিন্তু বুড়ো খুব সশ্রদ্ধভাবে মানচিত্রটা খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে মন্তব্য করলে :

—দাঁড়াও; দাড়াও। লিখো না। তুমি হয়তো আমার চেয়েও ভালো বোঝ এগুলো। ম্যাপের ব্যাপার ছেলেখেলা নয়। এতে ধাপ্পা নেই। সোজা পথ দেখায়। কিন্তু আমার পক্ষে সুবিধে না হলে সে রাস্তা ধরে চলব কেমন করে? তুমি বলছ প্রথমে আমায় কারগিনের ভেতর দিয়ে যেতে হবে। ওদিক দিয়ে হয়তো সোজাই হত, কিন্তু আমাকে যেতে হবে ঘুর পথে।

—কিন্তু কেন?

—কারণ আমার এক ভাই আছে লাতিশেভে। সেখানে খেতে পারব, ঘোড়া পাব। কিন্তু অচেনা অজানা লোকের সঙ্গে থাকলে খাইখরচাটা আমার পকেট থেকে যাবে। তুমি বলছ ম্যাপ অনুসারে আমায় আস্তাখভ গাঁয়ের ভেতর দিয়ে যেতে হবে। ও পথটা আরো সোজা জানি। কিন্তু যেতে হবে মালাখফের ভেতর দিয়ে। সেখানেও আমার দূর-সম্পর্কের আত্মীয় অবিশ্যি আছে। নিজের ঘোড়ার রসদ বাঁচিয়ে অন্যদেরটা ব্যবহার করতে পারব। খড়ের গাদা তো আর সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবে না, তাছাড়া বিদেশ বিভুঁয়ে খড় যে শুধু ধারই পাবে না তা নয়, কিনতেও " রবে না।

গ্রিগর গলায় বিষ ঢেলে বললে, কেন, ডনের ওপারে তোমার আত্মীয়-স্বজন নেই?

—হ্যাঁ, তা আছে।

—তাহলে ওদিকেও যাবে নিশ্চয়?

পান্তালিমন আগুন হয়ে ওঠে, ওসব শয়তানি ছাড়ান দাও তো। কাজের কথা হচ্ছে, তাই বল। বাজে বাজে কথা কেন। ঠাট্টা তামাশারই সময় বটে! আমাদের পরিবারে একজন চালাক লোক জুটেছেন দেখছি।

—দুনিয়ার যত আত্মীয়স্বজন, তাদের সঙ্গে দেখা করতে হবে এমন কথা নেই। পেছু হটার ব্যাপার, আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করে বেড়াবার কথা নয়। ফুর্তির সময় তো নয় এখন।

—কোন্ রাস্তায় যাব সে বুদ্ধি তোমায় দিতে হবে না, তোমাকে ছাড়াই চলতে পারব।

—তা যদি পার তো যাও না যেদিকে খুশি।

—তোমার মর্জিমতো চলবার চেষ্টা করে আমার লাভ নেই। সোজা ওড়ে শুধু চড়ুইপাখি—জান তো সেই কথাটি? আমি হয়তো এমন সব রাস্তায় যাবো যা শয়তানও জানে না, এমন সব জায়গা যেখানে শীতকালে রাস্তাই পাওয়া যায় না! বাজে কথা তো খুব বলছ, এসব কথনো ভেবেছিলে? আবার ডিভিশনের খবরদারি কর, হুঁ!

গ্রিগর আর বুড়ো অনেকক্ষণ ধরে ঝগড়াঝাঁটি করে। কিন্তু খানিক চিন্তা করার পর গ্রিগর মনে মনে স্বীকার করে বুড়ো যা বলেছে তার মধ্যে কিছুটা সারবস্তু আছে হয়তো। তখন মিটমাটের সুরে বলে:

—রাগ কোরো না বাবা। আমি তোমায় আমার রাস্তায় যেতে বলছি না। তোমার যেমন খুশি চালাও। আমি তোমাকে ডানিয়েৎসেব ওপারে খুঁজে বের করব।

পান্তালিমন খুশী হয়ে বলে—একথা তোমাব অনেক আগেই বলা উচিত ছিল। নানা ধরনের মতামত দিচ্ছ, রাস্তা বাতলাচ্ছ, কিন্তু যেটা তোমার মাথায় ঢোকে না তাহল মতলব ভাঁজা এক জিনিস আব ঘোড়াদের রসদ সব জায়গায় জুটবে কিনা সে কথা ভাবা হল আরেক জিনিস।

গ্রিগরের অসুস্থ অবস্থাব মধ্যেই বুড়ো ধীরেসুস্থে তৈবি হচ্ছিল বিদায় নেবার জন্য: খুব যত্ন করে ঘুড়ীটাকে খাইয়েছে। স্লেজখানা মেরামত করেছে, ওর জন্য নতুন ফেল্টের জুতোর অর্ডার দিয়েছে, নিজে চামড়া দিয়ে তার আস্তর লাগিয়েছে যাতে কাদা রাস্তায় ভিজে না যায়, আর থলি বোঝাই করেছে বাছাই করা ওট দিয়ে। পশ্চাদপসরণ করবে, এ ব্যাপারটাতেও সে প্রস্তুত হয়েছে বাড়িব সত্যিকারের কর্তার মতো। রাস্তায় যা কিছু জিনিসের দরকার হতে পারে সব সে বুদ্ধি বিবেচনা করে ঠিক-ঠাক করেছে। কুড়োল, দা, রাঁদা, বাটালি, সুতো। জুতোর বাড়তি শুকতলা, পেরেক, হাতুড়ি, ফিতে, জুটো দড়ি, এক পিপে আলকাতরা থেকে আরম্ভ করে ঘোড়ার নাল, গজাল সব সে সাবধানে তেরপলে বেঁধে নিয়েছে। যেকোনো সময় স্লেজে ওঠানো যাবে। সঙ্গে একটা দাঁড়িপাল্লা নেবার কথাও ভেবেছিল সে। যখন ইলিনিচ্না জিজ্ঞেস করল দাঁড়িপাল্লা দিয়ে কী হবে তখন সে ধমক দিয়ে বললে:

—তুমি তো জান গিন্নি, যত তুমি চেষ্টা করবে ততই গাধা হতে থাকবে। এরকম সহজ প্রশ্নের জবাব তুমি নিজে দিতে পার না মনে কর? পালাবার সময় পথে ওজন-দরে বিচালি ঘাস কিনতে হবে না? ওরা কি গজকাঠি দিয়ে বিচালি মাপে?

ইলিনিচ্না অবাক্ হয়ে বলে, কিন্তু ওরা তাদের নিজেদের দাঁড়িপাল্লা দিয়ে ওজন করবে না ?

পান্তালিমন ক্ষেপে ওঠে, ওরা কেমন পাল্লা দেবে সে তুমি কী করে জানবে ? হয়তো ওদের পাল্লার সবই ফাঁকি—আমাদের মতো লোকদের ওজনে ঠকাবার জন্য ? এই হল ব্যাপার ! জানি তো সব কেমন জাতের লোক ! তিবিশ সের মাল কেনো, আর দাম দাও এক মণের। বারে-বারে যদি আমাদের এমনি ক্ষতি হতে থাকে তো নিজেদের দাঁড়িপাল্লা নিয়ে যাওয়াই ভালো। তাতে করে এমন কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না ! এখানে তুমি বিনি দাঁড়িপাল্লায় বেশ চালাতে পারবে। ও দিয়ে কী কাজ তোমার এখানে ? যদি ফৌজ-টৌজ আসে, তারা ওজন না করেই বিচালি নেবে।… ওদের যা মাথাব্যথা সে হল গাড়ির যোগাড় করা। শিঙভাঙা শয়তানগুলোকে ঢের দেখেছি আমি , ভালোই জানা আছে ওদের !

প্রথমে একবার স্লেজের সঙ্গে একটা ছোট গাড়িও জুড়ে নেবার কথা ভেবেছিল সে, যাতে বসন্তকালে আবার একটা কিনতে গিয়ে পয়সা খরচা না হয়। কিন্তু পরে সুবুদ্ধির উদয় হতে এই বাজে মতলব ছাড়তে হল।

গ্রিগরিও তৈরি হতে লাগল। মসার পিস্তলটা আর রাইফেলখানা সাফ করে সে চিরদিনের বিশ্বস্ত চওড়া তলোয়ারটাকে ঠিক-ঠাক করে রাখল। সুস্থ হয়ে ওঠার এক হপ্তা বাদে ঘোড়াটাকে দেখতে গেল সে। চকচকে দেহখানার দিকে নজর বুলিয়ে সে খুশি হল এই ভেবে যে বুড়ো শুধু নিজের ঘুড়ীটারই পেট মোটা করেনি। কষ্টেসৃষ্টে ঘোড়াটার পিঠে চেপে বেশ ভালো মতো দাবড়ে নিল খানিক। তারপর বাড়ি ফিরে দেখল—কিংবা যেন মনে হল দেখতে পেল—আস্তাখফদের বাড়ির জানলায় কে যেন একটা ছোট সাদা রুমাল নাড়ছে ওকে উদ্দেশ করে।

পঞ্চায়েতে বসে তাতারস্কের সমস্ত পুরুষ বাসিন্দা মিলে ঠিক করল সবাই একদিনে গাঁ ছেড়ে চলে যাবে। কসাকদের পথের জন্য যত রকমের খাবার তৈরি করল মেয়েরা দুদিন ধরে। গ্রাম ছাড়ার দিন ঠিক হয়েছে ১২ই ডিসেম্বর। আগের দিন সন্ধ্যায় পান্তালিমন স্লেজগাড়িতে বিচালি আর ওট চাপিয়েছিল। পরদিন ভোর হতেই বিশাল ভেড়ার চামড়ার ওভার কোটখানা গায়ে চাপালো ও, শক্ত করে বেল্ট বেঁধে চামড়ার দস্তানা-জোড়া বেল্টের ফাঁকে ঢুকিয়ে নিল। তারপর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা নিবেদন করে বিদায় নিল পরিবারের সকলের কাছে।

একটু বাদেই গ্রাম ছেড়ে এক প্রকাণ্ড মালগাড়ির সারি রওনা হল পাহাড়ের দিকে। মেয়েরা গরুচরা মাঠে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাতের রুমাল নাড়তে লাগল বিদায়ী পুরুষ কসাকদের

উদ্দেশে। কিন্তু তখন স্তেপের প্রান্তরে একটা হালকা হাওয়া দিতে শুরু করেছে।

তুষারমথিত ধূমায়মান কুয়াশার ভেতর দিয়ে না দেখা যায় ধীরে-ধীরে পাহাড় বেয়ে ওঠা গাড়িগুলোকে, না দেখা যায় ওদের পাশে লম্বা পায়ে হেঁটে চলা কসাকদের।

ভিয়েশেন্স্কা রওনা দেওয়ার আগে আকসিনিয়ার সঙ্গে গ্রিগরের দেখা হয়েছিল। সন্ধ্যায় যখন গাঁয়েব আলোগুলো জ্বলে উঠেছে সেই সময় গ্রিগর এল ওর কাছে। সুতো কাটছিল আকসিনিয়া। ওব পাশে বসে আনিকুশকার বিধবা বউটি মোজা বুনছিল আর গল্পগাছা করছিল। ঘরে অন্য লোককে দেখে গ্রিগব সংক্ষেপে বললে:

—এক মিনিটেব জন্য বাইরে এসো। তোমাব সঙ্গে কথা আছে।

দবজাব কাছে এসে ওর কাঁধে হাত বেখে গ্রিগর জিজ্ঞেস করলে:

—আমাব সঙ্গে আসবে তুমি?

অনেকক্ষণ চুপ কবে বইল আকসিনিয়া, কী জবাব দেবে তাই ভাবছে। তারপর ধীরে ধীরে বললে:

—খামারেব কী হবে তাহলে? ঘোড়াটা?

—কারুর জিম্মায় সব রেখে চলো। আমাকে তো যেতেই হচ্ছে।

—কিন্তু কবে?

—কাল গাড়ি নিয়ে চলে আসব।

অন্ধকারে একটু হেসে আকসিনিয়া বললে:

—মনে আছে অনেকদিন আগে তোমায় বলেছিলাম তোমাকে নিয়ে আমি পৃথিবীব শেষপ্রান্তেও যেতে পারি? আমি এখনো ঠিক তাই আছি। তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা সত্য। আমি যাবো। একবারও ফিরে তাকাব না। কখন তোমাব জন্য অপেক্ষা কবব বলো?

—সন্ধ্যায়। বেশী কিছু এনো না সঙ্গে। কাপড় আর খাবার যা না হলেই নয়, ব্যস্। যাক, এখনকার মতো বিদায়।

—এসো। কিন্তু তুমি ভেতবে আসবে নাকি একবার? ও এখুনি চলে যাবে। কতদিন যে দেখি না তোমায়, এক যুগ হয়ে গেল। আমার আদরের গ্রিশা! আমি তো ভেবেছিলাম বুঝি তুমি···কিন্তু না, যাক ওকথা!

—না, এখন আর আসছি না। এখন ভিয়েশেন্স্কায় যেতে হবে। বিদায়। কাল আমার জন্য অপেক্ষা কোবো।

গ্রিগর বেরিয়ে পাল্লা ফটক খুলে চলে গেল। কিন্তু আকসিনিয়া তখনো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ি-দরজায়, হাসিমুখে। গরম-হয়ে-ওঠা গাল দুটো দুহাতে ঘষতে লাগল সে।

* * * *

ভিয়েশেন্স্কায় সরকারী আঞ্চলিক দপ্তর আর রসদ-সরবরাহের গুদামগুলো খালি করার কাজ শুরু হয়ে গেছে এর মধ্যেই। আঞ্চলিক আতামানের দপ্তরে এসে গ্রিগর রণাঙ্গনের পরিস্থিতির কথা জিজ্ঞেস করল। সহকারী সেনানী একজন তরুণ এনসাইন। সে বললে :

—আলেক্জান্দ্রভ্স্ক্ স্টেশনের কাছে এসে পড়েছে লালফৌজ। জানি না ভিয়েশেন্স্কার ভেতর দিয়ে কোন্ ফৌজ যাবে, কিংবা আদৌ যাবে কি না। নিজেই দেখতে পাচ্ছেন, কেউ কিছু জানে না, সবাই তাড়াতাড়ি সরে পড়ার যোগাড় করছে।…তার চেয়ে আমি আপনাকে ভালো কথা বলি, রেজিমেন্টের খোঁজ আর করবেন না। মিলেরোভোতে চলে যান, সেখানেই জানতে পারবেন রেজিমেন্ট এখন কোথায় আছে। মোটের ওপর এখন আপনার রেজিমেন্ট রেললাইন ধরে এগুচ্ছে। শত্রুকে কি ডনে ঠেকানো যাবে? না, তা মনে হয় না। বিনা যুদ্ধেই ভিয়েশেন্স্কা ছেড়ে দিতে হবে। কোনো সন্দেহ নেই।

গ্রিগর অনেক রাতে বাড়ি ফিরে এল। ইলিনিচ্না রাতের খাবার তৈরি করতে করতে বললে :

—তোমার প্রোখর তো এসেছে। তুমি চলে যাবার ঘণ্টাখানেক বাদে ও এসেছিল। বলল ফিরে আসবে। কিন্তু তারপর তো আর পাত্তাই নেই।

খবর শুনে খুশী হয়ে গ্রিগর তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে ফেলে, তারপর যায় প্রোখরকে দেখতে। ওর আরদালি শুকনো হাসি হেসে ওকে স্বাগত জানায়। বলে :

—আমি ভাবছিলাম তুমি বুঝি ভিয়েশেনস্কা থেকে সরাসরিই রওনা দেবে।

গ্রিগর হাসতে হাসতে ওর বিশ্বাসী আরদালিটির কাঁধ চাপড়ে বলে, তুমি আবার কোত্থেকে এলে ভূত?

—পরিষ্কার কথা : লড়াই থেকে।

—লাফাতে লাফাতে এলে?

—কেন, ওকথা কেন মনে হল তোমার? আমার মতো একজন বেপরোয়া সেপাই পালাবে? আইন ফাঁকি দিইনি আমি। তোমাকে ছেড়ে দক্ষিণ দেশে আমি যেতে চাইনি। একসঙ্গে পাপ করেছি আমরা। একসঙ্গেই যাব শেষ বিচারের দিন অবধি। আমাদের কথা এখন ধর্তব্যের মধ্যেই নয় তা জানো?

—জানি। তোমায় কীভাবে ওরা রেজিমেন্ট থেকে খালাস করে দিল সেই কথাই বলো।

—সে এক লম্বা গল্প। পরে বলব'খন—এড়াবার মতো করে প্রোখর বলে এবং আরো গম্ভীর হয়ে যায়।

—রেজিমেণ্ট কোথায় ?

—শয়তানই জানে রেজিমেণ্ট এখন কোথায়।

—তাহলে কতদিন রয়েছ ফৌজ ছেড়ে ?

—প্রায় দু'হপ্তা আগে ছেড়েছি।

—এতদিন তাহলে কোথায় ছিলে ?

—উঃ, কী ছিনে জোঁক রে বাবা তুমি!—বিরক্ত হয়ে প্রোখর বলে আর আড়চোখে তাকায় গিন্নির দিকে—খালি কী, কেন, কোথায় আর ধানাইপানাই ···যেখানেই আগে থাকি না কেন এখন সেখানে নেই। বলেছিলাম তোমাকে বলব, তার মানে বলবই। অ্যাই গিন্নি! মদ-টদ আছে কিছু ? কমাণ্ডিং অফিসারের সঙ্গে দেখা হলে গলাটা যে ভিজিয়ে নিতে হয়, আছে নাকি ঘরে কিছু ? না ? বেশ তো, এবার ছোট, কিছু জোগাড় করে নিয়ে এস চট করে! ঘরে স্বামী না থাকায় তোমার সামরিক শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে গেছে দেখছি। একেবারে শাসনের বাইরে চলে গেছ।

ওর গিন্নি হেসে বলে, তা এত ফোঁসফোঁসানি কীসের ? আমার ওপর বেশী তম্বি কোরো না বাপু: এবাড়ির আসল কর্তা তো আর তুমি নও, ন-মাসে ছ-মাসে এক-আধদিনের জন্য আস।

—আমার ওপর সবাই হুকুমবাজি করে, কিন্তু আমি তো তোমাকে ছাড়া কাউকে কিছু বলি না। যতদিন না সেনাপতির পদে উঠি সবুর কর, তারপর আমিও সবাইকে হুকুম করতে থাকব। কিন্তু এই কদিন তুমি একটু মুখ বুজে সয়ে যাও, তাড়াতাড়ি উর্দি পরে ছোট!

ওর গিন্নি যখন পোশাক পরে বেরিয়ে গেল, প্রোখর তখন গ্রিগরের দিকে একবার তিরস্কারের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে :

—বুঝলে পান্তালিয়েভিচ, তোমার সামান্য বোধশক্তিটুকুও নেই। একজন মেয়েমানুষের সামনে আমি তোমায় সব কথা বলতে পারব না। তুমি আছ কেবল কেন কী-বৃত্তান্ত এই নিয়ে জেরা করতে। তোমার টাইফাস সেরেছে তো ?

—হ্যাঁ, তা সেরেছে। এবার তোমার কথা বল। তুমি যেন কী গোপন করছ শয়তানের বাচ্চা। বলে ফেল। অতো ঢাক গুড়গুড় কিসের ? পালালে কী করে ?

—পালাবার চেয়েও ব্যাপারটা বেশী খারাপ······তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবার পর আমি রেজিমেণ্টে ফিরেছিলাম। ওরা আমাকে তোমার স্কোয়াড্রনের তিন-নম্বর পল্টনে জায়গা দেয়। কিন্তু লড়াইয়ের উৎসাহ আমার সাংঘাতিক! দু-দুবার হামলা করতে গিয়েছি, তারপর মনে-মনে ভেবেছি: এবার আমার হিম্মত দেখাতে হয়! একটা জায়গা খুঁজে আমায় পেতেই হবে, নয় তো তুমি সাবাড় হয়ে গেলে হে প্রোখর! তারপর যেন ইচ্ছে করেই লালফৌজ আমাদের

ওপর এমন চাপ দিতে শুরু করল আর এমন সাংঘাতিক লড়াই হতে লাগল যে আমাদের নিশ্বাস ফেলবার সময় জুটল না। যেখানেই লালফৌজ ঢুকে পড়েছে সেখানেই ওরা আমাদের সাবাড় করে দিচ্ছে। যেখানেই একটুখানি ভরসার অভাব, সেখানেই আমাদের রেজিমেন্টকে সাবাড় করে দিয়েছে তারা। এক হপ্তার মধ্যে আমাদের স্কোয়াড্রনের এগারোজন সেপাই হাওয়া হয়ে গেল। গোরু যেমন করে মাটি থেকে খাবার চেটে নেয় তেমনি করে। উঃ আমারো এত মন কাঁদতে লাগল যে কী বলব'—প্রোখর একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে গ্রিগরের দিকে থলিটা এগিয়ে দেয়, তারপর ধীরেসুস্থে বলতে থাকে, এবার আমার ওপর ভার পড়ল লিস্কির কাছে তদারকীর কাজে যাবার। আমাদের দলে ছিল তিনজন। একটা টিলার ওপর দিয়ে ধীরেসুস্থে ঘোড়া চালিয়েছি চোখদুটো সবদিকে খোলা রেখে। এমন সময় একজন লাল সেপাইকে দেখলাম, একটা ছোট খালের ভেতর থেকে গুঁড়ি মেরে বেরিয়ে দুহাত মাথার ওপর তুললে সে। তাড়াতাড়ি ঘোড়া চালিয়ে গেলাম তার কাছে, কিন্তু সে চেঁচিয়ে বললে, কসাক ভাইরা, আমি তোমাদের দলে। আমাকে মেরো না। আমি তোমাদেরই একজন—কিন্তু আমার ওপর কোনরূপ শয়তান ভর করেছিল কী কারণে যেন খেপে উঠে লোকটার কাছে গিয়ে বললাম আ্যাই হারামির বাচ্চা [illegible]ই সাদা হয়েছিলে তাহলে কেন আত্মসমর্পণ করছ। তুমি একটি জংলী শুয়োর। —বললুম, দেখতে পাচ্ছ না আমার প্রাণ হাতে নিয়ে কোনো রকমে লড়ছি? আর তুমি এদিকে হাত মাথায় এসে আমাদের দল ভারী করছ।—এই বলে আমি জিন থেকে তলোয়ার বের করে সোজা ওর শিরের ওপর ঘা কষিয়ে দিলাম চ্যাপটা দিক থেকে। আমার সঙ্গের অন্য কসাকরাও পরিষ্কার তাকে জিজ্ঞেস করলে—এভাবে লড়াই করাটা কি ভালো, চারদিকে ছোটাছুটি এলোপাথাড়ি। তোমরা সবাই যদি আগে চলে আসতে তাহলে আজ কবে যুদ্ধ শেষ হয়ে যেত।—কিন্তু এই দলছাড়া লোকটা যে একজন অফিসার সে আমি কেমন করে জানব? অথচ শেষ অবধি ব্যাপারটা দাঁড়াল তাই। তলোয়ারের ঘা কষাতে সে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে বললে —আমি হলুম গিয়ে একজন অফিসার, আর আমাকে মারবার সাহস তোমাদের হল। এর আগে আমি হাসারদের দলে কাজ করেছি, সেপাইদের দলে ভর্তি হবার সময় পড়লুম লালদের হাতে। তোমাদের কমাণ্ডারের কাছে নিয়ে যাও আমাকে, সব কথা খুলে বলব তাকে।—আমরা বললুম, তোমার দলিলপত্র সব আমাদের দাও।—কিন্তু সে খুব জাঁক করে বললে, তোমাদের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে আমার নেই। তোমাদের কমাণ্ডারের কাছে আমাকে নিয়ে যাও।

গ্রিগর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, কিন্তু তোমার গিন্নির সামনে এসব কথা নিয়ে আলোচনা করতে চাইছিলে না কেন?

—সে কথায় এখনো আসিনি আমি, দয়া করে বাগ্‌ড়া দিও না। ওকে সঙ্গে করে স্কোয়াড্রনে নিয়ে যাব ঠিক করলাম। কিন্তু আমরা হলাম সত্যিই গাধা।······আমাদের উচিত ছিল ওকে ওইখানেই সাবাড় করা, তাহলে সব খতম হয়ে যেত। কিন্তু ওকে আমরা কেতা মাফিক তাড়িয়ে নিয়ে এলাম। পরদিন দেখলাম সে আমাদের স্কোয়াড্রেনের সেনাপতি হয়েছে। ব্যস্‌ মজার ব্যাপারটা যা-হোক। তারপর শুরু হল আসল খেল্‌। দুয়েকদিন বাদে আমাকে ডেকে সে জিজ্ঞেস করলে: তাহলে তুই এক অখণ্ড রাশিয়া গড়বি বলে লড়াই করছিল, শুয়ারের বাচ্চা? আমাকে বন্দী করবার সময় তুই কী বলেছিলি? মনে পড়ে?—আমি যতোই নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করি, সে আমাকে দয়া দেখাবে না কোনোমতেই। তারপর যখন আমার তলোয়ারের ঘা শুর মনে পড়ে তখন সব ঝাল ঝাড়তে লাগল আমার ওপর। বলল, জানিস-আমি হাসার ফৌজের ক্যাপটেন ছিলাম, কুলীন বংশের লোক। আর তুই হতভাগা চাষা আমাকে মারতে সাহস করলি? আমাকে সে একবার ডাকলে, দুবার ডাকলে। ওর তরফ থেকে আমার আর কোনো দয়াই আশা করবার রইল না। ফৌজের কমাণ্ডারকে সে হুকুম দিলে আমাকে বাইরের ঘাঁটিতে পাঠাবার জন্য পাহারা-দারির কাজে, খাটাতে লাগল গাধার খাটুনি। মোটের ওপর আমার জীবনটাকে একেবারে দুর্বিষহ করে তুলল শুয়ারটা। আর-দুজন যারা আমার সঙ্গে তদারকিতে গিয়েছিল লোকটাকে বন্দী করবার সময়, তাদের সঙ্গেও সেই একই ব্যাপার চালাল সে। ছোকরাগুলো যতটা সওয়া যায় সইল, কিন্তু শেষ অবধি একদিন তারা আমাকে বলল, এস লোকটাকে শেষ করে দিই। নয় তো আমাদের বেঁচে থাকারই কোনো মানে হয় না।—ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভাবলাম, ঠিক করলাম রেজিমেণ্ট কমাণ্ডারকে সব কথা খুলে বলব। কিন্তু আমার বিবেক আমাকে বাধা দিচ্ছিল খুন করতে। লোকটাকে বন্দী করার সময়ই সারতে পারতাম কাজটা। কিন্তু পরে যেন হাতই তুলতে পারলাম না। ···গিন্নী যখন মুরগির গলায় ছুরির পোঁচ দেয় তখনই আমি চোখ ছানাবড়া করি, আর এ তো জ্যান্ত মানুষ মারার ব্যাপার।·········

গ্রিগর আবার বাগ্‌ড়া দিলে, কিন্তু তুমি তাকে খুন করেছ কিনা?

—দাঁড়াও, সবুর একটু। যথা সময়ে সবই জানতে পারবে। যাক, রেজিমেণ্টের কমাণ্ডারকে তো সব বললাম। তার সঙ্গে দেখা করতে সে হেসে বললে: ওকে একবার মারার পর তোমার এত উতলা হবার কোনো মানে হয় না জাইকভ। শৃঙ্খলা বজায় রেখে সে ঠিক কাজই করেছে। অফিসারটি লোক ভালো। বুদ্ধিমান।—চলে এলাম বটে কিন্তু মনে মনে ভাবলাম, ভালো অফিসারকে তুমিই বাবা গলায় ঝুলিয়ে নিয়ে বেড়াও, আমি আর যাচ্ছি না তার স্কোয়াড্রনে!—আরেক স্কোয়াড্রনে আমাকে বদলি করে দিতে বললাম, কিন্তু তাতেও কোনো কাজ হল না। বদলি তারা

করবে না। শেষে ঠিক করলাম একেবারে কেটে পড়ব। কিন্তু মুখে বলা যত সোজা কাজে ততো নয়। এক হপ্তা বিশ্রাম নিতে পাঠাল আমাকে পেছনে। আবার শয়তান ভর করল আমায়, পড়লাম ফের ঝামেলার মধ্যে। ঠিক করলাম এবার একটা বদ মেয়েছেলেকে ধরে অসুখ বাধাব, তাহলে হাল্‌কা ডিউটি পড়বে ব্যায়রামের জন্য। তারপর পশ্চাদপসরণ শুরু হলে সব কাজ গুছিয়ে নেয়া যাবে। এবার—জীবনে যা কখনো করিনি তাই করতে হল,—মেয়েমানুষের পেছনে ছুটতে লাগলাম, সবচেয়ে বদখদ্‌ চেহারাগুলো খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু বাইরে থেকে কিছু বুঝবার জো কি? কারুর কপালে তো আর লেখা নেই কার কী অসুখ? তাহলে কী করব বল?—ভয়ানকভাবে থুতু ছিটোয় প্রোখর, কান খাড়া করে শোনে ওর গিন্নী আবার ফিরে আসছে কিনা।

হাসি চাপা দেবার জন্য গ্রিগর মুখ দিয়ে হাত ঢাকে। চোখে ওর হাসি উপচে ওঠে। বলে:

—তারপর অসুখ বাধালে?

গ্রিগর কাঁদো-কাঁদো হয়ে তাকায় ওর দিকে। বুড়ো কুকুরের মতো করুণ ভাব ফুটে ওঠে ওর মুখে—যৌবন ওরও একদিন ছিল। খানিক চুপ করে থেকে [illegible]:

—পাওয়া কী চাট্টিখানি কথা? না চাইতেই একেকসময় জলের মতো এসে পড়ে। আর তখন মাথা খুঁড়েও পাবার উপায় নেই।

একটু ঘুরে দাঁড়িয়ে গ্রিগর নিঃশব্দে হাসে। তারপর মুখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে বুজে আসা গলায় বলে.

—ভগবানের দোহাই, আর কষ্ট দিও না। বলো, জুটেছিল কি জোটেনি?

প্রোখর আহত কণ্ঠে বলে, তোমার কাছে অবিশ্যি ব্যাপারটা মজার। অন্যের দুর্দশা দেখে শুধু বোকারাই হাসে। অন্তত আমার তাই মনে হয়।

--কিন্তু আমি হাসছি না তো তারপর কী হল?

—তারপর তো আমি যে আস্তানায় উঠেছিলাম সেই বাড়ির কর্ত্রীটির ওপর নজর চালাতে লাগলাম। সে ছুঁড়ীর বয়েস বছর চল্লিশেক হবে, হয়তো আরো কিছু কমও হতে পারে। মুখখানা তার ব্রণে ভরা, দেখতেও মানে এক কথায় ভগবান এদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করুন। পড়শিরা আকারে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলে আজকাল নাকি কোন্‌ ডাক্তারের সঙ্গে তার আশনাই। আমি ভাবলাম, মন্দ কী, এবার ব্যায়রামটা এসে যাবে আমার কাছে।—জোয়ান মোরগের মতো লেগে রইলাম মেয়েটার পেছনে। নানারকম ঠাটবাট দেখিয়ে তাকে কতো কথাই বললাম······এত কথা যে কাত্থেকে এল তা আমি নিজেই ভালো করে জানি না।—অপরাধীর মতো হাসল প্রোখর, পূর্বস্মৃতি মনে জাগতে একটু চাঙাও হয়ে উঠল যেন।—ওকে

বিয়ে করব কথা দিলাম, নানা বাজে জিনিস শোনালাম···শেষ অবধি তাকে কব্জাও করলাম। ব্যাপারটা প্রায় পাপকাজের কাছাকাছি এসে পড়েছিল! একদিন সে বলা-নেই কওয়া-নেই হু-হু করে কেঁদে ফেলল। তাকে ঠাণ্ডা কববার চেষ্টা করে বললাম—তোমার বুঝি অসুখ আছে? কিন্তু সে আর এমন কি, বরং ভালোই হল।—কিন্তু আমি নিজেই ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। তখন অনেক রাত। ধর কেউ যদি আমাদের আওয়াজ শুনতে পেয়ে যে-চালা-ঘরটায় আমরা ছিলাম সেখানে চুপিচুপি এসে ঢুকত? আমি বললাম যিশুর দোহাই, চেঁচিও না। আর যদি অসুখই কবে থাকে তো ঘাবড়াবার কী আছে। আমি তোমাকে এত ভালোবাসি যে সবকিছুর জন্যই আমি তৈরি!—কিন্তু সে বলে ওগো প্রোশেন্কা, মোটেই আমার অসুখ করেনি। আমি সৎ মেয়ে বলেই বোধ হয় ভয় করছে। সেইজন্য কেঁদে ফেলেছিলাম।—বিশ্বাস কর চাই না কব গ্রিগব পান্তালিযেভিচ, সে এই কথা বলতে কিন্তু আমার গা দিয়ে ঘাম ছুটল। ভাবলুম এই সেরেছে। কী বিপদেই পড়লাম! এই শেষ ভরসাটুকুই যা ছিল, তাকে ধমক দিয়ে বললুম, তাহলে ডাক্তারের কাছে ছুটেছিলে কেন? এত লোকেরই বা কিসেব আনাগোনা তোমাব কাছে?—সে বললে: ডাক্তারেব কাছে গিয়েছিলাম মুখটা সাফ করাব জন্য কিছু মলম যোগাড় কবতে।—তখন আমি মাথায় হাত দিযে বসে পড়ে বললুম, এখ্খুনি উঠে চলে যা হতচ্ছাড়ি, ডাইনি কাঁহাকা! তোকে আমার সতীসাধ্বী পেয়ে দরকার নেই, বিয়ে করব না তোকে!

প্রোখর সশব্দে থুতু ছুঁড়ে একটু যেন অনিচ্ছাব সঙ্গেই বলে চলল, সব পরিশ্রম আমার বৃথা হল। ঘরে ফিরে গিয়ে আমার জিনিসপত্তর গুছিয়ে নিয়ে সে রাতেই চলে গেলাম আরেক এলাকায়। সেখানকার ছোকরারা একটা নিশানা দিতে যা চেয়েছিলাম তা পেয়ে গেলাম এক বিধবার কাছে। এইবারই প্রথম সরাসরি আসল কথা পাড়তে পারলাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার অসুখ আছে? সে জবাব দিলে, আছে একটু-একটু। ওই একটু থাকলেই আমার হয়ে যাবে।—একখানা কুড়ি রুবলের নোট দিলুম তাকে। পরদিন আমার কৃতিত্বের কথা খুব শুনিয়ে বেড়ালাম, হাতে পড়ল হালকা ডিউটি। সেখান থেকে সরাসরি চলে এলাম বাড়ি।

—ঘোড়া না নিয়েই চলে এলে নাকি?

—নিশ্চয়ই না! ঘোড়ায় চেপেই এসেছি, রীতিমতো দুরস্ত জনা কায়দায়। আমি যেখানে অসুখের জন্য ছুটি নিয়ে ছিলাম সেখানেই ঘোড়া পাঠিয়ে দিয়েছিল সেপাইরা। কিন্তু সেটা আসল কথা নয়: এবার তুমি আমায় বল বউকে কি করে বলি। বরং এর চেয়ে বোধ হয় বেরিয়ে গিয়ে তোমার সঙ্গে রাত কাটালে পাপের হাত থেকে বাঁচতে পারি?

—না রে বাপু। তুমি বাড়িতেই থাক। বোলো যে তুমি জখম হয়েছ। সঙ্গে ব্যাণ্ডেজ কিছু আছে ?

—জঙ্গী হাসপাতালের পটিগুলো রয়েছে।

—ব্যস তাহলে ওই ব্যবহার কর।

হতাশভাবে প্রোখর বললে, আমাকে বিশ্বাসই করতে চায় না বউ। —তবু সে উঠে জিন-থলিটা হাতড়ালে। তারপর শোবার ঘরে গিয়ে সেখান থেকে চাপা গলায় বললে, যদি গিন্নি ফিরে আসে ওকে কথাবার্তা বলে আটকে রাখ। আমি এখ্খুনি আসছি।

গ্রিগর একটা সিগারেট পাকিয়ে নিয়ে ভাবতে বসল কীভাবে যাবার ব্যাপারটা ঠিক করা যায়। শেষ অবধি স্থির করল দুটো ঘোড়া জুতে নেবে স্লেজের সঙ্গে। সন্ধ্যের সময় রওনা হলে, ওর সঙ্গে আকসিনিয়া থাকলেও কারুর নজরে পড়বে না। অবশ্য শেষ পর্যন্ত সবাই জেনে যাবেই।

প্রোখর শোবার ঘর থেকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে এসে টেবিলের ধারে বসল, স্কোয়াড্রন কমাণ্ডারের কথাটা তো তোমায় শেষ অবধি বলিইনি আমার অসুখে পড়ার তিনদিন বাদে সেপাইরা তাকে খুন করে ফেলে।

—সত্যি ?

—[illegible]। লড়াইয়ের সময় তাকে পেছন থেকে গুলি করে মারে। ব্যস সাবাড় হয়ে গেল। বিনা কারণে বদনাম ঘাড়ে পড়ল সেই তো আমার আপসোস।

তাতারস্ক থেকে কদিন বাদেই চলে যেতে হবে সেই চিন্তায় মশগুল ছিল গ্রিগর। অন্যমনস্কভাবে জিজ্ঞেস করল যে অপরাধীটা কবল তাকে ধরতে পারেনি ?

—তাকে ধরবে সে ফুরসত কোথায় ? তখন সবাই একসঙ্গে পেছু হটছে, কাউকে খুঁজে বের করবার সময় নেই কিন্তু আমার গিন্নি কোথায় গেল ? একটু কিছু গলায় না ঢাললে যে চলছে না। তুমি কবে যাবে ঠিক করলে ?

—কাল।

—আর একটি দিন বেশ থাকা চলে না ?

—কেন ?

—অন্তত উকুনগুলো বাছিয়ে নিতে পারতাম। ও নিয়ে ঘোড়ায় চেপে যাওয়া কি চাট্টিখানি কথা ?

—ও কাজ রাস্তায়ই করতে পার। অবস্থা যা তাতে তো দেরি করা ঠিক নয়। ভিয়েশেনস্কা থেকে লালফৌজ তো বেশী দূরে নয়—হেঁটে এলে কঘণ্টার রাস্তা—।

—সকালে রওনা হচ্ছি আমরা ?

—না। রাতেই। শুধু একবার কারগিনে যেতে হবে। রাতটা সেখানে কাটাব।

—কিন্তু লালফৌজের খপ্পরে পড়ব না তো?

—যে কোনো সময় সরে পড়বার জন্য তৈরি থাকতে হবে। আমি ভাবছিলাম· ভেবেছিলাম আকসিনিয়া আস্তাখভাকে সঙ্গে নেব। তোমার আপত্তি নেই বোধ হয়?

—আমার সঙ্গে এর কী সম্বন্ধ বল? ইচ্ছে করলে এক জোড়া আকসিনিয়া নিতে পার সঙ্গে।

·· ঘোড়াদের পক্ষে একটু বোঝা হবে এই আর কি।

—সে তো বেশী ভারী নয়।

—মেয়েমানুষ সঙ্গে নিয়ে যাওয়া এক ঝকমারি। আর সেই বা কোন্ সুবাদে তোমার ঘাড়ে চাপছে? এমনিতেই তো আমাদের ঝামেলার অন্ত নেই!—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে প্রোখর—চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে, আমি জানি তুমি ওকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরবে। সব সময় তো স্বামীগিরি ফলাচ্ছ। আহা, গ্রিগর পান্তালিয়েভিচ তোমার জন্য সে তো কেঁদে কেঁদে সারা হল।

গ্রিগর শুকনো গলায় বলে, তোমার তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। বউয়ের কাছে এসব নিয়ে বক বক কোরো না যেন।

—কখনো এসব কথা তাকে বলেছি? আমাকে তো তুমি ভালো করেই জান। কিন্তু মেয়েটা যে বাড়ি ছাড়বে, কার সঙ্গে? দরজার কাছে পায়ের শব্দ শুনতে পায় ওরা। প্রোখরের বউ এল। ছাইরঙা ওড়নাটা তার বরফে ঢাকা।

তাক থেকে গেলাসগুলো নামিয়ে প্রোখর বললে, বাইরে জোর বরফ হাওয়া দিচ্ছে বুঝি?—তারপর হুঁশ হতেই বলে, কিছু এনেছ নাকি?

প্রোখরের বউয়ের গালদুটো দগদগে লাল। কোল থেকে দু-দুটো ধোঁয়া ওঠা বোতল নামিয়ে সে টেবিলের ওপর রাখল।

প্রোখর খুশী হয়ে বললে, ওঃ এতক্ষণে পথের দেখা মিলল!—ভদকাটা শুঁকে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, পয়লা নম্বর টীম। তেমনি শানদার হবে!

গ্রিগর দুটো ছোট গেলাস শেষ করার পর খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এই দোহাই পেড়ে বাড়ি রওনা হল।

॥ চার ॥

ঘোড়ায় চেপে টিলা বেয়ে ওপরে ওঠার সময় প্রোখর বললে, বলি লড়াই তো খতম হল। লালফৌজ যা জোর ধাক্কা লাগিয়েছে তাতে পেছুতে পেছুতে আমরা তো একেবারে সমুদ্দুরে পড়ে সেখানেই পাছা ঘষতে থাকব।

নিচে তাতারস্ক গ্রাম নীলচে কুয়াশায় জড়ানো। দিগ্বলয়ের তুষার ধবল গোলাপ-রাঙা রেখা ছাড়িয়ে ওপাশে অস্ত গেছে সূর্য। স্লেজগাড়ির চাকার নিচে বরফের মুচমুচ্ শব্দ। দুলকি চালে ছুটেছে ঘোড়াগুলো। দু ঘোড়ার স্লেজগাড়িতে গ্রিগর হেলান দিয়ে বসে আছে জিনসাজে কাঁধ ঠেকিয়ে। আকসিনিয়া বসে ওর পাশে। লোমের আস্তর দেয়া ভেড়ার চামড়ার কোতা জড়ানো গায়ে। সাদা ফুরফুরে ওড়নার নিচে ওর কালো চোখজোড়া খুশিতে ঝিক্‌মিক্ করছে।

গ্রিগর আড়চোখে চেয়ে দেখছিল ওকে—তুষারের ঠাণ্ডায় গালদুটো ওর লালাভ, হিমকণামাখা সুবঙ্কিম চোখের পাতার নিচে ওর জ্বলজ্বলে চোখের নীলচে শ্বেতাংশটুকু আর মোটা রেখায় টানা কালো ভুরুজোড়া। আকসিনিয়া একটা উৎসুক কৌতূহল নিয়ে এপাশ ওপাশ চেয়ে দেখছিল—স্তেপের মাঠ, হাওয়া-ঝাপটানো তুষারের গালিচা পাতা, গাড়ি ঘোড়া চলে ক্ষয়ে-যাওয়া মসৃণ রাস্তা, দূরের কুয়াশা ঢাকা দিগন্ত। সবই ওর কাছে নতুন আর অচেনা, কারণ আকসিনিয়া বাড়ি ছেড়ে আগে বেরোয়নি পারতপক্ষে। সবই তাই ওর মনোযোগ আকর্ষণ করে। কিন্তু মাঝে মাঝে চোখ নামিয়ে যখন চোখের পাতায় মাখা হিমকণার স্নিগ্ধ শিরশিরে ঠাণ্ডাটুক অনুভব করে তখন ওর হাসি পায় এই কথা ভেবে যে ওর এতদিনের একটি স্বপ্ন এমন অদ্ভুত অপ্রত্যাশিতভাবে সত্যি হতে চলল। ও আর গ্রিগর এখন তাতারস্ক ছেড়ে অনেক দূরে কোথাও গাড়ি চেপে চলেছে, সবে এসেছে ওর জন্মভূমি সেই ঘৃণিত তাতারস্ক জেলা থেকে যেখানে ওর অনেক বিড়ম্বনা জুটেছিল কপালে, যেখানে ওর অর্ধেক জীবনই কেটেছে এক অনভিলাষিত স্বামীর সঙ্গে গ্লানির মধ্যে, যেখানকার সব কিছুর মধ্যে কেবলই পীড়াদায়ক স্মৃতি। গ্রিগরের সান্নিধ্য সারা শরীর দিয়ে অনুভব করে ও হাসে—এ সুখ ও কোন্ দামে কিনেছে, আর ভবিষ্যতেই বা কী হবে সে কথা তো সে ভাবেইনি, ঐ স্তেপ-দিগন্তের মতোই কুহেলিঢাকা সে আঁধার ভবিষ্যৎ ওকে সুদূরপানে ডেকেছে হাতছানি দিয়ে।

কী ভেবে পাশ ফিরে চাইতেই প্রোখর লক্ষ্য করে আকসিনিয়ার লালচে আর বরফ-লেগে ফুলে-ওটা ঠোঁটের কোণে কাঁপা হাসিটুকু। আহত কণ্ঠে সে বলে :

—তোমার আবার দাঁত বের করার কী হল? বেশ বউটি তুমি! ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে খুব মজা হল বুঝি?

—খুশী হব না কেন?—গলার স্বরে ঝংকার দিয়ে বলে আকসিনিয়া।

—বড় খুশী হবারই মতো কথা বটে! তুমি একটি উজবুক, বুঝলে! একদিনের এই ছোট্ট পাড়ি কোথায় গিয়ে শেষ হবে তা তো জানো না, তাই আগেভাগেই দাঁত বের কোরো না। আগে তো বাঁচাও দাঁতের পাটিগুলো!

—অতীত আমার যেমন গেছে, ভবিষ্যৎটাও তার চেয়ে কিছু খারাপ হবে না গো!

—তোমায় দেখলে আমার গা বমি করে⋯।—প্রোখর ঘোড়াদুটোর ওপর একসঙ্গে চাবুকটা হাঁকড়ায় সজোরে।

আকসিনিয়া হেসে ওকে উপদেশ দেয়, তা তোমার মাথাটা ওপাশে ঘুরিয়ে মুখে আঙুল পুরে রাখো না।

—এই আবার বোকার মতো কথা বলছ। সমুদ্দর অবধি এতটা পথ কি এখন মুখ বুজে চলতে পারব? বেশ মজার বুদ্ধি যাহোক!

—তা তোমার গা বমি করছে কিসে?

—শান্তশিষ্ট হয়ে চুপটি করে থাক! আরেক ঘরের ছেলের বাপের সঙ্গে ভিড়ে কোথায় যে চলেছ সে শয়তানেই জানে! কিন্তু স্তেপান যদি এখন গাঁয়ে ফিরে এসে থাকে, কী হবে বলো দিকি?

—তোমাকেও বলি প্রোখর! তুমি আমাদের ব্যাপারে নাক গলাতে এস না, শেষে তোমারও বরাত খারাপ হয়ে যাবে!

—তোমা'র ব্যাপারে আমি কেন জড়াতে যাবো। আমাকে আর কথা শোনাতে হবে না! যা মনে ভাবি তাই বলি, আপত্তি কী? নাকি আমি তোমার গাড়োয়ান যখন, তখন আমায় ঘোড়ার সঙ্গেই কথা বলতে হবে? সেও বেশ বুদ্ধি! তুমি রাগ কর আর যাই কর, আকসিনিয়া, তোমায় বেশ একটা ভালো চাবুক দিয়ে চাবকাতে হয়। চাবকাতে হয় আর হুকুম দিতে হয় টুশব্দটি করতে পারবে না। কিন্তু মন্দ বরাতের ভয় আমায় দেখিও না! ভাগ্য আমি হাতে নিয়েই ঘুরে বেড়াই সব জায়গায়। আমার ভাগ্য অন্য ছাঁচের, অত ফুর্তিও নেই, এদিকে ঘুমের অবসরটুকুও দেবে না।·ওরে এই হতচ্ছাড়াগুলো! হাঁটছে দেখ ঢিমে তেতলা, পাজির পাঝাড়া সব!

গ্রিগর এতক্ষণ হাসিমুখে শুনে যাচ্ছিল সব। এবার সে ওদের ঠাণ্ডা করার জন্য বললে :

—গাঁ ছেড়ে সবে বেরিয়েছি, এখনই অত ঝগড়া কোরো না দুজনে! সামনে আমাদের লম্বা রাস্তা পড়ে আছে, ঝগড়ার অবসর প্রচুর মিলবে। ওকে কেন জ্বালাচ্ছ প্রোখর?

কড়া গলায় জবাব দেয় প্রোখর, আমি জ্বালাব ওকে! যা বলছি তার মুখে-মুখে যেন উত্তর না দেয়, ব্যস। এই মুহূর্ত আমার কী মনে হচ্ছে জানো? গোটা পৃথিবীতে মেয়ে মানুষের অধম যদি কিছু থাকে! ওরা হল সব ইঁদুরের ঝাড়······বুঝলে ভাই, ভগবানের সবচেয়ে ওঁচা সৃষ্টি। আমি হলে ওদের এমন শায়েস্তা করতাম যে দুনিয়ায় মেয়ে মানুষের গন্ধটি থাকত না! ঠিক এমনি আমার ধারণা হচ্ছে এখন। কী? হাসছো যে বড়ো? ঘুঁটে পুড়তে দেখে গোবররাই শুধু হাসে। লাগাম রেখো! একটি মিনিটের জন্য একটু নামব।

খানিকক্ষণ প্রোখর হেঁটেই চলে। তারপর স্লেজে ওঠে আরাম করে বসে মুখ বুজে।

সে-রাতটা কারগিনে কাটিয়ে প্রাতরাশের পর আবার সকালে ওরা রওনা হয়। সন্ধ্যে নাগাদ তাতারস্ক থেকে ওদের দূরত্ব দাঁড়ায় প্রায় মাইল চল্লিশের মতো।

একটানা বাস্তুহারা গাড়ির সারি চলেছে দক্ষিণমুখো। মরোজভ্স্কির কাছে এসে প্রথম কসাক ফৌজী দলটার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল ওদের। তিরিশ থেকে চল্লিশজন ঘোড়সওয়ার চলে গেল ফৌজী রসদ গাড়ি টানতে টানতে। যতই ওরা এগোয়, রাতে আস্তানা পাবার সম্ভাবনা ততই কঠিন হয়ে ওঠে। সন্ধ্যের আগে গাঁয়ের সব কটা মাথা গুঁজবার ঠাঁই দখল হয়ে গেছে, ঘোড়াদের আস্তাবল দেবার জায়গা নেই তো মানুষ কোন্ ছার। তাউরিগানের একটা জেলায় এসে গ্রিগর দোরে দোরে হানা দিয়ে বেড়ালো বৃথাই একটা ঘুমোবার ঠাঁই খুঁজে। শেষ অবধি রাত কাটাতে বাধ্য হল একটা চালাঘরের নিচে। তুষার গলে ওদের কাপড়-চোপড় ভিজে সপ্‌সপে হয়ে গিয়েছিল। ভোর নাগাদ আবার সেগুলো শুকিয়ে কাঠ, চলাফেরার সঙ্গে কেবল মুড়মুড় করে আর চিড় খেয়ে যায়। সারা রাতে চোখের পাতা এক করতে পারেনি ওরা, কেবল ভোরের মুখে উঠোনে একরাশ বিচালিতে আগুন লাগিয়ে খানিকটা শরীর সেঁকে নিতে পেরেছিল।

পরদিন আকসিনিয়া ভয়ে ভয়ে প্রস্তাব করলে: গ্রিশা দিনটা এখানেই কাটিয়ে গেলে হত না? সারা রাত বড় কষ্ট পেয়েছে সবাই, একটু ঘুম হয়নি, বোধহয় একটু বিশ্রাম নিলে ভালো হত।

রাজী হয় গ্রিগর। খুঁজেপেতে একটা আস্তানা বের করে। ভোরে আর

সব বাস্তুহারা বিদায় নিয়েছিল, কিন্তু শ খানেক আহত আর টাইফাস্-রুগী নিয়ে একটা জঙ্গী হাসপাতাল দিনের বেলাতেও গাঁয়ে রয়ে গেল।

একটা ছোট্ট ঘরে মাটির মেঝেয় শুয়ে দশজন কসাক। প্রোখর একটা ঘোড়া-কম্বল আর খাবারের থলি নিয়ে এসে ঠিক দরজার মুখেই কিছু বিচালি বিছিয়ে দেয়, তারপর ঘুমন্ত এক বুড়ো কসাককে জোর করে পা ধরে এক পাশে টেনে সরিয়ে কাঠখোট্টা অথচ মিষ্টি গলায় আকসিনিয়াকে বলে:

—শুয়ে পড তো এখানে, এমন শুকিয়ে গেছ যে আসল চেহারা চিনতেই পারা যায় না।

রাত ঘনিয়ে আসতে আবার নতুন লোকের আনাগোনা শুরু হয় গাঁয়ে। সারা রাত পাশের গলিগুলোতে ধুনি জলে, মানুষের গলা, ঘোড়ার ডাক, স্লেজ চাকার শব্দে গমগম করে জায়গাটা। গ্রিগর যখন প্রোখরকে ঘুম থেকে তোলে তখন ভোর হয়েছে কি-হয়নি। ফিসফিসিয়ে গ্রিগর বলে:

—ঘোড়াগুলোকে সাজাও। এখনই রওনা হওয়া যাক।

—এত তাডাতাডি যে? —হাই তুলে প্রোখর বলে।

—শুনতে পাচ্ছ?

জিনের চূড়ো থেকে মাথা তুলে প্রোখর শুনলে দূর থেকে কামানের চাপা গুরুগুরু আওয়াজ।

ডনের উত্তরের সব কটি জেলাই বুঝি দক্ষিণের দিকে ভিড়ে পড়ছে। রেল লাইন ধরে অসংখ্য উদ্বাস্তু মালগাড়ি জাবিৎসিন থেকে লিখায়া এসে মানিচে জড়ো হচ্ছিল। রাস্তায় নামার পর প্রথম হপ্তাটা গ্রিগর যেখানেই থেমেছে, খোঁজ করেছে তাতারস্কের পাড়াপড়শীদের, কিন্তু কোনো গাঁয়েই তাদের কারুর পাত্তা পায়নি। খুব সম্ভব ওর বাপ আর অন্য সবাই বেশী করে বাঁ ধার ঘেঁসে চলে গেছে উক্রেইনীয় এলাকা এড়িয়ে কসাক পল্লীর ভেতর দিয়ে অবলিভস্কায়ার দিকে। কেবল তেরদিনের দিন ওদের দুয়েকজনের সঙ্গে পথে সাক্ষাৎ হয়ে গেল। রাতে একজায়গায় উঠে ও খবর পেল ভিয়েশেনাস্কা জেলার একজন কসাক নাকি পাশের বাড়িতেই টাইফাসে আক্রান্ত হয়ে পড়ে আছে। কোথাকার লোক সে খোঁজ নিতে গিয়ে গ্রিগর ছোট্ট ঘুপচি ঘরটার ভেতর ঢুকে দেখল মেঝেয় পড়ে আছে বুড়ো অবনিজভ। তার কাছে শুনল তাতারস্কের উদ্বাস্তুরা নাকি দুদিন আগেই এগ্রাম ছেড়ে গেছে। ওদের অনেকে টাইফাসে ভুগছে, দুজন রাস্তাতেই মারা গেছে, আর অবনিজভ নিজের গরজেই থেকে গেছে এখানে।

গ্রিগর বিদায় নেবার সময় বুড়ো বললে, যদি ভালো হয়ে উঠে আর লাল-ফৌজের বন্ধুরা যদি দয়া করে প্রাণে না মারে, তাহলে কোনো রকমে ঘরে

ফিরব। আর তা না হলে এখানেই মরব। যেখানেই মরি, ব্যাপার তো সেই এক ; মরণ কোথাও মিষ্টি নয়।……

গ্রিগর বুড়োকে জিজ্ঞেস করে ওর বাপের কথা কিন্তু অব্‌নিজভ জবাব দেয় তার কোনো খবর সে রাখে না, কারণ সে তাতারস্ক ছেড়েছে একেবারে শেষ স্লেজ গাড়িটিতে চেপে। মান্নখভ্‌স্কি গ্রামের ভেতর দিয়ে আসার পর আর পান্তালিমন প্রোকোফিয়েভিচ্‌কে সে দেখেনি।

এর পরের ঘাঁটিটিতে অবশ্য গ্রিগরের ভাগ্য খানিকটা সুপ্রসন্ন হল। প্রথম যে বাড়িটিতে ঢুকেছিল সেখানেই ভিয়েরখ্‌নে-চিরস্ক গাঁয়ের জানা শোনা কসাকদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ওরাই গ্রিগরের জায়গা করে দিলে। পনেরোজন উদ্বাস্তু জালার ভেতর মাছের মতো গাদাগাদি হয়ে, তিন জন তার মধ্যে টাইফাসে ভুগছে, আরেকজন তুষারের ঠাণ্ডায় জখম। শুয়োরের তেলে ভুট্টার পায়েস রেঁধে কসাকরা গ্রিগর আর ওর সঙ্গীদের দিলে খুব যত্ন আত্তি করে। প্রোখর আর গ্রিগর খেল দেড়ে মুশে, কিন্তু আকসিনিয়া স্পর্শও করল না।

প্রোখর জিজ্ঞেস করলে, কী হল? খিদে পায়নি?—গেল-দুদিনে কোনো এক দুর্বোধ্য কারণে আকসিনিয়ার প্রতি প্রোখরের ব্যবহার বদলে গেছে। উগ্র হলেও একটু সমবেদনার আভাস এখন ওর কথায়।

আকসিনিয়া মাথায় ওড়না জড়িয়ে উঠোনের দিকে এগোল—শরীরটা একটু খারাপ বোধ হচ্ছে …

প্রোখর বলে গ্রিগরকে, ওর অসুখ বিসুখ করেনি তো?

—কে জানে?—পায়েসের থালা নামিয়ে রেখে গ্রিগর পেছন-পেছন যায়। দেখে আকসিনিয়া বুকে হাত চেপে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। ওকে জড়িয়ে ধরে গ্রিগর উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে :

—কী হল সিনিয়া মণি?

—খারাপ লাগছে, মাথা ধরেছে।

—ভেতরে এসে শুয়ে পড়ো।

—তুমি যাও, আমি এখুনি আসছি।

গলার আওয়াজ ওর ভারী একটানা। পা যেন টানতে চাইছে না। গুমোট ঘরের ভেতর ঢুকার সময় ওর দিকে গ্রিগর প্রশ্নভরা চোখে তাকায়, ওর গালের লাল আভাটা নজরে পড়ে গ্রিগরের, একটা সন্দেহজনক চকচকে ভাব চোখের মধ্যে। মনটা দমে যায় গ্রিগরের. অসুখ করেছে বোঝাই যাচ্ছে। গ্রিগরের মনে পড়ে আগের রাতে আকসিনিয়া বলছিল কাঁপুনি আর মাথা ঘোরার কথা। ভোরে যখন সে ঘুম থেকে ওঠে গ্রিগর লক্ষ্য করেছিল ওর মাথার সমস্ত কোঁকড়া চুল ঘামে একেবারে জবজবে, যেন এইমাত্র নেয়ে উঠেছে। শুয়ে এক দৃষ্টে তাকিয়ে দেখছিল ওকে ঘুমন্ত অবস্থায়, পাছে ঘুমের ব্যাঘাত হয় তাই সে উঠতেও সাহস করেনি।

পথ ভ্রমণের কষ্ট সে যথেষ্ট সয়েছে। এমনকি গ্রোখরকে উৎসাহও দিয়েছে মাঝে মাঝে। গ্রোখর অনুযোগ করত: কী অনাসৃষ্টি হল যে এই লড়াই। কে এমনটা ভেবেছিল? সারাদিন ধরে পথ চল, তারপর যখন রাতে কোথাও হাজির হলে তো মাথা গোঁজবার ঠাঁই নেই। তারপর যে কোথায় তোমার যাবার হুকুম হবে একেবারে খতম হবার আগে পর্যন্ত তোমার তা জানার উপায় নেই।

কিন্তু আজ সে উৎসাহ আকসিনিয়ার নেই। শুতে যাবার সময় গ্রিগরের মনে হল সে বুঝি কাঁদছে।

ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করে, কী ব্যাপার? অসুখটা কোথায় মনে হচ্ছে?

—অসুখ তো করেছেই।...এখন কী করবে? আমায় ছেড়ে যাবে তো?

—আচ্ছা বোকা তো! ছেড়ে যাব কেন তোমায়? কেঁদো না। বোধ হয় রাস্তায় একটু ঠাণ্ডা বেশী লেগে গিয়েছিল, বায়ু চড়ে গেছে তাই।

—গ্রিশা, আমার টাইফাস হয়েছে।

—বাজে বোকো না! টাইফাসের কোন লক্ষণ নেই, কপালটা তো বেশ ঠাণ্ডা, টাইফাস হতে যাবে কেন?—গ্রিগর সান্ত্বনা দেয় ওকে। কিন্তু মনে মনে এটুকু সে বেশ বুঝতে পারছে আকসিনিয়ার টাইফাসই হয়েছে, এখন যদি ও বিছানা ধরে তা হলে যে ওরা কী করবে সেইটেই সমস্যা।

গ্রিগরকে আরো নিবিড়ভাবে কাছে টেনে আকসিনিয়া চাপা গলায় বলে, উঃ এভাবে চলা বড় কষ্ট; রোজ রাতে কত অগুণতি লোকের ভিড় দেখেছ? উকুনে আমাদের খেয়ে শেষ করল গ্রিশা! এত লোকের মধ্যে নিজের দিকে যে একটু নজর দেব সে জো-টুকু নেই।... কাল চালাঘরের মধ্যে ঢুকে কাপড ছাডতেই দেখি জামায় কত যে উকুন।......জীবনে কখনো এমন দৃশ্য দেখিনি; মনে পডলেই গাবমি করে। কিছু খেতে পারি না!......কিন্তু কাল বেঞ্চিতে শুয়েছিল যে বুড়ো লোকটা তার গায়ের উকুন দেখেছিল? জামা থেকে বিড়বিড করে বাইরে বেরুচ্ছিল সব উকুনগুলো!

—ও সব কথা ভেবো না! কী এক বিচ্ছিরি ভাবনার জিনিস পেয়েছে! উকুন তো কী হয়েছে? লড়াইয়ের সময় অত বাছাবাছি চলে না।—বিরক্তিভরে ফিসফিস করে গ্রিগর বললে।

—সারা শরীর যে চুলকিয়ে সারা হল।

—সবাই চুলকিয়ে সারা হচ্ছে। এখন আর কী করা যাবে তা নিয়ে? চলতে দাও! ইয়েকাতেরি নেদারে গিয়ে ভালো করে চান করা যাবেখ'ন। আকসিনিয়া দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, কিন্তু পরিষ্কার জামা তো পরবার উপায় নেই আমাদের—এক মরণকাল ছাড়া, গ্রিশা!

—এখন ঘুমোও তো। কাল ভোরে উঠে রওনা দিতে হবে।

অনেকক্ষণ অবধি চোখে ঘুম আসে না গ্রিগরের। আকসিনিয়াও জেগে একাধিকবার নিঃশব্দে কাঁদে সে ভেড়ার-চামড়ার মস্ত জোব্বাখানা দিয়ে মাথা ঢেকে। তারপর অনেকক্ষণ উশখুশ এপাশ-ওপাশ করার পর গ্রিগর যখন পাশ ফিরে ওকে দুহাত জড়িয়ে ধরে তখনই একটু যা ঝিমুতে শুরু করে। মাঝরাতে গ্রিগরের ঘুম ভেঙে যায় একটা জোর আওয়াজে। কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে :

—এইয়ো! দরজা খোল নয়তো ভেঙে ফেলব! শয়তানের দল দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে!

বাড়ির কর্তা বয়স্ক নিরীহ গোবেচারা গোছের কসাক। সিঁড়ি-দরজার কাছে গিয়ে সে জিজ্ঞেস করে :

—কে ওখানে? কী চাই? যদি রাত কাটাবার মতলবে এসে থাক তো এখানে সুবিধে হবে না। এমনিতেই ভিড়ের ঠেলায় পাশ ফিরে শোবার জায়গাটি নেই।

বাইরে থেকে আবার চিৎকার আসে, খোল বলছি দরজা!—পরমুহূর্তে প্রায় আধ ডজন হাতিয়ারবন্ধ কসাক দরজার পাল্লাটা পুরোপুরি ঠেলে খুলে হুড়মুড় করে সামনের ঘরে ঢুকে পড়ে।

ওদের ভেতর একজন জিজ্ঞেস করে, কাদের আজ এখানে রাত কাটাতে দিয়েছ? লোকটার মুখ তুষার লেগে লোহার মতো কালো, ঠাণ্ডায় জমে-যাওয়া ঠোঁট প্রায় নাডতেই পারছে না।

—এরা বাস্তুহারা। কিন্তু তোমরা কে?

কোন জবাব না দিয়ে একজন কসাক লম্বা পা ফেলে বড ঘরটার মধ্যে ঢুকে গলা চড়িয়ে বললে :

—এইয়ো! বেশ মজাসে হাত পা মেলে ঘুমোচ্ছ দেখি। বেরোও এখান থেকে। জল্দি। সেপাইরা থাকবে এখানে। ওঠ। ওঠ! তাড়াতাড়ি করো। না তো ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেব।

গ্রিগর ধীরে সুস্থে উঠে দাঁড়িয়ে ভাঙা গলায় বললে—কে তুমি অমন চেঁচাচ্ছ যে বড়?

—কে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি!—কসাকটি গ্রিগরের দিকে এগিয়ে এল। ছোট্ট প্যারাফিন বাতির টিমটিমে আলোয় দেখা গেল লোকটার হাতে একটা পিস্তলের নল অল্প চকচক করছে।

—বড়ো তেজ দেখাচ্ছ দেখি! শুনে গ্রিগর বললে, বেশ। দেখি তোমার খেলনার দৌড়টা!—ক্ষিপ্রগতিতে কসাকের হাতের কব্‌জি চেপে ধরে এমন জোরে সে মুচড়ে দিলে যে লোকটা ককিয়ে উঠে হাতের মুঠো খুলে ফেললে। পিস্তলখানা ঝপ করে পড়ে গেল মেঝেয় পাতা কম্বলের ওপর। কসাকটিকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি নিচু হয়ে পিস্তলটা তুলে পকেটে পুরে গ্রিগর

শান্তকণ্ঠে বললে, এবার একটু কথাবার্তা কওয়া যাক্। কোন রেজিমেণ্টের সেপাই তুমি? তোমার মতো তেজীয়ান আর ক'জন আছে হে?

হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে উঠে কসাক এবার চেঁচিয়ে উঠল:

—সেপাইরা! এদিক এস!

দরজার কাছে এগিয়ে গেল গ্রিগর। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে দরজার গায়ে হেলান দিয়ে সে বললে:

—আমি উনিশ নম্বর ডন রেজিমেণ্টের স্কোয়াড্রন কমাণ্ডার। এবার একটু আস্তে! চেঁচামেচি থামাও! কে অমন গাঁকগাঁক করছে? আচ্ছা কসাক বন্ধুরা এসব হৈ-চৈয়ের কী মানে হয় বল তো? কাকে তোমরা ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করতে চাও? সে ক্ষমতা তোমাদের কে দিয়েছে? ক্যুইক মার্চ করে চলে যাও এবার!

কসাকদের একজন একটু উঁচু গলাতেই বললে, তা আপনি অমন গলাবাজি করছেন কেন? কতো রকম স্কোয়াড্রন কমাণ্ডারই তো দেখলাম! আমরা কি উঠোনে রাত কাটাব নাকি? সবাই বেরোও বলছি! বাস্তুহারাদের বের করে দেখার হুকুম আছে আমাদের ওপর, বুঝলেন? আর আপনি ঝামেলা বাধাচ্ছেন যত! আপনার মতো লোক ঢের দেখেছি!

বক্তার দিকে সোজা এগিয়ে গিয়ে গ্রিগর দাতে দাত চেপে বললে:

—আমার মতো লোক আগে কখনো ছাখোনি! তোমার মতো একটি গাধাকে আমি দুটি গাধা বানিয়ে দিই এই চাও নাকি! বেশ তাই করব!

সটকে পড়ো না! এ আমার পিস্তল নয়, তোমাদের লোকের কাছে পেয়েছি। এই নাও, এটা তাকেই দিয়ে দিও। কেটে পড়ো এবার তাড়াতাড়ি, নয়তো মারতে শুরু করে দেব, ছাল ছাড়িয়ে নেব একেবারে!—আস্তে করে কসাকটিকে ঘুরিয়ে সে ঠেলে দিল দরজার দিকে। মুখের ওপর উটের লোমের টুপিঢাকা এক প্রকাণ্ড চেহারার কসাক চিন্তিত কণ্ঠে বললে, দেব নাকি একে একটু শিক্ষা?—গ্রিগরের পেছনে দাঁড়িয়ে ওকে খুঁটিয়ে দেখছিল লোকটা। চামড়ার গোড়ালিওয়ালা ফেল্টের প্রকাণ্ড জুতোজোড়া ক্যাঁচকোঁচ করছিল এ-পা থেকে ওপায়ে শরীরের ভার বদল করতে।

তার দিকে ফিরে গ্রিগর আর আত্মসংবরণ করতে না পেরে হাতের মুঠো পাকাল। কিন্তু কসাকটি হাত তুলে বেশ নরম গলাতেই বললে:

—আমার কথা শুনুন, হুজুর; হুজুর কিংবা যাই বলুন নিজেকে। একটু সবুর। মুঠি পাকাবেন না! ঝামেলার দরকার নেই কোনো রকম। তবে আজকাল-কার দিনে কসাকদের বেশী ঘাঁটাবেন না। আবার সেই কঠিন সময় ফিরে আসছে, সেই ১৯১৭ সালের মতো। কখন কোন্ বেপরোয়া লোকের সঙ্গে ঝামেলা বাধিয়ে বসবেন! তারা আপনাকে দুখানা

নয়, পাঁচখানা বানিয়ে দেবে। অফিসার হিসেবে আপনার বুকের পাটা আছে তা দেখতে পাচ্ছি; আপনার কথা শুনে বুঝতে পাচ্ছি আমাদের ঘরেই আপনার জন্ম। তাই বলি আরেকটু সমঝে চলুন, নয় তো কী কাণ্ড করে বসবেন…।

গ্রিগর যার পিস্তল কেড়ে নিয়েছিল সে এবার চটা মেজাজে বললে :

—নাও, নাও, অত আর বন্দনা গাইতে হবে না! চলো পাশের বাড়িতে এবার। –সে-ই প্রথম পা বাড়াল দরজার দিকে। গ্রিগরকে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় তার দিকে একবার আড়চোখে চেয়ে সে কৃপা দেখিয়ে বললে, তোমাকে নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না আমরা, অফিসার, নইলে নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দিতাম।

গ্রিগর বিদ্রূপভরে ঠোঁট উল্‌টে জবাব দিলে :

—নাম তোমারই ভুলতে হত। ভাগো, ভাগো, নয় তো পাতলুন খুলে নেব। হুঁ! নাম ভোলাবার গোঁসাই! কোন দুঃখে যে পিস্তলটা ফিরিয়ে দিলাম। তোমার মতো বাহাদুরদের পিস্তল না রেখে ভেড়ার চামড়া পরে থাকা উচিত।

আরেকজন কসাক এতক্ষণ কোনো কথাবার্তার মধ্যে যোগ দেয়নি, এবার সে চুকচুক করে ঠোঁটে আওয়াজ করে বললে, চল, চল ভাইসব। মরুক গে চুলোয় যাক। ময়লা ঘাঁটতে গেলেই গন্ধ ছড়াবে, জানা কথা।

শাপশাপান্ত দিতে দিতে কসাকরা চলে গেল বরফে-জমে-যাওয়া শক্ত বুটের ঠোক্কর তুলে। গ্রিগর বাঁদির বাচ্চাকে কড়া হুকুম দিলে :

—আবার যেন খবরদার ওই দরজা খুলো না! ধাক্কাধাক্কি করে আপনিই চলে যাবে। যদি না যায়, তখন আমায় ডেকো।

ভিয়েরখ্‌নে চিরস্ক্‌-এর যে-সব লোক গোলমাল শুনে জেগে উঠেছিল তারা এবার নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় আলাপ জুড়ে দিয়েছে।

একজন বুড়ো দুঃখ করে বলছিল, আজকাল শৃঙ্খলা-টিঙ্খলা তো চুলোয় গেছে! অফিসারদের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলে যেন তারা সব কুত্তীর বাচ্চা! আগেকার দিন হলে এসব চলত না। শাস্তি খাটিয়ে হাড়মাস আলাদা করে ছাড়ত।

—কথা বলে? কথা বলতে দেখলে কোথায়? লড়াইয়ের জন্য কেমন তৈরি হচ্ছিল তা দেখনি? লোমশ টুপি-ঢাকা ওই আঁচ্ছা ঝাউগাছটা বলছিল, 'দেব নাকি এক ঘা!' তাতেই বোঝ কী দরের বেপরোয়া এরা সব।

কসাকদের একজন প্রশ্ন করে, অত সহজে ওদের ছেড়ে দিলে যে বড়, গ্রিগর পান্তালিয়েভিচ?

গ্রিগর ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি হেনে ওদের কথাবার্তা শুনছিল। জোব্বাকোটটা গায়ে চড়িয়ে সে জবাব দিল :

—তা, কী করতে হবে ওদের নিয়ে? ওরা এখন শাসনের বাইরে, কারুর কাছেই বশ মানবে না। দল পাকিয়ে ঘুরে বেড়ায়, মাথার ওপর কেউ নেই। কে ওদের বিচার করবে আর কেই বা চালাবে? ওদের কমাণ্ডার শুধু তারাই যারা ওদের চেয়ে রাশভারি! আমার মনে হয় না ওদের গোটা পল্টনের মধ্যে একজনও কেউ অফিসার আছে। অমন একেকটা স্কোয়াড্রন দেখেছি যারা একেবারেই বেওয়ারিশ। যাক্ এবার ঘুমোনো যাক্।

আক্সিনিয়া ফিসফিস করে বলে:

—কিন্তু ওদের সঙ্গে লাগতে গেলে কেন গ্রিশা? এসব লোকের সঙ্গে গোলমাল বাধিও না, ভগবানের দোহাই! তোমায় মেরে‌-ফেলতে বাধবে না কাফেরগুলোর!

—তুমি ঘুমোও। কাল খুব ভোরে উঠতে হবে। কেমন বোধ হচ্ছে এখন? একটু ভালো?

—না, ঠিক আগের মতোই।

—এখনও মাথা ধরা রয়েছে?

—হ্যাঁ। ভয় হয় আর বোধহয় খাড়া হয়ে উঠতে পারব না…।

গ্রিগর হাতের তেলোটা ওর কপালে রেখে নিঃশ্বাস ফেলে বললে:

—উঃ গা যেন পুড়ে যাচ্ছে একদম? তা হোক, তুমি ঘাবড়িও না। তোমার স্বাস্থ্য ভালো, সেরে উঠবে ঠিকই!

কোনো জবাব দিলে না আক্সিনিয়া। পিপাসায় ওর ছাতি ফেটে যাচ্ছিল। কয়েকবার গিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল। বিচ্ছিরিরকম গরম জল খেল কয়েক ঢোক, তারপর কোনোরকমে গা-বমি আর মাথা ঘোরা ভাবটা সামলে নিয়ে শুয়ে পড়ল আবার কম্বলের ওপর।

সে রাতে আরো চারটে দল এসেছিল সে বাড়িতে আস্তানার খোঁজে। তারা দরজায় রাইফেলের কুঁদো ঠুকে, জানালার খড়খড়ি তুলে ধাক্কাধাক্কি করে অবশেষে বিদায় নিল বাড়িওয়ালার চিৎকার শুনে। গ্রিগরের কায়দাটা শিখে নিয়ে বাড়িওয়ালা সিঁড়ি-দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়ছিল, ভাগো এখান থেকে। ব্রিগেডের সদর দপ্তর এটা!

ভোরে উঠে গ্রিগর আর প্রোখর ঘোড়ায় জিন চাপায়। আকসিনিয়া কোনো রকমে বাইরে যাবার পোশাকটা গলিয়ে নিয়ে উঠোনের দিকে যায়। তখন সূর্য উঠছে। চিমনি থেকে ওঠা পাতলা ধূসর ধোঁয়া নীল আকাশের গায়ে ছড়িয়ে পড়েছে। বেড়াগুলোর ওপর ঘন তুষারের আস্তর। চালাঘরের ছাতেও জমেছে বরফ। ঘোড়াদের গা থেকে ধোঁয়া উঠছে।

গ্রিগর আকসিনিয়াকে স্লেজে তুলে দেয়। বলে, একটু শোবার চেষ্টা করতে পার দেখ! খানিকটা আরাম পাবে হয়তো।

রাজী হয়ে মাথা ঝাঁকায় আকসিনিয়া। গ্রিগর ওর পা-দুটো যত্ন করে ঢেকে দেবার সময় আকসিনিয়া একবার সকৃতজ্ঞ দৃষ্টি মেলে তাকায় ওর দিকে, তারপর চোখ বোজে।

দুপুর বেলায় বড় সড়কটা ছেড়ে দুমাইল ভেতরে এক গ্রামে গিয়ে যখন ওরা দাঁড়ায় ঘোড়াদের দানাপানি দেবার জন্য, তখন আর স্লেজ ছেড়ে ওঠার ক্ষমতা নেই আকসিনিয়ার। গ্রিগর হাত ধরে তুলে ওকে এক বাড়ির ভেতর নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেয়। বাড়ির গিন্নি ওদের খাতির করে বিছানা ছেড়ে দিয়েছিল।

আকসিনিয়া কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে তাই লক্ষ্য করছিল গ্রিগর। মাথাটা ওর ওপর ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করলে, খারাপ লাগছে খুব, না গো?

জোর করে চোখ মেলে একবার ওকে ঝাপসা চোখে দেখে আকসিনিয়া ফের ঝিমিয়ে পড়ল একটা অর্ধচেতন তন্দ্রার মধ্যে। কাঁপা হাতে মাথার ওপর থেকে ওড়নাটা সরালো সে। গাল দুটো বরফের মতো ঠাণ্ডা কিন্তু কপালটা যেন ওর আগুন। রগের দুপাশে ছোট বরফের দানা জমেছে, সেই সঙ্গে ঘামের সরু ফোঁটা। সন্ধ্যের দিকে একেবারেই জ্ঞান হারাল সে। খানিক আগে কেবল জল খেতে চেয়েছিল ফিসফিস করে: একটু ঠাণ্ডা জল দেবে? একটু গলা বরফ।—তারপর এক মুহূর্ত থেমে আবার অস্পষ্ট কণ্ঠে বললে: গ্রিশাকে ডাকো!

—এই তো আমি। কী চাই সিনিয়া মণি?—গ্রিগর ওর হাতটা হাতে নিয়ে বুলিয়ে দিতে লাগল একটা অপ্রতিভ লাজুক ভাব করে।

—আমায় ছেড়ে যেও না গ্রিশা লক্ষ্মীটি!

—তোমায় ছেড়ে আমি যাব না। কিন্তু ও কথা কেন তুমি ভাবছ?

—এই অচেনা অজানা দেশে আমায় ছেড়ে যেও না। এখানেই মরব তাহলে।

প্রোখর ওকে জল খেতে দিলে। তামার মগে শুকনো ঠোঁট ঠেকিয়ে ও তেষ্টাভরে কয়েক ঢোঁক জল খেলে, তারপর একবার গুঙিয়ে উঠে মাথাটা এলিয়ে দিলে বালিসের ওপর। মিনিট পাঁচের মধ্যেই শুরু হল অসংলগ্ন আর জড়িতকণ্ঠে প্রলাপ। মাথার কাছে বসে গ্রিগর শুধু কয়েকটা কথা ধরতে পারলে: আমায় স্নান করতে হবে···একটা নীল কাপড়···তাড়াতাড়ি··· —অসংলগ্ন কথাগুলো শেষ দিকে কেমন ফিসফিসানির মধ্যে মিলিয়ে গেল। প্রোখর মাথা নেড়ে আপশোসের সুরে বলছিল:

কতবার তোমায় মানা করলুম ওকে সঙ্গে করে আনতে। এখন কী করবে বল? শাস্তি ছাড়া এ আর কিছু নয়, ধম্ম-কথা বলছি! এখানেই

কী রাতটা কাটাব? কী গো, কালা হয়ে গেলে নাকি? জিজ্ঞেস করি: এখানেই রাত কাটাবে না এগুবে?

কোনো জবাব দেয় না গ্রিগর। গুটিসুটি হয়ে বসেছে সে, আকসিনিয়ার ফ্যাকাশে মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি সরাচ্ছে না একবারও। বাড়ির গিন্নি অতিথিবৎসল সহৃদয় মানুষ, চোখের ইশারায় আকসিনিয়াকে দেখিয়ে সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলে প্রোখরকে:

—ওঁর বউ বুঝি? ছেলেপুলে আছে?

—হ্যাঁ। ছেলেপুলে আছে তো বটেই; সৌভাগ্য ছাড়া আর সব কিছুই আছে।—বিড়বিড় করে প্রোখর জবাব দেয়।

গ্রিগর উঠোনে গিয়ে একটা স্লেজের ওপর বসে সিগারেটের পর সিগারেট টেনে চলে। আকসিনিয়াকে এই গাঁয়েই রেখে চলে যেতে হবে। ওকে সঙ্গে নেয়া মানে ওর মরণ ডেকে আনা। সেটা সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। বাড়ির ভেতর গিয়ে সে আবার বিছানার ধারে বসে।

প্রোখর বলে, রাতটা এখানেই কাটাব, কী বল?

—হাঁ। কালকের দিনটা বোধ হয় দেখতে হবে।

খানিক বাদে এল বাড়ির কর্তা। বেঁটে খাটো রুগ্ন চাষী, চোখদুটো ধূর্ত, চঞ্চল। একখানা পা হাঁটু অবধি কাটা। কাঠের পা-টা ঠুকঠুক করে সে চট্ করে টেবিলে উঠে বসল। বাইরের পোশাকটা খুলে আড়চোখে প্রোখরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে:

—তাহলে ভগবান্ অতিথি পাঠালেন আমাদের ঘরে। কোত্থেকে আসা হচ্ছে?—জবাবের অপেক্ষা না করেই গিন্নিকে হুকুম করলে, চট করে আমায় খেতে দাও দিকি কিছু! ভয়ানক হাঁপিয়ে পড়েছি।

অনেকক্ষণ ধরে তারিয়ে তারিয়ে খেল লোকটা। চঞ্চল চোখদুটো মাঝে মাঝে প্রোখর আর আকসিনিয়ার নিশ্চল দেহটার ওপর গিয়ে পড়ছিল। গ্রিগর বড়ো ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তাকে নমস্কার জানালে। লোকটা কথা না বলে শুধু মাথা নেড়ে জিজ্ঞেস করলে:

—পেছু হটে যাওয়া হচ্ছে বুঝি?

—হ্যাঁ।

—তাহলে হুজুরের লড়াই যথেষ্ট করা হয়েছে?

—তাই মোটামুটি।

—উনি কে? আপনার পরিবার?—আকসিনিয়ার দিকে দেখিয়ে বললে লোকটি।

—হ্যাঁ।

—তা ওঁকে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছেন কেন? আমরা শোবো কোথায়?—অসন্তুষ্টভাবে গিন্নির দিকে তাকাল সে।

—ওঁর অসুখ করেছে যে ভানিয়া। বড্ডো মায়া হচ্ছিল আমার।

—মায়া! সকলের ওপর অত মায়া দেখালে চলবে না। পালে পালে আসছে সব দেখতে পাচ্ছ না! আপনারা কিন্তু বড্ডো ভিড বাডাচ্ছেন হুজুর!

কর্তা-গিন্নির দিকে তাকিয়ে বুকে হাত রেখে গ্রিগর অনুরোধ জানালে .

—দোহাই তোমাদের! যিশুর নামে বলছি, আমার বিপদে একটু সাহায্য কর ভাই। ওকে এখন সঙ্গে করে নিয়ে গেলেই মারা যাবে। তোমাদের কাছে যদি ওকে রেখে যেতে পারতাম। তোমাদের আমি তার জন্য পয়সা দেব, যত খুশী বল। সারা জীবন মনে করে রাখব তোমাদের দয়ার কথা। আর 'না' বোলো না ভাই, একটু দয়া কর!

—কথা বলতে বলতে গ্রিগরের গলার স্বরে প্রায় আকুতির মতো একটা করুণ মিনতির স্বর ফুটে উঠেছিল।

প্রথমে কর্তা সরাসরিই অস্বীকৃতি জানায়। বলে, এখন বাগবাগী মানুষকে দেখার সময় নেই। তাছাড়া জায়গাও নেই ঘরে। কিন্তু পরে খাওয়া শেষ করে উঠে সে বলে

—আসল কথাটা হল, খামখা কে আর সেবাযত্ন করতে হবে বলুন? কিন্তু ওকে দেখাশোনা করলে কত পাব? আমাদের যে ঝামেলা পোয়াতে হবে তার জন্য কত দিতে আপনি রাজী?

গ্রিগর পকেট থেকে তার সমস্ত টাকা বের করে এগিয়ে দিল লোকটার দিকে। জার সরকারের নোটের তাড়া হাতে নিয়ে আঙুলে থুথু দিয়ে লোকটা গুনল টাকাগুলো। তারপর বলল

—কিন্তু নিকোলাসের টাকা নেই সঙ্গে?

—না।

—হয়তো কেরেনস্কি কবল আছে? এ জিনিসে তত ভরসা নেই

—কেরেনস্কিও আমার কাছে নেই। যদি বল তো ঘোড়াটা রেখে যাই। লোকটা খানিকক্ষণ ভেবেচিন্তে শেষে জবাব দিলে না। ঘোড়া অবিশ্যি নিতে পারতাম। আমাদের চাষীদের কাছে ঘোড়ার দাম সব চাইতে বেশী। কিন্তু যা দিনকাল তাতে কোনো লাভ হবে না। শ্বেতরক্ষী না নেয় তো লালফৌজ কেড়ে নেবেই। এ থেকে আমাদের কোনো ফয়দাই হবে না। এই তো একটা ছোট্ট ঘুড়ী পেয়েছি সেদিন, সেও তো চোখের পলক না ফেলতে একদিন টেনে নিয়ে যাবে ওরা।—চুপ করে লোকটা ভাবতে থাকে। তারপর যেন একটা কৈফিয়ত দেবার সুরে যেন বলে·

—ভাববেন না যে আমি খুব লোভী। ঈশ্বর না করুন! কিন্তু আপনি নিজেই বিচার করে দেখুন হুজুর! উনি হয়তো একমাস বিছানায় থাকবেন কিংবা আরো বেশী তখন সে নানান খিদমত, এটা দাও সেটা দাও।

খাওয়াতে হবে রুটি, দুধ, এক-আধটা ডিম, মাংস। এ সবেই তো পয়সা লাগে: সত্যি নাকি বলুন? ওঁর কাপড় ধুতে হবে, ওঁকে চান করাতে হবে, হ্যানো ত্যানো…আমার গিন্নির এদিকে ঘর-গেরস্থালির কাজ, তার ওপর এসব দেখতে হবে। ব্যাপার অত সহজ নয়। কৃপণতা করবেন না, আরো কিছু দিন। আমি তো পঙ্গু, দেখতেই পাচ্ছেন একখানা পা নেই। না আছে আমার রোজগারের ক্ষমতা, না আছে পেটে খাবার! ভগবান্ যা জুটিয়ে দেন তাহাতেই চলে। রুটি আর মদটুকু…।

একটা অসাড় জ্বালাধরা একটা বিরক্তি নিয়ে গ্রিগর বলে:

—কৃপণতা আমি করছি না মশাই! টাকাকড়ি যা আমার সম্বল ছিল সবই তোমায় দিয়েছি। পয়সা ছাড়াই আমার চলে যাবে। আর কী চাই বলো?

লোকটা অবিশ্বাসভরে হেসে বলে: তাহলে আমায় সব টাকাই দিয়ে দিলেন আপনি? আপনার যা মাইনে তা দিয়ে তো জিনের থলি দুটো বোঝাই হয়ে যাবার কথা।

গ্রিগর এবার ফ্যাকাশে মুখ করে বলে, সোজা কথা বল অসুস্থ মেয়েটিকে তোমরা দেখবে কি না?

—না। এইরকমই যদি আপনি ভেবে থাকেন তাহলে আমাদের কাছে আর তাঁকে রেখে যাবেন না।—আহত কণ্ঠে বলে এবার লোকটা, ব্যাপারটা অত সহজ নয়, বুঝলেন…অফিসারের বউ তাতে আবার…পড়শিরা টের পেয়ে যাবে। ওদিকে কমরেডরা তো আপনাদের পেছু লেগেছে। তারা শুনলে আমাদের ওপরেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। না, সেক্ষেত্রে আপনি ওঁকে নিয়েই যান বরং। হয়তো পড়শীদের কেউ রাজী হতে পারে।—আপশোসের সুরে লোকটা গ্রিগরের হাতে টাকা ফিরিয়ে দেয়, তামাকের থলিটা বের করে সিগারেট পাকাতে শুরু করে।

গ্রিগর জোব্বাকোটখানা গায়ে চাপিয়ে প্রোখরকে বলে:

—ওর কাছে থাকো তুমি। আমি গিয়ে অন্য আস্তানা দেখছি।

দরজার ছিটকিনি খুলতে যাবে এমন সময় বাড়ির কর্তা তাকে আটকালো:

—একটু দাঁড়ান, হুজুর। অত তাড়া কিসের? আপনি কি মনে করেন এই অসহায় মহিলার জন্য আমার কষ্ট হয় না? ওঁর জন্য আমার খুবই দুঃখু হয়। আমি নিজে ফৌজে ছিলাম, আপনার পদমর্যাদার ওপর আমার শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু আর কিছু দিলে পারতেন না?

প্রোখর আর সামলাতে পারে না নিজেকে। মুখটা রাগে অন্ধকার করে সে গর্জন করে ওঠে:

—ওরে ঠ্যাং-কাটা ভিমরুল, আর কী দিতে পারি তোকে? তোর আরেকটা পাও ছেঁটে ফেলা উচিত, সেই তোর যোগ্য শাস্তি! গ্রিগর

পাস্তালিয়েছিচ! দিয়ে দিই একটু ধোলাই, তারপর আকসিনিয়াকে স্লেজে তুলে নিয়ে রওনা হই। শয়তানটা জাহান্নামে যাক!

প্রোখরের কথা শেষ অবধি কান পেতে শোনে, একবারও বাধা দেয় না লোকটা। তারপর বলে:

—দেখুন সেপাইরা, আমাকে অপমান করার কোনো কারণ নেই আপনাদের। সবাইকে মিলেমিশে যাতে কারুর গায়ে না লাগে এমনিভাবে সুরাহা করতে হবে ব্যাপারটা, শুধু আমায় গালিগালাজ করে কোনো লাভ হবে না। কেন মিছে গলাবাজি করছেন? আমি কি টাকার কথা বলছি? আমি সে উপ্‌রির কথা মোটেই ভাবিনি। আমি ভাবছিলাম আপনাদের হয়তো বাড়তি কিছু অস্তর-শস্তর থাকতে পারে, রিভলবার কিংবা রাইফেল।...আপনাদের কাছে এখন ওসব থাকা না-থাকা সমান। কিন্তু আমাদের কাছে ওর দাম অনেক বেশী। বাড়ি পাহারা দেবার জন্য আমাদের হাতিয়ারের দরকার। আমি সেই কথাই বলতে চাচ্ছিলাম। আপনি টাকা যেমন দিচ্ছিলেন দিন, সেই সঙ্গে রাইফেলটাও যোগ করুন, ব্যস মিটমাট হয়ে যাক। আপনার অসুস্থা স্ত্রীকে আমাদের কাছে রেখে যান; আমরা তাকে ঘরের লোকের মতোই দেখাশোনা করব। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি.

গ্রিগর প্রোখরের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলে:

—একে আমার রাইফেল আর কার্তুজগুলো দিয়ে দাও। তারপর ঘোড়ার সাজ পরাও।...আকসিনিয়া থাক...ভগবান্‌ দেখুন ওপর থেকে, ওকে তো আমি মরণের মুখে টেনে নিয়ে যেতে পারি না।

॥ পাঁচ ॥

দিনগুলো কেটে যাচ্ছে বৈচিত্র্যহীন, নিরানন্দ। আকসিনিয়াকে পেছনে ফেলে আসার পর থেকে গ্রিগরের যেন কোনো কিছুতেই আর আগ্রহ নেই। রোজ সকালে ও স্লেজে চড়ে, সীমাহীন তুষারঢাকা স্তেপের মাঠ বয়ে এগিয়ে চলে। আর রোজ সন্ধ্যায় খোঁজে রাতের আস্তানা, ঘুমোবার জন্য ঠাঁই। এইভাবে

চলে দিনের পর দিন। রণাঙ্গনে কী ঘটছে তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই গ্রিগরের। ও বুঝতে পেরেছে সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধ যেটুকু ছিল তা এখন ভেঙে পড়েছে, কসাকদের মধ্যে পনেরো-আনারই কোনো উৎসাহ নেই নিজেদের এলাকাটুকুও রক্ষা করার। সমস্ত রকম লক্ষণ বিচার করলে বলা যায় শ্বেতরক্ষী ফৌজের এই হল শেষ জঙ্গী তৎপরতা। তাছাড়া ডনের পারেই যদি ওরা লালফৌজের অগ্রগতিকে ঠেকাতে না পেরে থাকে, তাহলে কুবানের ধারে প্রতিরোধের কোনো সম্ভাবনাই নেই।

লড়াই থেমে আসছে। অতি দ্রুত সুনিশ্চিতভাবে ঘনিয়ে আসছে পরিসমাপ্তি। কুবানের কসাকরা হাজারে হাজারে রণাঙ্গন ছেড়ে ছুটছে বাড়িমুখো। ডনের কসাকরা একেবারে পর্যুদস্ত। যুদ্ধ আর টাইফাসের আক্রমণে হীনবীর্য দুই-তৃতীয়াংশ সৈনিক খুইয়ে স্বেচ্ছাসেবক ফৌজের আর ক্ষমতা নেই লালফৌজের চাপ সহ্য করার। লালফৌজ ক্রমাগত সাফল্য অর্জন করে এগিয়ে চলেছে।

উদ্বাস্তুদের মধ্যে গুজব, কুবান রাদার সদস্যরা নাকি সেনাপতি দেনিকিনের জানোয়ারসুলভ আচরণে ক্রমেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে। কুবান দল নাকি স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আয়োজন করছে। তাছাড়া লালফৌজের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও নাকি সমঝোতা হচ্ছে যাতে বিনা বাধায় সোভিয়েত বাহিনী ককেসাসের দিকে এগোতে পারে। কুবান আর তেরেকের বাসিন্দারা নাকি ডন-কসাক আর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সঙ্গে আদায় কাঁচকলায়—এমনি এক জোর গুজব চালু হয়েছে। একটা ডন ডিভিশনের সঙ্গে নাকি কুবান কসাক পদাতিক ফৌজের বড় রকমের লড়াইও হয়ে গেছে এর মধ্যে

একেকটা ঘাঁটিতে থেমে গ্রিগর কান পেতে খবরাখবর শোনে আর শ্বেতরক্ষীদের চূড়ান্ত সুনিশ্চিত পরাজয় সম্পর্কে ক্রমেই নিঃসন্দেহ হয়ে উঠতে থাকে। কিন্তু তবু একেক সময় মনে একটা ক্ষীণ আশা জাগে 'হয়তো বা শেষ পর্যন্ত বিপদের মুখে পড়ে শ্বেতরক্ষীদের ছিন্নবিচ্ছিন্ন, হতবল, দ্বন্দ্বব্যাপৃত শক্তিগুলো আবার একজোট হবে, আবার প্রতিরোধ সৃষ্টি করে লালবাহিনীকে পাল্টা আঘাত করে ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু রেস্তভের পতনের পর সে আশাও আর থাকে না। বাতায়িস্ক এর কাছাকাছি প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর লালফৌজ নাকি পেছু হটতে শুরু করেছে—এ কাহিনীও সে বিশ্বাস করতে পারে না। নিষ্ক্রিয় বসে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছে, কোনো জঙ্গী বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায় সে এখন। কিন্তু আরদালি প্রোখরকে মতলবটার কথা খুলে বলতে সে তো একেবারেই বেঁকে বসে।

—তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারেই লোপ পেয়েছে গ্রিগর পান্তালিয়েভিচ!
—প্রোখর চটে গিয়ে বলে, কী দায় পড়েছে আমাদের ওই নরকের মধ্যে মাথা গলানোর? নিজের চোখে দেখতেই তো পাচ্ছ পরিণতি কী দাঁড়াবে। শুধু

শুধু জানটা দেবে কেন বেঘোরে? নাকি তুমি ভেবেছ আমরা দুজনেই সব উদ্ধার করে দেব? যতক্ষণ না আমাদের গায়ে হাত পড়ছে কিংবা জোর করে পল্টনে ঢোকাচ্ছে ততক্ষণ এ পাশ থেকে যত তাড়াতাড়ি দূরে সরে পড়া যায় ততই মঙ্গল। না বাবা, তার চেয়ে বুড়োদের মতো চুপচাপ সরে পড়। গত পাঁচ বছরে তুমি আমি লড়াই তো কম করিনি। এখন অন্যরা হাত মকশো করুক। আবার লড়াইয়ে গিয়ে পঙ্গু হব, এই জন্যই কি ব্যায়রাম বাধিয়েছিলাম? বেঁচে থাক! রাজা হও তুমি! লড়াইয়ের কথা ভাবলেই আমার পেটের নাড়ি উল্টে আসে। তোমার যদি ইচ্ছে থাকে আবার যোগ দিতে পার, কিন্তু আমি যাচ্ছি না বাবা। তার চেয়ে বরং আমি হাসপাতালেই যাব যথেষ্ট আক্কেল হয়েছে।

দীর্ঘ নীরবতার পর গ্রিগর বললে

—তোমার যা মর্জি। আমরা কুবান অবধি যাব তারপর দেখব কী হয়।

প্রোখরের কায়দা-কানুনই আলাদা। জনবসতি এক-একটা জায়গায় এলেই সে ডাক্তারের খোঁজ করে। ওষুধের বড়ি আর মিকশ্চার জোগাড় করে। কিন্তু অসুখ সারিয়ে তোলার খুব আগ্রহ সে দেখায় না। ও শুধু একটা ওষুধ খেয়ে বাকি সব বড়ের ওপর ফেলে পা দিয়ে সযত্নে মাড়ায়। গ্রিগর জিজ্ঞেস করলে জবাব দেয় ব্যায়রামটা একেবারে সারিয়ে তোলার গরজ ওর নেই। শুধু খারাপের দিকে না গেলেই হল। তখন ওর স্বাস্থ্য পরীক্ষা হলে নতুন করে ফৌজে ঢোকার হাত থেকে বরং সহজে রেহাই পেয়ে যাবে। এক গ্রামের এক ওয়াকিবহাল কসাক ওকে পরামর্শ দিয়েছিল হাঁসের পায়ের নির্যাস ব্যবহার করতে। এর পর থেকে কোনো নতুন গ্রামে ঢুকলেই প্রোখর প্রথম যাকে পায় তাকেই জিজ্ঞেস করে ও মশাই বলতে পারেন এ গাঁয়ে হাঁস পোষা হয় কি না?—অবাক হয়ে সে-লোকটি যখন বলে যে কাছে-পিঠে পুকুর-টুকুর নেই বলে হাঁস পোষার কোনো কথাই ওঠে না তখন প্রোখর নিদারুণ বিদ্রূপ করে বলে—তোমরা কী মানুষ! জীবনে বোধহয় কখনো হাঁসের ডাক শোনোনি? স্তেপের মাঠের বলদ সব!—গ্রিগরের দিকে ফিরে সে তিক্তভাবে বিরক্তি প্রকাশ করে, নিশ্চয় পথে কোনো পাদরী পুরুতের মুখ দেখেছি। পোড়া অদৃষ্ট আমাদের। হাঁস পেলে যে-কোনো দামে কিনতে রাজী ছিলাম, কিংবা চুরিও করতে পারতাম। তাহলে অসুখটা সারত। কিন্তু এখন ব্যায়রামটার বড্ডো বেশী বাড়াবাড়ি দেখছি। আগে মজার ব্যাপার মনে হত, যদিও রাস্তায় ঘুমোতে পারতাম না। কিন্তু এখন দেখছি এ হতভাগা আপদ এক রীতিমতো শাস্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্লেজে বসে থাকতে পারি না।

গ্রিগরের তরফ থেকে কোনোরকম সায় মিলছে না দেখে অবশেষে চুপ করে প্রোখর। একটিও কথা না বলে একেক সময় সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলতে থাকে বরফ-কঠিন আলাপবিমুখ মৌনী বজায় রেখে।

এক ঘাঁটি থেকে আরেক ঘাঁটি পৌছাতে দিনগুলোকে মনে হয় ক্লান্তিকর দীর্ঘ। কিন্তু শীতের অন্তহীন রাতগুলো বুঝি-বা আরো দীর্ঘ। বর্তমানের ভাবনা আর অতীতের স্মৃতিমন্থনে ডুবে থাকবার প্রচুর সময় পেয়েছে গ্রিগর। ঘণ্টার পব ঘণ্টা ও কাটিয়ে দেয় নিজের অদ্ভুত আর সঙ্গতিহীন জীবনের দ্রুত অপসৃত দিনগুলোর কথা ভেবে। স্লেজে বসে দুঃসহ-নীরব এই তুষার-ঢাকা স্তেপের প্রান্তরেব দিকে ঝাপসা চোখে একদৃষ্টে চেয়ে অথবা রাতে কোনো দম-আটকানো ভিড-ঠাসা ছোট্ট ঘরে চোখ বুজে দাঁতে দাঁত চেপে শুয়ে থেকে ও শুধু আকসিনিযার কথাই ভাবে—সেই অচেনা গণ্ডগ্রামে রেখে আসা অসুস্থ অচেতন আকসিনিয়া; আর মনে পড়ে তাতারস্কে ওর আত্মীয়স্বজনদের কথাও। পেছনে ফেলে-আসা সেই ডন অঞ্চলে এখন সোভিয়েত শাসন কায়েম হয়েছে। একটা যন্ত্রণাদায়ক উদ্বেগ নিযে অনবরত গ্রিগর নিজেকে প্রশ্ন কবে, আমার জন্য ওবা মা বা দুনিয়ার ওপর খাবাপ ব্যবহার করবে না নিশ্চয়ই? সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ও প্রবোধ দেয় একটা কথা ভেবে—পথে আসতে আসতে কতবার শুনেছে, লালফৌজ নাকি সংযত-ভাবে মার্চ করে, দখলে-আসা কসাক-এলাকায় ওরা লোকদের সঙ্গে নাকি ভদ্র ব্যবহারই কবে। ধীরে ধীরে ওব সব উদ্বেগ কেটে যেতে থাকে। ওর বুড়ী মাকে যে ওরই জামিন হতে হবে সেটা অবিশ্বাস্য, একেবারেই যুক্তিহীন মনে হয়। ছেলেপিলেদের কথা মনে পডলে বুকটা যেন ব্যথায় মোচড দিয়ে ওঠে ক্ষণিকের জন্য—বোধহয় টাইফাসের হাত থেকে বাঁচবে না ওরা। তবু বোঝে যত ভালোই ওদের সে বাসুক না কেন, নাতালিয়ার মৃত্যুর পর আর কোনো দুঃখ ওকে তেমন প্রবলভাবে বিচলিত করতে পাববে না কোনোদিনও।

ঘোড়াদের একটু বিশ্রাম দেবার জন্য সাল্স্ক্ স্তেপের এক বাডিতে ওরা দুজন একনাগাড়ে চারদিন কাটিয়ে দিল। এ সময়টুকুর মধ্যে ওরা একাধিকবার আলোচনা করেছে এর-পর কী করা কর্তব্য। সে বাডিতে এসে ওঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রোখর জিজ্ঞেস করেছিল:

—আমাদের সেপাইরা কি কুবানে লডাই কববে, না ককেসাসের দিকে এগোবে? কী মনে হয় তোমার?

—জানি না। কিন্তু তাতে কী তোমাব খুব-একটা এসে যায়?

—বাঃ, বেশ কথা! এসে যাবে না? নিশ্চয়ই যায়। এভাবে তো আমাদের ঠেলতে ঠেলতে কোন্ কাফেরদের দেশে নিয়ে যাবে, সেই তুর্কীদের রাজত্বে, তখন বেরুবে মজা!

গ্রিগর বিরক্তির স্বরে জবাব দেয়, আমি দেনিকিন নই। কোথায় আমাদের টেনে নিয়ে যাবে সে-কথা আমায় জিজ্ঞেস কোরো না।

—জিজ্ঞেস করছি এইজন্য যে গুজব শুনলুম ওরা নাকি কুবান নদীর কাছে আত্মরক্ষার জন্য লড়বে, তারপর বসন্তকালে রওনা দেবে বাড়ির দিকে।

গ্রিগর বিদ্রূপভরে হেসে ওঠে, আত্মরক্ষার জন্য কে লড়বে?

—কেন, কসাকরা আর ক্যাডেটরা। আর কে আছে?

—যত সব বাজে কথা! ওদের দলে তো তুমিও ছিলে; দেখতে পাও না আশেপাশে কী ঘটছে? সবাই কেটে পড়ছে যত তাড়াতাড়ি পারা যায়, এখন আবার দুশমনকে ঠেকাবার গরজ কার?

প্রোখর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, আমাদের যা করুণ অবস্থা সে তো দেখতেই পাচ্ছি চোখে, তবু যেন বিশ্বাস হতে চায় না। তবে, ধর যদি বিদেশ-বিভুঁয়ে গিয়েই উঠতে হয় আর কাঁকড়ার মতো একতরফা চলতেই হয়, তাহলে কী করবে? যাবে?

—তুমি কী করবে?

—আমার কথা হল: তুমি যেখানে আমিও সেখানে। সবাই যদি যায় তো আমি আর কেন একা পেছনে পড়ে থাকব?

—ঠিক সেই কথা আমিও ভাবছিলাম। একবার যদি ভেড়ার পালে পড়েছ, তো ভেড়ার পেছু-পেছুই চলতে হবে!

—ওরা মানে ওই ভেড়ার পাল তো মাঝে মাঝে বেজায়গায় নিয়ে গিয়ে বেকুব বানিয়ে দেয়। ওসব কথা ছাড়ান দাও। আসল কথা যা তাই বল শুনি।

—ঘ্যানর ঘ্যানর কোরো না বাপু। যখন ওখানে যাবো তখন দেখা যাবে। আগে থাকতেই কেন ঝামেলা বাড়ানো?

—যাক্ তবে, তথাস্তু! আর কিছু জিজ্ঞেস করব না।—প্রোখর হার মানে।

কিন্তু পরদিন ঘোড়া বের করতে গিয়ে সে আবার আগের কৌতূহলের টানে। একটা উকোনঠ্যাঙার হাতল খুব মন দিয়ে যেন দেখছে এমনি ভান করে কথায়-কথায় জিজ্ঞেস করে, 'সবুজ' দলের নাম শুনেছ?

—হ্যাঁ, কী হয়েছে ওদের?

—এই যে সব 'সবুজ' গজিয়েছে এরা কারা? কাদের দলে এরা?

—'লাল'দের।

—তাহলে ওদের 'সবুজ' বলে কেন?

—ভগবান্ জানেন! হয়তো বা ওরা বনবাদাড়ে লুকিয়ে থাকে, তাই ওদের বলে 'সবুজ'।

অনেকক্ষণ কী ভেবে ইতস্তত করে জানায় প্রোখর আচ্ছা, তুমি আমি যদি এই সবুজের দলে ভিড়ি, তাহলে?

—খুব একটা ইচ্ছে আমার নেই।

—কিন্তু 'সবুজ' না হলে তো দেখছি ঘরে ফেরার কোনো রাস্তা নেই, কী বলো? লড়াই না চাইলে, আর সেপাইদের ঘরে ফিরতে দিলে, তা তারা সবুজ শয়তানই হোক, আর নীল বা হলদে শয়তানই হোক, আমার কোনো আপত্তি নেই।……

গ্রিগর উপদেশ দেয়, আরো কিছুদিন সবুর কর, হয়তো বা ওইরকমই কিছু ঘটে যাবে!

জানুয়ারির শেষ। কুয়াশা-ঢাকা বরফ-গলা এক দুপুরে গ্রিগর আর প্রোখর বেলায়াগ্লিনা গ্রামে এসে হাজির হল। গাঁয়ে ভিড় করেছে পনেরো হাজার বাস্তহারা, তার মধ্যে অর্ধেকেরই আবার টাইফাস ব্যামো। ছোট ইংলিশ ওভারকোট, খাটো চামড়ার কোর্তা, আর লম্বা ককেসীয় কোট পরে কসাকরা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে আস্তানা আর ঘোড়ার খাবারের খোঁজে। সবত্র ছোটাছুটি করছে ঘোড়সওয়ার আর স্লেজগাড়ি। প্রত্যেক বাড়ির উঠোনে জাব্‌নার গামলা ঘিরে ডজন ডজন শুঁটকো ঘোড়া করুণভাবে বিচালি চিবোচ্ছে। রাস্তায় গলিতে পরিত্যক্ত স্লেজগাড়ি, ফৌজী মালগাড়ি, গোলাবারুদের বাক্স। রাস্তা ধরে চলতে চলতে প্রোখর বেড়ার ধারে বাঁধা একটা উঁচু ঘোড়া দেখে বললে:

—আরে, এ যে আন্দ্রিয়ুশার ঘোড়া! তাহলে তো তাতারস্কের লোকরা নিশ্চয় এখানে আছে।—টপ করে স্লেজ থেকে নেমে প্রোখর বাড়ির ভেতর ঢুকল খোঁজ নিতে।

ক মিনিট বাদে প্রোখরের জ্ঞাতিভাই আর প্রতিবেশী আন্দ্রেই তপল্‌স্কফ্ বেরিয়ে এল ভেতর থেকে—কাঁধে জোব্বাকোটখানা ফেলে। প্রোখরের সঙ্গে গম্ভীর চালে লম্বা পা ফেলে সে এগিয়ে এল স্লেজের দিকে। ঘোড়ার ঘামের গন্ধমাখা কালো হাতখানা গ্রিগরের দিকে সে বাড়িয়ে দিল।

গ্রিগর জিজ্ঞেস করে, সঙ্গে আমাদের গাঁয়ের লোকজন আছে?

—সবাই মিলেই দুর্ভোগ পোয়াচ্ছি।

—তা, কীরকমভাবে এলে?

—আর সবাই যেমন এসেছে। রাতে একেক জায়গায় থামি আর মানুষজন ঘোড়া পেছনে ফেলে আসি…

—আমার বাবা বেঁচে আছেন তো সুস্থ শরীরে?

গ্রিগরের মাথার ওপর দিয়ে শূন্য দৃষ্টি মেলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তপল্‌স্কফ্:

—খারাপ খবর, গ্রিগর পান্তালিয়েভিচ,… খুব খারাপ…তোমার বাপের

নাম করে ভগবানকে ডাক: কাল সন্ধ্যায় তার আত্মা ঈশ্বরের কাছে আশ্রয় নিয়েছে। মারা গেছে…

ফ্যাকাশে হয়ে গ্রিগর বললে, কবর হয়েছে ?

—তা বলতে পারি না। এখন অবধি ও দিকটায় যাওয়া হয়নি আজ। তোমাকে বাড়ি দেখিয়ে দিচ্ছি।…ডানদিক দিয়ে চল, কোণ থেকে ওই চার নম্বর বাড়িখানা।

পাতটিনের চাল দেয়া একটা বড় বাড়ির সামনে এসে হাজির হয় গ্রিগর; বেড়ার ধারে ঘোড়া রোখে। তপল্স্কফ্ বললে সোজা উঠোনের মধ্যে ঢুকে পড়তে।

ফটক খোলবার জন্য স্লেজ থেকে নেমে তপল্স্কফ্ এগোলো—এখানেও বেশ ভিড়, প্রায় জনা কুড়ি লোক। তবে কোথাও জায়গা মিলে যাবে তোমার।

ভয়ানক গুমোট ঘরটার মধ্যে প্রথম ঢুকল গ্রিগরই। মেঝের ওপর গা ঘেঁষাঘেঁষি করে শুয়ে বসে আছে গ্রামের পরিচিত লোকজন। কেউ জুতো কেউ জিনসাজ মেরামত করছে। বুড়ো বেস্খে্ভ্নফ্ সমেত তিনজন যাদের সঙ্গে পান্তালিমন এসেছিল, তারা টেবিলের ধারে বসে সুপ্ খাচ্ছে। গ্রিগরকে দেখে কসাকরা উঠে দাঁড়িয়ে সমস্বরে ওর নমস্কারের জবাব দিলে।

গ্রিগর মাথা থেকে লোমের টুপিখানা খুলে চারদিকে চেয়ে বললে, বাবা কোথায় ?

বেস্খে্ভ্নফ্ ধীরে ধীরে জবাব দিলে, খারাপ খবর আছে পান্তলিমন প্রকোফিয়েভিচ্ মারা গেছে।—চামচেটা রেখে কোটের আস্তিনে মুখ মুছে সে ক্রুশপ্রণাম করে—কাল রাতে বিদায় নিলে। ঈশ্বর তাকে আশ্রয় দিন।

—জানি। কবর কি হয়ে গেছে এর মধ্যে ?

—না, এখনও নয়। আজ কবর দিতে যাবার কথা ছিল, শক্ত হয়ে উঠেনি এখনও। বড় ঘরটায় তাকে নিয়ে রেখেছি ঘরটা ঠাণ্ডা বলে। এই পথে। —পাশের ঘরের দরজাটা খুলে দিয়ে বেস্খে্ভ্নফ্ খানিকটা কৈফিয়তের সুরে বললে, একই ঘরের মধ্যে একসঙ্গে রাত কাটাতে চায়নি কেউ; অসোয়াস্তি লাগে তো, তাছাড়া এখানে সে ভালই আছে।…এ ঘরটা বেশী গরম নয়।

বড় ঘরটায় অনেকখানি জায়গা। শনের বিচি আর ইঁদুরের ঝাঁঝালো গন্ধ। একটা কোণে জোয়ার আর শন বোঝাই। বেঞ্চের ওপর ময়দা আর মাখনের পিপে। কামরার মাঝখানটিতে একটা ঘোড়া-কম্বলের ওপর পড়ে আছে পান্তালিমন প্রকোফিয়েভিচ। বেস্খে্ভ্নফ্‌কে একপাশে সরিয়ে গ্রিগর ঘরে ঢুকে বাপের পাশে এসে দাঁড়ায়।

বেস্খে্‌ভ্নফ্‌ চাপা গলায় বলে, দুহপ্তা অসুস্থ ছিল। সেই মেচেৎকা থেকেই ধরেছিল টাইফাস্‌। আর এই এখানে এসে বিশ্রাম পেলে তোমার বাপ···এই তো জীবন আমাদের· ।

ঝুঁকে পড়ে গ্রিগর ওর বাপের দিকে তাকায়। অতি পরিচিত মুখের রেখাগুলো অসুখে বদলে দিয়েছে, অদ্ভুতরকম অচেনা আর অন্যরকম মনে হচ্ছে যেন। পান্তলিমনের পাংশু বসা-গালদুটো পাকা দাড়িতে ভরে গেছে, মুখের ওপর ঝুলে পড়েছে গোঁপজোড়া, চোখদুটো আধবোজা। চোখের সাদা অংশের নীলচে পর্দায় সেই জলুস আর ঠিকরে-ওঠা প্রাণবন্ত ভাব নেই। বুড়োর নিচের চোয়ালখানা একটা লাল রুমাল দিয়ে বাঁধা —সেই লালের পাশে পাকা কোঁকড়া দাড়ি যেন আরো সাদা, আরো রুপোলী মনে হয়।

গ্রিগর হাঁটু গেড়ে বসে শেষবারের মতো মনোযোগ দিয়ে সেই মুখখানার ছবি মনের পটে এঁকে নিতে চেষ্টা করলে। আপনা থেকেই ভয় আর ঘৃণায় যেন শিউরে উঠল দেহটা ওর—পান্তালিমনের ধূসর ফ্যাকাশে মুখের ওপর, চোখের কোটরে আর গালের ভাঁজে ভাঁজে থিক থিক করছে উকুন। মুখের ওপর একটা জীবন্ত চলন্ত পর্দা টেনে দিয়েছে যেন উকুনের দল। দাড়ির মধ্যে ভিড় করে, ভুরুর মধ্যে আর কোর্তার শক্ত কলারে ধূসর আস্তরের মতো লেগে রয়েছে খালি উকুন।

* * * *

গ্রিগর এবং আরো দুজন কসাক শাবল দিয়ে কবর খোঁড়ে জমাট, লোহার-মতো-কঠিন কাদাটে মাটিতে। কয়েক ফালি তক্তা জুড়ে প্রোখর একটা সাদামাটা কফিন তৈরি করে। দিনের শেষে ওরা পান্তালিমনকে নিয়ে কবর দেয় স্তাভ্রোপোলের সেই ভিন্‌দেশী মাটিতে। ঘণ্টাখানেক বাদে গাঁয়ের ঘরে ঘরে যখন সবে বাতি দিতে শুরু করেছে, গ্রিগর বেলায়াগ্লিনা গ্রাম ছেড়ে চলল নভোপকরফস্কায়ার দিকে।

করোনভ্‌স্কি গাঁয়ে এসে ওর শরীরটা খারাপ লাগতে লাগল। বেলা দুপুর অবধি প্রোখর ডাক্তারের খোঁজ করতেই কাটিয়ে দিল। শেষ অবধি পেল এক আধামাতাল সামরিক সার্জেনকে, অতিকষ্টে তাকে রাজী করিয়ে নিয়ে এল ওদের আস্তানায়। জোব্বা-কোটটা না খুলেই ডাক্তার গ্রিগরকে পরীক্ষা করলে, ওর নাড়ি টিপে বিনা দ্বিধায় জানিয়ে দিলে:

—আবার টাইফাসে ধরেছে। ক্যাপ্টেন, তোমায় বলছি, এবার যাত্রাটা বন্ধ রাখ; নয়ত পথেই মরবে।

—থেকে যাব লালফৌজের অপেক্ষায়?—শুকনো হাসি গ্রিগরের মুখে।

—কেন, লালফৌজ তো এখনো বেশ খানিকটা দূরেই রয়েছে জানি।

—কিন্তু ওরা এসে পড়বে নিশ্চয়ই। 'ক

—তাতে সন্দেহ নেই। তবে আমার পক্ষে থেকে গেলেই ভাল। আমি হলে দুটো মন্দের মধ্যে যেটা কম মন্দ সেটাই বেছে নিতাম।

—না, যেমন করে হোক আমায় যেতেই হবে।—জোর গলায় বলে গ্রিগর উর্দিটা পরে নিল।—আমায় কিছু ওষুধ তো দেবেন নিশ্চয়ই?

—যেতে চাও যাও, সে তোমার খুশী। তোমাকে আমার উপদেশ দেবার কথা, দিয়েছি, এর পর কি করবে সে তোমার মর্জি। ওষুধ যদি দিতে হয়, সেরা ওষুধ হল বিশ্রাম আর যত্ন। ওষুধের নাম লিখে দিতে পারতাম কিন্তু ডাক্তারখানার লোক তো পালিয়েছে। আর আমার কাছেও ক্লোরোফর্ম, আয়ওডিন আর স্পিরিট ছাড়া কিছুই নেই।

—বেশ তা হলে কিছু স্পিরিটই দিন।

—স্বচ্ছন্দে। রাস্তায় তো এমনিতেই মরবে, স্পিরিটে কিছু ইতর-বিশেষ হবে না। তোমার আবদালিকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দাও। হাজার গ্রাম দিয়ে দেব। আমি মানুষ ভাল···।

নমস্কার জানিয়ে ডাক্তার বেরিয়ে গেল টলতে টলতে।

প্রোখর স্পিরিট নিয়ে এল। কোত্থেকে একটা জোড়া ঘোড়ার মালগাড়ি যোগাড় করে ঘোড়াগুলো সাজিয়ে সে ঘরে ঢুকে জানালে বিষণ্ণ ব্যাঙের স্বরে, মাননীয় হুজুর! আপনার গাড়ি হাজির।

তারপর আবার শুরু হল একের পর এক সেই ক্লান্ত একঘেয়ে দিনগুলো।

* * * *

ককেসাস্ পাহাড়ের পাদদেশ থেকে কুবান এলাকায় দ্রুত এগিয়ে আসছে দক্ষিণী বসন্ত। স্তেপের প্রান্তরে অকস্মাৎ শুরু হয় বরফ গলা। চকচকে কালো মাটি জেগে ওঠে এখানে ওখানে গলা বরফের ফাঁকে ফাঁকে। ছোট ছোট নদী ঝরনার রূপালি কণ্ঠে জাগে কলতান। রাস্তার ওপর ফুটে ওঠে গলা বরফের একেক ফালি জলাশয়। দরান্তের নির্মেঘ নীলে বাসন্তী আভা। কুবানের উদার আকাশ হয়ে ওঠে আরও গভীর, আরও সুনীল, আরও প্রতপ্ত।

দুদিনের মধ্যেই সূর্যের উত্তাপ এসে পড়ে শীতের গমক্ষেতে। চষা মাটি থেকে সাদা কুয়াশা ওঠে। কাদা রাস্তায় ছপ্ ছপ করে চলে ঘোড়াগুলো, পায়ের গিঁটের লোম অবধি কাদায় ডুবে যায়, চাকার গর্তে আটকে যায় পা। শিরদাঁড়া বেঁকিয়ে ঘামে নেয়ে উঠে তবু চলতে থাকে। ভেবে-চিন্তে প্রোখর ওদের লেজগুলো বেঁধে দেয়, মাঝে মাঝে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ওদের পাশে পাশে চলতে থাকে। জোর করে কাদা থেকে পা টেনে

হলে গজরায়—কাদা তো নয় আলকাতরা, মাইরি বলছি! ঘোড়াগুলো যে দু-দণ্ড গা শুকিয়ে নেবে সে যো-টুকু নেই।

গ্রিগর চুপচাপ। গাড়িতে শুয়ে কাঁপছে, গায়ে চাদর জড়িয়ে নিয়েছে। কিন্তু কারও সঙ্গে কথা বলতে না পেরে প্রোখর অস্বস্তি বোধ করছিল। গ্রিগরের পা কিংবা জামার আস্তিন টেনে ও বলতে থাকে—এ কাদা আর সহ্য হয় না। একবার বেরিয়ে এসে পরখ করেই দেখ। তখন মনে হবে তোমার অসুখই ঢের ভালো।

প্রায় শুনতে পাওয়া যায় না এমনিভাবে ফিসফিস করে গ্রিগর বলে, চুলোয় যাও!

রাস্তায় কারুর সঙ্গে দেখা হলেই প্রোখর শুধোয়—এরপর কাদা কি আরও বিশ্রী না এই রকমই?

ওরা হেসে তামাশা করে জবাব দেয়, আর প্রোখর জ্যান্ত মানুষের সঙ্গে দু একটা কথা বলতে পেরে খুশী হয়ে আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটে।

মাঝে মাঝে ঘোড়াগুলোকে দাঁড করিয়ে সে কপালের ঘাম মোছে—বাদামী কপালের ফোঁটা ফোঁটা সরস ঘাম। মাঝে মাঝে একেক জন ঘোড়-সওয়ার ওদের পেছনে ফেলে এগিয়ে যায়। প্রোখরের মনে হয় ওদের থামিয়ে দু-একটা কথা বলতে পারলে বেশ হত। নমস্কার জানিয়ে সে কেবলই শেষ কথাটুকু শুনিয়ে দেয়:

—শুধু শুধু এগিয়ে যাচ্ছ সময় নষ্ট করতে·····ওদিকে আর বেশী দূর যেতেও পারবে না। কেন পারবে না? কারণ কাদা ওদিকটায় এত বেশী যে ঘোড়াদের পেট অবধি ডুবিয়ে সাঁতরাতে হয়—মানে ওদিককার লোকদের মুখেই যেমনটা শুনেছি—গাড়ির চাকা ঘুরবে না, বেঁটে লোকরা তো রাস্তার মাঝখানেই পড়ে ডুবে যাবে। মিছে কথা বলছি না। বেঁড়ে কুত্তী মিছে কথা বলতে পারে, আমি নয়। আমরা কেন যাচ্ছি জিজ্ঞেস করছ? আমাদের আর উপায় কি! সঙ্গে এক ব্যারামী পাদ্রীকে নিয়ে যাচ্ছি, তিনি কি আর লালদের সঙ্গে থাকতে পারতেন······।

বেশীর ভাগ ঘোড়সওয়ার প্রোখরকে খোশমেজাজে গালাগাল করে চলে যায়। কেউ কেউ আবার দাঁড়িয়ে পড়ে ওর দিকে কঠিন দৃষ্টি হেনে দু'একটা অপমানসূচক মন্তব্য করে:

—গাধাগুলো তাহলে ডন ছেড়েও পালিয়ে আসছে? তোমাদের জেলার সবাই কি তোমাদেরই মতো?

দলছাড়া এক কুবান কসাক প্রোখরের উপর ভয়ানক চটে গেল এইসব আজেবাজে কথা বলে তাকে আটকে রাখবার জন্য। প্রোখরের মুখের উপর তার চাবুকটা প্রায় এসে পড়েছিল আর কি! কিন্তু এক অসাধারণ কৌশলে প্রোখর চট্‌ করে লাফিয়ে গাড়িতে উঠল, কম্বলের তলা থেকে

তার কারবাইনটা টেনে বের করে হাঁটুর উপর রাখল। কুবান কসাক প্রচণ্ড গালাগাল ঝেড়ে ঘোড়া হাঁকায়। এদিকে প্রোখর তখন হো হো করে হেসে পেছন থেকে হাঁক পাড়তে শুরু করেছে :

—এ তোদের জাবিৎসিন নয় যে ভুট্টাক্ষেতে লুকিয়ে জান বাঁচাবি। ওরে হাঁদা! বদ্ধির ঢেঁকি! ওরে ও ভুট্টার ছাতু! এদিকে ফিরে আয়! পেছনের কাপড় তোল্ নয়তো কাদায় লুটোবে। ওরে লেজ গুটিয়ে পালাচ্ছিস যে বড়? ভীতু মাগী! আমার কাছে টোটা নেই, নইলে তোকে যমের বাড়ি পাঠাতাম! চাবুকটা নামা, শুনতে পাচ্ছিস?

বিনা কাজে কয়েকদিন একঘেয়ে কাটিয়ে প্রোখরের মাথা প্রায় খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এইভাবে তার নিজস্ব কায়দায় খানিকটা আনন্দ কুড়োল সে।

* * * * * *

অসুখের প্রথম দিন থেকেই যেন স্বপ্নের ঘোরে দিন কাটাতে লাগল গ্রিগরের। মাঝে মাঝে অচৈতন্য হয়ে পড়ছিল আবার জ্ঞান ফিরে আসছিল। অনেকক্ষণ সংজ্ঞাহীন হয়ে থেকে চেতনা ফিরে আসার পর এমনি একটা মুহূর্তে প্রোখর ওর উপরে ঝুঁকে পড়ল।

গ্রিগরের ঝাপসা চোখের দিকে কাতর ভাবে চেয়ে বলল, এখনো বেঁচে আছ?

ওদের মাথার উপর সূর্য। ঘন নীল আকাশে কলরব তুলে কালো ডানা-ওয়ালা দাঁড়-কাকের ঝাঁক উড়ে যায়, কখনো একসঙ্গে ভিড় করে, কখনো ভাঙা ভাঙা মখমল কালো রেখায় দীর্ঘায়িত হয়। গরম মাটি আর কচি ঘাস থেকে একটা মাতাল গন্ধ ওঠে। ঘন ঘন নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রিগর লোভীর মতো বুক ভরে টেনে নেয় বসন্তের তরতাজা বাতাস। প্রোখরের গলার স্বর ওর কানে ঢোকে অতি ক্ষীণ হয়ে। আশেপাশের সব কিছু মনে হয় অবাস্তব, অবিশ্বাস্য রকম ক্ষুদ্রায়তন, অত্যন্ত সুদূর। ওদের পেছনদিকে বহুদূরে শোনা যায় কামানের চাপা গুরু গুরু আওয়াজ। কাছে পিঠে কোথাও একটা লোহালক্কড়ের মালগাড়ির চাকা তালে তালে সুর মিলিয়ে ঝকর ঝকর করে এগিয়ে আসছে, ঘোড়ার নাকঝাড়া আর চিঁহিচিঁহি ডাক, মানুষের গলার স্বরও কানে আসে। সেঁকা রুটি, খড় আর ঘোড়ার ঘামের ঝাঁঝালো গন্ধ আসে গ্রিগরের নাকে। যেন এক অন্য জগৎ থেকে এসব কিছু সাড়া জাগায় গ্রিগরের চেতনারাজ্যে। মনের সবটুক একাগ্রতা এনে ও প্রোখরের গলার আওয়াজ শুনতে চেষ্টা করে, প্রাণপণ প্রয়াসে বুঝতে পারে ওর আরদালি ওকে জিজ্ঞেস করছে

—একটু দুধ খাবে নাকি?

কোনোরকমে জিভটা সামান্য চালিয়ে গ্রিগর শুকনো ঠোঁট চাটে, বুঝতে

পারে একটা পরিচিত টাটকা স্বাদের ঘন ঠাণ্ডা পানীয় ওর মুখে ঢেলে দেয়া হচ্ছে। কয়েক চুমুকের পর ও দাঁতে দাঁত চাপে। প্রোখর ফ্লাস্কের ছিপি লাগিয়ে আবার ঝুঁকে পড়ে গ্রিগরের ওপর। খুব ভালো করে শুনতে না পেলেও কতকটা প্রোখরের শুকনো ঠোঁট নাড়া দেখেই গ্রিগর আন্দাজ করতে পারে ওর প্রশ্ন :

—তোমাকে এ গাঁয়ে রেখে গেলেই কি ভালো হত না? তোমার পক্ষে চলা এখন শক্ত হবে, কী বল?

গ্রিগরের মুখে যন্ত্রণা আর উদ্বেগের ভাব ফুটে উঠেছিল। আরেকবার ওর সবটুকু মনের জোর একজায়গায় করে ফিসফিসিয়ে বললে :

—আমায় নিয়ে চল · যতক্ষণ না মরি, নিয়ে চল সঙ্গে ··

প্রোখরের মুখ দেখে বুঝতে পারে ওর কথা শুনতে পেয়েছে সে। তাই আবার নিশ্চিন্ত হয়ে সে চোখ বোজে, চেতনাহীনতাকে মেনে নেয় যন্ত্রণার উপশম হিসেবে—কোলাহলমুখর অশান্ত এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে বিস্মৃতির ঘন অন্ধকারে তলিয়ে যায় সে।····

॥ ছয় ॥

আবিন্‌স্কায়া গ্রাম অবধি গোটা রাস্তাটায় গ্রিগরের কেবল একটি ঘটনার কথাই মনে পড়ে—সূচীভেদ্য অন্ধকার এক রাতে ওর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল কনকনে হাডকাঁপানো ঠাণ্ডায়। অনেকগুলো মালগাড়ি চলেছিল পাশাপাশি। গলার আওয়াজ আর চাকার একটানা খটখটে শব্দে বোঝা যাচ্ছিল গাড়ির সার নেহাত ছোটোখাটো নয়। যে গাড়িটাতে গ্রিগর চড়েছে-সেটা দলের মাঝামাঝি কোথাও। ঘোড়াগুলো হেঁটে হেঁটে চলেছে। প্রোখর জিভের আওয়াজ করে মাঝেমাঝে ভাঙা বসা-গলায় বলে ওঠে—এইও বাচ্চা! আর চাবুক হাঁকড়ায়। চামড়ার চাবুকের সাঁই-সাঁই আওয়াজ গ্রিগরের কানে আসে, ঢের পায় ঘোড়াগুলো আরো জোরে রশিতে টান দিয়েছে, কড়কড় করছে গাড়ির জোয়াল, আরো তাড়াতাড়ি ছুটেছে গাড়ি, মাঝে মাঝে সামনের ব্রিচ্‌কা গাড়িখানার পেছনে ঠোকর খেয়ে যাচ্ছে জোয়ালের ডাণ্ডাটা।

কোনোরকমে ভেড়ার-চামড়ার কম্বলটা টেনে গায়ে জড়িয়ে চিৎ হয়ে শোয় গ্রিগর। কালির মতো কালো আকাশে প্রকাণ্ড ভারী মেঘগুলো বাতাসের তাড়া খেয়ে দক্ষিণদিকে গড়িয়ে চলেছে। ক্বচিৎ একেকটা তারা মুহূর্তেকের জন্য মেঘের ছোট জানলার ফাঁকে হলদে শিখা জ্বালিয়ে উধাও হয়, তারপরেই দুর্ভেদ্য আঁধার আবার ঢেকে ফেলে স্তেপের তৃণ-প্রান্তর, টেলিগ্রাফের তারে বাতাসের কান্না জাগে, হঠাৎ দানাদানা গুঁড়ি-গুঁড়ি হালকা বৃষ্টি নেমে আসে মাটির বুকে।

রাস্তার ডানদিক ধরে একটা ঘোড়সওয়ার ফৌজের সারি এগিয়ে যাচ্ছিল। গ্রিগরের কানে এল দীর্ঘদিনের পরিচিত একটা ছন্দোময় ঐকতান—আঁটসাঁট করে বাঁধা কসাকী সরঞ্জামের টুংটাং আওয়াজ, কাদার ওপর অসংখ্য ঘোড়ার-খুরের তালে-তালে ছপছপ করে চলা। দুটো স্কোয়াড্রনের বেশী যায়নি, অথচ ঘোড়ার খুরের শব্দ এখনো কানে আসছে, তার মানে রাস্তার ধার দিয়ে নিশ্চয় একটা গোটা রেজিমেণ্ট চলেছে। নীরব স্তেপের মাঠে গান-গেয়ে-ওঠা পাখির মতো সামনে থেকে হঠাৎ দরাজ মোটা গলায় কে যেন গান ধরলে :

ও ভাই, নদীর দখিন ভাটিতে কামিশিন্স্কার পাবে,
সারাতভের ধু-ধু তেপান্তরে,
সবার সেরা দেশ ...

—প্রাচীন কসাক গান, অসংখ্য গলা এবার একসঙ্গে গেয়ে ওঠে। কিন্তু সবার ওপর ছাপিয়ে ওঠে উঁচু পর্দায় একটি পুরুষ-কণ্ঠ, আশ্চর্য শক্তি আর সৌন্দর্যমণ্ডিত। নিচু পর্দার কণ্ঠগুলো মিলিয়ে যাবার পরেও সেই ব্যঞ্জনাময় উচ্চকণ্ঠ কোথায় যেন অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ায়, আঁকড়ে ধরে হৃদয়ের মর্মস্থানটিকে। কিন্তু ততক্ষণে প্রথম গায়ক পরের কলিটুকু শুরু করে দিয়েছে :

সেই দেশে ছিল যতেক কসাক স্বাধীন-প্রাণ
ডন, গ্রেবেন আর ইয়াযিৎস্কের সুসন্তান

গ্রিগরের অন্তস্থলে কী যেন বিদীর্ণ হয়। একটা আকস্মিক কান্নার দমকে কেঁপে ওঠে ওর দেহ, গুমরে-ওঠা একটা বেদনা ওর গলা চেপে ধরে। কান্নাটা জোর করে চেপে ও উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে কখন গায়ক আবার শুরু করবে, তারপর ছেলেবেলার পরিচিত সেই কথাগুলো নিঃশব্দে আবৃত্তি করে চলে সেই লোকটির সঙ্গে সঙ্গে :

তিমোফেইয়ের ছেলে ঘেরমাক ছিল সদার আতামান,
লাভরেন্তেই-তনয় আসছিল আস্ত্রাখা সে কাপ্তান।

গায়ক গানের প্রথম কথা-কটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ির ভেতরকার কসাকরা কথাবার্তা থামিয়ে দিয়েছে, গাড়োয়ানরাও আর

ঘোড়াদের দাবড়াচ্ছে না, হাজার-হাজার গাড়ির সারি চলেছে একটা গম্ভীর স্পর্শকাতর নৈঃশব্দ্যের মধ্যে। গায়ক প্রত্যেকটি শব্দ আলাদা আলাদা উচ্চারণ করে একেকটা কলির প্রথম কথাগুলো গেয়ে চলে আর ফাঁকে-ফাঁকে শুধু শোনা যায় চাকার আওয়াজ, কাদার ওপর ঘোড়ার খুরের ছপছপানি। যুগ-যুগান্ত ডিঙিয়ে যে প্রাচীন গীত আজ অবধি চলে এসেছে, বিষাদ-গম্ভীর স্তেপের ভূমিতে তাঁর আধিপত্য চিরকালের। অনাড়ম্বর সহজ কথায় এ গান বর্ণনা করেছে কসাকদের স্বাধীন পূর্বপুরুষদের কথা—এককালে তাঁরা নির্ভীক বিক্রমে জারের ফৌজকে ধূলিসাৎ করেছিল। ছোট ছোট বোম্বেটে বজরায় চেপে তাঁরা ডন আর ভলগায় ঘুরে ঘুরে জারের জাহাজ লুঠ করত, সুদূর-সাইবেরিয়ার নির্বাসনকে তোয়াক্কা না করে সওদাগর মহাজন আর অভিজাত শাসকদের তারা "নিংড়ে নিত"। আর আজ সেই স্বাধীন কসাকদের উত্তরাধিকারীরা রুশ জনগণের সঙ্গে কলঙ্কময় যুদ্ধে একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে নির্লজ্জের মতো পলায়ন করছে আর বিষণ্ণ নীরব হয়ে শুনছে সেই সুমহান সংগীত।

রেজিমেন্ট এগিয়ে চলে। গাড়িগুলোকে ডিঙিয়ে গায়করা চলে গেছে বাস্তুহারাদের ছাড়িয়ে বহু দূরে। কিন্তু এর পরেও অনেকক্ষণ অবধি গাড়িগুলো চলতে থাকে একটা মোহাচ্ছন্ন নীরবতার মধ্যে। কোনো কথাবার্তা নেই, এমনকি ক্লান্ত ঘোড়াদের উদ্দেশ করে হাঁকডাক অবধি নয়। কিন্তু দূরের অন্ধকার থেকে গানটা তব ভেসে এসে ছড়িয়ে পড়ে ঠিক ডন নদীর বন্যার মতো সবদিক ছাপিয়ে: ওদের ছিল একপ্রাণ একই সুরে বাঁধা।

খর-রোদ গ্রীষ্মের উত্তাপ সে তো আর নেই।
তারপর এল যে তুহিন, ভাই, হিমের কঠিন কলে।
বল কোথা যাই, ভাই, কেমনে কাটাই ?
বড়ো দীর্ঘ, ইয়ায়িকের পথ যে সুদূর।
ভল্‌গার তীরে যদি ধাই তবু লোকে দেবে যে দুর্নাম।

কাজান শহরে হায়, সেখানেও আছে সেই জার ভয়ঙ্কর জার সেই দুরন্ত ভাসিলিয়েভিচ্‌ ....

এখন আর গায়কদের কণ্ঠ শোনা যায় না, শুধু সেই উচ্চগ্রামের সঙ্গত ঝঙ্কৃত হতে থাকে, থেমে গিয়ে আবার উচ্চকিত হয়ে ওঠে। একই রকম স্তব্ধ ভারাক্রান্ত নীরবতার মধ্যে সবাই কান পেতে শোনে।

যেন স্বপ্নের ঘোরে গ্রিগরের মনে হতে থাকে একটা গরম ঘরের মধ্যে ওর জ্ঞান ফিরে আসছে। চোখ না খুলেই ও টের পায় সারা শরীরটায়

পরিষ্কার বিছানার চাদরের একটা আরামদায়ক শুচিতা। কোনো ওষুধের উগ্র গন্ধ ওর নাকে ঠেকে। প্রথমে ভেবেছিল বুঝি হাসপাতাল। কিন্তু পাশের কামরা থেকে এল উদ্দাম পুরুষ কণ্ঠের হাসি, বাসনপত্রের আওয়াজ আর মাতাল গলার স্বর। পরিচিত মোটা গলায় কে যেন বলছে:

…আর তোমারও বুদ্ধির বলিহারি! আমাদের রেজিমেণ্টটাকে তোমার খুঁজে বের করা উচিত ছিল, আমরা সাহায্য করতাম। যাক্ এবার খেয়ে নাও এক ঢোঁক। কেন অযথা সময় নষ্ট করছ?

প্রোখর জবাব দিল কান্নাভরা স্বরে মাতালের মতো:

—হা ভগবান্, কেমন করে সে-কথা জানাব বল? ওর খেদমৎ করা কি চাট্টিখানি কাজ মনে কর? ছোট্ট বাচ্চাটির মতো মুখে ঢেলে দিয়ে খাওয়াতাম, দুধও খাইয়েছি, বুঝেছ, যিশুর দিব্যি! নিজে রুটি চিবিয়ে সে রুটি তার মুখে গুঁজে দিয়েছি। ছোরার ডগা দিয়ে তার দাঁতকপাটি আলগা করেছি। একবার তো গলায় দুধ ঢালতে না ঢালতে ওর দম আটকে মরবার দাখিল সে সব কথা ভাবতেও পারি না।

—কাল ওকে চান করিয়েছিলে?

—চান করিয়ে চুল আঁচড়ে দিয়েছি। ওর দুধের জন্যই সব খরচা করে বসে আছি।…আপশোসের কথা নয়, সব কিছু মানতে আমি রাজী-আছি। কিন্তু ওর খাবার চিবিয়ে ওকে হাতে করে খাইয়ে দেয়া। সে কী সোজা ব্যাপার বাপু। যদি বল সোজা, তাহলে পদের কথা ভুলে তোমায় মেরেই বসব হ্যাঁ।

গ্রিগরের ঘরের ভেতর প্রবেশ করল প্রোখর, খারলাম্‌পি ইয়েরমাকফ আর পিয়োত্রা বোগাতিরিয়েফ। পিয়োত্রার ধূসর 'কারাকুল' টুপি মাথার পেছনে ঠেলে দেয়া, মুখখানা টকটকে লাল। প্লাতন রিয়াব্‌চিকফ্ এবং আরো দুজন অপরিচিত কসাকও ছিল।

—জেগে আছে!—পাগলের মতো চিৎকার করে ইয়েরমাকফ এলোমেলো পা ফেলে গ্রিগরের দিকে এগিয়ে এল।

বেপরোয়া খোশমেজাজী মানুষ প্লাতন রিয়াব্‌চিকফ একটা বোতল ঝাঁকিয়ে কেঁদে চিৎকার করে চললে:

—গ্রিশ্কা! আদরের বুড়ো খোকা রে! মনে পড়ে চিরা নদীর ধারে কীভাবে আমরা ঘোড়া ছুটিয়েছিলাম? আর সে কী লড়াই! কোথায় গেল আমাদের সেই তেজ? সেনাপতিরা সব আমাদের কী বানিয়ে দিলে। আমাদের ফৌজের কী অবস্থা করলে ওরা? নির্বংশ হোক সব! তোমার জ্ঞান ফিরেছে? এই নাও, এক ঢোঁক খাও তো, এখুনি ভালো হয়ে যাবে। একেবারে খাঁটি ইস্পিরিট!

—এত করেও আমাদের ফাঁকি দিতে পারলে না!—ইয়েরমাকফ বিড়বিড়

করে বলে। . আনন্দে ওর কালো তেলতেলে চোখ দুটো ঝকমক করছে। গ্রিগরের বিছানার ওপর ধপ করে বসতে ওর ভারেই বিছানাটা ভাঙার জোগাড়।

গ্রিগর অতি কষ্টে চোখ ঘুরিয়ে কসাকদের পরিচিত মুখগুলো এক এক করে দেখে ক্ষীণ কণ্ঠে বলে :—আমরা কোথায় ?

—ইয়েকাতেরিনোদার দখল করেছি আমরা। শিগ্‌গিরই আরো পেছু হটে যাব! খেয়ে নাও, গ্রিগর পান্তালিয়েভিচ। পুরনো মিতে! উঠে পড় চটপট ভগবানের দোহাই! তোমাকে এভাবে শুয়ে থাকতে দেখে সহ্য হয় না আমার!—গ্রিগরের পায়ে পড়ে রিয়াব্‌চিকফ। কিন্তু বোগাতিরিয়েফ নিঃশব্দে হাসছিল, অন্যদের তুলনায় বেশী প্রকৃতিস্থ মনে হচ্ছিল তাকে। বেল্‌ট্‌ ধরে রিয়াব্‌চিকফকে সহজেই তুলে সে সাবধানে মেঝের্‌ ওপর নামিয়ে দিলে।

ইয়েরমাকফ শঙ্কিত কণ্ঠে বলে, ওর কাছ থেকে বোতলটা নিয়ে নাও। নষ্ট হয়ে যাবে জিনিসটা!

গ্রিগরের দিকে ফিরে দন্তবিকাশ করে মাতাল হাসি হেসে সে বলে: জান আমরা কী খাচ্ছি? ভিন্‌দেশে কসাকদের বাঁচতে হবে তো। তাই একটা মদের মালখানা লুট করেছিলাম যাতে সেটা লালদের হাতে না পড়ে। আর জিনিস যা পেলাম সে কী বলব! তুমি বললে বিশ্বাস করবে না···! রাইফেল ছুঁড়ে একটা চৌবাচ্চা ফুটো করলুম, ফোয়ারাব মতো বেরিয়ে এলো মদ।

চৌবাচ্চাটা বুলেট দিয়ে ঝাঁঝরা করে ফেললুম, একেকজন দাঁড়িয়ে গেল একেকটা ফুটোর সামনে টুপি, গামলা, আর বোতল ধরে, কেউ কেউ ওখানেই দাঁড়িয়ে আঁজলা ভরে পান করে নিলেন। মালখানার দুই প্রহরীকে তলোয়ারের ঘায়ে শেষ করে যখন ভেতরে ঢুকলাম তখন শুরু হল আসল খেল্‌। দেখলুম এক বেঁটেখাটো কসাক, সাহসী বলতে হবে, চৌবাচ্চার মাথা বেয়ে উঠেছে একটা বড় বালতি নিয়ে, ওপর থেকে তুলে নেবার মতলবে। কিন্তু বেটা চৌবাচ্চায় পড়ে গিয়ে ডুবল। কংক্রীটের মেঝে, মদ উপচে পড়ে আমাদের হাঁটু অবধি ঘর ভাসিয়ে দিয়েছে। আর কসাকরা সেই মদের ভেতর ঘুরে ঘুরে নদীতে ঘোড়া যেমন জল খায় তেমনি ঝুঁকে পড়ে পায়ের একেবারে নিচে থেকে চোঁ চোঁ করে খেতে শুরু করল। ওখানেই শুয়ে পড়ল কেউ কেউ। মদ খেতে খেতেই হয়তো কয়েকজন সাবাড হয়ে গেছে! আমরা অত হ্যাংলামি করিনি! খুব বেশী চাহিদা আমাদের নেই: বালতি পাঁচেক ধরে এমনি একটা পিপে গডাতে গড়াতে নিয়ে এলুম। ওই আমাদের যথেষ্ট। প্রাণভরে খাও গো বাছা! আমাদের 'ভদ্র' ডনের এমনিতেই নাভিশ্বাস। প্রাতনটা তো ডুবেই মরেছিল আর কি। মেঝের ওপর ছুঁড়ে

দিয়ে ওর ঠ্যাং ধরে ছিল ওরা। দুটো ঢোঁক গিলে প্রায় দম বন্ধ হয়ে মরে, এমন সময় আমি জোর করেই ওকে টেনে তুললাম!

প্রত্যেকের গা থেকে মদ, পেঁয়াজ আর তামাকের উগ্র গন্ধ। গ্রিগরের গা বমি-বমি, মাথা ঘোরার মতো লাগছে। একটা দুর্বল অবসাদখিন্ন হাসি হেসে সে চোখ বুজলে।

॥ সাত ॥

ইয়েকাতেরিনোদারেই বোগাতিরিয়েভের চেনা-জানা একটা লোকের বাড়িতে [illegible] শুয়ে কাটালো গ্রিগর। অসুখের পর ধীরে ধীরে সেরে উঠছে। তারপর, প্রোখরের ভাষায় "শরীরটাকে মেরামত" করে, আবিন্‌স্কায়া গাঁয়ে এসে প্রথম সে ঘোড়ায় চাপল অনেক দিন বাদে।

নভোরোসিস্ক শহর তখন খালি করা হচ্ছে। রুশ মহাজন, জমিদার, সেনাপতিদের পারবার-পরিজন আর প্রভাবশালী কূটনীতিজ্ঞদের জাহাজে করে তুর্কিদেশে চালান করা হচ্ছিল। প্রত্যেকটা জেটিতে দিনরাত জাহাজ বোঝাই। যুঙ্কার সেপাইরা জাহাজী কুলি সেজে স্টিমারের ওপর মাল তুলছে—সামরিক সরঞ্জাম আর বিশিষ্ট উদ্বাস্তুদের তোরঙ্গ বাকস ইত্যাদি।

ডন আর কুবানের কসাকদেরও ছাড়িয়ে আগেভাগে পৌঁছে এসেছিল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সেপাইরা। ওরাই প্রথম নভোরোসিস্কে আসে। জাহাজে ওঠার জন্য ভিড় জমিয়েছে সবাই। একটা ইংরেজ ড্রেড্‌নট্‌ জাহাজ বন্দরে লাগতে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কর্তারা বুদ্ধি করে তাতেই চেপে বসলেন। তনেল্‌নীয়ার কাছাকাছি তখন লড়াই চলছে। শহরের রাস্তায় হাজার হাজার উদ্বাস্তুর ভিড়। ক্রমাগত ফৌজ এসে হাজির হচ্ছে। জেটিগুলোতে মানুষের অবর্ণনীয় ভিড়। নভোরোসিস্কের আশপাশের পাহাড়গুলোয় চুনোপাথরের ঢালে হাজারে হাজারে পরিত্যক্ত ঘোড়াব পাল চরে বেড়াচ্ছে। বন্দরের ধারে রাস্তায় কসাকদের জিনসাজ, রসদ আর জঙ্গী সরঞ্জাম পাহাড়-প্রমাণ হয়ে জমে উঠেছে—এখন আর কেউ এ-সব চায় না। সারা শহরে গুজব ছড়িয়েছে শুধু স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকেই

নাকি জাহাজে তোলা হবে আর ডন-কুবানের কসাকদের জোর করে মার্চ করে নিয়ে যাওয়া হবে জর্জিয়াতে।

১৯২০ সালের পঁচিশে মার্চ সকালে গ্রিগর আর প্লাতন রিয়াব্‌চিকফ বন্দরে খোঁজ করতে গেল দুনম্বর ডন বাহিনীর সেপাইদের জাহাজে নেয়া হবে কিনা। আগের দিন সন্ধ্যায় কসাকদের মধ্যে গুজব রটেছিল সেনাপতি দেনিকিন নাকি হুকুম দিয়েছেন যেসব ডন কসাকের সঙ্গে সরঞ্জাম আর ঘোড়া রয়েছে তাদের ক্রিমিয়াতে নিয়ে যাওয়া হবে।

সাল্‌স্ক্‌ এলাকার কালমিকরা গিজ্‌ গিজ্‌ করছে জেটিতে। মানিচ্‌ আর সাল থেকে ঘোড়া উটের পাল নিয়ে ওরা কাঠের বসত-ঘর গোটাই ঘাড়ে তুলে নিয়ে এসেছে একেবারে সমুদ্র অবধি। লোকগুলোর গা থেকে বোট্‌কা ভেড়ার চর্বির গন্ধ। গ্রিগর আর রিয়াব্‌চিকফ্‌ নাক ঘুরিয়ে নিয়ে জেটির ধারে নোঙর-করা এক মস্ত যাত্রীবাহী স্টিমারের সিঁড়ির দিকে এগিয়ে চল্‌ল। মারকফ ডিভিশনের অফিসাররা এসে সিঁড়ি পাহারা দিচ্ছে এখন। কাছেই ভিড জমিয়েছে ডন কসাক গোলন্দাজরা জাহাজে ওঠার অপেক্ষায়। খাকি তেরপলে ঢাকা কামানগুলো জাহাজের গলুই জুড়ে রয়েছে। জোর করে ভিড ঠেলে এগিয়ে গ্রিগর কালো গোঁফওলা এক জোয়ান সার্জেন্টকে জিজ্ঞেস করলে :

—এটা কোন্‌ গোলন্দাজ ফৌজ ভাই ?

আডচোখে গ্রিগরের দিকে চেয়ে অনিচ্ছার সঙ্গে জবাব দিলে সার্জেণ্ট :

—ছত্রিশ নম্বর।

—কারগিন থেকে ?

—হ্যাঁ।

—জাহাজে লোক তোলার ভার কার হাতে ?

—ওই তো রেলিংএর ধারে দাঁড়িয়ে। কর্নেল টর্নেস্ট কেউ হবে।

গ্রিগরের জামার আস্তিন ধরে রাগত স্বরে রিয়াব্‌চিকফ বললে :

—দূর, চলো যাই। জাহান্নমে যাক্‌ ওরা। এদের পেট থেকে কিছু বার করতে পারবে ভেবেছ ? লড়াইয়ের সময় আমাদের জন্য এদের গরজ পড়েছিল, এখন আর আমরা এদের কোন্‌ কাজে লাগব……।

সার্জেণ্টটা হেসে সারবন্দি গোলন্দাজদের দিকে চেয়ে চোখ টিপে বললে :

—তোমাদের কপাল ভালো! অফিসারদেরও ওরা জাহাজে নিচ্ছে না এখন!

জাহাজে যাত্রী নেয়ার ভার যার ওপর সেই কর্নেলটি সিঁড়ি ধরে নেমে আসছে। তার পেছন পেছন হন্তদন্ত হয়ে ঘুরছিল টাক-মাথা এক সরকারী কর্মচারী, বোতামখোলা দামী ভেড়ার চামড়ার কোর্তা পরা।

বুকের ওপর বেড়ালের চামড়ার টুপিখানা চেপে ধরে সে যেন অনুনয় করে কী বলছিল। লোকটার ঘামভেজা মুখ আর চালশেধরা চোখে এমন একটা হাতে-পায়ে-ধরা ভাব যে কর্নেলটি পেছন ফিরে রূঢ়ভাবে চেঁচিয়ে বললে :

—একবার তো আপনাকে বলেছি! মেলা বিরক্ত করবেন না, নয় তো ডাঙায় নামিয়ে দেবার হুকুম দেব। আপনার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে! কোন্ চুলোয় রাখব আপনার ছাইভস্ম? আপনি কি অন্ধ? দেখতেই পাচ্ছেন সব কিছু। যান্ যান্ সরে পড়ুন! যদি ইচ্ছে হয় সোজা গিয়ে দেনিকিন সাহেবকেই না হয় নালিশ করুন! আমি তো বলেছি পারব না। পারব না তো পারবই না! কী, রুশভাষা বোঝেন না?

নাছোড়বান্দা কর্মচারীটির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়ে কর্নেল গ্রিগরের পাশ কাটিয়ে নামতে যাচ্ছিল। গ্রিগর তার পথ আটকে টুপির ডগায় হাত ঠেকিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে

—অফিসাররা কি জাহাজে ওঠার [illegible] পাচ্ছে?

—এ জাহাজে নয়। ঠাঁই নেই।

—তবে কোন জাহাজে?

—যেখানে যাত্রী বাছাই হচ্ছে সেখানে গিয়ে খোঁজ নিন।

—গিয়েছিলাম, কিন্তু ওরা কিছু জানে না।

—আমিও জানি না। যেতে দিন আমাকে!

—কিন্তু আপনারা তো ছাব্বিশ নম্বর গোলন্দাজ ফৌজকে তুলছেন। আমাদের জায়গা হবে না কেন?

—আমাকে যেতে দিন তো! খবরের আড্ডা নই আমি!—কর্নেল গ্রিগরকে একপাশে আস্তে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু গ্রিগর পা দুখানা ফাঁক করে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ওর চোখে একটা নীলচে আগুনের শিখা দপ করে জ্বলেই আবার নিভে যায়।

—তাহলে এখন আমাদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে? কিন্তু আগে তো খুব দরকার পড়েছিল, তাই না? [illegible] আমাকে হটাতে পারবেন না!

গ্রিগরের চোখের দিকে একবার চেয়ে কর্নেল চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। [illegible] সেপাইরা সিঁড়ির কাছে আড়াআড়ি রাইফেল ধরে অতি কষ্টে প্রচণ্ড ভিড় ঠেকাতে চেষ্টা করছিল। গ্রিগরের পিছন দিকে তাকিয়ে কর্নেল ক্লান্তভাবে বললে

—আপনার কোন্ রেজিমেন্ট?

—উনিশ নম্বর ডন রেজিমেন্ট থেকে আমি আসছি, আর সবাই অন্য রেজিমেন্টের।

—সবশুদ্ধ কত জন আপনারা?

—দশজন।

—হবে না। অত জায়গা নেই।

রীয়াবচিকফ্ দেখলে চাপা গলায় গ্রিগর কী বলছে আর তার নাকের ফুটো কাঁপছে :

—কুত্তা, এসব কিসের চালাকি? এখ্খুনি পথ ছেড়ে দাও বলছি, নয়তো···।

রীয়াবচিকফ্ মনে মনে ক্রুদ্ধ পরিতৃপ্তির সঙ্গে ভাবলে, গ্রীশা বুঝি এই সাবাড় করে দেয় লোকটাকে! কিন্তু দুজন মারকফ্ সেপাই রাইফেলের কুঁদো দিয়ে ভিড় ঠেলে কর্নেলকে উদ্ধার করতে তাড়াতাড়ি ছুটে আসছে দেখে ও গ্রিগরের জামার আস্তিন ধরে টানলে.

—গ্রিগর, আর গোল পাকিও না বেশী! চলে এসো।

ফ্যাকাশে মুখ করে কর্নেল বললে, তুমি একটি হাঁদা। এইরকম ব্যবহারের জন্য তোমায় কৈফিয়ত দিতে হবে।—মারকফ সেপাইদের দিকে ফিরে গ্রিগরকে দেখিয়ে সে বললে :

—এই মৃগীরুগীটাকে গ্রেপ্তার করুন তো মশাইরা। একটু শৃঙ্খলার ব্যবস্থা করুন এখানে। বড়কর্তার সঙ্গে আমার জরুরী কাজ রয়েছে অথচ এখানে দাঁড়িয়ে যত সব ইয়ের যত রকম প্রলাপ শুনতে হচ্ছে ।—গ্রিগরের পাশ কাটিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায় কর্নেল।

নীল উর্দির ওপর কাপ্তেনের তকমা আঁটা ছিমছাম করে গোঁফ-ছাঁটা এক ঢ্যাঙা মারকফ-সেপাই সোজা গ্রিগরের দিকে এগিয়ে এসে জেরা করলে

—কী চান আপনি? কেন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করছেন?

—যা চাই তা হল জাহাজে একটু জায়গা।

—আপনার রেজিমেন্ট কোথায়?

—জানি না।

—দলিলপত্র দেখান।

পাশনে-আঁটা মুখ-ফোলা দ্বিতীয় আরেক ছোকরা কাঁপা মোটা গলায় বললে :

—একে সান্ত্রীঘরে ধরে নিয়ে গেলেই হয়। সময় নষ্ট কোরো না ভিসংস্কি।

কাপ্তেন খুঁটিয়ে গ্রিগরের কাগজপত্র দেখে আবার ফেরত দিলে।

—রেজিমেন্ট আগে খুঁজে বের করুন। ভালো কথা বলছি এখান থেকে সরে পড়ুন। যাত্রী তোলার কাজে ব্যাঘাত করবেন না। যারাই ঝামেলা করবে বা কাজে বাগড়া দেবে কোনোরকম বাছবিচার না করে সবাইকে গ্রেপ্তার করার হুকুম আছে আমাদের ওপর।—ঠোঁট কুঁচকে আড়চোখে একবার রীয়াবচিকফের দিকে তাকিয়ে কাপ্তেন গ্রিগরের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললে, ছত্রিশ নম্বর গোলন্দাজ ফৌজের কমাণ্ডারের

সঙ্গে বরং কথা বলুন, বুঝলেন। ওদের দলে ভিড়ে যান, জাহাজে উঠতে পারবেন।

রীয়াবচিকফের কানে গিয়েছিল কথাগুলো। সে খুশিভরা গলায় বললে,

—তুমি কারগিনের লোকদের কাছে যাও। আমি ছুটে গিয়ে ওদের নিয়ে আসছি। তোমার জিনসাজ ছাড়া আর কী জিনিস আনতে হবে বলো?

উদাসীনভাবে গ্রিগর বললে,—চলো একসঙ্গেই যাব।

* *

ফেরার পথে সেমিওনভাস্কি গাঁয়ের এক চেনাজানা কসাকের সঙ্গে দেখা। তেরপল-ঢাকা বিরাট এক গাড়ি বোঝাই পাঁউরুটি নিয়ে জেটির দিকে যাচ্ছিল লোকটা। রীয়াবচিকফ তাকে ডাকলে:

—এই যে ফিওদোত। কী নিয়ে যাচ্ছ হে?

—প্লাতন নাকি! গ্রিগর পান্তালিয়েভিচ! এই যে, নমস্কার। রুটি নিয়ে যাচ্ছি আমাদের রেজিমেন্টের জন্য, রাস্তার খোরাক। তাড়াতাড়ি সেঁকে নিয়ে এলাম, নয়তো সারা পথ ছাতু খেয়ে চলতে হত।

গাড়ির কাছে এগিয়ে এসে গ্রিগর জিজ্ঞেস করে:

—রুটি সব ওজন করে এনেছ, না গুনতি করা?

—কার দায় পড়েছে গুনতে? কেন? রুটি চাই নাকি তোমার?

—হ্যাঁ।

—তা হলে নাও কয়েকটা।

—ক'টা নিতে পারি?

—কতগুলো বইতে পারবে। আছে তো যথেষ্টই।

গ্রিগর যখন একটার পর একটা রুটি নিতে আরম্ভ করল, রীয়াবচিকফ তখন অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছে। শেষ পর্যন্ত কৌতূহল চাপতে না পেরে জিজ্ঞেস করে বসল:

—কী হল তোমার, এত রুটিতে কী হবে?

—দরকার আছে।—গ্রিগরের সংক্ষিপ্ত জবাব। লোকটার কাছ থেকে দুটো থলি চেয়ে নিয়ে তার মধ্যে রুটিগুলো সব ভরে নিল সে। তারপর অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিয়ে রীয়াবচিকফকে বললে:

—একটা থলি কাঁধে তোলো। নিজেরাই টেনে নিয়ে যাই।

—শীতকালটা তো আর এখানেই কাটাতে যাচ্ছো না?—কাঁধের উপর থলিটা ফেলে কৌতুক করে প্রশ্ন করলে রীয়াবচিকফ্।

—আমার নিজের জন্য নিচ্ছি না।

—তবে কার জন্য?

—আমার ঘোড়ার জন্য।

থলিটা আস্তে করে মাটিতে নামিয়ে রেখে হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞেস করে রীয়াবচিকফ:

—ঠাট্টা করছ?

—না, মোটেই না।

—তাহলে তুমি ··তোমার মাথায় কী আছে বলো তো পান্তালিয়েভিচ? থেকে যাবার মতলব করেছ নাকি?

—ঠিক ধরেছ। থলিটা এবার তোলো, চলো এগোও। আমার ঘোড়াকে তো খাওয়াতে হবে। চেটে চেটে জাবনার গামলাটাও বোধ হয় আস্ত রাখেনি এর মধ্যে। ঘোড়ার কদর এখনও আছে হে, পায়ে হেঁটে কাজ চলে না।

আস্তানা পৌঁছানো অবধি আর একটি কথাও বলেনি রীয়াবচিকফ। খালি থলিটাকে এ কাঁধ থেকে ও কাঁধে বদলেছে কঁকাতে কঁকাতে। ফটক অবধি এসে সে জিজ্ঞেস করে: অন্য সেপাইদেরও বলবে নাকি?—তারপর জবাবের অপেক্ষা না করেই দুঃখিত কণ্ঠে বলে, মাথায় তো তোমার বেশ মতলব খেলল! কিন্তু আমাদের কী হবে বল তো?

নিস্পৃহ ভাব দেখিয়ে গ্রিগর জবাব দেয়, সে তোমরাই ঠিক কর। ওরা যদি আমাদের না নেয়, যদি আমাদের জায়গা না দিতে পারে, তো না-ই দিক, দরকার নেই! কী দায় পড়েছে আমাদের ওদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার? আমরা পেছনেই থেকে যাব। কপাল ঠুকে দেখিই না কী হয়। ভেতরে ঢোকো এবার, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

—বাঃ বেশ কথা বললে যাহোক। ফটক নজরেই পড়ল না, ফাঁপর দেখ? বেশ মজার কথা! কানে জোর ধাক্কা দিয়েছ হে গ্রিশা! এক কথায় একেবারে বসিয়ে দিয়েছ! আর এইমাত্র আমি ভাবছিলাম, অত রুটি নিয়ে ও কী করবে? এখন তো আমাদের সাথীরা সব খবর পেলে খেপে উঠবে।

—সে যাহোক, তুমি কী করবে? থেকে যাবে না?—গ্রিগর এবার জানতে উৎসুক হয়।

রীয়াবচিকফ আতঙ্কিত হয়ে ওঠে—তুমি কী ভাবছ শুনি?

—তুমি নিজেই ভেবেচিন্তে ঠিক কর।

—ভাববার কী আছে এমন। সুযোগ পেলেই আমি উচ্চবাচ্য না করে চলে যাব। কারগিন গোলন্দাজদের সঙ্গে ভিড়ে এখান থেকে সরে পড়ব।

—পরে আপসোস করবে।

—হ্যাঁ, তা তো বটেই! আমার মাথা বাঁচাবার গরজ বড় কম নয় ভাই। লালফৌজ এ মাথার ওপর জল্লাদ লেলিয়ে দিক্ সে ইচ্ছে আমার মোটেই নেই!

—কিন্তু একবার ভেবে দেখ প্লাতন। অবস্থাটা যা··· ···।

—ও কথা আর বোলো না। আমি এখুনি চললাম।

—যা তোমার মন চায়। তর্ক করে তোমায় বোঝাব না ··।—বিরক্ত হয়ে গ্রিগর জবাব দেয়। বাড়ির পাথরের সিঁড়ির দিকে ও-ই পা বাড়ায় প্রথম।

ইয়েরমাকভ, প্রোখর, বোগাতিরিয়েফ, সবাই বেরিয়ে পড়েছে। বাড়ির গিন্নি একজন বয়স্ক কুঁজো আর্মেনীয় মহিলা। সে বললে কসাকরা যাবার সময় বলে গেছে শিগ্‌গিরই ফিরবে। বাইরের পোশাক আর না খুলে গায়েই রেখে একটা বড়ো রুটি মোটা মোটা চিলতে করে কেটে গ্রিগর আস্তাবলের ঘোড়াগুলোর দিকে চলে গেল। রুটির টুকরোগুলো দুভাগ করে একভাগ সে নিজের ঘোড়াকে দিয়ে আরেক ভাগ দিলে প্রোখরের ঘোড়াকে। জল বয়ে আনার জন্য সবে বালতিটা হাতে তুলেছে এমন সময় আস্তাবলের দরজায় এসে দাড়াল বোগাতিরিয়েফ। জোব্বাকোটের ভাঁজে সাবধানে রুটির একেকটা বড়ো চিলতে জড়িয়ে রেখেছিল প্রাতন। মনিবের গন্ধ পেয়ে তার ঘোড়াটা একটু নাক ঝাড়ল। গ্রিগর মিটমিট করে হেসে লক্ষ্য করছিল বোগাতিরিয়েফের চুপি চুপি এগিয়ে আসা। গ্রিগরের দিকে না তাকিয়ে সে জাবনার গামলায় রুটির টুকরোগুলো ছড়িয়ে দিতে দিতে বললে:

—অমন করে দাঁত বের কোরো না বলছি যদি অমন নজির দেখ ও তাহলে আমাকেও যে রুটি খাওয়াতে হয় ঘোড়াকে। ভেবেও দেখ আমার খুব মজা লাগবে? নিজের ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে নিজেকেই ওই হতভাগা জাহাজে তুলতে হবে। সাধ করে মোটেই যাচ্ছি না। সাক্ষাৎ যম আমায় পথ দেখাচ্ছে

বাঁধে আর একটাই মন আছে, নাহি না ভগবান করুন যেন এটিও বাঁচা না যায়, তাহলে আর দ্বিতীয় গজাবে না ইহকালে।

●

সেদিন বিকেল অনেকটা গড়িয়ে যাবার আগে অবধি ওদের কারুরই মুখ দেখা যায়নি। ইয়েরমাকভ মদের একটা মস্ত বোতল সে এনেছে। প্রোখরের সঙ্গে একটা থলি তাতে ঘন হলদে তরল পদার্থ ভরা একেকটা শীলমোহর করা শিশি।

বোতলগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে ইয়েরমাকভ জাঁক করে বললে, কাজের কাজ একটা করা হয়েছে বটে। রাতখানা বেশ ভালোই কাটবে। —তারপর ব্যাখ্যা করে বললে: রাস্তায় এক ফৌজী ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমাদের বলে তার ওষুধপত্তরগুলো গুদামঘর থেকে জেটি অবধি একটু পার করে দিতে। কালমিকরা কাজ করতে চাইছিল না। শুধু দু'জন সেপাইরা গুদাম থেকে মাল টেনে বার করে নিয়ে যাচ্ছিল, তাই আমরা ওদের সঙ্গে ভিড়ে গেলাম। ডাক্তার খানিকটা মদ বখশিশ দিলেন আমাদের, কিন্তু প্রোখর এই শিশিগুলো মেরে দিলে ফাঁকতালে। সত্যি বলছি, ঠাট্টা নয়।

—কিন্তু ওর মধ্যে আছে কী? রীয়াবচিকফ উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

প্রোখর শিশিগুলো নেড়েচেড়ে আলোর দিকে তুলে দেখে, রঙীন কাঁচের ভেতর ঘন তরল জিনিস, বুদ্বুদ উঠছে।

—এ তো সুরাসারের চেয়েও সবেস মাল হে। দামী বিলিতি মদ না হয়ে যায় না। শুধু রুগীদের জন্য বরাদ্দ এ জিনিস··· ···ইংরাজী-জানা এক যুক্কার মহিলা আমায় বলেছিল এর কথা। স্টীমারে উঠে অতি দুঃখের মধ্যেও আমরা খানিকটা গলায় ঢেলে গান গাইব "ও আমার প্রিয় জন্মভূমি" তারপর সারাপথ চাখতে চাখতে একেবারে ক্রাইমিয়া। সেখানে গিয়ে শিশিগুলো সমুদ্দুরে ফেলে দেব।

—চটপট করে চলো সবাই গিয়ে জাহাজে উঠি। নয়তো তোমাদের জন্যই ওরা জাহাজ ছাড়তে পারবে না। বলবে, 'আমাদের বীরশ্রেষ্ঠ প্রোখর জাইকফ গেল কোথায়? ওকে ছাড়া তো জাহাজ চলে না।'—বীয়াবচিকফ ঠাট্টা করে বলে। তামাকের দাগওলা হলদে আঙুলটা গ্রিগরের দিকে দেখিয়ে সে আবার বলে: যাবার ব্যাপারে ও তো মত বদলেছে। আমিও যাব না।

হতভম্ব হয়ে প্রোখর বলে ওঠে, অমন কথা বোলো না।—শিশিটা ওর হাত থেকে প্রায় খসেই পড়েছিল আর কী।

ভুরু কুঁচকে গ্রিগরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে ইয়েরমাকফ প্রশ্ন করে, এসব আবার কী? এখন আবার মাথায় কোন পোকা ঢুকল?

—আমরা যাবো না ঠিক করেছি।

—কেন?

—কারণ আমাদের জন্য জায়গা হবে না।

—আজকে না হলেও, কালকে তো হবে।—বোগাতিরিয়েফ আশ্বস্ত কণ্ঠে বলে।

—জেটিতে একবারও গিয়েছিলে?

—হ্যাঁ, কেন?

—কী ঘটছে সেখানে দেখেছ?

—হ্যাঁ, দেখেছি।

—হ্যাঁ হ্যাঁ তো করছ! নিজেই যখন দেখেছ, আবার বলে বোঝাতে হবে? ওরা শুধু আমাকে আর বীয়াবচিকফকে নিতে রাজী। তাও আবার একজন বললে আমাদের নাকি কারগিন গোলন্দাজদের সঙ্গে ভিড়তে হবে, না হলে কোনো কিছু হবে না।

বোগাতিরিয়েফ তাড়াতাড়ি বললে—ওরা তো এখনো জাহাজে ওঠেনি নিশ্চয়ই? ··মানে ওই গোলন্দাজদের কথা বলছি?

গোলন্দাজ সেপাইরা জাহাজে উঠবার জন্য লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শুনে সে তখুনি যাবার জন্য তৈরি হয়। জামা, বাড়তি পাতলুন আর একটা

উর্দি তার ঝোলানো থলিটার মধ্যে পুরে তারই মধ্যে কয়েকটা রুটি ফেলে সে বিদায় সম্ভাষণ জানায়।

ইয়েরমাকফ তাকে ফের বোঝায়—আরে পিয়োত্রা, যেও না, থাকো। শুধু শুধু কেন আমাদের দলটা ভেঙে চলে যাচ্ছ?

কোনো জবাব না দিয়ে বোগাতিরিয়েফ দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে ফের নমস্কার জানায়। বলে—ভালোয় ভালোয় থেকো। ভগবান মুখ তুলে চাইলে আবার দেখা হবে।—তারপর ছুটে বেরিয়ে যায়।

বোগাতিরিয়েফ চলে যাবার পর ঘরের ভেতর একটানা অস্বস্তিকর নীরবতা। ইয়েরমাকফ রান্নাঘরে গিয়ে বাড়ির গিন্নির খোঁজ করে। চারটে গেলাস এনে তাতে সুরাসার ঢালে মুখে একটি কথাও না বলে। ঠাণ্ডা জলে-ভরা একটা মস্ত তামার চা-পাত্র টেবিলে বসিয়ে সে শুয়োরের মাংস ফালি করে কাটে। মথটি বুজেই সে টেবিলের ধারে বসে মাথায় হাত রেখে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে পায়ের দিকে। চা-দানের নল থেকে সরাসরি খানিকটা জল চুষে নিয়ে ধরা গলায় বলে, কুবানের জলে এত প্যারাফিনের গন্ধ কেন?

কেউ জবাব দেয় না। রীয়াবচিকফ একটা পরিষ্কার নরম গাছের-ডাল দিয়ে ওর ময়লা তলোয়ারের ধারটা ঘসে ঘসে তোলে। গ্রিগর ওর থলি হাতড়ায়। প্রোখর অন্যমনস্কভাবে জানলার বাইরে পাহাড়ের তৃণহীন ঢালের দিকে তাকিয়ে থাকে, শুধু একেক পাল ঘোড়া সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

—বসো-না হে! শুরু কর দিকি।—বলে আর কারুর জন্য অপেক্ষা না করে ইয়েরমাকফ গলায় আধ গেলাস সুরাসার ঢেলে দেয়, তারপর একটু জল খায়। এক টুকরো মাংস চিবোতে চিবোতে আগের চেয়ে একটু উৎফুল্ল চোখে গ্রিগরের দিকে তাকিয়ে বলে: লাল কমরেডরা আমাদের সবে জবাই করবে না বোধহয়, কী বল?

—আমাদের সবাইকে ওরা মারবে না। এক হাজারেরও বেশী লোক তো এখানেই পড়ে থাকবে।—জবাব দিলে গ্রিগর।

ইয়েরমাকফ হাসে: আমাদের সবার কথা আমি ভাবছি না। শুধু নিজের জানটা নিয়েই আমার মাথাব্যথা।

বেশ খানিকটা পান করার পর ওদের আলাপ-আলোচনা আগের চেয়ে সজীব হয়ে উঠতে থাকে। কিন্তু খানিক বাদেই অপ্রত্যাশিত ভাবে বোগাতিরিয়েফ ফিরে এল। মুখখানা গোমড়া, ভুরু কোঁচকানো। ঠাণ্ডায় নীল হয়ে গেছে মুখের চামড়া। আনকোরা বিলিতি উর্দির একটা গোটা বস্তাই সে দোরের গোড়ায় নামিয়ে রেখে নীরবে পোশাক খুলতে লাগল।

প্রোখর ব্যঙ্গ করে নমস্কার জানিয়ে বললে, স্বাগত, ফিরে এসো!

বোগাতিরিয়েফ একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে:

—দেনিকিনের এই লোকগুলো আর রাজ্যের যত বেজন্মা যদি আমার সঙ্গে গিয়ে ধর্ণা দেয় তবে আর যাই কী করে। সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, ঠাণ্ডায় জমে যাবার দাখিল কিন্তু কোনো কাজ হল না। ঠিক আমার আগেই এসে কেটে গেল। আমার সামনে দুজন ছিল, একজনকে ওরা নিলে আরেকজন বাদ। গোলন্দাজদের অর্ধেকই তো পড়ে রইল। একে তোমরা কী বলবে?

—আমাদের মতো লোকদের সঙ্গে ওদের এই-ই দস্তুর।—হো-হো করে হেসে ইয়েরমাকফ বোতলের তরল পদার্থ ছিটিয়ে পুরো এক গেলাস ঢেলে দিলে বোগাতিরিয়েফের জন্য।—এই নাও হে, দুঃখের দিনে খাও। নাকি ওরা কখন এসে ডেকে নিয়ে যাবে সেই অপেক্ষায় থাকবে? জানলা দিয়ে বাইরে তাকাও। সেনাপতি ব্যাঙ্গেল আসছেন না তো দলবল নিয়ে?

কোনো জবাব না দিয়ে বোগাতিরিয়েফ সিধে দাঁতের ফাঁক দিয়ে সুরাসারটুকু শুষে নিলে। এখন ওর তামাশার মেজাজ নেই। কিন্তু ইয়েরমাকফ আর রাঁধাবাড়িকর দুজনেই আধমাতাল হয়ে আর্মেনিয়ান বুড়ীটাকে এমন মদ খাওয়ালো যে তার আর দাঁড়াবার ক্ষমতা রইল না। তারপর তারা মতলব করতে লাগল একজন অ্যাকর্ডিয়ন বাদককে কোনো জায়গা থেকে ধরে আনা যায় কিনা।

বোগাতিরিয়েফ ওদের বুদ্ধি দিলে, তোমরা বরং স্টেশনে যাও। ওরা গাড়ি খালি করছে। টেনকে ট্রেন বোঝাই উর্দি পড়ে পড়ে পচে যাচ্ছে।

ইয়েরমাকফ চেঁচিয়ে ওঠে, উর্দি দিয়ে কী ঘোড়ার ডিম হবে? যা উর্দি এনেছ ওই আমাদের ঢের হবে। বাড়তি কিছু থাকলে এমনিতেই তো আমাদের খসিয়ে ছাড়বে পিয়োত্রা। ওহে শুনছ? আমরা লাল ফৌজের দিকেই যাবো ঠিক করেছি, বুঝেছ? আমরা তো কসাক, না কি বল? লাল সেপাইরা যদি আমাদের বাঁচতে দেয়, তাহলে আমরা ওদেরও সেবা করব। আমরা ডনের কসাক। কসাকের খাঁটি রক্ত আমাদের, কোনো ভেজাল নেই। লড়াই আমাদের পেশা। জানো আমি কেমন করে তলোয়ার ঘোরাই? বাঁধাকপির ডাঁটার মতো। সিধে হয়ে দাঁড়াও, তোমার ওপর হাতটা মকশো করি। কী? বক বকর করছ? আরে বাবা, যখন তলোয়ার ঘোরাই তখন আর বিচার করি না কাকে রাখি কাকে মারি। তাই না হে মেলেখফ, সত্যি না?

গ্রিগর ক্লান্তভাবে জবাব দেয়—দিক্ কোরো না।

লাল টকটকে চোখদুটো মিটমিট করে ইয়েরমাকফ তলোয়ার খোঁজে। তলোয়ারটা একটা সিন্দুকের ওপর পড়ে আছে। বোগাতিরিয়েফ তাকে খোশমেজাজেই ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলে:

—বাহাদুর আনিকা, বেশী গরম দেখিও না, নয়তো এক্ষুনি তোমায় ঠাণ্ডা করে দেব। অল্পস্বল্প করে খাও। মনে রেখো তুমি একজন অফিসার।

—পদক চাপরাশ সমেত আমি চাকরিতে ইস্তফা দেব। শুয়োরের যতটা ভাবনার দরকার চাকরির দরকারও আমার কাছে এখন ততটাই। আমাকে আর চাকরির কথা শুনিও না। তোমার পদকগুলোও ছিঁড়ে নামিয়ে দেব নাকি? পিয়োত্রা, লক্ষ্মীসোনা, একটু সবুর। এক্ষুনি সব খুলে ফেলে দিচ্ছি।

বোগাতিরিয়েফ হেসে ওর বেসামাল বন্ধুটিকে ঠেলা দেয়—এখনও তার সময় হয়নি হে, পরে যথেষ্ট সময় পাবে।

ভোর অবধি মদ খায় সবাই। সন্ধ্যের দিকে অন্য কসাকরাও ভিড় জমায়, একজন আসে অ্যাকর্ডিয়ন নিয়ে। ইয়েরমাকফ নাচে "কসাক" নাচ, যতক্ষণ না মেঝেয় গড়িয়ে পড়ে ততক্ষণ নাচে। তারপর ওকে সবাই টেনে সরায়। দু'পা ফাঁক করে খালি মেঝের ওপরেই ও সটান ঘুমোয় মাথাটা বেয়াড়া রকম ভাবে বেঁকিয়ে। সকাল অবধি ওদের পানোৎসব চলে, তবে স্ফূর্তিহীন। আগন্তুকদের মধ্যে এক বয়স্ক কসাক মাতাল অবস্থায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে আর বলে কমশাৎকার লোক আমি। আমাদের বলদগুলো ছিল এত উঁচু যে মাটিতে দাঁড়িয়ে তোমরা তাদের শিঙের নাগাল পেতে না। আমার ঘোড়াগুলো ছিল সিংহের মতো। আর এখন আমাদের খামারের কী অবস্থা? একটা বুড়ী কুত্তী রয়েছে। সে ও এখন তখন। এমন কিছু নেই যা খেয়ে সে বাঁচবে সেখানে।

ছেঁড়া সিবকাশ্যান কোট পরা এক কুবান-কসাক অ্যাকর্ডিয়ন-বাদককে বললে 'নাউরস্' নাচের একটা বাজনা ধরতে। তারপর বেশ নাটকীয়ভাবে হাত ছুঁড়ে ছুঁড়ে এমন আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ঘরের ভেতর দিয়ে চলে বেড়াতে লাগল যে গ্রিগরোর নিশ্চিত ধারণা হল লোকটার বুটের তলা একেবারে বুঝি স্পর্শ করছে না নোংরা পালিশ চটা মেঝে।

মাঝরাতে কয়েকজন কসাক মিলে কোথেকে যেন লম্বা সরুগলা মাটির কলসী জোগাড় করে নিয়ে এল। পাত্রটার গায়ে আধছেঁড়া রং জ্বলা লেবেল আঁটা, ছিপি শিলমোহর করা, লাল টকটকে শিলমোহরের মোমের সঙ্গে বড় বড় তামার শীল ঝুলছে। প্রোখর প্রকাণ্ড কলসীটা হাত দিয়ে চেপে ধরে অতিকষ্টে ঠোঁট নেড়ে লেবেলের বিদেশী শব্দগুলো পড়তে চেষ্টা করে। কলসীতে হয়তো বালতিখানেক তরল পদার্থ ছিল। ইয়েরমাকফ জেগে উঠে ওর কাছ থেকে কলসীটা নিয়ে মেঝেতে নামিয়ে রাখে। তলোয়ার বের করে। প্রোখর গাঁই-গুঁই করবার আগেই তলোয়ারের একটা তেরছা ঘায়ে কলসীর গলাটা উড়িয়ে দিয়ে চেঁচায়—গেলাস আনো শিগগি

কয়েক মিনিটের মধ্যে উধাও হয়ে গেল ঘন, অদ্ভুত সুগন্ধময় তেতো পানীয়টুকু। বোগাতিরিয়েফ তুরীয়ানন্দে বারে বারে জিভটা চুকচুক করে আর

বিড়বিড়িয়ে বলে, এতো মদ নয়, এ যে অমৃত গো! শুধু চিরতরে চক্ষু বোজার আগেই এ পান করা চলে, তাও আবার যার-তার জন্য নয়, শুধু তাদেরই এতে হক্ আছে যারা কখনো তাস পেটেনি, তামাক খায়নি, মেয়েছেলে ছোঁয়নি… এ হল এক কথায় পাদ্রিদের সুধারস!

এবার প্রোখরের মনে পড়ল যে ওর থলিতেও দাওয়াখানার সেই মদের শিশিগুলো রয়ে গেছে। সে তখন চেঁচিয়ে উঠল:

—আরে সবুর, প্লাতন! এখুনি অত জাঁক কোরো না! আমার কাছে ওর চেয়েও ঢের সরেস মাল আছে হে! ও তো ঘোড়ার পেচ্ছাব, আমি জেটির গুদাম থেকে যা জিনিস এনেছি, সে হল সত্যিকারের সুরা! মধুর সঙ্গে ধূপের সুবাস, কিংবা বুঝি তারও বেশী! এ ভাই তোমার পাদ্রির সুধা নয়, এ হল—সিধে কথা বলছি,—স্বয়ং জার সম্রাটের অমৃত। আগের দিনে জাররা পান করতেন, এখন পড়েছে আমাদের ভাগে …।—একটা বোতলের ছিপি খুলতে খুলতে প্রোখর সগর্বে শুনিয়ে দিল।

রীয়াবচিকফ পানের ব্যাপারে সদা প্রস্তুত। এক ঢোঁকে আধ গেলাস ঘন তরল পদার্থ সাবাড় করে ফেলল সে। সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখ ফ্যাকাশে, চোখ-দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে।

ভাঙা গলায় চেঁচাতে লাগল—এ তো মদ নয়, এ যে কার্বলিক! রাগে গেলাসের বাকিটুকু সে প্রোখরের জামার ওপর ঢেলে দিয়ে টলতে টলতে ছুটে বেরিয়ে গেল ভেতরের বারান্দার দিকে। হট্টগোলের মধ্যে সবার ওপরে গলা চড়াতে চেষ্টা করে প্রোখর। গাঁক গাঁক করে বলে—না, না, মিছে কথা! শয়তানটা মিছে কথা বলছে! এ হল ইংরিজি মদ! সেরা জাতের! ওর কথা বিশ্বাস কোরো না ভাইসব।—পুরো একটা গেলাস সে এবার নিজেই গলায় উলটে ঢেলে দিল। তারপর রীয়াবচিকফের চেয়েও ফ্যাকাশে হয়ে গেল সে।

নাকের ফুটো ফুলিয়ে প্রোখরের চোখের দিকে তাকিয়ে ইয়েরমাকফ বলে—কী? এবার বলো এ কী জিনিস? জারের অমৃত? কড়া? মিষ্টি? ওরে শয়তান, এবার মুখ ফুটে কথা বল, নয়তো এ বোতল তোর মাথায় ভাঙব!

মনে মনে ভোগটুকু হজম করতে করতে প্রোখর শুধু মাথা নাড়ে আর হেঁচকি তোলে। নিঃশব্দে উঠে বেরিয়ে যায় রীয়াবচিকফের পেছু পেছু। হাসিতে দম আটকাবার জোগাড় ইয়েরমাকফের। গ্রিগরের দিকে তাকিয়ে চোখ মটকায় ভঙ্গি করে। আঙিনার ভেতরে ঢুকে আবার ফিরে আসে মিনিট খানেক বাদে, তারপর এমন প্রচণ্ড হেসে ওঠে যে ঘরের বাদবাকি সকলের গলার স্বর তাতে চাপা পড়ে।

গ্রিগর ক্লান্ত কণ্ঠে বলে, এ সব কী হচ্ছে তোমাদের? অমন হ্যা-হ্যা করছ কেন গাধার মতো?

ওরে ভাই, গিয়ে দেখে এস, ছাখো কীভাবে ওগ্‌রাচ্ছে দুটোতে মিলে। জানো কী খেয়েছিল মদ ভেবে?

—কী, কী?

—বিলিতি এক উকুন-মারা তেল।

—বাজে কথা বলছ!

—মাইরি বলছি। গুদামঘরে গিয়ে আমি নিজেও একবার মদ মনে করেছিলাম। কিন্তু তারপর যখন ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করি, এ কী মাল ডাক্তার? ডাক্তার জবাব দেয়, ওষুধ। আমি বলি, সব দুঃখের আসান সেই জিনিস নয়তো? মানে মদ-টদ? ডাক্তার বললে, রাম কহো! এ হল উকুন-মারা তেল, মিত্রশক্তি পাঠিয়েছে। মালিশের ওষুধ। খাবার জিনিস নয় আদপেই।

গ্রিগর রুটে গিয়ে তিরস্কার করে—তবে কেন ওদের সেকথা বলোনি উল্লুক?

—হার মানবার আগে শয়তানগুলো একটু প্রায়শ্চিত্তি করুক। এত সহজে মরবে না নিশ্চয়।—ইয়েরমাকফ চোখের জল মুছতে মুছতে একটু শ্লেষের সঙ্গে ফের বলে: আর তাছাড়া এবার থেকে একটু বুঝে শুঝে খাবে। আগে ওদের সামলানোই দায় হত। অত তেষ্টা যাদের প্রাণে, তাদের এটুকু শিক্ষার দরকার ছিল। যাক্‌, এবার তুমি আমি একটু খাব নাকি, না আরেকটু সবুর করব? শেষ অবধি চালানোই যাক!

ভোরের আলো ফোটার ঠিক আগে গ্রিগর সিঁড়ি-দরজার মুখে গিয়ে কাঁপা আঙুলে একটা সিগারেট জড়িয়ে নেয়। আগুন ধরিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে ভিজে দেয়ালে ঠেস দিয়ে।

গোটা বাড়ি মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে মাতাল চিৎকারে, অ্যাকর্ডিয়নের ডুকরে-ওঠা কান্নায় আর সজোর শিটির আওয়াজে। নাচিয়েদের পায়ের গোড়ালি দাপাদাপি করে চলেছে নিরলস সুর্ছাদ তালে। কিন্তু উপসাগরের দিক্‌ থেকে বাতাসে ভেসে আসছে একটা স্টীমারের মোটা গম্ভীর বাঁশির আওয়াজ। অনেক মানুষের কণ্ঠস্বর মিলে জেটির ধারে একটা জমাট কোলাহলের সৃষ্টি হয়েছে, মাঝে মাঝে তার ঐকতান কেটে যাচ্ছে জঙ্গী হুকুমের তীক্ষ্ণ চিৎকার, ঘোড়ার হ্রেষা আর স্টীমারের শিটিতে। রেললাইন ধরেই কোথায় যেন লড়াই চলছিল। কামানের চাপা গুরু গুরু গর্জন আর তারই ফাঁকে ফাঁকে মেসিনগানের আতপ্ত বিস্ফোরণশব্দ ক্ষীণ হয়ে কানে আসে। গিরিপথের ওপার থেকে আকাশের উঁচুতে একটা হাউই উঠল ফুলকি ছড়াতে ছড়াতে। কয়েক লহমার জন্য দৃষ্টিগোচর হল কুঁচো পাহাড়ের পিঠগুলো, একটা সবুজ স্বচ্ছ আভায় আলোকিত হয়েই আবার তারা ঢাকা পড়ল দক্ষিণী রাতের জমাট ঘন আঁধারে। এবার আরও স্পষ্ট, আরও মুহুর্মুহু

গোলন্দাজ কামানের গর্জন উঠে একটানা গুলির আওয়াজের সঙ্গে মিশে যেতে লাগল।

॥ আট ॥

সমুদ্র থেকে ঠাণ্ডা নোনা একটা ভারী বাতাস আসছিল। সে বাতাসে অজানা-অচেনা ভিনদেশের গন্ধ বয়ে এনে সমুদ্রের তীরে ছড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু ভিনদেশী কসাকদের কাছে শুধু এই বাতাসই নয়, সবকিছুই ঠেকছে অদ্ভুত। হাওয়া ঝাপটানো, বৈচিত্র্যহীন এই সাগরধারের লোকালয়টি যেন ছন্নছাড়া, ঘরের স্বাচ্ছন্দ্য এখানে নেই। জাহাজে ওঠবার আশায় সবাই ঘন ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে জেটিতে। সাগরের সৈকত বরাবর সবুজ ফেনিল ঢেউয়ের মেলা। মেঘের ফাঁক দিয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে রয়েছে নিস্তাপ সূর্য। জেটিতে ইংরেজ আর ফরাসী যুদ্ধজাহাজ থেকে ধোঁয়া উঠছে, একটা ড্রেডনট জাহাজ ধূসর বিভীষিকার মূর্তি নিয়ে ঝুঁকে রয়েছে জলের ওপর। ওপরে কালো ধোঁয়ার পর্দা ছড়ানো। জেটির আশেপাশে একটা থমথমে নীরবতা। শেষ জাহাজটা যেখানে খানিক আগে নোঙর ঠেকিয়ে রেখেছিল এখন সেখানে অফিসারদের জিনসাজ, তোরঙ্গ, কাপড়চোপড়, ভেড়ার চামড়ার কোট, লাল গদী-আঁটা চেয়ার এবং আরো এটা-ওটা জিনিস ভাসছে, -তাড়াহুড়ো করে জাহাজে ওঠার সময় সিঁড়ির ওপর থেকে ছুঁড়ে দেয়া।

ভোরবেলায় গ্রিগর ঘোড়ায় চেপে জেটির ধারে আসে। প্রোখরকে ঘোড়ার জিম্মা দিয়ে অনেকক্ষণ অবধি ভিড়ের মধ্যে ঘুরে কাটায়, চেনা পরিচিত মুখ খুঁজে পেতে চেষ্টা করে, মানুষের অসংলগ্ন উদ্বিগ্ন কথাবার্তা শোনে। অবসরপ্রাপ্ত এক বুড়ো কর্নেলকে দেখল জাহাজের সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে গুলি খেয়ে আত্মহত্যা করতে—জাহাজে লোকটার জায়গা মেলেনি তাই।

কয়েক মিনিট আগেও এই বেঁটেখাটো নিশপিশে লোকটা গালে এবড়ো-খেবড়ো পাকা দাড়ি আর ফুলো-ফুলো জলভরা ইঁদুরে চোখ নিয়ে প্রহরীদের সেই অফিসারটিকে চেপে ধরেছিল। তলোয়ার-বাঁধা কোমরবন্ধটা আঁকড়ে ধরে করুণভাবে কী যেন বলছিল ফিসফিস করে আর নাক টানতে

জোব্বাকোটের পকেটের অনেকটা ভেতরে হাত গুঁজে গ্রিগর নিঃশব্দে এগিয়ে এলো ওদের দিকে—অকারণ জমে-ওঠা ভিড়টা ঠেলে।

রীয়াবচিকফ সোজা ঘোড়া চালিয়ে ওর দিকে এসে তাগিদের সুরে প্রশ্ন করে, আমাদের সঙ্গে আসছ, নাকি আসবে না ?

—না, আসব না।

—একজন কসাক জঙ্গী কমাণ্ডারকে পেয়েছি আমাদের দলে। রাস্তার প্রত্যেক ইঞ্চিটা তার মুখস্ত, চোখ বুজে আমাদের তিফ্‌লিস্‌ অবধি নিয়ে যেতে পারে বলেছে। চলে এসো গ্রিশা! তারপর ওখান থেকে তুর্কীদের দিকে চলে যাব। কী বলো হে? কোনো রকমে গায়ের চামড়া বাঁচাতে হবে যে। প্রায় শেষ মাথায় তো এসে গেছি, অথচ এর মধ্যেই আধমরা অবস্থা তোমার।

প্রোখরের হাত থেকে ঘোড়ার লাগামটা নিয়ে গ্রিগর ধীরে ধীরে জিনের ওপর চেপে বসল কোনো রকমে, বুড়ো লোকের মতো।—না। আমি যাবো না! আমি যাচ্ছি না! কোনো মানে হয় না যাবার। তা ছাড়া বড় দেরিও হয়ে গেছে এখন···ওই দ্যাখ!

রীয়াবচিকফ ফিরে তাকায়। তারপর নিষ্ফল হতাশা আর আক্রোশে তলোয়ারের ওপরকার গিঁটটা মুমড়ে ছিঁড়ে ফেলে। পাহাড়ের দিক থেকে সারিবাঁধা লালফৌজী সেপাই দলে দলে এগিয়ে আসছে। একটা সিমেণ্ট কারখানার কাছাকাছি এসে মেশিনগানগুলো কটকট করে উঠল পাগলের মতো। সাঁজোয়া ট্রেন থেকে মানুষের সারিগুলো লক্ষ্য করে ছোঁড়া হতে লাগল গোলাগুলি। প্রথমে গোলাটা এসে ফাটল একটা হাওয়া-কলের কাছে।

গ্রিগর হঠাৎ যেন উৎফুল্ল হয়ে আবার সিধে বুক চিতিয়ে হুকুম করলে, চলো ভাইসব, নিজেদের আস্তানায়, চলে এসো আমার পেছু পেছু!

কিন্তু রীয়াবচিকফ গ্রিগরের ঘোড়ার লাগাম চেপে ধরে ভয়ে ভয়ে বললে:

—যেও না! এখানেই থাকা যাক্‌···বাবা! জীবনে শান্তি থাকলে মরেও সুখ আছে···

—আঃ রাখো বাজে কথা! মরার কথা কেন বলছ? কী বক্‌বক্‌ করছ?—বিরক্ত হয়ে গ্রিগর আরো দুয়েকটা কথা যোগ করতে যাচ্ছিল কিন্তু সমুদ্রের দিক থেকে প্রচণ্ড এক গর্জন ওর গলার স্বরকে ডুবিয়ে দিল। ইংরেজ ড্রেডনট্‌ জাহাজটা ঘুরে নিশানা নিয়ে দাঁড়িয়ে বারো ইঞ্চি কামানগুলো থেকে এক ঝাঁক গোলা ছুঁড়েছে। খাঁড়ির ভেতর থেকে যে স্টীমারগুলো বেরিয়ে আসছিল সেগুলোকে আড়াল দিয়ে ওপাশে শহরতলি থেকে নেমে আসা লাল আর সবুজ ফৌজের সারিগুলোর ওপর ওরা চালাতে লাগল গোলা। তারপর কামানের মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে গোলাবর্ষণ করতে লাগল গিরিপথের মাথায় যেখানে লালফৌজী গোলন্দাজেরা ঘাঁটি

গেড়েছে সেইখানে। জেটিতে ভিড়-করা কসাকদের মাথার ওপর দিয়ে ইংরেজ গোলাগুলো ছুটতে লাগল অস্বস্তিকর গর্জন আর আর্তনাদ করে।

বোগাতিরিয়েফের ঘোড়াটা প্রায় বসে পড়েছিল। লাগামটা জোরে টেনে তাঁকে আঁকড়ে ধরে গোলাগুলির আওয়াজের মধ্যেই চেঁচিয়ে বলতে লাগল বোগাতিরিয়েফ.

—আরে ইংরেজ কামান তো খুব হাঁকডাক করছে। কিন্তু নিশানার বালাই নেই। কোনো ফয়দাই হচ্ছে না, খালি দুমদাম আওয়াজ।

গ্রিগর হেসে বললে, করুক আওয়াজ। এখন আমাদের কাছে ওরা সবাই সমান।—ঘোড়াটাকে চালিয়ে সে এবার পথ ধরে এগুলো।

খোলা তলোয়ার হাতে ছ'জন ঘোড়সওয়ার তখন ওদিকের মোড় ঘুরে আসছে বিপুল বেগে ঘোড়া চালিয়ে গ্রিগরদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে। একেবারে সামনের সওয়ারটির বুকের ওপর একটা রক্ত লাল শালুর টুকরো আঁটা।

অবশেষে ঘর

॥ এক ॥

দুদিন ধরে একটা উষ্ণ দখিনে হাওয়া বইছিল।

মাঠঘাটের শেষ বরফটুকুও গলে গেছে এর মধ্যে। বসন্তের ফেনিল জলধারাগুলো এবার কল্লোল থামিয়েছে, স্তেপের ছোট ছোট নদী আর নালায় ছলছল শব্দ নেই। তৃতীয় দিনের ভোর নাগাদ বাতাসটা পড়ে গেল। স্তেপের প্রান্তরে ভিড় জমালো ঘন কুয়াশা। গেল-বছরের কাশবনের ঝাড়গুলোতে শিশিরের রুপোলি ছোঁয়া লেগেছে। পাহাড়ী খাত, টিলা, আর গ্রামগুলো, ঘণ্টাঘরের চূড়ো আর ত্রিভুজাকৃতি পপ্‌লারের ছুঁচোলো ডগা—সব ডুবে গেছে একটা দুর্ভেদ্য দুগ্ধ-ধবল কুহেলির মধ্যে।

কুয়াশাচ্ছন্ন সেই ভোরে অসুখ থেকে ওঠার পর এই প্রথম আকসিনিয়া বেরিয়ে এসে দাঁড়াল সিঁড়ি দরজার গোড়ায়। ঝিরঝিরে দখিনে হাওয়ার উগ্র মিষ্টি নেশায় বুঁদ হয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সে। মাথাঘোরা আর বমিভাব দমিয়ে একেবারে ফলবাগানের কুয়োটা অবধি এগিয়ে গেল সে। বালতিটা নামিয়ে রেখে কুয়োর ধারে বসল।

পৃথিবী যেন অপরূপ অনন্য, আশ্চর্য সতেজ আর মোহময়ী মনে হয় আকসিনিয়ার চোখে। চারিদিকে ও চেয়ে দ্যাখে সলজ্জ চোখ মেলে, ছোট্ট শিশুটির মতো পোশাকের ভাঁজে ভাঁজে আঙুল চালায়। কুয়াশাঢাকা ওই দুরন্ত, বরফ-গলা জলে থৈ-থৈ বাগিচার ওই আপেল গাছগুলো, ভিজে বেড়া, বেড়া পেরিয়ে ওপাশের ওই রাস্তাটা, চাকার দাগের গভীরে যেখানে জল থিতিয়েছে—সবই অবিশ্বাস্য সুন্দর ঠেকে আকসিনিয়ার চোখে। যেন সূর্যালোকের ছোঁয়ার ঘন অথচ আল্‌তো রঙের ছোপ লেগেছে সবকিছু ফুটে ওঠার মধ্যে।

কুয়াশার ফাঁক দিয়ে এক টুকরো পরিষ্কার আকাশের উঁকি। ওই হিমশীতল নীলটুকু যেন আকসিনিয়ার চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। পচা বিচুলি আর ভিজে কালো মাটির সোঁদা গন্ধ এত চেনা আর মিষ্টি যে গভীরভাবে নিশ্বাস নেয় আকসিনিয়া, হাসি ফোটে ওর ঠোঁটের কোণে। কুয়াশা-ঢাকা স্তেপের কোন্ এক প্রান্ত থেকে এক টুকরো গান ভেসে এল স্কাইলাকের,

আর কী-একটা অব্যক্ত বেদনা জাগিয়ে তুলল আকসিনিয়ার বুকের মধ্যে। অচিন্ দেশে শোনা এই এক কলি স্কাইলার্কের গান ওর বুকের স্পন্দন যেন বাড়িয়ে দিল, ওর চোখ থেকে নিংড়ে বের করে নিল দুফোঁটা জল।

মনের অজ্ঞাতেই নতুন করে ফিরে পাওয়া এ জীবনটা ওর কাছে আনন্দময় হয়ে ওঠে। সবকিছু নিজের হাতে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখার একটা প্রবল ইচ্ছা জাগে, সবকিছু দেখতে ইচ্ছে করে খুঁটিয়ে। শিশির ধোয়া কালো দাগ-ধরা কবমচা ঝোপটাকে ছুঁতে চায় ও হাল্কা গোলাপী মখমলপারা ফুলে-ছাওয়া ওই আপেলগাছটার ডালে গাল চেপে ধরতে চায়। ভাঙা বেড় ডিঙিয়ে যেতে সাধ হয়, হেঁটে যেতে ইচ্ছে করে ওই বাদাড়ের ভেতর দিয়ে, পথ ছেড়ে আঘাটায়—সেই যেখানে মস্ত নিচু খানাটার ওপাশে মাঠে মাঠে হৈমন্তী ফসলের সবুজ সমারোহ দূরান্ত কুহেলির সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

বেশ কটা দিন আকসিনিয়ার কেটে গেল গ্রিগরের ফিরে আসার প্রতীক্ষায়। কিন্তু, পাড়াপড়শিরা যারা এ বাড়ির কর্তার সঙ্গে দেখা করতে আসে তারা বলে যুদ্ধ এখনো চলছে। ভোরোনেস থেকে অনেক কসাক নাকি ক্রিমিয়ার দিকে পাড়ি জমিয়েছে আর যারা পেছনে রয়ে গেল তারা হয় যোগ দিয়েছে লালফৌজে, নয়তো খাটতে গিয়েছে খনি এলাকায়।

হপ্তার শেষে ও মনস্থির করে ফেলল বাড়িতে ফিরে যাবে। পথের সাথীও একজন জুটে গেল আকাশ ফুঁড়ে। একদিন সন্ধ্যায় এক বেটেখাটো কুঁজো বাড়িতে সটান ঢুকে পড়ল কোনো জানান না দিয়েই। নমস্কার ঠুকে মুখটি বেশ বন্ধ—সে বোতাম খুলতে শুরু করল কাদাভরা ইংরিজি জোব্বা-কোটটার। কোটের সেলাই কেটে পড়ার উপক্রম ছেঁড়া থলির মতো ঝুলছে চারপাশে।

বাড়ির মনিব অনাহূত অতিথির দিকে অবাক হয়ে চেয়ে জিজ্ঞেস করে

তা, ভালোমানষের পো, ভালোমন্দ জিজ্ঞেসাবাদ নেই, হুট করে ঢুকে পড়লে যেন থাকবে বলে, এ আবার কী মতলব?

বুড়ো ঠিক করে জোব্বাকোটটা খুলে দরজার গোড়ায় একটু ঝেড়ে নিয়ে বেশ আলগোছে একটা দেয়ালের ওপর ঝুলিয়ে রাখে। তারপর ছোট্ট পাকা দাড়িটায় হাত বুলিয়ে একটু হেসে বলে

—দাদা ভাই, মাপ করো আমায় কিন্তু আমার এক কালে যা দেখবার শিখে নিয়েছি—আগে কাপড় জামা খুলে ফেল, তারপর জিজ্ঞেস করো রাতে থাকতে পারো কিনা। নয়তো তোমায় ঢুকতেই দেবে না। লোকে আজকাল বড্ডো শেয়ানা হয়েছে, অতিথ দেখলে খুশি হয় না।

—কিন্তু তোমায় শুতে দিই কোথায়? দেখতেই পাচ্ছ এমনিতেই আমাদের জায়গা হয় না।—আগের চেয়ে নরম হয়ে মনিব বলল।

—বাড়ি যাবার জন্য আমিও তৈরি হচ্ছি, দাদু।

—বেশ, তাহলে আমার সঙ্গে চলো। দুজনে একসঙ্গে বেশ ভালোই কাটবে পথটা।

আকসিনিয়া রাজী হয়ে যায় তখুনি। পরদিন বাড়ির কর্তাগিন্নির কাছে বিদায় নিয়ে ওরা দুজন রওনা হল নভো-মিখাইলভ্স্কি গ্রাম ছেড়ে।

বারোদিন ধরে পথ চলে অবশেষে সন্ধ্যা নাগাদ ওরা মিলিউতিন্স্কি গাঁয়ে আসে। একটা বড়সড় ভদ্রচেহারার বাড়িতে উঠে রাতটুকু সেখানে থাকার অনুমতি চায়। পরদিন সকালে আকসিনিয়ার সঙ্গী ঠিক করলে একহপ্তা সে এই গাঁয়েই কাটিয়ে দেবে। বিশ্রাম হবে, পা টা সারানো যাবে কারণ তার পায়ে ফোস্কা পড়ে রক্ত ঝরছে এখন। আর এগোবার ক্ষমতা নেই। এ বাড়িতে তার কিছু সেলাইয়ের কাজও জুটে গেল। বুড়ো নিজের সাবেকী পেশা ফিরে পাবার জন্য মুখিয়েই ছিল। জানলার ধারে বেশ জুত করে বসে কাঁচিজোড়া আর সুতো দিয়ে বাঁধা এক গোছা ছুঁচ বের করে চটপট একটা কাপড়ের সেলাই তুলতে শুরু করে দিল।

আকসিনিয়াকে বিদায় দেবার সময় বাচাল বুড়োটা ক্রুশ প্রণাম করে। হঠাৎ চোখে জল এসে পড়েছিল, কিন্তু তখুনি চোখ মুছে বুড়ো আগের মতোই রসিকতা করে

—দায় জিনিসটা সাধ করে আসে না, তবে দায়ে পড়লে অচেনা মানুষও আপন হয়ে পড়ে। এই দেখ না, তোমায় বিদায় দিতে আমার কষ্ট হচ্ছে। যাক কী আর করা যাবে, একাই চলে যাও বাছা, তোমার অভিভাবকের দুটো পা-ই খোঁড়া হয়ে গেল। কোথাও দুটি মোটাভাত যদি জোটে এবার। তাছাড়া বয়েসটা সত্তরের কোঠায়, সে তুলনায় বেশ হেঁটেছি তোমার সঙ্গে, একটু বেশীই হেঁটে ফেলেছি। যদি সুযোগ পাও আমার বুড়ীটিকে বোলো যে তার বুড়ো ঘুঘু বেচেবর্তে ভালোই আছে। বোলো যে তাকে হামামদিস্তায় ছেঁচা হয়েছে, ঢেঁকির তলায় পাড় দেয়া হয়েছে, তবু সে জানে বেঁচে আছে, এখন সে ভালো মানুষদের পাতলুন সেলাই করছে, যে কোনো সময় ঘরে ফিরতে পারে। আর এ কথাও তাকে বোলো সে বুড়ো হাঁদা এখন পেছু হটে আসছে, বাড়ির দিকেই ফিরছে, তবে সে জানে না কবে আবার বাড়ির চুল্লির ধারে উঠে বসবে।

রাস্তায় আরও বেশ কটা দিন কেটে গেল আকসিনিয়ার। বরফ ধ্বসে এসে একটা গাড়ি চেয়ে গেল ও যে পথে চলেছে সেদিক পানেই। তাতারস্কে এলো ঘোড়ায় চেপে। সন্ধ্যা নাগাদ নিজের বাড়ির আঙিনায় খোলা ফটকটার কাছে এসে এক নজর তাকাল মেলেখফদের বাড়ির দিকে।

আচমকা ওর গলার কাছে যেন একটা চাপা কান্না এসে আটকে গেল। রান্নাঘরটা খাঁ খাঁ করছে, একটা অবহেলার গন্ধ সেখানে। এতদিনের জমে ওঠা তীব্র মেয়েলি কান্নায় ও ফেটে পড়ে। তারপর ডনের দিকে যায় জল আনতে। উনুনটা ধরিয়ে টেবিলের ধারে বসে হাঁটুর উপর হাত জোড়া এলিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে ও শুনতেও পায় না দরজা খোলার আওয়াজ। ইলিনিচ্না যখন ঘরে এসে দাঁড়ায় কেবল তখনই ওর—চমক ভাঙ্গে। ইলিনিচ না বলে :

—ভাল আছ তো পড়শি? কতদিন চলে গেছ, ভিনদেশে ঘুরে বেড়িয়েছ, তোমার কোন খবরই পাইনি··· ।

আকসিনিয়া একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল।

—অমন করে চেয়ে আছ কেন?

কথা বলছ না কেন? কোন খারাপ খবর নেই তো?

—বলতে বলতে ইলিনিচ্না ধীরে ধীরে টেবিলের ধারে এসে বেঞ্চির কোণায় বসল, আকসিনিয়ার মুখের উপর থেকে তার সপ্রশ্ন চাউনিটা একবারও না সরিয়ে।

আকসিনিয়া থতমত খেয়ে বলে :

খবর আমার কাছে কেন? আমি ভাবতে পারিনি আপনি আসবেন। বসেবসে কি ভাবছিলাম। খেয়াল করিনি কখন আপনি এলেন।

—কী সাংঘাতিক রোগা হয়ে গেছ, শরীরে তো কিছু নেই মনে হচ্ছে।

—আমার টাইফাস হয়েছিল······

—আর আমাদের গ্রিগর সে কেমন আছে? ওকে কোথায় ছেড়ে এলে? বেঁচে আছে তো?

আকসিনিয়া সংক্ষেপে বললে যা কিছু জানত। ইলিনিচ্না একটি কথাও না বলে শেষ অবধি শুনল। তারপর জিজ্ঞেস করল . যখন তোমাকে ছেড়ে গেল তখন কি ওর অসুখ-বিসুখ ছিল।

—না।

—তারপর ওর আর কোন খবর পাওনি?

—না।

ইলিনিচ্না স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

—যাক, তোমার সুখবরটার জন্য ধন্যবাদ। কারণ গাঁয়ের মধ্যে ওর সম্পর্কে কত কথাই না লোকে বলে

প্রায় শোনাই যায় না এমনি ভাবে আকসিনিয়া বলে—কী কথা বলে?

—ও, রাজ্যের সব বাজে কথা ওসব গুজবে কান দিয়ে লাভ নেই· গাঁয়ের লোকদের মধ্যে শুধু ভাঙ্গা বেস্খে্বনফ্ই ফিরে এসেছে। কাতেরিনোদারে

ও অসুস্থ দেখেছিল গ্রিগরকে। এ ছাড়া আর অন্য যা-সব গল্প সে আমি বিশ্বাস করি না।

—কিন্তু ওরা কী বলে দিদিমা ?

—শুনেছি সিনগিন গাঁয়ের এক কসাক নাকি বলেছে লালফৌজ গ্রিগরকে মেরে ফেলেছে নভোরোসিস্কে। খবর শুনে আমি সিনগিন অবধি ছুটেছিলাম। মায়ের প্রাণ কি স্থির থাকতে পারে!···কসাকটিকে খুঁজে বের করলাম। সে প্রত্যেকটি কথাই অস্বীকার করলে, গ্রিগরকে সে নাকি চর্মচক্ষেই দেখেনি। তারপর আর এক গুজব রটল, ও নাকি কয়েদখানায় ছিল, সেখানেই টাইফাসে মারা গেছে·· ···।

ইলিনিচনা চোখ নামিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে নিজের কড়াপড়া ভারী হাতদুটো খুঁটিয়ে দেখতে থাকে। বয়েসের জন্য গালের চামড়া ঝুলে পড়েছে। তবু বুড়ীর মুখখানা প্রশান্ত, চাপা ঠোঁট দুটোয় কঠিনতা; কিন্তু হঠাৎ কালসিটে ধরা গালের ওপর যেন একটা লাল আভা উপ্‌চে ওঠে, চোখের পাতাজোড়া কাঁপে। আকসিনিয়ার দিকে উৎসাহভরা জ্বলজ্বলে শুকনো চোখদুটো মেলে ধরা গলায় বলে :

—কিন্তু আমার তো বিশ্বাস হয় না। আমার শেষ ছেলেটাকেও হারাবো সে হতেই পারে না। আমাকে সে শাস্তি ঈশ্বর দেবেন কেন?···আর তো মাত্র কটা দিন বাঁচব।·· আর মাত্র কটা দিন, আমার দুঃখের পেয়ালা তো এমনিতেই উপচে পড়ছে! গ্রিশা বেঁচে আছে! আমার মন যখন বলছে তখন বাছা আমার নিশ্চয়ই বেঁচে আছে।

কথা না বলে সরে গেল আকসিনিয়া।

রান্নাঘরে একটানা দীর্ঘ নীরবতা। হঠাৎ দম্‌কা বাতাসে সিঁড়ির দরজাটা খুলে গেল, ওদের কানে এল ডনের ওপারে পপ্‌লার বনের ভেতর দিয়ে বানের জল সরে যাওয়ার কল্‌কল্ শব্দ, জলের ওপর দিয়ে বুনো হাঁসেদের ব্যাকুল ডাক।

আকসিনিয়া দরজাটা ভেজিয়ে চুল্লির কাছে গিয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়।

নিচু গলায় বলে, ওর জন্য দুঃখ করবেন না দিদিমা। ওর মতো মানুষকে কি ব্যারামে কাবু করতে পারে? লোহার মতো শক্ত মানুষ সে। অমন লোক মরে না। দারুণ তুষারের মধ্যেও সারা পথ চলেছে, হাতে দস্তানা নেই।

—ছেলেপুলেদের কথা কোনো সময় বলত? ক্লান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করে ইলিনিচ্‌না।

—আপনার কথা, ছেলেদের কথা বলত অনেক সময়। ওরা সব ভালো আছে তো?

—ভালোই আছে, ওদের অকল্যাণ কে করবে? কিন্তু আমাদের

পান্তালিমন প্রকোফিচ্ মারা গেছে পেছু হটার সময়। এখন আমরা পড়েছি একলা…।

আকসিনিয়া নিঃশব্দে ক্রুশপ্রণাম করে। স্বামীর মৃত্যুর কথাটা বুড়ী এমন শান্তভাবে বলে যে আশ্চর্য ঠেকে আকসিনিয়ার।

টেবিলে হাত রেখে ইলিনিচ্না ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। বলে, দেখেছ কাণ্ড। তোমার সঙ্গে বসে গল্প করছি, ওদিকে আঁধার হয়ে এল যে।

—বসুন না যতক্ষণ খুশি, দিদিমা।

—নাঃ যেতেই হবে, দুনিয়াটা একা রয়েছে ঘরে।—মাথার ওপর ওড়না টেনে দিতে দিতে রান্নাঘরের ভেতরটা একবার দেখে ভুরু কোঁচকায় বুড়ী—তোমার চুল্লিতে দেখছি বড্ডো ধোঁয়া উঠছে। চলে যাবার সময় কাউকে এখানে এসে থাকবার ব্যবস্থা করে গেলে ভালো করতে। যাক্, আসি তবে! •

দরজার শেকলে হাত দিয়ে পেছনে ঘাড় না ফিরিয়েই আবার বলে: একটু যখন থিতু হয়ে বসবে, একবারটি না-হয় এসো দেখা করতে। হয়তো গ্রিগরের খবর কিছু পাবে। তখন জানাতে পারবে।

* * *

সেই দিনটি থেকে মেলেখফ পরিবারের সঙ্গে আকসিনিয়ার সম্পর্কটা সম্পূর্ণ বদলে গেল। গ্রিগরের মরা-বাঁচা নিয়ে ওদের উভয়ের উৎকণ্ঠাই যেন উভয়কে আরো কাছাকাছি, আরো নিকট করে আনে। পরদিন দুনিয়া আকসিনিয়াকে উঠোনে দেখে ওকে ডাকে। বেড়ার ধারে এসে আকসিনিয়ার রোগা কাঁধদুটোর ওপর হাত রেখে ওর দিকে চেয়ে মিষ্টি সরল হাসি হেসে বলে:

—কী রোগা হয়ে গেছ, আকসিনিয়া! একেবারে হাড় গোনা যায় যে!

জবাবে আকসিনিয়া হাসে। বলে, এমন জীবন তোমার হলে একই দশা হত তোমারও।—পূর্ণ সৌন্দর্যে ফুটে-ওঠা মেয়েটির রক্তিম মুখশ্রী দেখে একটা ঈর্ষার ব্যথা অনুভব করে আকসিনিয়া।

কোনো কারণে গলার আওয়াজটা নিচু করে দুনিয়া জিজ্ঞেস করে—মা কাল তোমাকে দেখতে এসেছিল বুঝি?

—হ্যাঁ।

—আমিও তাই ভেবেছিলাম। গ্রিশার কথা জিজ্ঞেস করেছে?

—হ্যাঁ।

—আর কাঁদেনি একটুও?

—না। মনটা খুব শক্ত ওঁর।

আকসিনিয়ার দিকে আস্থার দৃষ্টিতে চেয়ে দুনিয়া বলে:

—কাঁদলে বোধ হয় ভালোই হত তার পক্ষে, আবো লাঘব হত কষ্ট।…
জানো আকসিনিযা, সেই গেল শীতকালের পর থেকে এমন সুন্দর মানুষটি হযে উঠেছে মা, আগেব মতো একেবাবেই নয। বাবার কথা যখন শুনল আমি ভাবলাম বুঝি একেবাবে ভেঙে পডবে, ভীষণ ঘাবডে গেলাম। কিন্তু এক ফোঁটা জল গডাল না তাব চোখে। শুধু বললে. স্বর্গবাজ্যে প্রবেশলাভ ককন উনি। আমাব স্বামীব সব দুঃখভোগেব অবসান হল । এবপব সন্ধ্যে অবধি আব কাবো সঙ্গে একটি কথা নয। আমি কত কিছু বলাবাব চেষ্টা কবলাম তাকে দিযে, কিন্তু শুধু হাত নেডে আমাকে সবিযে দেয আব চুপ কবে থাকে। সেদিন তাকে নিযে আমাব যা দুশ্চিন্তা হযেছিল। সন্ধ্যায মাঠ থেকে গকভেডাগুলো ফিরিযে এনে আঙিনা ছেডে এসে তাকে জিজ্ঞেস করলাম · মা, বাতেব জন্য কিছু চডাবো উনুনে ? তখন তাব যন্ত্রণা যেন কাটল, কথা বলতে শুক কবল ।—দুনিযা নিশ্বাস ফেলে চিন্তিতভাবে আকসিনিযাব কাঁধেব ওপব দিযে চোখেব দৃষ্টি মেলে বলে

—আচ্ছা, গ্রিগব কি মাবা গেছে ? লোকে যা বলছে তা কি সত্যি ?

—আমি তো জানি না ভাই।

আকসিনিযাব দিকে আডচোখে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিযে দুনিযা আবো গভীবভাবে নিশ্বাস ফেলে।

—মা কেবল ওব জন্যই দিনবাত হা হুতাশ কবে। মুখে কেবল 'আমাব বাছা' ছাডা কথাই নেই। ওযে কখনও মাবা যেতে পাবে তা মা কিছুতেই বিশ্বাস কবছে না। কিন্তু জানি আকসিনিযা, যদি কখনও শোনে সে সত্যিই বেচে নেই তা হলে দুঃখে শোকে নিজেই মাবা যাবে। জীবনেব সব সাধ চলে গেছে, একমাত্র আশা যা নিযে বেচে আছে তা হলো গ্রিগব। ছেলেপিলেবাও তাঁকে তেমন চায না আজকাল, কাজেব সময হাত থেকে জিনিস পডে যায। একবাব ভেবে দেখ, একটি বছবেব মধ্যে আমাদেব পবিবারেব চাব চাবজন লোক ··আকসিনিযা বেডাব ওপব ঝুঁকে পডে সহানুভূতিব আবেগে দুনিযাকে বুকে জডিযে ওর গালে সজোবে চুমু খায।

—তোব মাকে কাজকর্মেব মধ্যে আটকে বাখিস ভাই। বেশী শোক কবতে দিস নে।

—কী দিযে ওকে আটকে রাখব ? ওডনাব কোণ দিযে চোখ মুছে বলে দুনিযা :

—একবাব এসনা আমাদেব ঘবে। মাব সঙ্গে কথা বলবে। তাতে খানিকটা হাল্কা হবে হযত ওব মনটা। আমাদেব এডিযে চলাব কোন কাবণ নেই তোমাব।

—আচ্ছা, আসব একসময। আসব ঠিকই দেখিস।

—কাল আমাকে খামাবে যেতে হবে। আনিকুশকাব বিধবা বউটার

সঙ্গে হাত মিলিয়েছি, কিছু গম বুনব এই ইচ্ছে আমাদের। তোমার নিজের জন্য কিছু বুনবার কথা ভেবেছ নাকি?

—হ্যাঁ, আমি তো সেইরকম বুননেওয়ালা।—নিরানন্দ হাসি হেসে বলে আকসিনিয়া—বুনবার আছেই বা কী আমার? তাছাড়া কী লাভ বুনে, বল? নিজের জন্য আমার তেমন প্রয়োজন নেই, কোনোরকমে বেঁচে থাকতে পারব।

—তোমার স্তেপানের কোনো খবর পেয়েছ?

—না, কোনো খবর নেই।—উদাসীনভাবে জবাব দেয় আকসিনিয়া,—খুব একটা উৎকণ্ঠাও নেই আমার তার জন্যে।—নিজের কথায় আকসিনিয়ার নিজেরই অবাক লাগে। অজান্তেই বেরিয়ে এসেছে এই স্বীকারোক্তিটুকু, অপ্রতিভ মনে হয় নিজেকে। বিব্রত ভাবটাকে চাপা দেবার জন্য সে তাড়াতাড়ি বলে, যাক, এবার আসি ভাই। একটু ঘরে গিয়ে গোছগাছ করতে হবে।

দুনিয়া যেন আকসিনিয়ার বিব্রতভাবটা লক্ষ্য করেনি এমনি ভান করে। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলে

—একটু সবুর। বলছিলুম কি, তুমিও আমাদের সঙ্গে কাল একটু হাত লাগাবে কি? নয়তো মাটিটা তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে, শেষ অবধি সামলাতে পারব বলে ভরসা হয় না। গাঁয়ে তো মাত্র দুটি কসাক মিস্ত্রি রয়েছে, তারাও আবার খোঁড়া।

আকসিনিয়া সাগ্রহে রাজি হয়। খুশি হয়ে দুনিয়া চলে যায় জোগাড়যন্ত্র করতে।

পরদিন সকালের জন্য সে তৈরি হতে থাকে পর-পর যা সাজাবার ঠিকঠাক করে। আনিকুশকার বউয়ের সঙ্গে মিলে বীজগুলো ঝেড়ে নেয়, মইটাকে মেরামত করে, ঠেলাগাড়ির চাকায় তেল দেয়, বীজ বোনার সব ব্যবস্থা করে। সন্ধ্যের সময় কিছু গমের শীষ কুড়িয়ে একটা রুমালে জড়িয়ে নিয়ে কবরখানায় যায়। পিয়োত্র, নাতালিয়া আর দারিয়ার কবরের ওপর সেগুলো ছড়িয়ে রাখে যাতে পরদিন পাখিরা উড়ে আসে সেই কবরগুলোর কাছে। সরল মনে ও বিশ্বাস করেছে মৃতদের আত্মা পাখিদের আনন্দ কলরব শুনে খুশী হবে।

সূর্য ওঠার ঘণ্টাখানেক আগেই যা-একটু গভীর স্তব্ধতা নেমে এসেছিল ডনপারের মাটিতে। জল থৈ থৈ বন। ভেতর দিয়ে চাপা কলকল শব্দে বেনোজল ছুটছে পপ্‌লারের হাল্কা সবুজ গুঁড়িগুলোকে ধুয়ে, জলের ওপর মাথা জাগিয়ে থাকা ওকের ঝোপ আর কচি ঝাউয়ের ডগাগুলোকে

তালে তালে দুলিয়ে। টইটম্বুর হ্রদের জলে স্রোতের টানে হুমড়ি খেয়ে পড়া শরবনের সোঁ সোঁ শব্দ জলে-ভাসা ক্ষেতখামারের কোলে নির্জন খাড়ির ধারে যেখানে যেখানে বানের জল দাঁড়িয়েছে জমা বরফের মতো নিথর হয়ে, আর বুকে ধরেছে তারাভরা আকাশের গোধূলি-আলো,—সেখানে চখাচখীর মৃদু ডাক, নর-হাঁসের ঘুম জড়ানো শিস্ আব কদাচিৎ মরশুমী মরালের কলকণ্ঠ। বন্যার অঢেল বিস্তারে পুষ্ট হয়ে ওঠা মাছের দল অন্ধকারেই লাফিয়ে ওঠে একেক সময়, আর তরল ঢেউ গড়িয়ে গড়িয়ে যায় ঝিল্‌মিলে জলের ওপর দিয়ে অনেক দূরে, সঙ্গে সঙ্গে শোনা যায় কোনো চম্‌কে ওঠা পাখির সতর্ক কাকলি। তার পরেই আবার নীরব হয়ে মুখ বোজে ডনপারেব মাটি। কিন্তু ভোরের সঙ্গে যেই খড়িমাটি জাগা পাহাড়ী বাঁকগুলো লালচে হয়ে উঠল, অমনি জাগল একটা মেঠো হাওয়া। স্রোতের উলটো বইতে লাগল, সজোরে, সবেগে। নদীব ওপর মাথা জাগাল প্রকাণ্ড একেকটা সাত হাত উঁচু ঢেউ, বনের ফাঁকে-ফাঁকে গজবালো বন্যাব ক্ষেপা জল, দুলে দুলে ককাতে লাগল গাছেরা। এমনি করে সারাদিন বইল সে বাতাস, একেবাবে রাত ভোবের দিকে তার ক্ষান্তি। আর এই জল হাওয়া চলল বেশ কটা দিন ধরে। স্তেপের মাঠে পবদা টেনে দিয়েছে একটা লাল্‌চে-বেগ্‌নি কুয়াশা। মাটি শুকিয়ে ঘাসের বাড বন্ধ হযে গেছে, হেমন্তের রিক্ত মাঠে ধবেছে ফাটল। ঘণ্টায় ঘণ্টায় আবো শুকিযে উঠছে মাটি, অথচ তাতারস্কের ফসলী জমিগুলোতে একটি প্রাণীরও দেখা নেই। গোটা গাঁয়ে গুটিকয়েক জড়ভরত বৃদ্ধ রয়ে গেছে। পশ্চাদপসবণ কবে ফিরেছে কয়েকজন তুষারাহত, অসুস্থ বা পঙ্গু কসাক। ক্ষেত খামারে কাজ করছে কেবল মেযে আর শিশুরা। মানুষ-পালানো গাঁযে শুধু পাগলা হাওয়া ধুলো ছড়ায়,- কুঁড়েঘরের দরজাগুলোয় তালি বাজায় আর চালার ওপরের খড়গুলোকে এলোমেলো করে দেয়। বুড়োরা বলে, এবছর অজন্মা হবে রে! একে তো শুধু মেয়েরাই নেমেছে মাঠে, তায় আবার তিনখানা ঘরের একখানাতে শুধু ফসল বোনা। আর মরা মাটিও হয়েছে তেমনি বাঁজা।

দুনিয়া আর অন্য মেয়েরা দুদিন হল বীজ বোনা শুরু করেছে। আকসিনিয়া সেদিন বিকেল নাগাদ বলদগুলোকে পুকুরে এনেছিল জল খাওয়াতে। বাঁধের পাশে একটা জিন-আঁটা ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে অবনিজভদের দশ বছরের ছেলেটা। ঘোড়াটা জাবর কাটছে, নরম ধূসর ঠোঁট বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে। কিন্তু ছেলেটা এদিকে বেশ তাল-তাল কাদা তুলে পুকুরের জলে ছুঁড়ে সকৌতুকে দেখছে কেমন করে ঢেউয়ের চাকাগুলো ধীরে ধীরে বড়ো হয়ে মিলিয়ে যায়।

আকসিনিয়া জিজ্ঞাস করে—কোথায় চলছিস রে ভাঙ্কা ?

—মা'র জন্য খাবার এনেছি।

—গাঁয়ের সব খবর কী রে ?

—কিছু না। গেরাসিম দাদু কাল রাতে বেশ বড়ো একটা কাতলা মাছ ধরেছিল। ফিওদর মেলনিকফ ফিরে এসেছে পেছু হটে যাবার সময়।

পায়ের ডগায় ভর দিয়ে ঘোড়ায় লাগাম চাপিয়ে ছেলেটা এক গোছা বালামচি আঁকড়ে ধরে। তারপর অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে জিনের ওপর লাফিয়ে উঠে বসে। বয়স্ক একজন চাষীর মতো গদাই-লস্করী চালে প্রথমটা ঘোড়া নিয়ে এগোয় পুকুর ছেড়ে। কিন্তু খানিকটা এগিয়ে একবার আকসিনিয়ার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখেই জোরে ঘোড়া দাব্ড়ায়, পেছন থেকে ওর ফ্যাকাশে নীল জামাটাকে দেখায় একটা ফুলে-ওঠা বেলুনের মতো।

বলদগুলো জলে মুখ দিয়েছে। আকসিনিয়া বাঁধের ওপর শরীরটা একবার এলিয়ে দিয়ে তখুনি ঠিক করে ফেলে গাঁয়ে ফিরে যাবে। মেলনিকফ কসাক সেপাই। সে নিশ্চয় গ্রিগরের কিছু খবর রাখবেই। বলদগুলোকে চালার তলায় এনে ও ডুনিয়াকে বললে :

—আমি গাঁয়ে চললুম। ভোরে ফিরে আসব।

—বিশেষ কাজ ?

—হ্যাঁ।

পরদিন সকালে ফিরে এল আকসিনিয়া। ডুনিয়া যখন বলদগুলোকে জোয়ালে জুতছে, আনমনা একটা গাছের ডাল দোলাতে দোলাতে এগিয়ে এল সে। ভুরুজোড়া কিন্তু ওর কোঁচকানো। ঠোঁটের কোণাদুটো সজোরে চেপে রাখা।

—ফিওদর মেলনিকফ ঘরে ফিরেছে। গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম গ্রিগরের কথা। কোনো খবরই রাখে না।—সংক্ষেপে কথা কটা বলেই চট্ করে ঘুরে চলে গেল আকসিনিয়া খামার বাড়ির দিকে।

* * * * *

ওদের গম বোনার কাজ হয়ে যাবার পর আকসিনিয়া নিজের জমি নিয়ে পড়ে। তরমুজ-ক্ষেতে তরমুজ বোনে। বাড়িটাকে পলেস্তারা লাগিয়ে চুনকাম করে যতদূর ওর ক্ষমতায় কুলোয়। ঘরে যেটুকু খড় ছিল তাই দিয়ে চালাঘরের ওপরটা ছায়। কাজের মধ্য দিয়ে দিন কাটে, কিন্তু গ্রিগরের জন্য ওর মনের উদ্বেগ কিছুতে কমে না। স্তেপানের কথা ওর ভাবতেও ইচ্ছে করে না। কোনো কারণে ওর দৃঢ় ধারণা হয়েছে স্তেপান আর ফিরবে না। তবু যখন কোনো কসাক ঘরে ফেরে তখন ওর প্রথম প্রশ্ন হয়—আমার স্তেপানকে তোমরা কেউ দেখেছ ? তারপর অবশ্য পাকে-প্রকারে চেষ্টা করে গ্রিগরের খবর খুঁটিয়ে বের করতে। গাঁয়ের সবাই ওদের ঘনিষ্ঠতার

কথা জানত ; এমন কি পরচর্চা-প্রিয় মেয়েরা অবধি ওদের নিয়ে কানাকানি বন্ধ করেছে। কিন্তু আকসিনিয়া লজ্জা পায় পাছে ওর মনের আবেগ প্রকাশ হয়ে পড়ে। নেহাত যখন কোনো যুদ্ধফেরত গোমড়া-মুখো সেপাই গ্রিগরের কথা আদপেই উল্লেখ করে না তখন আকসিনিয়া অপ্রতিভ হয়ে বলে ফেলে, কিন্তু আমাদের পড়শি গ্রিগর পান্তালিয়েভিচ্‌কে আপনারা দেখেননি কোথাও ? ওঁর মা তো ভেবে সারা ; একেবারে শুকিয়ে মরলেন··।

নভোরোসিস্‌কে ডন ফৌজ আত্মসমর্পণ করার পর গ্রিগর বা স্তেপানকে গাঁয়ের কোনো কসাকই দেখেনি। কিন্তু জুনের শেষে স্তেপানেরই রেজিমেণ্টের আরেক সেপাই ঘরে ফেরার পথে দেখা করতে এল আকসিনিয়ার সঙ্গে। খবর জানাল : স্তেপান তো ক্রিমিয়াতে চলে গেছে, আমার কাছে আসল খবর শুনুন। নিজের চোখে তাকে জাহাজে উঠতে দেখেছি। তার সঙ্গে একটা কথা বলারও সুযোগ আমার হয়নি। সে এমন ভিড় যে মানুষের মাথার ওপর দিয়ে ওদের হাঁটতে হয়েছে!—গ্রিগরের কথা জিজ্ঞেস করতে লোকটা ভাসা-ভাসা জবাব দিলে : দেখেছিলুম তাকে জেটিতে। পদক চাপরাশ পরা। কিন্তু তারপর আর নজরে পড়েনি। অনেক অফিসারকে নাকি মস্কোতে ধরে নিয়ে গেছে। কে জানে সে এখন কোথায় · ?

কিন্তু এক হপ্তা বাদে তাতারস্কে ফিরে এল প্রোখর জাইকফ। জখম হয়ে মালগাড়িতে চেপে এসেছে মিলেরোভো স্টেশন থেকে। খবরটা শুনে আকসিনিয়ার গাই দোহানো বন্ধ হয়ে গেল। বাছুর ছেড়ে দিয়ে ওড়না মাথায় টেনে ও তাড়াতাড়ি পা চালাল জাইকফের বাড়ির দিকে। পথে আসতে আসতে ভাবল, প্রোখরই জানবে নিশ্চয়। জানতেই হবে ওকে! কিন্তু ধরো যদি ও বলে গ্রিগর মারা গেছে ? তাহলে আমি কী করব ?— ক্রমে ক্রমে ওর চলার বেগ শিথিল হয়ে আসে, হাতটা বুকের কাছে রাখে। যদি মন্দ খবর হয় ? বুকটা কেঁপে ওঠে ওর।

মস্ত এক গাল হেসে ঠুঁটো বাঁ হাতখানা পেছনে লুকিয়ে প্রোখর ওকে সাদরে ডেকে নেয় বড় ঘরটার মধ্যে :

—এই যে আমার সাথী! নমস্কার গো! তোমায় দেখে বড় খুশি হলাম। এদিকে আমরা তো ভেবেছিলাম সেই ছোট গ্রামটাতেই তুমি বুঝি পটল তুলেছ। যা বিচ্ছিরি অসুখে পড়েছিলে—আর তোমাদের ছুরতও যা করেছে—মানে ওই টাইফাসে·· আহা! দেখবার মতো। কিন্তু পোল্‌রা আমায় কেমন চমৎকার করে কুঁদে দিয়েছে দেখেছ তো। হতভাগার দল!—প্রোখর ওর বাঁহাতের গিঁটবাঁধা আস্তিনটা দেখায়— আমার বউ তো দেখে কেঁদেই আকুল। কিন্তু আমি তাকে বোঝালুম, ওরে গাধা অমন চেঁচাসনে। আরো কতজনের মাথা কেটে নিয়েছে অথচ তারা নালিশটি জানায়নি অবধি।···কিন্তু একখানা হাত গেছে, তো

কী আর এমন। যখন খুশী কাঠের হাত বানিয়ে দিতে পারে। তা ছাড়া কাঠের হাতে ঠাণ্ডা লাগার ভয় নেই। কাটা গেলেও রক্ত পড়বে না। অসুবিধে শুধু বুঝলে ভাই। একহাতে এখনও ঠিক দ্রুত করে উঠতে পারি না। পাতলুনে বোতাম লাগাতে পারি না, মুশকিল। কিয়েভ থেকে বাড়ি এলাম, এতটা পথ বোতাম খোলাই ছিল। কী লজ্জা! তাই, একটু উনিশ-বিশ দেখলে কিছু মনে কোরো না। যাক, ভেতরে এসে বোসো, আমার অতিথি যে গো তুমি, নাকি? যতক্ষণ গিন্নি বাইরে আছে ততক্ষণ একটু গালগল্প করা যাক। শয়তানীটাকে একটু ভদকা আনতে পাঠিয়েছি। ঘরে স্বামী ফিরল কাটা হাত নিয়ে, আর গলা ভেজাবার একটু সামগ্রী অবধি রাখেনি! বেটাছেলে বিদেশে থাকলে তোমাদের সব মেয়েমানুষই সমান। তোমাদের সবাইকে আমি চিনি, সত সব ভিজে বেড়াল।

—যাক, আমাকে বল তো...

—হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি। বলছি! তোমাকে এমনি করে নমস্কার জানাতে বলেছে।—বলে প্রোখর তামাশা করে মাথা নিচু করে, তারপর ফের খাড়া হয়ে ভুরু উঁচোয় অবাক হয়ে—আরে দেখ দেখ, বেশ তো! এমন কাঁদছ কেন বোকার মতো? তোমরা মেয়েমানুষ জাতটাই এক ছাঁচে গড়া! যদি স্বামী মল তাহলেও কান্না, যদি জ্যান্ত ঘরে ফিরল, তাহলেও কান্না। চোখ মোছ, চোখ মোছ, আরে দূর, এমন ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে আছে? নভোরসিস্কে সে আর আমি কমাণ্ডার বুদিয়নির চোদ্দ-নম্বর ডিভিশনে যোগ দিয়েছিলাম।

আমাদের গ্রিগর পান্তালিয়েভিচ তো এক কোম্পানি, মানে এক স্কোয়াড্রনের নেতাই হয়ে বসল। আমি অবিশ্যি তার আবদালি হলুম। কিয়েভ অবধি মস্ত করে চললুম আমরা। হ্যাঁ ভাই পোলগুলোকে বেশ শিক্ষা দিয়েছি যাই বলো! পথে চলতে চলতে গ্রিগর বলেছিল, জার্মানদের মেরেছি, অস্ট্রিয়ানদের ওপর তলোয়ার পরখ করেছি, পোলদের মাথার খুলি বড়ো শক্ত হবে মনে হয় না। আমার তো মনে হয় আমাদের রুশদের চেয়েও ওদের তলোয়ার পেঁচানো অনেক সোজা হবে তাই না হে? বলে আমার দিকে চোখ টিপে দাঁত বার করলে! লালফৌজে যোগ দেবার পর ও একদম বদলে গেছে। খুব হাসিখুশী, আর বেঁড়ে ঘোড়ার মতো চটপটে। তবে হ্যাঁ, আমাদের পারিবারিক ঝগড়াটা অবশ্য লেগেই থাকত বরাবর। একদিন তার কাছে গিয়ে ঠাট্টা করে বলেছিলাম, 'হুজুর, কমরেড মেলেখফ, এবার একটু থামতে হয় যে!' চোখ পাকিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল খবরদার, ওসব তামাশা করবে না, হয় খারাপ হয়ে যাবে বলে দিচ্ছি!' সেদিনই সন্ধ্যায় কী একটা কাজে

আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল। আমারও মাথায় কী দুষ্টু বুদ্ধি চাপল, আবার ডাকলাম 'হুজুর' বলে···ব্যস্। যে ভাবে পিস্তলখানা উঁচিয়ে ধরলে! একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে নেকড়ের মতো দাঁত বের করলে—দাঁতও ওর তেমনি দু'পাটি, মুখ জুড়ে, সার বেঁধে সেপাই দাঁড়িয়ে আছে যেন। আমি একটা ঘোড়ার পেটের তলায় মাথা লুকোলুম। নিজেকে কোনো রকমে বাঁচিয়ে। শয়তানটা আমায় খালি মরতে বাকি রেখেছিল! যাক, আমরা তো উক্রেইনে এসে পোলদের সঙ্গে লড়াই জুড়ে দিলাম। মন্দ যুদ্ধ করে না, তবে শিরদাঁড়া একটু কমজোরী। এমনিতে সব মোরগের মতো বুক ফুলিয়ে চলে, কিন্তু তেমন চাপ দিলে পিঠটান দিতে কসুর করে না!

আকসিনিয়া তোতলাতে থাকে—বোধহয় ছুটিতে ঘরে ফিরবে?···

প্রোখর ফোঁস করে ওঠে—অমন কথাও ভেবো না! গ্রিগর বলে আগে যত পাপ করেছে তার প্রায়শ্চিত্তি না হওয়া তবধি চালিয়েই যাবে কাজ। আর তা সে করবেও: মুখ্যুর কাজ আর তেমন কঠিন কিসে? আমাদের একটা ছোট শহরের ওপর হামলা চালাবার জন্য টেনে নিয়ে গেল একবার। আমি নিজের চোখে দেখেছি ও চার-চারটে উহ্লানকে কেটে শেষ করল। ছেলেবেলা থেকেই শয়তানটা ন্যাটা, তাই দু'ধার থেকেই সমানে চালাতে পারে। লড়াইয়ের পর বুদিয়ানি স্বয়ং রেজিমেণ্টের সামনে ওর করমর্দন করলেন, ওকে আর আমাদের স্কোয়াড্রনকে ধন্যবাদ জানালেন। এই তো সব কীর্তিকলাপ ও করে বেড়াচ্ছে···তোমার ওই পান্তালিয়েভিচ।

আকসিনিয়া যেন আচ্ছন্নের মতো শুনছিল।···মেলেখফদের ফটকের সামনে এসে ওর চমক ভাঙল। দুনিয়া সিঁড়ির দরজায় বসে দুধে চুমুক দিচ্ছিল। ভুরু না তুলে সে জিজ্ঞেস করলে:

—তুমি বুঝি খামিরটার জন্য এসেছ? আমি নিজেই নিয়ে যাবো বলেছিলাম অথচ একদম ভুলে গিয়েছি।—কিন্তু আকসিনিয়ার দিকে নজর পড়তেই ওর জলভরা অথচ আনন্দে উজ্জ্বল চোখ জোড়া দেখে কিছু বুঝতে আর বাকি রইল না দুনিয়ার।

দুনিয়ার কাঁধে নিজের উত্তপ্ত মুখখানা চেপে ধরে আনন্দে হাঁপাতে হাঁপাতে আকসিনিয়া চাপা গলায় বললে:

—বেঁচে আছে রে, ভালো আছে···খবর দিয়ে পাঠিয়েছে···যা এবার মাকে গিয়ে বল্!

॥ দুই ॥

শ্বেতরক্ষীদের সঙ্গে তাতারস্কের যেসব কসাক পশ্চাদপসরণ করেছিল, তাদের মধ্যে জন তিরিশেক ফিরে এল গরম পড়ার আগেই। ওদের বেশির ভাগই বুড়ো আর বয়স্ক কসাক সেপাই। অসুস্থ আর আহত ছাড়া গাঁয়ের আর-সব জোয়ান কসাক এখনো নিখোঁজ। কিছু কিছু যোগ দিয়েছে লালফৌজে। অন্যরা র‍্যাঙ্গেলের ফৌজীদলের সেপাই হয়ে ক্রিমিয়ায় বসে দিন গুণছে। ডন এলাকায় নতুন করে এগোবার জন্য তৈরি হচ্ছে তারা।

যারা গেছে তাদের অর্ধেকই থেকে যাবে ভিন দেশে চিরকালের মতো—হয় টাইফাসে ভুগে শেষ হবে, নয়তো শত্রুর সঙ্গে কুবানের তীরে শেষ মোকাবিলায় মরণকে ডেকে এনে। মূল ফৌজ থেকে যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল তারা মানিচের ওপারে স্তেপ অঞ্চলে ঠাণ্ডায় জমে মারা গেছে। দুজনকে গেরিলা সেপাইরা বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিল, তারা একেবারেই বেপাত্তা। তাতারস্ক থেকে অনেক কসাকই নিখোঁজ হয়েছে। মেয়েরা উদ্বিগ্ন ব্যাকুল প্রতীক্ষায় হাতের তেলোর আড়াল দিয়ে চেয়ে থাকে দূরের পানে। কে জানে? হয়তো কোনো দেরি করে ফেরা পথিক সন্ধ্যার নীলচে কুয়াশায় সামনের ওই পথ ধরে এগিয়ে আসছে।

অনেকদিন প্রতীক্ষার পর যদি কোনো ঘরের মনিব এল উস্কোখুস্কো উকুনপড়া রোগা চেহারা নিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে তার বাড়িতে আনন্দের সোরগোল পড়ে যাবে। নোংরা কালো সেপাইটির জন্য জল গরম হবে। ছেলেপিলেরা রেষারেষি করবে বাপের সঙ্গে প্রথম কথা বলার জন্য। তার প্রত্যেকটা চালচলন হাঁ করে দেখবে। আনন্দে প্রায় মাথা খারাপ করে গিন্নি একবার ছুটবে টেবিল সাজাতে, আবার দৌড়বে তোরঙ্গ থেকে কর্তার জন্য পরিষ্কার জামা বের করতে। তারপর দেখা যাবে, যেন নেহাত তার ভাগ্যে কাঁটা দেবার জন্যই ইচ্ছে করে কাপড়টায় তালি পড়েনি। ছুঁচের ফুটোয় তখন তার সুতো পরাতে কেবলই আঙুল কাঁপে। সেই আনন্দের মুহূর্তে অমন যে বার-বাড়ির ওঁচা কুকুরটা,—বহুদূর থেকে মনিবকে চিনতে পেরে তার পেছন পেছন ছুটে দোরগোড়া অবধি এসে যখন তার হাত চাটতে থাকবে তখন তাকেও ঢুকতে দেয়া হবে বাড়ির ভেতর। থালা গেলাস ভেঙে আর দুধ উল্টে দিয়েও সেদিন বাড়ির কাচ্চা-বাচ্চারা নিস্তার পেয়ে যাবে

বেকসুর। স্নান করে সাফ জামা জুতো পরে কর্তা যখন বাইরে আসবেন তখন পাড়ার মেয়েরা উঠোনে গিজগিজ করছে। তারা খোঁজ নিতে আসে প্রিয়জনদের, কসাক সেপাইয়ের প্রত্যেকটা কথা তারা যেন গিলতে থাকে শঙ্কা আর কৌতূহল নিয়ে। একটু বাদে হয়তো ওদেরই একজন বাইরের আঙিনায় বেরিয়ে গিয়ে কান্নাভেজা মুখের ওপর হাতদুটো চেপে অন্ধের মতো ছুটবে কোনো গলির ভেতর দিয়ে সদর রাস্তা ছেড়ে। তারপরেই কোন ছোট্ট কুঁড়েঘরে সদ্য বিধবার কান্নার রোল উঠবে, সঙ্গে যোগ দেবে শিশুদের সরু সরু কচি গলার স্বরও। এই হল তাতারস্ক—এক ঘরে তাব আনন্দের সাড়া আর ঘরে বয়ে আনে অশেষ শোকের ছায়া।

পরদিন খুব ভোরে উঠে পরিষ্কার করে দাড়ি কামিয়ে বয়েসটা বেশ খানিক কমিয়ে কর্তা বেব হয় খামার বাড়ি দেখতে। কোথায কোথায় কী জিনিসের দরকার সব খুঁটিয়ে দেখে। প্রাতবাশের পরেই শুরু হয়ে যায় তার কাজ। পন্‌চাকিব কল ঘডঘড করে, চালাঘরের ছাঞ্চির তলাব ঠাণ্ডায় কোথায় যেন কুড়ুলেব ঠকাঠক্ শব্দ উঠে জানান দেয় যে সে-বাড়ির চৌহদ্দিতে আবার ফিবে এসেছে কাজেব কাঙাল একজোড়া পৌরুষ হাত। কিন্তু যে বাড়িব মানুষেরা তাদের বাপ বা স্বামীর মৃত্যুব খবর পেয়েছিল সে বাড়ির আঙিনায় এখন বিরাজ করছে মূক নিস্তব্ধতা। শোকে নিশ্চুপ হয়ে মাটিতে পড়ে আছে মা, তাকে ঘিবে অনাথ ছেলেমেয়েদেব ভিড। একরাতের মধ্যে তাদেব যেন কতই না বয়েস বেড়ে গেছে।

কসাকদের কেউ ফিরে এসেছে শুনলেই ইলিনিচ্‌না বলে—আব আমাদের ঘরেব ছেলেটি কবে ঘবে ফিরবে? আর সবাই ফিবে আসে কিন্তু তার তো কোনো খববই নেই।

দুনিয়া বিরক্ত কণ্ঠে জবাব দেয়—জোয়ান কসাকদের যে ওরা ছেড়ে দিচ্ছে না, তাও বুঝতে পারো না মা?

—ছাড়ছে না মানে? তিখন গোরাসিমভ কী করে এলো তাহলে? ও তো গ্রিশার চেয়ে এক বছরের ছোট।

—কিন্তু ও যে যখম হয়েছিল, মা।

—কেমন ধারার জখম? ইলিনিচ্‌না পালটা জবাব দেয়।—কালই তাকে খামার বাড়ির বাইরে দেখেছি, কেমন গট্‌মট্ করে হেঁটে চলে গেল। জখম মানুষ কি অমন হাঁটে?

—জখম হয়েছিল, তবে এখন সেরে উঠছে।

—কেন আমাদের ছেলেটি কি অনেকবার জখম হয়নি? সারা গায়ে তার কাটা ছড়ার দাগ। ওরও একটু সেবাযত্নের কি দরকার নেই?

তুনিয়া ওর মাকে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করে—গ্রিগরের ফিরে আসার ভরসা করে এখন কোনো লাভ নেই। কিন্তু ইলিনিচ্‌নাকে কিছু বোঝানো সহজ কাজ নয়।

তুনিয়াকে সে ধমকায়—চোপরাও, গাধা। তুই আমার চেয়ে বেশী জানিস্, মাকে শেখাতে এসেছিস। আমি তো বলেছি তাকে বাড়ি ফিরতেই হবে। তার মানে সে ফিরবেই। ভাগ, চলে যা এখান থেকে, তোর সঙ্গে কথা বলতে আমার মুখ ব্যথা করে কাজ কী।

ছেলের জন্য সবুর করে করে বুড়ীর ধৈর্যের বাঁধ যেন আর থাকে না। কথায় কথায় গ্রিগরের নাম। একটা সুযোগ মিললেই হল। মিশাৎকা কখনো অবাধ্য হয়, সঙ্গে সঙ্গে বুড়ীর ধমক—দাঁড়া না, তোর বাপ আসুক বাড়িতে, হতভাগা শুয়োর। বলে দেব, তখন খাবি ঠেঙানি।—যদি কোনো গাড়ি তার নজরে পড়ল যার ছাউনি নূতন পড়েছে, অমনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলবে দেখলেই বোঝা যায় ও গাড়ির মালিক ঘরে রয়েছে, আর আমাদের গাড়িটার অবস্থা ছাখো, সদর বার সব এক হয়ে গেছে। সারা জীবনে ইলিনিচ্‌না কখনো তামাকের ধোঁয়া সহ্য করেনি, সর্বদাই তামাকখোরদের ঠেলে বের করে দিয়েছে রান্নাঘর থেকে। আর আজ সে-ব্যাপারেও তার পরিবর্তন। তুনিয়াকে প্রায়ই বলে, যা, প্রোখরকে ডাক্ তো, এসে একটু সিগ্রেট খাক বসে, নয়তো মনে হয় যেন এ জায়গায় জ্যান্ত মানুষ বাস করে না। তারপর গ্রিশা যখন পল্টন থেকে ফিরবে তখন মনে হবে যেন, হ্যাঁ, বাড়িতে একজন মরদ আছে বটে।—রোজ বাড়তি খাবার তৈরি করে ইলিনিচ্‌না, রাতের খাওয়ার পর উনোনে এক কড়া কপির ঝোল সে চাপাবেই। তুনিয়া কিছু বললে ইলিনিচ্‌না অবাক হয়ে জবাব দেবে, বলিস কি রে, না হলে চলবে কেন? আমাদের সেপাইটি আজ ঘরে ফিরতে পারে, গরম গরম কিছু খেয়ে নেবে। নয়তো সেই কতক্ষণ খিদে পেটে থাকবে, তখন এটা উনোনে চাপাও, সেটা গরম করো—একদিন তুনিয়া তরমুজ ক্ষেত থেকে ফিরে এসে ছাখে গ্রিগরের পুরনো কোট আর বং জলা লাল ফিতা-লাগানো টুপিটা রান্নাঘরের একটা পেরেকে ঝুলছে। সে সপ্রশ্ন চোখে মায়ের দিকে তাকায়। ইলিনিচ্‌না অপরাধীর মতো করুণ হাসি হেসে বলে, তোরঙ্গ থেকে বের করলুম রে তুনিয়া। বাইরে থেকে উঠোনে আসতে যখন এগুলো চোখে পড়ে দিব্যি মনে হয় গেরস্তবাড়ির মতো ··যেন ও সত্যি সত্যি ফিরে এসেছে ।

গ্রিগরকে নিয়ে এই অনন্ত বকবকানি শুনে শুনে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তুনিয়া। একদিন তার আর সহ্য হয় না, মাকে রীতিমতো তিরস্কার করে বলে:

—মা, একই কথা অনবরত বলতে তোমার একটুও খারাপ লাগে না? কান একেবারে ঝালাপালা করে দিয়েছ সকলের। কেবলই ওই এক কথা, গ্রিশা, গ্রিশা।

—নিজের ছেলের কথা বলব তার খারাপটা কিসের শুনি? দাঁড়া না, তোর যখন ছেলেপুলে হবে তখন বুঝবি।···ধীরে সুস্থে জবাব দেয় ইলিনিচ্না।

তারপর গ্রিগরের টুপি আর কোটখানা রান্নাঘর থেকে সে নিজের ঘরে নিয়ে যায়। বেশ কিছুদিন আর একটি কথাও সে বলে না গ্রিগর সম্পর্কে, কিন্তু বিচালি ঘরে তোলার ঠিক দু'একদিন আগেই ফের দুনিয়াকে বলে:

—গ্রিগরের কথা তুললে তুই রাগ করতে পারিস, কিন্তু তাকে বাদ দিয়ে আমরা বাঁচব কী করে বল? একবারও কি সে-কথা ভেবে দেখেছিস বোকা? এখন ধর ফসল কাটার সময় হল, অথচ আমাদের কেউ নেই যে কাস্তের ফলাটুকুও ধার দেয়। চারদিক থেকে জরাজীর্ণ অবস্থা, এর মধ্যে তাল রাখা কি তোর-আমার কর্ম? ঘরের মনিব যেখানে নেই সেখানে কি লক্ষ্মীশ্রী থাকে?

দুনিয়া কিছু বলে না। ও বেশ ভালোই বোঝে যে ওর মায়ের দুশ্চিন্তা আসলে ক্ষেত-খামার নিয়ে মোটেই নয়, শুধু গ্রিগরের কথা তুলে মনটাকে হাল্কা করার এক অছিলা মাত্র। ইলিনিচনা তার ছেলের কথা এবার দু'গুণ উৎসাহে শুরু করে, মনের ভাব চাপবার চেষ্টাও করে না। সে রাতে ইলিনিচ্না উপোস দেয়। অসুখ করল কিনা জিজ্ঞেস করতে অনিচ্ছাভাবে জবাব দেয়:

—বুড়ো হয়ে পড়েছি যে··· গ্রিশার জন্য বড্ডো মন কেমন করছে।··· এমন কষ্ট হচ্ছে বুকটাতে যে কিছুই ভালো লাগে না। পৃথিবীর দিকটা তাকাতে যেন আমার চোখ ভারি হয়ে আসে রে।

কিন্তু মেলেখফ-বাড়িতে কর্তৃত্ব করার ভাগ্য যার ছিল সে গ্রিগর নয়। ফসল তোলার ঠিক মুখটাতে মিশকা কশেভয় এসে হাজির হল রণাঙ্গন থেকে। দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের সঙ্গে রাতটা থেকে পরদিন সকালে এল মেলেখফদের বাড়ি। ইলিনিচ্না তখন রান্না করছিল। ভদ্রভাবে দরজায় টোকা দিয়ে যখন কোনো জবাব পেল না কশেভয় তখন নিজেই রান্নাঘরের ভেতরে ঢুকে পুরনো সেপাই টুপিখানা খুলে ইলিনিচ্নার দিকে তাকিয়ে হাসল।

—এই যে ইলিনিচ্না মাসি! হঠাৎ আমাকে দেখবে ভাবতেও পারো নি তো?

—নমস্কার। তুমি আমার কে যে তোমার কথা ভাবতে হবে? আমাদেব বংশের ক'নম্বর বাতি তুমি? কর্কশভাবে জবাব দিয়ে কশেভয়ের ঘৃণিত মুখটার দিকে সরোষে তাকিয়ে থাকে ইলিনিচ্না।

এ অভ্যর্থনায় একটুও বিচলিত না হয়ে মিশকা বলে :

—হাজার হলেও আমরা চেনা-জানা মানুষ।

—ব্যস্ তার বেশী নয়।

—কিন্তু এসে একটু দেখা করে যাওয়াটা কিছু অপরাধ নয়। আমি তো থাকতে আসিনি এখানে।

—না, সে সৌভাগ্য আমার এখনো হয়নি।—চিবিয়ে-চিবিয়ে কথা কটা বলে ইলিনিচ্না ফের মন দেয় রান্নায়। আর ভ্রূক্ষেপ করে না আগন্তুকের ওপর।

ইলিনিচ্নার কথা গ্রাহ্য না করে মিশকা রান্নাঘরের এদিক-উদিক চেয়ে বলে :

—দেখতে এলাম তোমরা কেমন আছ, কী করছ। এক বছরেরও বেশী দেখা-সাক্ষাৎ নেই।

কথলার ওপর সজোরে হাঁড়িগুলো বসিয়ে দিয়ে ইলিনিচ্না ফুঁসিয়ে ওঠে :

—তাতে আমাদের খুব বেশী লোকসান হয়নি।

দুনিয়া বড ঘরে পোশাক বদলাচ্ছিল। মিশকার গলার আওয়াজ কানে যেতে সে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। হাতদুটো নিঃশব্দে জোড করে বসে রইল বেঞ্চিতে। নডতেও সাহস হচ্ছে না যেন। কান পেতে শুনতে লাগল রান্নাঘরেব কথাবার্তা। হঠাৎ মুখে ওর রক্তের ঝলক লাগে, তারপরেই গালদুটো এমন ফ্যাকাশে হয়ে যায় যে ওর নাকের ডগার নিচে পর্যন্ত সাদা দাগ ফুটে ওঠে। শুনতে পায়, মিশকা সশব্দে পায়চারি করছে রান্নাঘরে, তারপরেই যেন মচ্ করে আওয়াজ করে একটা চেয়ারে বসল, তারপর দেশলাইয়ের কাঠি ঠুকল। সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধটা বড ঘরেও উডে আসে এবার।

—শুনলাম বুড়ো কর্তা নাকি মারা গেছেন?

—হ্যাঁ।

—আর গ্রিগর?

অনেকক্ষণ চুপ করে আছে ইলিনিচ্না, তারপর নিতান্ত অনিচ্ছাব সঙ্গেই জবাব দিলে :

—লালফৌজের সঙ্গে কাজ করছে এখন। তোমার টুপিতেও যে তারা বসানো আছে, তারও সেই রকম।

—ওর তো অনেক আগেই সেটা পাওয়া উচিত ছিল...।

—সে হল তার নিজের ব্যাপার।

এবার গলার আওয়াজে একটা সুস্পষ্ট উদ্বেগের ভাব এনে মিশ্‌কা জিজ্ঞেস করে :

—আর য়েভ্‌দোকিয়া পান্তালিয়েভনা ডুনিয়া ?

—সে পোশাক বদলাচ্ছে। বড্ডো আগে-ভাগে এসেছ মুখ দেখাতে; এসময় কোনো ভদ্রলোক বের হয় না।

—ছোটলোক তো হতেই হবে। তোমাদের দেখবার ইচ্ছে হয়েছিল তাই এসেছি, এতে আর সময়-অসময় বাছার কী হয়েছে ?

—দেখ মিখাইল, আমায় চটিও না বলছি!

—কীভাবে চটালুম তোমাকে পিসিমা ?

—কেন, এইসব করে।

—এইসব মানে ? বুঝলাম না।

—তোমার এই ধরনের কথাবার্তায় পিত্তি চটে যায়।

ডুনিয়া শুনতে পায় মিশকা একটা গভীর নিশ্বাস ফেলল। আর বরদাস্ত হয় না ডুনিয়ার। এবার সে লাফিয়ে উঠে ঘাগরা ঠিক করে নিয়ে সোজা ঢুকে পড়ে রান্নাঘরে। মিশকা তখন জানালার ধারে বসে শেষ টানটা দিচ্ছে সিগারেটে। ওর গায়ের চামড়া হলদে, এমন রোগা হয়ে গেছে যে চেনাই দায়। এবার ফ্যাকাশে চোখদুটো জ্বলজ্বল করে উঠল ওর। ডুনিয়াকে দেখে ওর গালে যেন একটা লাল আভাও খেলে গেল মনে হল। তড়বড় করে উঠে ভাঙা-গলায় বললে :

—এই যে।

ডুনিয়া প্রায় অস্পষ্ট গলায় জবাব দিলে—নমস্কার।

মেয়ের দিকে তাকিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে হুকুম দিলে ইলিনিচ্‌না—যা তো জল নিয়ে আয়।

মিশকা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে রইল কখন ডুনিয়া ফিরবে। ইলিনিচ্‌না একটি কথাও বলেনি। মিশকাও চুপ করেই ছিল। শেষমেষ সিগারেটটা দু'আঙুলের ফাঁকে টিপে দিয়ে বললে :

—আমার ওপর অত নারাজ কেন, পিসিমা ? আমি কি তোমার পাকা ধানে মই দিলুম ?

ভিমরুলের কামড় খাওয়ার মতো ভোঁ করে উনোনের দিক থেকে ঘুরে দাঁড়াল ইলিনিচ্‌না।

—নির্লজ্জ বেহায়া, কোন্‌ আক্কেলে তুমি এখানে আসো ? এরপরেও তোমার একথা বলতে সাহস হয় ? খুনী কোথাকার!

—আমি কীভাবে খুনী হলাম ?

—আসল খুনী! পিয়োত্রাকে মেরেছে কে ? তুমি না ?

—হ্যাঁ।

—তা হলে? এরপরেও খুনের বাকি রইল কী? তবু এসে তুমি মুখ দেখাও…এমনভাবে ঠ্যাং ছড়িয়ে বসো যেন…। বলতে বলতে ইলিনিচ্‌নার গলা বুজে আসে, চুপ করে যায়। তারপর আবার সামলে নিয়ে বলতে থাকে—আমি তো তার মা হাজার হোলেও? এর পরেও কেমন করে তুমি আমার চোখের দিকে চাও?

ফ্যাকাশে হয়ে যায় মিশ্‌কা। এই কথাগুলোই শুনবে বলে ওর আশঙ্কা ছিল। উত্তেজনায় একটু তোতলামি এসে যায় ওর। জবাব দেয়:

—চোখ বুজে থাকার কোন কারণ দেখি না। ধরো যদি পিয়োত্রা আমাকে বাগে পেত। তাহলে সে কী করত শুনি? সে কি আমায় চুমু খেয়ে ছেড়ে দিত? আমাকেও সে খুনই করত। আমরা কি সেই পাহাড়ের ওপর মোকাবিলা করেছিলাম সোহাগ করবার জন্য? লড়াই মানেই তো তাই।

—আর বুড়ো করশুনভ? শান্তিপ্রিয় বুড়ো লোকদের খুন করাও কি যুদ্ধ?

—তা ছাড়া কী? অবাক হয়ে মিশ্‌কা বলে—নিশ্চয়ই সেটাও যুদ্ধ। আমি ওই শান্তিপ্রিয় বুড়োদের হাড়ে-হাড়ে চিনি। ওরা পাতলুন গুটিয়ে ঘরে থাকে বটে, কিন্তু লড়াইয়ের চেয়েও দু'গুনো ক্ষতি করে ওরাই। বুড়ো হাবড়া গ্রিশকা অবধি ওইভাবেই কসাকদের উসকে ছিল আমাদের বিরুদ্ধে। ওদের জন্যই তো যুদ্ধটা বাধল। আমাদের বিরুদ্ধে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল কারা? ওই শান্তিপ্রিয় বুড়োদের দলই। আর তুমি আমায় বলছ 'খুনী'। ভাল 'খুনী'ই দেখেছ যাহোক। আগে আমি একটা ভেড়া বা শুয়োর অবধি জবাই করতে পারতাম না, এখনো পারি না। এসব ছোট জানোয়ারদের মারতেও আমার হাত সরবে না। আর সবাই জানোয়ারদের জবাই করে, আমি দুহাতে কান ঢেকে সরে পড়ি পাছে চিৎকার শুনতে হয় বা দেখতে হয় চোখে।

—কিন্তু আমাদের ভাইপো…

—রাখো তোমাদের ভাইপো!—মিশকা রেগে বাগড়া দেয়—সে আমাদের যা উপকার করেছে সে আর বলতে নেই। অনেক ক্ষতি করেছে সে আমাদের। বাড়ি থেকে তাকে বেরুতে বললাম, সে শুনল না। সোজা গিয়ে সে মুখ থুবড়ে পড়ল। ওদের ওপর আমার রাগই হয়…এই বুড়ো শয়তানগুলো। আমি এমনিতে কোনো প্রাণীকে মারতে পারি না, বড়ো জোর মাথা গরম হলে পারি, কিন্তু এইসব… আমায় মাপ কোরো—তোমার এইসব ভাইপো-টাইপো আর গোখরোর বাচ্চাগুলোকে আমি যতখুশী সাবাড় করতে পারি। ওদের মারতে আমার একটুও হাত কাঁপে না। দুনিয়াতে এদের দিয়ে কোনো উপকারই আসে না।

ইলিনিচ্‌না গলায় বিষ ঢেলে বলে তোমার মন এখন এমন কঠিন

যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে ভেতরটা। আমার ধারণা তোমার বিবেক তোমাকে শান্তি দিচ্ছে না—।

মিশকা হেসে বলে: সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। ওই ড্যাকরা বুড়োর মতো অপদার্থের জন্য ভাবতে আমার বিবেকের ভারি বয়ে গেছে। জ্বরে জ্বরে কাহিল হয়ে পড়েছি। জ্বরের ঠেলায় একেবারে জর্জরিত না হলে, মা···

—খবরদার আমায় 'মা' বলো না। ইলিনিচ্‌না যেন আগুন হয়ে ওঠে—কোনো কুত্তীকে 'মা' বলে ডেকো!

মিশকা গম্ভীর হয়ে অলক্ষুণে ভঙ্গিতে চোখ ঘোঁচ করে বলে—আমায় কুত্তীর বাচ্চা বললে! তোমার জন্য আমি যতটা সইতে পারি তারও একটা সীমা আছে। কিন্তু এই আমি তোমাকে সোজা জানিয়ে দিচ্ছি পিসিমা! পিয়োত্রার ব্যাপারে আমার ওপর চোট দেখিও না। সে যা চেয়েছিল তাই তার জুটেছে।

ইলিনিচ্‌না কঠিন স্বরে বলে—তুমি খুনী! হাজার বার খুনী! বেরিয়ে যাও এখান থেকে। তোমার মুখ দেখলেও আমার পিত্তি জ্বলে যায়।

মিশকা আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে নির্বিবাদে সওয়াল করে:

—তোমার ভাই মিত্রি করশুনভের বেলায়? সে বুঝি খুনী নয়? তারপর তোমার গ্রিগরই বা কী? আদরের দুলালটির কথা তো কিছু বলছ না। সে তো একজন জলজ্যান্ত খুনী, তাতে কিছু সন্দেহ আছে?

—বাজে কথা বোলো না।

বাজে কথা বলা আমি অনেক আগেই ছেড়েছি। কিন্তু তুমিই বলো না, সে আসলে কী? আমাদের কত লোককে সে সাবাড় করেছে, জানো? কাজের কথায় এসো! যারা লড়াইয়ে নেমেছিল তাদের প্রত্যেককেই যদি ওই নাম দাও তাহলে আমরা সবাই খুনী। আসল কথা হল কাকে আমরা খুন করি এবং কেন।

ইলিনিচ্‌না চুপ করে থাকে, কিন্তু যখন দ্যাখে তার মেহমানের ওঠার কোনো লক্ষণই নেই তখন কর্কশভাবে বলে:

—ব্যস্ ব্যস্! তোমার সঙ্গে কথা বলার এখন সময় নেই, বাড়ি যেতে পারো!

মিশকা হেসে উঠে দাঁড়ায়—আমার এখন খরগোশের গর্তের মতো হাজারটা মাথা গোঁজাবার ঠাঁই!

যেন এইসব কথা আর গালাগালিতে ও ভড়কাবার পাত্র! ওর গণ্ডারের চামড়া—বদমেজাজী কোনো বুড়ীর অপমানজনক কথায় কান দিতে ওর বয়ে গেছে। ও জানে দুনিয়া ওকে ভালবাসে, ব্যস্ আর কাউকে ওর তোয়াক্কা নেই, বুড়ী তো কোন্ ছার।

পরদিন সকালে আবার এসে উদয় হয় ও। যেন কিছুই হয়নি এমনিভাবে ইলিনিচ্‌নাকে নমস্কার করে জানলার ধারে বসে। দুনিয়ার প্রত্যেকটা চাল-চলন লক্ষ্য করতে থাকে।

নমস্কারের জবাব না দিয়ে বুড়ী বাক্যবাণ ছোঁড়ে—খুব যে আমাদের দেখতে আসা হচ্ছে!

দুনিয়া আগুন হয়ে ওঠে, জলন্ত চোখে মার দিকে একবার চেয়ে কোনো কথা না বলে আবার চোখ নামিয়ে নেয়। মিশকা একটু হেসে জবাব দেয়:

—আমি তো তোমাকে দেখতে আসি না ইলিনিচ্‌না পিসি। তোমার এত ডর কিসের?

—এবাড়ির রাস্তাটা একেবারে ভুলে যেতে পারো না? তাহলে তো বাঁচি।

—কেন, আমায় কোথায় যেতে বলো? গম্ভীর হয়ে এবার মিশকা জিজ্ঞেস করে—তোমার ভাই মিত্রির জন্য আজ আমি সংসারে একা। শূন্য বাড়িতে তো আর ভূতের মতো বসে থাকতে পারি না। পিসিমা, তোমার ভাল লাগুক না লাগুক, তোমাদের দেখতে আমাকে আসতেই হবে।—কথাটা শেষ করে মিশকা আরো জুত করে বসে পা দুটো ছড়িয়ে।

ইলিনিচ্‌না একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। এরকম নাছোড়বান্দাকে সত্যিই তাড়ানো দুষ্কর। মিশকার গাঁট্টাগোট্টা চেহারা। একপাশে হেলানো মাথা আর জোরালো পুরু ঠোঁটের মধ্যে ষাঁড়ের মতো একটা একগুঁয়েমির প্রকাশ যেন।

মিশকা চলে যাবার পর বাচ্চাকাচ্চাদের বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে ইলিনিচ্‌না এবার দুনিয়ার দিকে ফিরে বলে:

—দেখবি ও যেন এবাড়িতে আর পা না মাড়ায়। বুঝলি?

চোখের পাতাও পড়ে না দুনিয়ার, একভাবে চেয়ে থাকে মায়ের দিকে। মেলেখফদের চরিত্রের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য এক মুহূর্তের জন্য ঝিলিক দিয়ে যায় ওর মারাত্মক কোঁচকানো ভুরুজোড়ার মধ্যে। প্রত্যেকটি কথা চিবিয়ে চিবিয়ে ও বলে:

—না! সে আসবে! তাকে বাধা দিতে পারবে না তুমি! সে নিশ্চয় আসবে!—নিজেকে সামলাতে আর না পেরে এবার আঁচলাথায় মুখটা ঢেকে দুনিয়া ছুটে যায় সিঁড়ি-বারান্দার দিকে।

ভারি নিঃশ্বাস ফেলে জানালার ধারে বসে পড়ে ইলিনিচ্‌না। ওই ভাবেই বসে নীরবে মাথা নাড়তে থাকে আর ক্ষীণদৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে স্তেপের সুদূর প্রান্তে যেখানে রোদের রুপালি মাথা একসার সোমরাজ ঝোপ মাটিকে আলাদা করে রেখেছে আকাশ থেকে।

* * * *

সেদিনই সন্ধ্যে নাগাদ তুনিয়া আর ওর মা ডনের ধারে বাগানের একটা পোড়ো বেড়া তুলে বসাবার চেষ্টা করছিল। ওর মা তেমনিই অপ্রসন্ন গম্ভীর। এমন সময় এল মিশকা। কথাটি না বলে তুনিয়ার হাত থেকে শাবলটা কেড়ে নিয়ে বললে :

—ওইটুকুন মাত্র খুঁড়েছ, আবার বাতাস এলে তো বেড়াশুদ্ধ ফের উলটে পড়বে।

খুঁটির গর্তগুলো ফের গভীর করতে লাগল মিশকা। বেড়াটিকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে খাড়া করে দিয়ে চলে গেল। পরদিন সকালে দুটো নতুন পালিশ করা বিদে আর উকোনঠেঙা এনে মেলেখফদের আঙিনায় খাড়া করে রাখল সে। ইলিনিচ্‌নাকে নমস্কার করে রীতিমতো কাজের কথা পাড়লো :

—মাঠের ঘাসগুলো একটু নিড়িয়ে নেবার ইচ্ছে আছে? অন্যেরা তো এরমধ্যেই ডনের ওপারে চলে গেল।

কোন জবাব দেয় না ইলিনিচ্‌না। ওর বদলে কথা বলে তুনিয়া।

—কেমন করে নদী পার হব? আমাদের ডিঙিটা তো সেই শরৎকাল থেকে গোলাঘরে পড়ে আছে—শুকিয়ে বোধহয় ঝন্‌ঝনে হয়ে গেছে।

মিশকা তিরস্কার করে—শীতের পরে পরেই উচিত ছিল ওটাকে জলে নাবানো। হয়তো ফুটোফাটা মেরামত করা যেতে পারে? নৌকো ছাড়া তো চলাই যাবে না।

তুনিয়া সবিনয়ে তাকিয়ে থাকে ওর মায়ের মুখের দিকে কিছু একটা শোনার আশায়। ইলিনিচ্‌না সমানেই ময়দা ঠেসে চলেছে, ভাব করছে যেন এসব কথাবার্তার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই।

প্রায় নজরেই পড়ে না এমনিভাবে হেসে মিশকা বলে—তোমাদের দড়ি-দড়া কিছু আছে?

তুনিয়া গোলাঘর থেকে একবোঝা শনের গাঁট নিয়ে আসে।

দুপুরের খাওয়া নাগাদ মিশকা নৌকোটাকে কাজের মতো অবস্থায় আনে। তারপর আসে রান্নাঘরে।

—নৌকোটাকে টেনে জলে নামিয়ে রেখে এলাম। একটু ভিজুক এবার। দড়ি দিয়ে বরং একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখো, নয়তো কেউ আবার নিয়ে যাবে। তারপর, ঘাস নিড়োনোর কী হল পিসিমা? একটু সাহায্য করতে পারি হয়তো। এমনিতেও তো আমার এখন কিছু করবার নেই।

ইলিনিচ্‌না তুনিয়াকে দেখিয়ে বলে—একে জিজ্ঞেস কর।

—আমি বাড়ির গিন্নিকে জিজ্ঞেস করছি।

—আমি যে এবাড়ির গিন্নি নই, তা লোকে দেখলেই বুঝবে···

তুনিয়া কেঁদে ফেলে বড়ো ঘরের দিকে ছুটে যায়।

মিশকা মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত করে বলে—তাহলে আমাকে সাহায্য করতেই হবে। তোমাদের ছুতোর কাজের যন্ত্রপাতি কোথায়? একটা নতুন বিদে বানিয়ে দিই, পুরনোগুলো কোনো কাজে আসবে বলে মনে হয় না।

চালাঘরের নিচে গিয়ে মিশকা একটা বিদের দাঁতে ধার দিতে শুরু করে আর সেই সঙ্গে শিস্ দেয়। ছোট্ট মিশাৎকা ওর আশপাশ দিয়ে নেচে বেড়ায় আর উৎসুকভাবে ওর চোখের দিকে তাকায়। বলে:

—মিখাইল কাকা, আমাকে একটা ছোট বিদে বানিয়ে দেবে? আমাকে কেউ বানিয়ে দেয় না। দিদিমা বানাতেই জানে না, পিসিমাও জানে না। খালি তুমিই জানো। খুব ভালো বানাতে পারো তুমি।

—হ্যাঁ গো মিতে, তোমায় দেব একটা বানিয়ে, সত্যি বলছি। কিন্তু একটু সুরে দাঁড়াও। নয়তো চোখের মধ্যে গিয়ে কাঠের চিল্‌তে পড়বে।—কশেভয় বলে আর হাসতে-হাসতে ভাবে একেবারে হুবহু হয়েছে ওর বাপের মতো, খুদে শয়তানটা। ঠিক সেই চোখ, সেই ভুরু, তেমনি ঠোঁটটা উঁচু করে থাকা…। নাও, এই ত্যাখো ওস্তাদের কাজ।

একটা ছোট্ট খেলনার বিদে তৈরি করার চেষ্টা করে মিশকা কিন্তু শেষ করতে [illegible] না। ঠোঁটটা ওর নীল হয়ে উঠেছে। হলদে মুখখানায় একটা বিরক্তি অথচ উদাসীন ভাব ফুটে ওঠে। শিস বন্ধ করে ছুবিটা নামিয়ে রেখে ও শীতলাগার মতো কাঁধদুটো কোঁচকাতে থাকে।

মিশাৎকাকে বলে—মিখাইল, মিতে আমার, যাও তো লক্ষ্মীটি, আমার জন্য একটা কাঁথাটাথা কিছু নিয়ে এসো। শুয়ে পড়ব।

ছেলেটির কৌতূহল জাগে—কিন্তু কেন?

—আমি অসুখ করতে চাই।

—কেন?

—উঃ খালি খ্যানর খ্যানর! কেন, আমার অসুখের সময় হয়েছে, বাস, হল তো! যাও শিগ্‌গির আনো।

—কিন্তু আমার বিদে?

—সে পরে হবে'খন।

একটা দারুণ কাঁপুনি মিশকার শরীরে। দাঁতগুলো খিট্‌খিট্ করছে। মিশাৎকার আনা একটা চটের ওপর ও টান হয়ে শুয়ে পড়ে। তারপর টুপিটা খুলে মুখ ঢেকে রাখে নিজের।

মিশাৎকা করুণভাবে বলে—এর মধ্যেই অসুখ হল?

—হ্যাঁ, এখন আমার অসুখ।

—কিন্তু কাঁপছ কেন?

—জ্বরে কাঁপুনি ধরাচ্ছে তাই।

—কিন্তু দাঁত কিট্‌কিট্ করছ কেন?

টুপির আড়াল দিয়ে এক চোখে মিশকা ত্যাখে ওর দস্যি মিতেটিকে। একটু হেসে একদম মুখ বুজে থাকে, কোনো জবাব দেয় না। মিশাৎকা আতঙ্কে ওর দিকে চেয়ে থেকে ভোঁ করে দৌড়ে যায় ঘরের ভেতর।

—দি মা, মিখাইল কাকা চালাঘরে শুয়ে আছে, ভীষণ কাঁপছে, কাঁপতে কাঁপতে নেচে উঠছে।

জানালা দিয়ে বাইরে একবার তাকিয়ে ইলিনিচ্না টেবিলের দিকে এগোয়। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে, কী যেন মনের মধ্যে একটা নাড়াচাড়া করতে থাকে।

মিশাৎকা অধৈর্য হয়ে বুড়ীর জামা ধরে টানে—কিছু বলছ না কেন দি-মা?

ইলিনিচ্না ওর দিকে ঘুরে শক্ত গলায় বলে।

—যা তো একটা কম্বল নিয়ে যা ওই হারামজাদাটার জন্য, ঢেকেঢুকে থাক্। জ্বরে পড়েছে আর কি, একরকম ব্যায়রাম। পারবি তো কম্বল টানতে?—আবার জানলার কাছে গিয়ে বুড়ী উঠোনের দিকে তাকায়—এই থাম্ থাম্। ছেড়ে দে, দরকার নেই।

ডুনিয়া ওর নিজেব ভেড়া-চামড়ার কোটখানা দিয়ে ততক্ষণে কশেভয়কে ঢেকে দিয়েছে। আব ওর ওপর ঝুঁকে পড়ে কী যেন বলছে।

জ্বরের ধাক্কাটা কাটিয়ে ওঠার পর মিশকার বাকি দিনটা কাটে ব্যস্ততার মধ্যে, খড় কাটার যোগাড়-যন্ত্র কবে। বেশ একটু কাহিল হয়ে পড়েছে দেখা যাচ্ছে। চলাফেরায় জড়তা, শিথিল ভাব খানিকটা। কিন্তু তবু মিশাৎকার খেলনাটা ও তৈবি কবে দেয়।

সন্ধ্যের সময় ইলিনিচনা খাবাব সাজিয়ে ছেলেপিলেদের টেবিলে বসায়। ডুনিয়ার মুখেব দিকে না তাকিয়ে বলে:

—যা ডেকে আন্ ··কী বলে ওব নাম···খেতে ডাক।

মিশকা খেতে বসে ক্রুশ প্রণাম কবে না। দেহে ক্লান্তির ভাব। হলদে মুখটার ওপর শুকনো ঘামের ময়লা দাগ। ঠোঁটে চামচ তুলে ধবতে গিয়ে হাত কাঁপে। খুব অল্প খায়, তাও খুব অনিচ্ছাভরে। মাঝে মাঝে অন্যমনস্কভাবে আর সবার দিকে তাকায়। কিন্তু ইলিনিচ্না একটা জিনিস দেখে অবাক হয়—যখনি "খুনী" লোকটার স্তিমিত চোখজোড়া গিয়ে ছোট্ট মিশাৎকাব ওপর পড়ছে তখনি যেন উজ্জ্বল উল্লসিত হয়ে উঠছে। বিস্ময় আর আনন্দের স্ফুলিঙ্গ যেন চকিতে দেখা দিয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে চোখজোড়ার মধ্যে আর ওর ঠোঁটের কোণে প্রায় দুর্লক্ষ্য হাসি ফুটে উঠছে একেকবার। তারপব যখনই ও নজর ফিরিয়ে নিচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই ভোঁতা উদাসীনতার ছায়া এসে পড়ছে মুখখানার ওপর।

ইলিনিচ্না আড়াল থেকে লক্ষ্য করতে লাগল কশেভয়কে। এই প্রথম

তার নজরে পড়ল মিশকা অসুখে বিসুখে কী দারুণ রোগা হয়ে গেছে। ধূলিধূসর উর্দিটার নিচে স্পষ্ট জেগে আছে ওর কণ্ঠার হাড়, চওড়া পিঠখানা কুঁজো মেরে গেছে। হাড় যেন চামড়া ফুঁড়ে বেরুচ্ছে। এদিকে কচি সরু গলাটার ওপর লোমশ কণ্ঠমণিটা এমন বেখাপ্পা দেখায়। "খুনীর" ঝুঁকে-পড়া দেহ আর ফ্যাকাশে মুখখানা যতই দেখে ইলিনিচ্না ততই অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করে, যেন এই অনুভূতিটা ওকে দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলছে। যে লোকটাকে সে এত ঘৃণা করে তার ওপর হঠাৎ যেন একটা অযাচিত করুণা এসে পড়তে চায় ইলিনিচ্নার বুক ঠেলে।—সেই মাতৃসুলভ করুণা যা কঠিন হৃদয় নারীরাও এড়াতে পারে না। এই নতুন অনুভূতিটাকে দমন করতে না পেরে অবশেষে সে এক পিরিচ দুধ মিশকার দিকে ঠেলে দিয়ে বলে :

—খেয়ে নাও তো এইটুকু। এত রোগা হয়ে গেছ যে তোমায় দেখলে আমার গা গুলিয়ে আসে···আহা, কী চমৎকার জামাইটি না হবেন।

* * * * *

গাঁয়ের লোকজন কশেভয় আর দুনিয়াকে নিয়ে নানা কথা বলাবলি শুরু করেছে ঘাটের সিঁড়ির কাছে এক বুড়ীর সঙ্গে দুনিয়ার দেখা। গলার আওয়াজে রীতিমতো বিদ্রূপ ফুটিয়ে স্ত্রীলোকটি বলে : কী গো, মিখাইলকে কি শেষে মজুর-মুনিষ রাখলে নাকি ঘরে? সে যে তোমাদের আঙিনা ছেড়ে নড়েই না।

মেয়ের অনেক সাধ্যসাধনার পরও ইলিনিচনা একগুঁয়ের মতো জবাব দেয়: যতই বায়না ধরো বাপু, তোমাকে আমি ও ছোকরার হাতে ছেড়ে দেব না। আমার আশীর্বাদ তুমি তাহলে কোনোদিনও পাবে না।

তারপর দুনিয়া যখন পরিষ্কার জানিয়ে দেয় সে কশেভয়ের সঙ্গে আলাদা ঘর করবেই, সাজগোজের যোগাড়ও করে, তখন ইলিনিচনা অগত্যা মত বদলায়।

ঘাবড়ে গিয়ে বলে—তোর কি বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেল। ছেলেপিলেগুলোকে নিয়ে আমি একা মানুষ কী করব? না খেয়ে মরব নাকি?

—সে তুমিই ভালো জানো মা। কিন্তু আমি আর গাঁয়ের লোকের ঠাট্টা-তামাশা শুনতে রাজী নই।—সিন্দুক থেকে পুরনো জামাকাপড়গুলো বের করে দিতে দিতে মৃদুস্বরে বলে দুনিয়া।

ইলিনিচ্না নিজের মনেই বিড়বিড় করে, তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে ভারী পা-জোড়া টেনে টেনে কুলুঙ্গির পটের দিকে এগোয়।

পটখানা নামিয়ে নিয়ে ফিস্‌ফিস করে বলে—বেশ, তাই হোক তাহলে মা। তাই যদি তুই ভেবে থাকিস্ তাহলে ঈশ্বর তোর সহায় হোন্। এদিকে আয়।

চট্‌পট্‌ তুনিয়া হাঁটু গেড়ে বসে। ইলিনিচ্‌না ওকে আশীর্বাদ করে কাঁপা গলায় বলে :

—আমার মরা মা-ও এই পটখানি তুলেই আমায় আশীর্বাদ করেছিলেন।—ওরে তোর বাবা যদি আজ বেঁচে থাকতেন—এই সময় তোকে দেখতে।···মনে আছে তোর স্বামীর কথা কী বলেছিলেন তিনি? এযে আমার কী কঠিন পরীক্ষা তা ঈশ্বরই জানেন···। বলতে বলতে নীরবে ঘুরে ইলিনিচ্‌না সিঁড়ি-দরজার দিকে চলে যায়।

মিশকা শত চেষ্টা করেও তুনিয়াকে হাজার বকমে বুঝিয়েও রাজী করাতে পারল না যাতে গির্জাঘরে গিয়ে বিয়েটা না হয়। অবশেষে দাঁতে দাঁত চেপে ওব মতেই সায় দিতে হল। মনে মনে তামাম তুনিয়াকে অভিশাপ দিয়ে মিশকা এমনভাবে বিয়ের জন্য তৈরি হতে লাগল যেন জল্লাদের কাছে যাচ্ছে। ভিসারিওন পাদ্রি রাতেব আঁধারে খালি গির্জায় চুপিসাড়ে ওদের বিয়ের মন্ত্রটা সেরে দিলেন। অনুষ্ঠানের পর তরুণ দম্পতিকে অভিনন্দন জানিয়ে উপদেশ দেবার সুবে বললেন :

—ওহে ছোকরা সোভিয়েত কমরেড, জীবনটা কেমন দেখতে দেখতে চক্রবৎ ঘুরে যায় দেখেছ তো! গেল বছর নিজের হাতে তুমি আমার ঘবে আগুন দিয়েছিলে, অর্থাৎ কিনা বাড়িটাকে আমার সঁপে দিয়েছিলে আগুনের মুখে। আর আজ—তোমার বিবাহে মন্ত্র পড়ে আমার কত না পুলক হল। শাস্ত্রে বলেছেন : 'যাকে তুমি পায়ে ঠেল তার পা ধরেই সাধতে হবে।' কিন্তু সে যাহোক, আমি বড আনন্দ পেলুম। তুমি যে ফিরে এসে আবার খ্রীষ্টের মন্দিরেই আশ্রয় নিলে এতে আমাব অশেষ আনন্দ হল।

মিশ্‌কাব ধৈযেব বাঁধ এবাব আব টিকল না। নিজের ইচ্ছাশক্তির তুর্বলতায় লজ্জিত আর নিজেব ওপরই ক্রুদ্ধ হয়ে এতক্ষণ একটা কথাও বলতে পারেনি। এবার সে কুচুটে পাদ্রিটাব দিকে জলন্ত চোখে তাকিয়ে যাতে তুনিয়া না শুনতে পায় এমনিভাবে চাপা গলায় বললে :

—তুঃখ এই যে সে-সময় তুমি গাঁ ছেড়ে পালিয়েছিলে, নয়তো তোমাকে শুদ্ধ্‌ বাড়িতে আগুন দিতাম, বুঝলে বাব্‌রিওলা শয়তান। এখন মাথায় ঢুকেছে তো?

আচমকা এই আক্রমণে হতভম্ব হযে পাদ্রি মিশকার দিকে চেয়ে চোখ পিট্‌পিট্‌ করেন। কিন্তু বর তখন কনের ওডনার খুঁট ধরে শক্ত গলায় বলে : চলে এসো। তাবপর ফৌজী বুট-জুতোয় খট্‌মট্‌ আওয়াজ তুলে দরজার দিকে এগোয়।

ওদের এই নিরানন্দ বিয়ের উৎসবে না ছিল ভদ্‌কা পান, না ছিল গলা-ছেড়ে গান। নিতবর প্রোখর জাইকফ পরদিন এ সম্পর্কে নালিশ জানাল আকসিনিয়ার কাছে। ঘন ঘন থুথু ছিটিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করল :

—বুঝলে বাছা, এ এক মজার বিয়ে হল যাহোক। গির্জাঘরে আমাদের মিখাইল তো পাদ্রির কানে কী বললে, ব্যস্ পাদ্রির বদন এত্তটুকুন হয়ে গেল। তারপর বিয়ের খাওয়া। কী খেয়েছি আমরা শুনবে? মুরগীর রোস্ট আর দই—একফোঁটা ভদ্‌কাও যদি দিত শয়তানরা। গ্রিগর পান্তালিয়েভিচের উচিত ছিল ওর ভগ্নীর এই বিয়েটা একবার দেখা। মাথায় হাত দিয়ে বসত। না বাছা, আমার অনেক হয়েছে। আর কখনো যাচ্ছি না এইসব নতুন কেতার বিয়েতে। কুত্তার বিয়েতেও এর চেয়ে বেশী ফুর্তি হয়। কুত্তীগুলো অন্তত নিজেদের ভিতর কামড়াকামড়ি করে আর হল্লাও হয় খুব। আর এখানে, না আছে মদ, না আছে মারামারি। জাহান্নমে যাক্ কাফেরগুলো। বিয়ের পর এমন বিতিকিচ্ছি অবস্থা হয়েছিল আমার বুঝেছ, যে সারারাত দুচোখ বুজতে পারিনি। কেবল গা চুলকেছি, যেন কেউ আমার জামার ভেতর মুঠো-মুঠো ছারপোকা ছেড়ে দিয়েছিল…।

॥ তিন ॥

যেদিন থেকে কশেভয় মেলেখফদের বাড়িতে নিজের আস্তানা করেছে সেদিন থেকেই ও বাড়ির খামারের চেহারা একেবারে বদলে গেল। অল্প সময়ের মধ্যে বেড়াটাকে মেরামত করে ফেলল কশেভয়। গাড়িতে করে স্তেপের খড় বয়ে এনে মাড়াই-আঙিনায় ফেলল, যত্ন করে চালটা ছেয়ে দিল। এবার ফসল তোলার জোগাড় হবে, তাই একটা নতুন পাটাতন আর হাল লাগালো খন্দ-কলে, খুব মেহনত করে আঙিনা সাফ করল ফসল মাড়াইয়ের জন্য, পুরনো তুষ-ওড়ানোর পাখা আর জোয়ালিটাও মেরামত হল। মনে মনে ওর ইচ্ছে ছিল একটা ঘোড়ার বদলে বলদের জোয়ালিটা না হয় বেচেই দেবে, তাই অনেকবার সে দুনিয়াকে বলেছে 'একটা ঘোড়া যে আমাদের বড়ো দরকার। এসব অবতারদের দিয়ে গাড়ি চালানো মানে শ্মশানযাত্রায় যাওয়া।' একদিন গোলাঘরের ভেতর একটিন সাদা আর নীল রং আবিষ্কার করে ও সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে ফেলল জানলার খড়খড়িগুলো রং করতে হবে। এতদিন ওগুলোর রং জলে গিয়েছিল। জানলার উজ্জ্বল নীল রঙের ফ্রেম নিয়ে যখন

আবার দেখা দিল মেলেখফদের বাড়িটা, তখন যেন তার বয়েস কমে গিয়ে যৌবন ফিরে এসেছে।

বাড়ির মনিব হিসাবে মিশ্‌কার উৎসাহের অন্ত নেই। গায়ে জ্বর থাকলেও হাত গুটোবার লোক সে নয়। দুনিয়া ওকে সাহায্য করছে সব কাজে।

বিয়ের পর প্রথম কটা দিনের মধ্যেই দুনিয়ার চেহারা আগের চেয়ে বেশ ভালো হয়ে উঠেছে। কাঁধ আর পেছনের দিকটায় যেন ছড়িয়ে পড়েছে পুষ্টির আভাস। ওর চোখ জোড়ায়, হাঁটাচলায়, এমন কি ওর চুল বাঁধার কায়দায়ও একটা নতুন অভিব্যক্তি। আগেকার সেই বেখাপ্‌পা একটেরে চলার ভঙ্গি, বালিকাসুলভ চপলতা আর সারল্য অদৃশ্য হয়ে গেছে। সব সময় মুখে হাসি লেগেই থাকে। আগের চেয়ে অনেক ধীরস্থির হয়েছে সে। সপ্রেম দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে যখন স্বামীর দিকে তখন আশেপাশের আর কোনো ঘটনাই নজরে পড়ে না। যুবজনের সুখ সর্বদাই অন্য-নিস্পৃহ।

কিন্তু যত দিন যায় ইলিনিচ্‌নার কাছে জীবন যেন ক্রমেই আরো নিঃসঙ্গ আরো একাকী হয়ে পড়ে। যে-বাড়িতে তার সারা জীবনটাই প্রায় কেটে গেল, এখন যেন সে-বাড়িতে তার অস্তিত্ব 'উপরন্তু' মাত্র। দুনিয়া আর ওর স্বামী এমনভাবে কাজ করে যেন কোনো নতুন জায়গায় ওরা ওদের নীড় বাঁধছে—একান্ত আপনার মতো করে। ইলিনিচ্‌নার সঙ্গে ওরা কোনো বিষয়ে আলোচনা করে না, যখন খামারে কোনো নতুন জিনিস বানায় তখন তার অনুমতিও চায় না, এমন কি বুড়ীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দুটো মিষ্টি কথা অবধি খুঁজে প্যায় না যেন। যখন সবাই খেতে বসে, হয়তো ওরা দুচারটে অর্থহীন বাক্যবিনিময় করে তার সঙ্গে। তারপরেই ইলিনিচ্‌না ফের ডুবে যায় উদাস চিন্তায়, একাকী। মেয়ের সুখ দেখে তার তেমন আনন্দ হয় না। তার ওপর বাড়িতে একটি অপরিচিত লোকের উপস্থিতি অসহ্য লাগে—ইলিনিচ্‌নার কাছে তার জামাই সেই আগের মতোই 'অপরিচিত' রয়ে গেছে। জীবনটা ওর কাছে বোঝার মতো হয়ে দাঁড়ায়। এক বছরের মধ্যে এতগুলি প্রিয়জনকে সে হারিয়েছে, তাই দুঃখবেদনায় জর্জরিত হয়ে সে বেঁচে রয়েছে বার্ধক্য ও জীর্ণতার মধ্যে। সারা জীবনে শোকতাপ সে যথেষ্ট পেয়েছে, হয়তো বা একটু বেশীই পেয়েছে। এখন আর শোককে ঠেকাবার মতো শক্তি তার অবশিষ্ট নেই। একটা পূর্ব সংস্কার যেন বদ্ধ ধারণার মতো তার মাথায় কেবলি ঘোরে—মৃত্যু, অনেকবার তার পরিবারের মধ্যে দর্শন দিয়ে গেছে বটে তবে আবার সে মেলেখফদের এই পুরনো বাড়ির চৌকাঠ মাড়াতে আসবে—একাধিকবার। দুনিয়ার বিয়েটাকে মেনে নেয়ার পর তার আর একটিই কামনা রয়েছে এখন: গ্রিগরের ফিরে আসা অবধি সবুর করে থাকা,

তার হাতে ছেলেপিলেদের ভার বুঝিয়ে দিয়ে জন্মের মতো চোখ বোজা। দীর্ঘ কঠোর জীবনে এত দুঃখ সে সয়েছে যার পর তার রীতিমতো হক্ আছে বিশ্রামের অধিকার পাবার।

গ্রীষ্মের দীর্ঘায়িত দিনগুলো যেন কাটতেই চায় না। আকাশে তপ্তপোড়া সূর্যের কিরণ। কিন্তু চন্‌চনে রোদেও ইলিনিচ্‌নার উষ্ণতাবোধ নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে সিঁড়ি-দরজায় বসে থাকে পুরো রোদের মধ্যে। পরিবেশ সম্পর্কে কোনো চেতনা নেই। এখন আর সে আগের সেই ব্যস্তসমস্ত উৎসাহী গৃহকর্ত্রী নয়। কোনো কাজের প্রেরণা আসে না আর মনে। সবই যেন নিরর্থক। এখন মনে হয় সবই অপ্রয়োজনীয় আর অবাস্তব। আগের মতো কাজের ক্ষমতাও তার ফুরিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে সে নিজের হাতদুটির দিকে তাকায়। বহু বছরের মেহনতে কড়া-পড়া দুটি হাত। ভাবে: আমার কাজ যা ছিল সব তো সেরেছি এই হাতে।...এখন বিশ্রামের সময় হল।... যতটুকু বাঁচার বেঁচেছি, আর নয়।... কেবল আমার গ্রিশাকে দেখব বলেই বেঁচে আছি...।

একবার শুধু তার আগের তেজটুকু ফিরে এসেছিল, কিন্তু তাও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। একদিন ভিয়েশেনস্কা থেকে ঘরে ফেরার পথে প্রোখর দেখা করে গিয়েছিল। দূর থেকেই চিৎকার করে বলেছিল:

—এবার ইলিনিচ্‌না ঠাকমা, কী খাওয়াবে বলো। তোমার ছেলের চিঠি এনেছি সঙ্গে করে।

বুড়ী ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। তার কাছে চিঠি মানেই নতুন কোনো দুর্ভাগ্য—বরাবর যা সে জেনে এসেছে। কিন্তু প্রোখর যখন গ্রিগরের ছোট্ট চিঠিখানা পড়ে শোনাল, সে চিঠির প্রায় আধখানাই তার প্রিয়জনদের স্নেহ ভালোবাসা জানিয়ে, কেবল শেষ ক'টা ছত্রে লিখেছে শরৎকালে ঘরে ফিরে আসবে ছুটি নিয়ে তখন ইলিনিচ্‌নার যেন আনন্দে কথা সরে না মুখে। মুক্তার মতো এতটুকু চোখের জলের ফোঁটা বাদামী মুখখানা বেয়ে গালের গভীর রেখাগুলো ডিঙিয়ে গড়িয়ে পড়ে। মাথা নিচু করে জামার আস্তিন আর রুক্ষ হাতে সে-জল মোছে সে। কিন্তু তবু বাগ মানে না চোখের জল, অজস্র ধারে গড়িয়ে পড়ে মুখ বেয়ে আঙরাখার ওপর, ফোঁটা ফোঁটা দাগ জমে ওঠে এক পশলা উষ্ণ বৃষ্টির মতো। স্ত্রীলোকের কান্নায় প্রোখর কোনোদিন প্রফুল্ল তো হয়ইনি, সে যেন আদপে সহ্যই করতে পারে না এসব। তাই বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে সে বলে:

ওহো ঠাক্‌মা, বেশ এক চিত্তির করলে যাহোক! তোমাদের মেয়ে-মানুষদের যেন চোখের জলের আর শেষ নেইকো! তোমার খুশী হওয়া উচিত,

কাঁদতে শুরু করলে কেন। আচ্ছা আমি চলি, বিদায়। তোমাকে দেখে আমার বিশেষ আনন্দ হচ্ছে না।

ইলিনিচ্‌না কান্না থামিয়ে ওকে আটকায় :

—এমন সুখবর দিলে বাছা···কেন যে অমন বেসামাল হয়ে পড়লাম? দাঁড়াও একটু, তোমায় খুশী করে দিই।—অসংলগ্ন কথাগুলো বিড়বিড় করে বলে বুড়ী সিন্দুক থেকে অনেক দিনের লুকিয়ে রাখা একটা বোতল বের করে।

প্রোখর এবার বসে গোঁপে তা দেয়।

জিজ্ঞেস করে—আমার সঙ্গে একটু খাবে তো, এত খুশী যখন হয়েছ? তারপরেই উদ্বিগ্ন চিন্তা ঢোকে মাথায়—এই দ্যাখো, আবার আমার জিভে শয়তান ভর করেছে। এখুনি যদি আবার ভাগ বসায় তাহলে—বোতলে আছে তো মাত্র ওইটুকুন চাখ্‌বার মতো—

কিন্তু ইলিনিচ্‌না রাজী হয় না। চিঠিটা সযত্নে ভাঁজ করে পটের কুলুঙ্গিতে রাখে, কিন্তু তারপর আবার কী মনে হতে চিঠিখানা তুলে নিয়ে খানিকক্ষণ হাতে রেখে একেবারে বুকে গুঁজে সজোরে চেপে ধরে নিজের হৃৎপিণ্ডের ওপর।

দুনিয়া খামার থেকে ফিরে এসে বারবার করে পড়ে চিঠিখানা। অবশেষে হেসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে :

—যদি দাদা তাড়াতাড়ি চলে আসত। মা, তুমি আর আগের মতো নেই মা।

ইলিনিচ্‌না চিঠিখানা কেড়ে নিল দুনিয়ার হাত থেকে, আবার জামার ভেতর লুকিয়ে একটু হেসে মেয়ের দিকে খুশিভরা আধ-বোজা চোখে তাকিয়ে বলল :

—আজকাল আমায় দেখে তো কুকুরেও ডাকে না, এমনই অকাজের হয়ে গেছি। কিন্তু আমার ছেলেটি কেমন তার মাকে মনে রেখেছে—! কী লিখেছে দ্যাখ্‌ না! আদর করে বড়ো নামেই না ডেকেছে! লিখেছে, আমি তোমায় গড় হয়ে প্রণাম করছি মা, সোনামণিদেরও আমার স্নেহ জানিও, আর তোকেও ভোলেনি রে দুনিয়া—আরে হাসছিস কেন রে? তুই একটা মুখ্যু, গো-মুখ্যু!

—কেন মা, এখন কি একটু হাসতেও নেই? কিন্তু কোথায় চললে তুমি?

—বাগানে যাচ্ছি আলুখেত নিড়োতে।

—আমিই তো কাল যেতুম নিজে। তুমি বরং ঘরে থাক। সব সময় তো বলো শরীরে জোর পাও না, তবে এখন হঠাৎ এত কাজের তাগিদ কিসের পেলে!

—না রে, আমি যাব··এত খুশী লাগছে যে নিজেই সব করতে ইচ্ছে করছে।—ইলিনিচ্‌না অকপটেই বলে আর বেশ চটপট রুমালখানা মাথায় জড়িয়ে নেয় নবীন উৎসাহে।

খামারে যাবার পথে একবার আকসিনিয়ার ওখানে ওঠে। প্রথমে ভদ্রতার খাতিরে সাধারণ দু-একটা কথা বলে অবশেষে চিঠিখানা বের করে।

—আমাদের খোকা আমায় চিঠি দিয়েছে। মাকে বড়ো খুশী করে লিখেছে যে ছুটিতে বাড়ি আসবে। এই নাও পড়শি, পড়ো দেখি, আরেকবার শুনি চিঠিটা।

এরপর আকসিনিয়াকে অনেকবারই পড়তে হয়েছিল সে-চিঠি। সন্ধ্যে হলেই ইলিনিচ্না ওর ঘরে আসত। সযত্নে রুমালে জড়ানো হলদে খামটা বের করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলত

—পড়ো না আকসিনিয়া লক্ষ্মীটি। আজ আমার মনটা বড়ো ভার। ঘুমিয়ে স্বপন দেখলাম ও যেন কত্তো ছোট্টটি, ঠিক যেমনটি ইস্কুলে পড়তে যেত তেমনি।

কালক্রমে চিঠির কপিং পেন্সিলে লেখা অক্ষরগুলো ঝাপ্সা হতে শুরু করেছিল, অনেকখানি তো তার এখন একেবারেই দুর্বোধ্য। তবু আকসিনিয়ার তাতে অসুবিধা হত না, এতবার সে পড়েছে চিঠিটা যে তার প্রত্যেকটা শব্দ ওর কণ্ঠস্থ। এরও পরে যখন পাতলা কাগজখানা জীর্ণ হয়ে ছিঁড়ে যাবার যোগাড়, আকসিনিয়া নির্বিবাদে চিঠির শেষ ছত্র অবধি গড়গড় করে পড়ে শোনাত।

চিঠি আসার হপ্তা দুয়েক বাদে অসুস্থ হয়ে পড়ল ইলিনিচ্না। দুনিয়া তখন ফসল ঝাড়াইয়ের কাজে ব্যস্ত, বুড়ী তাকে সে কাজ থেকে ছাড়াতে চায় না, অথচ নিজেও সে বান্নার কাজ সামলে উঠতে পারছে না।

মেয়েকে বললে—আজ আর উঠতে পারব না রে। তুই নিজেই একটু দেখে টেখে নে।

—কেন তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে মা?

ইলিনিচ্না তার পুরনো জামার সেলাই খুঁটিয়ে দ্যাখে, চোখ না তুলেই জবাব দেয়

—গোটা দেহটাই কাহিল লাগছে যেন ভেতরটা একেবারে কেউ মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। যখন বয়েস কম ছিল তোর বাপ আমাকে পাগলের মতো ধরে-ধরে মারত। আর তার মুঠিও ছিল লোহার মতো। মরার মতো পড়ে থাকতাম একেক হপ্তা। এখন ঠিক সেইরকম বোধ হচ্ছে, শরীরের ভেতরটা যেন গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে, যাঁতাকলে পেষার মতো।

—মিখাইলকে ডাক্তার ডাকতে পাঠাব?

—ওকে বলে কী কাজ? আমি নিজেই কোনোরকমে উঠে যাই।

পরদিন সকালে সে উঠলও বটে। উঠে আঙিনার দিকে গেল।

কিন্তু সন্ধ্যে নাগাদ ফের ধরল বিছানা। মুখখানা একটু ফুলেছে, চোখের নিচে টস্‌টস্‌ করছে। রাতে সে অনেকবার চেষ্টা করল দুহাতে ভর দিয়ে উঠে বসতে। পালা-করে রাখা বালিশের ওপর থেকে মাথা তুলে ঘন-ঘন নিশ্বাস নিতে লাগল। বড কষ্ট হচ্ছিল দম নিতে। তারপর দম-আটকানো ভাবটা যেন একটু কাটল। চুপচাপ চিত হয়ে শুয়ে থাকল সে, বিছানা ছেড়ে উঠতেও পারল। বেশ কয়েকটা দিন যেন নীরব বৈরাগ্য আর শান্তির মধ্যে দিয়ে কেটে গেল। একা থাকতে চাইছিল ইলিনিচ্‌না। তাই আকসিনিয়া দেখা করতে এলে দুচারটে কথায় তার প্রশ্নের জবাব দিল। আকসিনিয়া চলে গেলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। ছেলেপিলেরা মাঠে গিয়ে খেলা করছে আর দুনিয়াও ঘরে এসে মেলা কথা জিজ্ঞেস করে জালাতন করছে না, এতে যেন খুশীই হল ইলিনিচ্‌না। এখন আর তার সমবেদনা বা সান্ত্বনার প্রয়োজন নেই। এমন একটা সময় এসেছে যখন ওর কাছে একাকী থাকাটাই যেন একান্ত জরুরী মনে হয়, সমস্ত জীবনের স্মৃতি রোমন্থন করতে হবে এবার, তাই। চোখদুটো আধবোজা করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুয়ে থাকে অনড হয়ে, শুধু ফুলো ফুলো আঙুলগুলো দিয়ে কম্বলের ভাঁজগুলো জড করে। আর এই সময়টাতে তার চোখের সামনে সারা জীবনটা যেন ছায়াছবির মতো সরে যেতে থাকে।

সে জীবনটা যে কী আশ্চর্য রকমের অসম্পূর্ণ দীনতায় ভরা, তার কতখানি অংশ যে ভারাক্রান্ত তিক্ততার মধ্যে কেটেছে, আরো কত-কীই ঘটেছিল যা ইলিনিচ্‌না স্মরণ করতেই নারাজ। কোনো কারণে তার স্মৃতি আর চিন্তার বেশির ভাগটাই আছে গ্রিগরকে ঘিরে। হয়তো-বা তার কারণ লডাইয়ের শুরু থেকে আজ অবধি এতগুলো বছরের মধ্যে গ্রিগর সম্পর্কে তার একটানা চরম উদ্বিগ্নতা যা থেকে সে কখনো রেহাই পায়নি। আর হয়ত এই কারণে যে গ্রিগরই তার একমাত্র বাঁধন, এই জীবনের সঙ্গে তার একমাত্র সম্পর্কসূত্র। আর তাছাডাও বোধ হয় কালের গতিতে বড ছেলে আর স্বামীর প্রতি তার টান অতি ক্ষীণ আর ম্লান হয়ে গিয়েছিল, কারণ তাদের কথা মনে হত অতি কদাচিৎ। যেন এক অস্পষ্ট ধোঁয়াটে কুয়াসার ভেতর দিয়েই তাদের কেবল দেখতে পেত সে, তার চেয়ে স্পষ্টতর নয়। যৌবন আর বিবাহিত জীবনের দিনগুলো মনে করতে তার ইচ্ছেই হত না, যেন কোন্‌ বিপুল দূরত্বে তারা মিলিয়ে গেছে, স্মরণ করেও না আসে সুখ, ন শান্তি। অতীতের দিকে ফিরে যেতে হলেই একটা কঠোর নির্মোহ ভাব। কিন্তু "ছোট পুত্তুর"টির কথা তার পরিষ্কার মনে পড়ে, এত স্পষ্ট সে ছবি যেন ধরা-ছোঁয়া যায়। অথচ ওর কথা মনে হওয়া মাত্র ইলিনিচ্‌নার বুকটা দুরদুর করে ওঠে। তারপরেই আসে সেই দম-আটকানো ভাব।

মুখটা তাব ধূসর হয়ে ওঠে। অনেকক্ষণ পড়ে থাকে অচৈতন্য হয়ে। আবার জ্ঞান ফিরলেই মনে পড়ে ছেলের কথা। সবার কনিষ্ঠ ছেলেটিকে সে ভুলতে পাবে না।

একদিন বড়ো ঘবটাতে শুয়েছিল ইলিনিচ্‌না। বেলা দুপুরের সূর্য গনগন করছে বাইরে। আকাশেব দক্ষিণ প্রান্তে হাওয়ায় ভব কবে সাদা মেঘেরা ভেসে চলেছে সগর্বে উজ্জ্বল-নীলেব আঙিনা দিয়ে। দুঃসহ নীরবতা ভঙ্গ করছে শুধু ঝিঁঝিঁপোকার একটানা ঝিমধবা ডাকে। বাইরে, ঠিক জানলাটাব নিচে, ঘবেব ভিত ঘেঁষে এক ঝাড় ঘাস—আধা বিবর্ণ দুবোঘাসের সঙ্গে মিলে জংলাঘাস আর চোবকাঁটা—বোদেব তাত থেকে বেঁচে গেছে এই ঝাড়টুকু, এবং মধ্যে বাসা বেঁধেছে সেই ঝিঁঝিপোকারা। ওদেব একটানা ঝিঁ-ঝিঁ-ঝিঁ ইলিনিচ্‌নার কানে আসে, রৌদ্রতপ্ত ঘাসের গন্ধ কামবার ভেতবেও তার নাকে এসে পৌঁছোয়। মুহূর্তেব জন্য ইলিনিচ্‌নাব চোখেব সামনে ভেসে ওঠে আগস্ট মাসেব বোদপোড়া তৃণপ্রান্তবেব ছবি, সোনালি গমের মুড়োনো গোড়, কপোত-ধূসব কুয়াশায় মোড়া উজ্জ্বল নীল আকাশ।

সে যেন পবিষ্কাব দেখতে পাচ্ছে সোমবাজ লতার বেড়া দেয়া মাঠে বলদ চরছে, গাড়িব ওপব ছাউনি টেনে দেয়া। সোমবাজেব ঝাঁঝালো তেতো গন্ধেব মধ্যে ঝিঁঝিপোকাব শুকনো করাত চেরা আওয়াজ শুনতে পায়। তারপর যেন নিজেকেও দেখতে পাচ্ছে সে—যৌবনময়ী, সুচাঁদ সুন্দবী। ওই সে চলেছে খামাববাড়িব দিকে বস্ত পদে। পায়েব নিচে ওর মুড়োঘাস মড়মড় করছে, খোঁচা দিচ্ছে হাঁটুব নিচে খালি পায়ে, পিঠেব দিকে ঘাগবাব ভেতব জড়ো-হওয়া ঘামে ভেজা জামাটা শুকিয়ে যাচ্ছে তপ্ত বাতাসে, পুড়ে যাচ্ছে ওব কাঁধটা। গালে লেগেছে লালেব আমেজ, মুখে রক্তেব উচ্ছ্বাস জাগাব ফলে কানদুটো অল্প ঝাঁঝাঁ কবে। এক হাত ভাজ কবে সে দুগ্ধভাবাক্রান্ত স্তনদুটিকে ঠেকিয়ে বাখে আব একটা শিশুব ফোঁপানি কান্না শুনে আবো তাড়াতাড়ি পা চালায় জামার গলাব বোতাম খুলতে-খুলতে।

তাবপব যখন গাড়িব নিচে ঝোলানো দোলনাটিব ভেতব থেকে ছোট্ট কালচে গ্রিশাংকাকে কোলে তুলে নেয় তখন তার শুকনো ঠোঁটে হাসি ফুটে ওঠে। গলাব ক্রুশ বাঁধা ভিজে সুতোটা দাত দিয়ে সবিয়ে ধবে বেখে সে তাড়াতাড়ি মাই দেয় বাচ্চাটিব মুখে আব ফিসফিস করে বলে দাত চেপে ওবে আমাব ছোট্ট মানিক। আমাব সোনাব চাঁদ•• তোব মা তোকে না খাইযে বোগা কবে ফেলেছে বে। ছোট্ট গ্রিশাংকা তখ বাগ কবে ফোঁপাতে থাকে আব ছোট ছোট মাড়ি দিয়ে সজোবে মাই কামড়ে চুষতে থাকে। ইলিনিচ্‌নাব পাশে তখন দাঁড়িয়ে গ্রিশাংকার বাপ, কালো গোঁপওয়ালা জোয়ান মানুষ—কাস্তেতে শান দিচ্ছিল। আধবোজা চোখেব পাতাব ফাক দিয়ে ইলিনিচ্‌না ছাখে তার মুখের হাসি আব ঝিলিক্‌-দেয়া চোখেব নীলচে সাদা

অংশটুকু। গরমে নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল ইলিনিচ্‌নার, ভুরু থেকে ঘামের স্রোত নেমে এসে গালে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। তারপর সে আলোটা মিলিয়ে গেল, মিলিয়ে গেল চোখের সামনে থেকে ।

স্বপ্নের ঘোর কাটিয়ে ওঠে ইলিনিচ্‌না। চোখের-জলে ভেজা মুখের ওপর একবার হাতটা ঘষে স্থির হয়ে পড়ে থাকে অনেকক্ষণ। মাঝে মাঝে নির্মম-ভাবে দম আটকে আসে, একেকবার সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে সে।

সেদিন সন্ধ্যের পর দুনিয়া আর তার স্বামী যখন শুয়ে পড়েছে, ইলিনিচ্‌না প্রাণপণে তার অবশিষ্ট শক্তিটুকু একত্র করে উঠে আঙিনার ভেতর নেমে এল। আকসিনিয়া তখন বাইরে বেরিয়েছিল ওর পালের একটা হারানো গরুর খোঁজে। বাড়ি ফিরে এসে ছাখে, ইলিনিচ্‌না ধীরে-ধীরে টলতে টলতে এগিয়ে যাচ্ছে—ফসল মাড়াইয়ের উঠোনের দিকে। আকসিনিয়া অবাক হয়ে ভাবল, এরকম অসুস্থ অবস্থায় ওখানে গিয়েছে কেন বুড়ী? মেলেখফদের মাড়াই-উঠোনের বেড়ার কাছে চুপিচুপি এগিয়ে এসে উঁকি দিল সে। আকাশে ফুট্‌ফুটে জ্যোছনা। স্তেপের দিক থেকে হাওয়া আসছিল। পাথর-মাজা ফাঁকা শানটার ওপর ঘন ছায়া জমেছে খড়ের পাঁজার। ওপাশের বেড়াটা দুহাতে আঁকড়ে ধরে ইলিনিচনা তাকিয়ে আছে স্তেপের প্রান্তরের দিকে, সেই যেখানে চাষীরা আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়ে রেখে গেছে—একটা সুদূর দুর্গম ছোট তারার মতো, সেইদিকে। আকসিনিয়া পরিষ্কার দেখতে পেল চাঁদের নীলচে আলোয় বুড়ীর ফোলা মুখখানা যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, কালো শালের তলা দিয়ে পাকা চুলের গোছা চূর্ণ হয়ে পড়েছে মুখের ওপর।

ইলিনিচ্‌না অন্ধকার তৃণপ্রান্তরের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর যেন খুব কাছেই রয়েছে এমনিভাবে সে ডাকতে লাগল গ্রিশাকে

—গ্রিশা, বাছা আমার! আমার সোনার চাঁদ! তারপর এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে একেবারে অন্য ধাঁচের নিচু আর খসখসে গলায় সে বলে উঠল.

—আমার বত্রিশনাড়ি-ছেঁড়া বুকের ধন রে!

আকসিনিয়ার সারা দেহ কেঁপে ওঠে একটা অনিশ্চিত উদ্বেগ আর ভয়ে। বেড়ার ধার থেকে চট্‌ করে নেমে এসে সে নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকে।

সে রাতে ইলিনিচ্‌না বুঝতে পারে যে তার এবার ডাক এসেছে, মৃত্যু শিয়রে। ভোরবেলায় তোরঙ্গ থেকে সে গ্রিগরের জামাটা বের করে, জড়িয়ে গোল পাকিয়ে বালিশের তলায় রাখে। তারপর সে নিজের কবরের কাপড়ও গোছগাছ করে নেয়, এমনকি যে জামাটা তাকে পরানো হবে শেষনিশ্বাসের পর, সেটাও সে বের করে।

পরদিন সকালে রোজকার মতো দুনিয়া আসে ওর মাকে দেখতে। ইলিনিচ্‌না বালিশের তলা থেকে গ্রিগরের সাবধানে ভাঁজ করা কোর্তাটা বের করে মুখে কোনো কথাটি না বলে দুনিয়ার দিকে এগিয়ে দেয়।

—এ আবার কী ? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে দুনিয়া।

ইলিনিচ্না অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বলে :

—গ্রিশার জামা··· তোর স্বামীকে দিস, ও-ই পরুক। বেচারার পুরনো জামাটা বোধহয় ঘামে পচে গেছে।

দুনিয়া দেখে ওর মায়ের কালো ঘাগরা, জামা আর কাপড়ের চটি বেঞ্চির ওপর রাখা হয়েছে—দীর্ঘ মহাযাত্রার পথে যে পোশাকে ঢাকা হয় মানুষের দেহ সেই পোশাক , দেখে ও ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

—এসব আবার কি গুছিয়ে রেখেছ মা ? না, না, সরাও এসব, যিশুর দোহাই। হা ভগবান্! এখনি কেন মরার কথা ভাবতে শুরু করেছ !

—না রে, আমার সময় ঘনিয়েছে।···ফিসফিস্ করে বলে ইলিনিচ্না—আমার পালা এল এবার।···ছেলেপিলেগুলোকে দেখিস, যতদিন না গ্রিগর ফেরে একটু লক্ষ্য রাখিস মা।···ততদিন বাঁচতে পারব না বেশ বুঝতে পারছি।···ও আসা পর্যন্ত টিকে থাকতে পারব না রে।··

দুনিয়া যাতে তার চোখের জল দেখতে না পায় তাই দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় ইলিনিচ্না, ওড়না দিয়ে মুখখানা ঢাকে।

তিনদিন পর মৃত্যু হল ইলিনিচ্নার। তারই বয়েসের অন্য বুড়ীরা তার দেহ স্নান করালে, [illegible] পোশাক পরালে, বড়ো ঘরের টেবিলটার ওপর তাকে শোয়ালে। বিকেলে আকসিনিয়া এল শেষ দেখা দেখতে। ইলিনিচ্নার আগেকার সেই গর্বিত সমুন্নত চেহারা এখনকার এই ক্ষুদ্রকায় বৃদ্ধার কঠোর সুন্দর মুখমণ্ডলের মধ্যে খুঁজে পাওয়া শক্ত। ঠাণ্ডা হলদে কপালটার ওপর ঠোঁট স্পর্শ করতে গিয়ে আকসিনিয়া লক্ষ্য করল সাদা ঘোমটার তলায় সেই অবাধ্য পাকা চুলের গোছা আগের মতোই চূর্ণ হয়ে পড়েছে, আর কানের গোল কম্বুটা একেবারে অল্পবয়েসী মেয়ের মতো খুদেপানা।

দুনিয়ার সম্মতি পেয়ে আকসিনিয়া ছোট ছেলেমেয়েগুলোকে নিয়ে গেছে নিজের ঘরে। এই নতুন আরেকটা মৃত্যু দেখে ওরা একেবারে হকচকিয়ে গেছে, মুখে রা-টি নেই। আকসিনিয়া ওদের খাইয়ে দাইয়ে বিছানায় নিয়ে শুল। ওদের ছোট্ট দেহগুলো নিঃশব্দে লেপ্টে রয়েছে দু'পাশে, প্রিয় পুরুষের সন্তানদের জড়িয়ে ধরতেই এক অদ্ভুত অনুভূতি জাগল আকসিনিয়ার মনে। নিজের ছেলেবেলায় শোনা সব রূপকথার গল্প ওদের বলতে লাগল নিচু গলায়, যাতে ওদের মনটা সরিয়ে রাখা যায় মরা ঠাকুরমার চিন্তা থেকে। আস্তে আস্তে সুর করে করে আকসিনিয়া বলতে লাগল অনাথ গরিব ভানিউশকার সেই গল্প :

হংসবলাকা, তোমার ধবল পাখার ভরে,
আমায় নিয়ে চল

সুদূর পারে—
যেথায় আমার আপন দেশ
সেথা যাব আপন ঘরে…

গল্প শেষ করার আগেই শুনতে পেল ওরা বেশ তালে তালে একটানা নিশ্বাস ফেলছে। মিশাৎকা শুয়েছিল খাটের বাইরের দিকটায় আকসিনিয়ার কাঁধের ওপর মুখ গুঁজে। কাঁধটা একটু ঝেড়ে নিয়ে ছেলেটার পেছনে-ফেরানো ছোট্ট মাথাটা আগের চেয়ে সোয়াস্তির মধ্যে এনে দিল আকসিনিয়া। তারপর হঠাৎ বুকের মধ্যে ওর এমন একটা নিদ্রুণ বেদনা বিদীর্ণ অনুভূতি জাগল যে মনে হতে লাগল দারুণ একটা আক্ষেপ ওর টুঁটি চেপে ধরেছে। প্রচণ্ড অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়ল সে, কান্নার দমকে দমকে কেঁপে উঠতে লাগল। কিন্তু চোখের জলটুকু মোছার শক্তি ওর নেই: গ্রিগরের ছেলে-মেয়েরা ওর দুবাহুর আশ্রয়ে ঘুমিয়ে আছে, আকসিনিয়ার মন চাইল না ওদের ঘুম ভাঙাতে।

॥ চার ॥

ইলিনিচ্‌নার মৃত্যুর পর অনস্বীকার্যভাবেই এবাড়ির একমাত্র কর্তা হয়ে দাঁড়াল কশেভয়। সুতরাং খামারটাকে উদ্ধার করে আবার দাঁড়িয়ে তোলার উৎসাহ যে তার দ্বিগুণ হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা একেবারেই হল না: যতই দিন যায় মিশকা যেন ততই কাজে নিরুৎসাহ হতে থাকে। সন্ধ্যের দিকে প্রায়ই সে বেরিয়ে গিয়ে সিঁড়ি-দরজায় বসে। অনেক রাত অবধি বসে-বসে ধূমপান করে আর কী যেন ভাবে। স্বামীর এই পরিবর্তনটুকু দুনিয়াশার নজরে না পড়ে যায় না। একাধিকবার সে অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছে—যে-মিশকা একসময় নিজেকে পর্যন্ত সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে কাজে ডুবে থাকত সে হঠাৎ নিতান্ত অকারণেই এক-একসময় কুড়ুল বা রেঁদা ফেলে রেখে চুপচাপ বসে বিশ্রাম নেয়। শীতের রাই বুনবার সময়ও সেই একই ব্যাপার ঘটল খামারে। দুএকবার হয়তো চক্কর দিয়ে এল, তারপরেই বলদগুলোকে থামিয়ে সে সিগারেট পাকিয়ে নেবে, চষা জমির ওপর বসে ভুরু কুঁচকে ধোঁয়া ছাড়বে।

দুনিয়া তার বাপের সাংসারিক জ্ঞানটুকু ভালোই পেয়েছিল উত্তরাধিকার হিসেবে। সে চিন্তা করে দেখল মিশকার উৎসাহে যেন ভাটা পড়ে আসছে হয় অসুখ করেছে কিংবা হয়তো এটুকু ওর অলসতা ছাড়া আর কিছু নয়। এমন স্বামীকে নিয়ে আমার বিড়ম্বনা হবে। ওকে দেখলে মনে হয় যেন পরের ঘরে বাস করছে আধা দিন সিগারেট খেয়ে আর আধা দিন গা চুলকে কাটাচ্ছে, কাজের কাজ কিছুই করছে না। ওর সঙ্গে আমার একটু কথাবার্তা হওয়া দরকার—হৈ-চৈ না করে ধীরে সুস্থে, যাতে উতলা না হয়ে পড়ে। এরকমভাবে যদি কাজ করে তাহলে তো খুদকুড়োর জোগাড়-টুকুও হবে না..।

তাই একদিন দুনিয়া সাবধানে ওকে জিজ্ঞেস করে

—মিশ্‌কা তুমি তো আর আগের মতো নেই, তোমার অসুখটা কি বড্ডো বাড়াবাড়ি করছে?

—অসুখ আর কই? অসুখ ছাড়াই এমনিতে এখানে বড়ো হাঁপিয়ে উঠেছি। বিরক্তিভরে জবাব দিয়ে মিশকা বলদদুটোকে ঠেলে ফের চক্কর দিতে শুরু করে।

দুনিয়ার মনে হল তার বেশী প্রশ্ন করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। হাজার হলেও স্বামীকে উপদেশ দেয়া মেয়েদের কাজ নয়। ব্যাপারটা তাই এখানেই ইতি হল।

বুঝতে ভুল হয়েছিল দুনিয়ার। আগের সেই উদ্যম নিয়ে কাজ করার পক্ষে এখন মিশকার একমাত্র বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তার একটা বদ্ধমূল ধারণা—দিনের পর দিন সে যেন বেশী করে উপলব্ধি করছে যে এত তাড়াতাড়ি নিজের গ্রামে ফিরে এসে বসবাস করা তার পক্ষে অনুচিত হয়েছে। এলাকার সংবাদপত্রে যুদ্ধের খবর পড়ে কিংবা সন্ধ্যার সময়, লড়াই-ফেরৎ লালফৌজী কসাকদের মুখে গল্প শুনে ও মনে মনে ভাবত ক্ষুণ্ণ হয়ে ও ত এত আগে-ভাগে কেন খামারী করতে ফিরে এলাম বড়ো বেশী তাড়াহুড়ো করে। কিন্তু ইদানীং গ্রামের লোকদের আচরণে ও আরো বিশেষ উদ্বেগ বোধ করছিল—কেউ কেউ প্রকাশ্যেই বলে বেড়াচ্ছে শীতকালের আগেই সোভিয়েত রাজত্ব খতম হবে, র‍্যাঙ্গেল নাকি তাউরিদে থেকে এগিয়ে আসছে, মাখনোর সঙ্গে মিলে সে নাকি এর মধ্যে রস্তভের কাছাকাছি এসে পড়েছে। তাছাড়া 'মিত্রশক্তি' নাকি নভরোসিস্কে বিরাট এক অভিযাত্রী বাহিনী নামিয়েছে। সারা গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়েছে গুজব, ক্রমেই উদ্ভট থেকে উদ্ভটতর সব গল্প শোনা যাচ্ছে। খনি অথবা বন্দীশিবির থেকে ফিরে আসা কসাকরা সারা গ্রীষ্মকালটা গাঁয়ে বসে বাড়ির খেয়ে-দেয়ে মোটা হয়েছিল, তারাও নিজেরটা নিয়েই ব্যস্ত। রাতে ঘরচোলাই ভদ্‌কা খায়, নিজেদের ভেতর কানাঘুষো করে, মিশ্‌কার সঙ্গে দেখা হলে উদাসীনতার ভান করে প্রশ্ন করে খবরের

কাগজ তো পড়েছ হে কশেভয়! বলো দেখি র‍্যাঙ্গেলের কথা। শিগগিরই তাকে সাবাড় করে দেয়া হচ্ছে তো? আর ওই যে লোকে বলছে 'মিত্রশক্তি' নাকি ফের আমাদের উপর চেপে আসছে সেও কি সত্যি না বাজে কথা?

একদিন রোববার সন্ধ্যে নাগাদ প্রোখর জাইকফ এসে হাজির। মিশকা তখন সবে মাঠ থেকে ফিরে হাতমুখ ধুয়ে নিচ্ছিল সিঁড়ি-বারান্দায় দাঁড়িয়ে। ছুনিয়া একটা কুঁজো থেকে জল ঢেলে দিচ্ছিল ওর হাতে আর স্বামীর রোগা রোদপড়া ঘাড়টার দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসছিল। প্রোখর ওদের নমস্কার জানিয়ে সিঁড়ির নিচের ধাপটিতে বসে জিজ্ঞেস করল:

—গ্রিগর পান্তালিয়েভিচের কোনো সংবাদ পাওনি?

—না। চিঠিপত্র দেয়নি।—জবাব দিলে ছুনিয়া।

মিশ্‌কা মুখহাত মুছে প্রোখরের চোখের দিকে হেসে তাকিয়ে বললে—কেন? গ্রিগরের জন্য খুব চিন্তিত বুঝি?

প্রোখর নিশ্বাস ফেলে জামার হাতাটা গুটিয়ে নিলে।

—তা তো বটেই। একসঙ্গেই তো বরাবর কাজ করে এলাম দুজন।

—এখন বুঝি আবার কোনো নতুন কাজে যাবার মতলব করেছ?

—নতুন কী?

—কেন, চাকরি।

—ওর কাছে আমার চাকরির দিন শেষ হয়েছে।

মিশ্‌কা তবু গম্ভীর হয়ে বলতে থাকে: কিন্তু আমি তো ভেবেছিলাম তুমি বুঝি ওর জন্যই অপেক্ষা করে আছ, বেঁচেও আছ ওরই চাকরি করবে বলে। সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য

—এবার তুমি বাজে কথা বলতে শুরু করলে মিখাইল।—ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে প্রোখর বলে।

—কেন বলছি? গাঁয়ে যে সব কানাঘুষো কথাবার্তা চলে সবই তো শুনতে পাই।

—আমাকে কখনো তেমন কথা বলতে শুনেছ? কোথায় শুনেছ ওসব কথা?

—তুমি না হলেও তোমার আর গ্রিগরের মতো লোকরাই বলে। তারা সবাই "নিজের দলের লোকদের" জন্য অপেক্ষা করছে।

—আমি কোনো 'নিজের দলের লোকের' জন্য অপেক্ষা করছি না, আমার কাছে সবাই সমান।

—সেইটেই তো মারাত্মক কথা, সবাই তোমার কাছে সমান হল। বাড়ির ভেতর এসো। কিছু মনে কোরো না, আমি ঠাট্টা করছিলাম।

প্রোখর অনিচ্ছাভাবে সিঁড়িতে পা দিয়ে চৌকাঠ ডিঙোতে ডিঙোতে বলে :

—তোমার ঠাট্টাগুলো ভাই বড় মজা পাবার মতো নয়···আগের কথা সব ভুলে যাও। অতীতের মাশুল তো আমি দিয়েছিই।

টেবিলে বসে মিশ্‌কা শুকনো গলায় বলে—অতীতের সবটাই কি ভুলে যাওয়া চলে। বোসো না, আমাদের সঙ্গে খেয়ে যাও আজ।

—ধন্যবাদ। সে অবিশ্যি ঠিক কথাই যে অতীতকে একেবারে ভোলা যায় না। যেমন ধরো, আমার একটা হাত খোয়া গেছে, ভুলতে পারলে খুবই খুশী হতাম। কিন্তু তা ভোলা যায় না : সব সময়ই মনে পড়িয়ে দেয় অভাবটা।

দুনিয়া টেবিল সাজাতে সাজাতে স্বামীর দিকে না তাকিয়েই মন্তব্য করে :

—তোমার মতে যারা শ্বেতরক্ষীদের দলে যোগ দিয়েছিল তাদের কখনোই মাফ করা যায় না ?

—কেন, তুমি কী ভেবেছিলে ?

—আমি তো ভেবেছিলাম যারা পুরনোটা খুঁচিয়ে তোলে তাদের চোখ বুজিয়ে দেয়া হবে, কথায় তো তাই বলে।

—সে তুমি বাইবেলেই পাবে।—কঠিন স্বরে মিশ্‌কা বলে—কিন্তু আমার মতে মানুষকে সব সময় তার কাজের জবাবদিহি করতেই হবে।

—গবরমেণ্ট তো তেমন কোনো কথাই বলে না।—দুনিয়া ধীরে ধীরে মন্তব্য করে। আরেকজন কসাকের সামনে স্বামীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করার প্রবৃত্তি ছিল না দুনিয়ার। কিন্তু মনে-মনে সে মিশকার ওপর বিরক্ত হয়েছে—প্রোখরের সঙ্গে তার তামাশাটা নিতান্তই অযথা, তার ওপর ওর ভাইয়ের সঙ্গে প্রকাশ্যে শত্রুতার ভাব দেখাল সে।

—গবরমেণ্ট তোমাকে কিছুই বলেনি ; কারণ তোমাকে তার বলার কিছু নেইও। কিন্তু সোভিয়েত আইনে শ্বেতরক্ষীদের চাকরি করার কৈফিয়ত দিতে হবেই।

প্রোখর জিজ্ঞেস করে—তাহলে আমার কাজেরও কৈফিয়ত দিতে হবে তো ?

—তুমি তো নেহাতই ওঁচা ; এতদিন ভেড়ার মতো চরে এখন খোঁয়াড়ে ঢুকেছ ! আরদালিদের কেউ সওয়াল করবে না। কিন্তু গ্রিগর ফিরে এলে তাকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। আমরা তাকে বিদ্রোহের ব্যাপারে জেরা করব।

—জেরা করবে তুমি, তাই বুঝি ?—টেবিলের ওপর দইয়ের বাটিটা রাখতে গিয়ে দুনিয়ার চোখদুটো ঝল্‌কে ওঠে।

—হ্যাঁ, আমিও জেরা করব বই কি !— শান্তভাবে জবাব দেয় মিশকা।

—সে কাজ তো তোমার নয়।···তুমি ছাড়াই অনেক উকিল জুটে যাবে সওয়াল করতে। লালফৌজে কাজ করে সে মাফ পেয়ে গেছে, আবার কী !···

ডুনিয়ার গলাটা কাঁপে। টেবিলে বসে সে আঙরাখার খুঁট আঙুলে জড়ায়। বউয়ের উত্তেজিত ভাবটা যেন নজরে পড়েনি এমনিভাবে মিশকা ধীরে সুস্থে বলেই চলে :

—দুএকটা কথা জেরা করার ইচ্ছে আমারও আছে বৈকি। তবে তার মাফ পেয়ে যাবার ব্যাপারটা আমাদের একটু তলিয়ে দেখতে হবে। সে যে কতখানি মাফ পেয়েছে তা আমাদের নতুন করে বিবেচনা করা দরকার হবে। যথেষ্ট রক্ত সে ঝরিয়েছে। আমাদের মেপে দেখতে হবে কাদের পাল্লায় রক্ত বেশী ভারি…।

বিয়ের পর এই প্রথম ঝগড়া মিশ্‌কা আর ডুনিয়ার। রান্নাঘরে তখন একটা অস্বস্তিকর নীরবতা। মিশকা চুপচাপ দই খায় আর মাঝে মাঝে তোয়ালে দিয়ে মুখ মোছে। প্রোখর সিগারেট ফোঁকে, আর তাকিয়ে থাকে ডুনিয়ার দিকে। তারপর শুরু করে ক্ষেত-খামারি নিয়ে কথাবার্তা। আরো আধ ঘণ্টা সেখানে কাটিয়ে যাবার সময় প্রোখর বললে :

—কিরিল গ্রমভ তো ফিরেছে। শুনেছ ?

—না তো। কোত্থেকে এলো সে।

—লালফৌজের দল থেকে। এক নম্বর ঘোড়সওয়ার ব্রিগেডে ও ছিল।

—মামন্তভের দলে কাজ করত, সেই কিরিলই তো ?

—হ্যাঁ, সেই লোক।

মিশ্‌কা সব্যঙ্গ হেসে বলে—বড় বাহাদুর সেপাই ছিল !

—আমার তা মনে হয় না। যেখানে লুটপাটের ব্যাপার সেইখানেই তাকে হাজির দেখা যেত প্রথম। ওকাজে ছিল একেবারে সিদ্ধহস্ত।

—শুনেছি বন্দীদের নাকি জবাই করত কসাইয়ের মতো। সামান্য বুট জুতোর জন্যও খুন করত। শুধু বুটজোড়া নেবে বলেই একেবারে মানুষ খুন।

—তাই তো শুনেছি। প্রোখরও সায় দেয়।

মিশকা বিনিয়ে বিনিয়ে বললে—একেও মাফ করতে হবে নাকি, অ্যাঁ ? ঈশ্বর ওর শত্রুদের ক্ষমা করেছেন আর আমাদেরও তদ্রূপ করতে হুকুম দিয়েছেন নাকি ?

—এর জবাব বড়ো সোজা নয়।…তবে কীই বা করতে পারো এখন ওর ?

মিশকা ভুরু কোঁচকায়—তা ··যা করতে পারি নাস্তানাবুদ করে যমের দুয়ার দেখিয়ে ছাড়ব ! এমনিতেও সে রেহাই পাবে না। ভিয়েশেনস্কায় ডন এলাকার চেকা বসে আছে, ওকে বেশ আদর করে গলা জড়িয়ে ধরবে তারা।

প্রোখর হেসে বলে :

—কথায় আছে না, কুঁজো সোজা হয় কবরে গেলে, তার আগে নয় ! গ্রমভ্‌ লুটের মাল নিয়ে এসেছে, লালফৌজের কাছ থেকেও। আমার বউয়ের কাছে ওর বউ জাঁক করে বলেছে সে নাকি মেয়েদের

পল্লার একখানা কোট এনেছিল তার জন্য। এছাড়া আরো কতো পোশাক-আশাক। ও ছিল মাস্লাকেব ব্রিগেডে, সেখান থেকেই ঘবে ফিরেছে। আমাব মনে হয় পালিয়ে এসেছে। হাতিযারগুলোও নিয়ে এসেছে সঙ্গে কবে।

—কী হাতিয়াব? জিজ্ঞেস কবে মিশকা।

—জানোই তো, একটা কাববাইন, একখানা পিস্তল আব হযতো অন্য-কিছু জিনিস।

—তুমি জানো ও সোভিযেত দপ্তবে গিযেছিল কিনা হাজিবা দিতে?

প্রোখর হো হো কবে হেসে হাত নাড়ে।

—গলায দড়ি বেঁধেও তাকে সেখানে নিতে পাববে কিনা সন্দেহ। পালিয়ে এসেছে ছাড়া আব কি ভাবা যায়। আজ না হলেও কাল সবে পড়বে বাড়ি থেকে। লক্ষণ দেখে যা মনে হয কিবিলেব আবও লড়াইয়েব সাধ আছে। 'কিন্তু আমাকে তুমি মিছেই দুষছ। না ভাই, লড়াই আমি অনেক করেছি। শখ আমাব একেবাবেই মিটে গেছে, আব নয়।

এব পবে প্রোখব আব দেরি করে না, চলে যায়। খানিক বাদে মিশকাও বেরোয। ছেলেপিলেদেব খাইযে দাইযে শোবাব যোগাড কবছে দুনিযা এমন সময় মিশকা ফিবে আসে। হাতে ওব ছোট বস্তাব মধ্যে কী যেন একটা জিনিস।

দুনিযা একটু ঝাঁঝিযে বলে—গিযেছিলে কোন্ চুলোয?

মিশকা মিষ্টি হাসে—আমাব বিযেব তত্ত্ব এনেছি।

সযত্নে বাঁধা থলিটার মোড়ক খুলে একটা বাইফেল, কার্তুজভবা একটা ব্যাগ, পিস্তল আব দুটো হাতবোমা বেব কবে মিশকা। বেঞ্চিব ওপর জিনিসগুলো সাজিযে একখানা পিবিচে সাবধানে প্যাবাফিন ঢালে।

ভুরু দিযে ইশাবা কবে হাতিযাবগুলো দেখায দুনিযা—ওগুলো এল কোত্থেকে?

—ওসব আমাব। লড়াই থেকে নিযে এসেছিলাম।

—তাহলে পুঁতে বেখেছিল কোথায?

—যেখানেই হোক তবে জিনিসগুলো ভালোই বাখা হযেছিল।

—তুমি যে অনেক জিনিসই গোপন বাখতে ভালোবাস সেকথা আমি বলবই। একটা কথাও তো আমাকে তুমি বলোনি এসম্পর্কে। নিজের স্ত্রীর কাছে গোপন কবো?

জোব কবে দিলখোলা হাসিভাবটা বজায রেখে মিশ্কা একটু ইতস্তত করে বলে—কেনই বা তোমাকে বলতে যাব দুনিযা? এ তো মেযেদেব ব্যাপাব নয়। ও জিনিস যেমন আছে তেমনি পড়ে থাক্। এ নিযে আমাদেব সংসারেব কী আসে যায়।

—তাহলে বাড়িতে ও-জিনিস এনেছ কেন? এখন তো তুমি আইন

মেনে চলছ, সবই তো জান। · আইনের কাছে এর জন্য তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে না ?

মিশ্‌কার মুখখানা কঠিন হয়ে ওঠে। বলে : তুমি একটি গাধা। যখন কিরিল গ্রমভ হাতিয়ার নিয়ে পালিয়ে আসে তখন সেটা সোভিয়েত সরকারের পক্ষে বিপদের কারণ, কিন্তু যখন আমি নিয়ে আসি তখন তাতে সোভিয়েত সরকারেরই ষোল আনা মঙ্গল। বুঝতে পেরেছ ? কার কাছে আমি জবাবদিহি করব ? ভগবানই জানেন তুমি কী বক্‌বক্‌ কবছ। যাও, বিছানায় গিয়ে শুযে পড়ো।

মিশ্‌কার মতে একমাত্র যা সিদ্ধান্ত হতে পারে তাই সে করেছে—শ্বেতরক্ষীরা যদি হাতিয়ার নিয়ে ফিরে আসতে থাকে তাহলে তাকে সতর্ক আর প্রস্তুত থাকতেই হবে। রাইফেল আব পিস্তলটা সে সযত্নে সাফ কবে। পরদিন সকালে আলো ফুটতেই সে পায়ে হেঁটে বওনা হয় ভিয়েশেনস্কার দিকে।

ডুনিয়া ওর থলিতে খাবার গুঁজে দেবাব সময গজগজ করছিল :

—সব সময় আমার কাছে কিছু চাপতে চেষ্টা কবছ। অন্তত কতদিনের জন্য যাচ্ছ, কেন যাচ্ছ, সেটুকু তো আমায় বলে যাবে ? এরকমভাবে দিন কাটানোব কী মানে হয় ! যাওয়াব ইচ্ছে হল, চল্লেন উনি। একটা কথাও যদি মুখ থেকে বেবোয। তুমি কি আমাব স্বামী, না আমাব জামার বোতাম শুধু ?

—ভিয়েশেন্‌স্কায় যাচ্ছি সামরিক কমিশনারের কাছে। এব চেয়ে বেশী তোমায় আর কী বলব বল ? আমি ফিবলে তুমি সব জানতে পাববে।

থলিটা পাশে ঝুলিযে নিয়ে মিশ্‌কা ডনেব পাড দিয়ে নেমে গেল। নৌকায় উঠে তাডাতাডি দাড ঠেলে চলল নদীব ওপাবে।

ভিয়েশেনস্কায় ডাক্তারি পবীক্ষার পর ডাক্তার মিশ্‌কাকে জানিয়ে দিলেন :

—দেখুন কমরেড, লালফৌজের দলে কাজ করবার উপযুক্ত আপনি নন। ম্যালেরিয়ায় আপনাকে একেবারে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। তার চেয়ে চিকিৎসা করান, নয়তো আরো খারাপ অবস্থা হবে। - আপনার মতো লোককে লালফৌজের প্রয়োজন নেই।

—তাহলে কেমন লোককে প্রয়োজন ? ডুবছর কাজ করলাম ফৌজে আর আজ আমাকে দরকার হচ্ছে না বুঝি ?

—আমাদের সবচেয়ে বড়ো চাহিদা স্বাস্থ্যবান মানুষ। ভালো হয়ে উঠুন, তারপর কাজে লাগবেন। এই ব্যবস্থাপত্র নিন, ওষুধের দোকানে কুইনিন পাবেন।

—হু, এবার বুঝতে পারলাম।—কশেভয় জামাটা গলিয়ে নিল ছটফটে ঘোড়ার গলায় বগলশ্ পরাবার মতো, গলার ভেতর মাথাটা তার ঢুকতেই চাচ্ছিল না। রাস্তায় নেমে পাতলুনের বোতাম আঁটতে আঁটতে ছুটল পার্টির আঞ্চলিক কমিটির দপ্তরের দিকে।

* * * *

কশেভয় তাতারস্কে ফিরে এল গ্রামের বিপ্লবী কমিটির সভাপতি হয়ে। বউকে তাড়াতাড়ি সম্ভাষণ জানিয়ে বললে:

—হ্যাঁ, এবার দেখবে মজাটা।

—তার মানে? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে দুনিয়া।

—মানে আগে যা বলেছিলাম তাই।

—কী বলেছিলে আবার?

—আমি সভাপতি হয়েছি। বুঝলে?

বিরক্ত হয়ে দুনিয়া হাতে তালি বাজায়। কী একটা মন্তব্য করতে যাচ্ছিল, কিন্তু মিশ্‌কা আর শোনার জন্য অপেক্ষা করল না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ফ্যাকাশে খাকি উর্দির ফিতেটা জায়গা-মতো বসিয়ে সে লম্বা লম্বা পা ফেলে সোজা চলল সোভিয়েত দপ্তরের দিকে।

শীতের সময় বিপ্লবী কমিটির সভাপতি হয়েছিল বুড়ো মিখিফ, এখনো সেই কাজেই বহাল রয়েছে সে। চোখে একটু কম দ্যাখে, কানে শুনতে পায় না। এত বড়ো দায়িত্বের কাজে হাঁপিয়ে উঠেছিল। কশেভয়ের কাছে যখন শুনল সে এবার রেহাই পাবে বড়ো আনন্দ হল তার।

—এই কাগজপত্র। এই পল্লী কমিটির শিলমোহর। এগুলো সব বুঝে নাও, যিশুর দোহাই!—নির্ভেজাল খুশিতে ক্রুশ প্রণাম করে হাত রগড়ে সে বলে: বয়েস তো সত্তরের কোঠায় হল, সারা জীবনেও কোনোদিন কোনো দপ্তরের কাজ করিনি, একেবারে বুড়ো বয়েসে ঘাড়ে এসে পড়ল এই কাজ।... এসব তোমাদের মতো ছেলেছোকরাদেরই সাজে, আমার দ্বারা কি কিছু হত? চোখে দেখি না ভালো কানে শুনি কম। আমার এখন হরিনাম করার দিন গো, তা-নয় সবাই মিলে ওরা আমায় সভাপতি করে দিল।

জেলা বিপ্লবী কমিটির আদেশ-নির্দেশগুলো তাড়াতাড়ি করে দেখে নিল মিশ্‌কা, তারপর জিজ্ঞেস করল

—সম্পাদক কোথায়?

—অ্যাঁ?

—মর গে যা। বলি সম্পাদক কোথায়?

—সম্পাদক? ও, সে তো রাই বুনছে গো। হপ্তায় খালি একবার করে আসে, বাজ পড়ুক বেটার মাথায়। মাঝে মাঝে জেলা থেকে চিঠিপত্র

আসে, সেগুলো পড়া দরকার, অথচ কুকুর লেলিয়েও ত্রিসীমানা থেকে খুঁজে পাওয়া যাবে না তাকে। তাই, দরকারী কাগজও অনেক সময় পড়ে থাকে দিনের পর দিন, পড়ে দেবার লোক নেই। কারণ আমি তো আবার লেখাপড়ায় গোমুখ্যু। কোনো রকমে শুধু নাম দস্তখত করতে পারি। পড়তে পারি না একদম। কাজের কাজ যা পারি সে হল শিলমোহর লাগানো·

কশেভয় ভুরু উঁচিয়ে দেখাছিল বিপ্লবী কমিটির আপিস ঘরের শ্রী—নোংরা দাগধরা দেয়াল, পুরনো একখানা ছাতাপড়া প্লাকার্ড ঝুলছে শুধু।

অপ্রত্যাশিতভাবে কাজ থেকে রেহাই পেয়ে এত খুশী হয়েছিল বুড়ো মিথিফ যে সাহস করে একটু রসিকতাও করে ফেলল। ন্যাকড়ায় জড়ানো শিলমোহরখানা কশেভয়কে দেবার সময় বললে

—পল্লীর সম্পত্তি বলতে যা কিছু তা হল এই। বুঝিয়ে দেবার মতো তহবিল কিছু নেই, আর আতামান মোড়লের চাপরাশেরও কোনো কদর নেই সোভিয়েত আমলে। তুমি যদি চাও আমার পুরনো লাঠিখানা দিতে পারি তোমায়।—ফোকলা হাসি হেসে বুড়ো তার অ্যাশ কাঠের লাঠিগাছ এগিয়ে দিল। লাঠির বাঁটটা ব্যবহারের ফলে বেশ চকচকে হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু তামাশার মেজাজ নেই মিশ্‌কার এখন। হতশ্রী অবহেলিত দপ্তর ঘরটার দিকে আরেকবার চোখ তুলে তাকিয়ে সে ভুরু কুঁচকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে·

—তোমার কাছ থেকে সব জিনিস আমি নিয়ে নিয়েছি। তার হিসেব আমরা বুঝে দেব দাদু। এখন সরে পড়ো তো এখান থেকে জলদি। চোখের ইশারায় ও সিধে দরজাটা দেখিয়ে দিলে।

তারপর টেবিলের ধারে দুই কনুই রেখে বসে রইল কশেভয় একা, অনেকক্ষণ। দাঁতে দাঁত চেপে নিচের চোয়ালটা সামনে ঠেলে দিয়ে। হা ভগবান, এতদিন ওর মাথায় যে কী শয়তানে ভর করেছিল। শুধু মাটি কুপিয়েছে আর এদিকে আশেপাশে যা ঘটে যাচ্ছে তা মাথা তুলেও দেখেনি বা শোনেনি। নিজের ওপর, সবকিছুর ওপর। যা রাগ হচ্ছে ওর তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। টেবিল ছেড়ে উঠে ও উর্দিটা ঠিক করে নিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বললে দূরের দিকে তাকিয়ে

—দাঁড়াও বাছাধনেরা, আমি দেখাচ্ছি সোভিয়েত সরকার কাকে বলে।

দরজা ভেজিয়ে শেকল তুলে দিয়ে ও এগোলো বাড়ির দিকে। গির্জার কাছে দেখা হল ছোকরা অবনিজফের সঙ্গে। অন্যমনস্কভাবে ওর দিকে নমস্কার করে কশেভয় এগিয়েই যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ কী খেয়াল হতেই ফিরে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে ডাকলে

—এই আন্দ্রিউশ্‌কা। একটু দাঁড়াও তো। তোমাকে আমার দরকার আছে।

কটা-চুল লাজুক ছেলেটি চুপটি করে এগিয়ে এল। মিশ্‌কা এমনভাবে হাতটা এগিয়ে দিল ওর দিকে যেন ও বয়স্ক একজন মানুষ।

—কোনদিকে যাচ্ছিলে? গাঁয়ের ওদিকটাতে? তাহলে বেড়াতে বেড়িয়েছ তাই বল? যাক, তোমাকে যা জিজ্ঞেস করছিলাম: তুমি তো ইশকুলের ছোট ক্লাশে পড়েছ, তাই না? পড়েছ। খুব ভাল। আপিস-টাপিসের কাজ কিছু জান?

কী ধরনের আপিসের কাজ?

—এই সামান্য কাজ। চিঠিপত্র দেখা, জবাব দেয়া, এইসব।

—খুলেই বলুন না, কমরেড কশেভয়।

—এই যে-সব কাগজপত্র আপিসে আসে আর কী। জানো ওসবের কাজ? কাগজপত্র বাইরে পাঠাতে হয় তারপর আরো সব নানা কাজ।—মিশকা আন্দাজে আঙুল নেড়ে ঘুরিয়ে শেষ অবধি ওর জবাবের অপেক্ষা না করে বলেই ফেলে, যদি না জানা থাকে, শিখে ফেলবে দুদিনে। আমি এখন গ্রামের বিপ্লবী কমিটির সভাপতি। আর তুমি শিক্ষিত ছেলে বলে তোমাকে আমি সম্পাদক করে নিলাম। বিপ্লবী কমিটির আপিসে চলে যাও, গিয়ে সবকিছু দেখে শুনে নাও, টেবিলের ওপর সমস্ত কিছু পড়ে রয়েছে। আর আমি শিগগিরই ফিরব। বুঝতে পেরেছো?

—কমরেড কশেভয়।

মিশকা হাত নেড়ে অধৈর্য ভাবে বললে

—পরে কথাবার্তা বলা যাবে এবিষয়ে। তুমি গিয়ে কর্তব্য কাজ বুঝে নাও।—ধীরে ধীরে মাপে মাপে পা ফেলে মিশ্‌কা রাস্তা ধরে এগোল।

বাড়িতে এসে নতুন পাতলুন পরে পকেটে পিস্তল গুঁজে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টুপিটা ঠিক করতে লাগল।

দুনিয়াকে জানিয়ে রাখল—আমি একটা দরকারী কাজে যাচ্ছি এক জায়গায়। কেউ যদি খোঁজ করে সভাপতি কোথায়, বলে দিও আমি শিগগিরই ফিরব।

সভাপতি হওয়া মানেই কতগুলো বাধ্যবাধকতার মধ্যে থাকা। মিশকা বেশ ধীরে ভারিক্কি চালে হাটে। ওর চলার ধরনটা এমনিই অস্বাভাবিক যে গাঁয়ের লোকেরা থেমে দাড়িয়ে হাসিমুখে ফিরে তাকায় ওর দিকে। রাস্তায় প্রোখর জাইকফের সঙ্গে দেখা হ'তে সে সসম্ভ্রমে সরে গিয়ে প্রায় বেড়ার ওপরে কাত হয়ে পড়ছিল আর কি।

—এসব আবার কেন হে মিখাইল? হপ্তার দিনে একেবারে ফুলবাবু সেজে কুচকাওয়াজে বেরিয়েছ? আবার বিয়ে সাদি করবে নাকি?

মিশ্‌কা অর্থপূর্ণভাবে ঠোঁট চেপে জবাব দেয়—সেই রকমই কিছু।

প্রমফের বাড়ির ফটকের কাছে এসে মিশ্‌কা তামাকের থলির জন্য নিজের

পকেট হাতড়ায়। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার চওড়া উঠোনটার দিকে, আশেপাশের ঘর আর জানালাগুলোর দিকে চোখ বুলিয়ে নেয়।

কিরিল গমফের মা তখন সিঁড়ি-দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসছিল। হাতে একটা থালায় গরুকে খাওয়াবার জন্য ফালি-করা লাউ। মিশ্‌কা সসম্ভ্রমে তাকে নমস্কার করে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

—কিরিল বাড়িতে আছে পিসিমা?

—হ্যাঁ আছে। সোজা চলে যাও ভেতরে।—একপাশে সরে গিয়ে বুড়ী জবাব দিলে।

অন্ধকার সিঁড়ি-দরজা। মিশ্‌কা আধো অন্ধকারে ছিটকিনির খোঁজে হাতড়ায়।

কিরিল নিজেই বসার ঘরের দরজাটা খুলে দিয়ে এক পা পেছিয়ে গেল। দাড়িগোঁপ পরিষ্কার করে কামানো, হাসি-হাসি মুখখানা। একটু বুঝি নেশাও করেছিল। মিশ্‌কার দিকে চকিত সন্ধানী চোখে একবার তাকিয়ে সহজ স্বরে বললে:

—এ যে আরেক সেপাই। এসো হে কশেভয়, বসো, আমাদের অতিথি হয়ে বোসো। এই একটু শরাব চলছিল, সামান্য একটু পান···

টেবিলের ধারে ঘিরে-বসা অতিথিদের দিকে চেয়ে বাড়ির মনিবের সঙ্গে করমর্দন করে মিশকা বললে—যেখানে অতিথিসেবা আছে সেখানে চর্বচোষ্যে সংকার না হলেও চলে!

ওর আবির্ভাবটা হয়েছে খুবই অসময়ে বুঝতে পারা যাচ্ছে। মিখাইলের অচেনা চওড়া কাঁধওয়ালা এক কসাক দূরের কোণে বসে গড়াচ্ছিল। কিরিলের দিকে ক্ষিপ্র প্রশ্নসূচক চাউনি দিয়ে সে গেলাসটা সরিয়ে রাখল। করশুনভদের এক দূরসম্পর্কের আত্মীয় সেমিওন আখ্‌ভাত্‌কিন বসেছিল উলটো দিকে। মিশ্‌কাকে দেখে সে ভুরু কুঁচকে চোখ সরিয়ে নিল।

কিরিল মিশক্‌কে বসতে অনুরোধ করে।

—অনুরোধের জন্য ধন্যবাদ।

—কিন্তু বোসো ভাই। দোষ নিও না। আমাদের সঙ্গে বসে একটু মদ-টদ খাও।

মিশ্‌কা টেবিলের ধারে বসে। ঘর চোলাই ভদকার গেলাসটা কর্তার হাত থেকে নিয়ে সে মাথা ঝুঁকিয়ে বলে:

—কিরিল ইভানোভিচ, তোমার ঘরে ফিরে আসা উপলক্ষ্যে এই সুরাপান করছি।

—ধন্যবাদ। তুমি কি অনেকদিন হল ফৌজ থেকে ফিরেছ?

—অনেকদিন। থিতু হয়ে বসার সময় পেয়েছি।

—থিতু হয়ে বসার, বিয়ে করারও সময় পেয়েছ নিশ্চয়। কিন্তু মুখটা অমন গোমড়া কেন? খেয়ে নাও ওইটুকু!

—না, আর দরকার নেই। তোমার সঙ্গে কিছু কাজের কথা ছিল।

—কিন্তু এ বাড়াবাড়ি হচ্ছে! না, ওসব চলবে না! আজ আমি কোনো কাজের কথার মধ্যে নেই! আজ কেবল বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে ফূর্তি। যদি কাজের ব্যাপারে এসে থাকো তবে কাল হবে।

মিশ্‌কা টেবিল ছেড়ে ওঠে। শান্তভাবে হেসে বলে—সামান্য একটা ব্যাপার, তবে সবুর করার সময় নেই। এক মিনিটের জন্য বাইরে এসো।

কিরিল এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে চুমরানো গোঁপে তা দেয়, তারপর উঠে দাঁড়ায়।

—এখানেই কথাটা সারলে হত না? কেন মিছে দল ভেঙে ওঠা?

মিশ্‌কা ধীরে অথচ জেদের স্বরে বলে—না, বাইরে চল।

সেই চওড়া কাঁধওয়ালা অপরিচিত কসাকটা বলে—যাও না ওর সঙ্গে বাইরে; অত তা-না-না করছ কেন?

কিরিল অনিচ্ছাভরে রান্নাঘরের দিকে পথ দেখিয়ে এগোয়। ওর বউ তখন উনোনের কাছে কাজে ব্যস্ত। কিরিল বিড়বিড় করে তাকে বলে—এখান থেকে যাও তো কাতেরিনা! তারপর বেঞ্চিতে বসে থপ্ করে প্রশ্ন করে মিশ্‌কাকে—হ্যাঁ, কাজের কথাটা কী?

—কতদিন হল ফিরেছ?

—কেন, কী ব্যাপার?

—জিজ্ঞেস করছি কতদিন হল ফিরেছ?

—আজ নিয়ে বোধহয় চারদিন হল।

—বিপ্লবী কমিটির দপ্তরে একবারও এসেছিলে?

—না, এখনও যাইনি।

—ভিয়েশেন্‌স্কার সামরিক কমিশনের কাছে যাবার কথা ভেবেছিলে একবারও?

—তোমার উদ্দেশ্যটা কী? যদি কাজের কথা থাকে তো তাই বল।

—আমি আমার কাজের কথাই বলছি।

—তাহলে চুলোয় যাও! তুমি কোন্ মহাত্মা এলে যে তোমার কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে?

—আমি বিপ্লবী কমিটির সভাপতি। তোমার রেজিমেণ্টের কাগজপত্র আমাকে দেখাও।

কিরিল টেনে-টেনে বললে—ও, তাই বলো তারপর মিশ্‌কার চোখের দিকে তীক্ষ্ণ, হঠাৎ-সম্বিত-পাওয়া দৃষ্টিতে তাকিয়ে মন্তব্য করলে—তোমার মতলবখানা তাহলে এই?

—হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ। কাগজপত্র দাও দেখি।

—আজ কাগজপত্র নিয়ে সোভিয়েত দপ্তরে আসব।

—এখুনি দেখাও।

—কোথায় যেন বেঁধে-ছেঁদে রেখেছি।

—তাহলে খুঁজে বের কর।

—না। এখন আর খুঁজব না। যাও মিখাইল, বাড়ি যাও। এখানে মিছিমিছি একটা দৃশ্য তৈরি নাই বা করলে।

—দৃশ্য খুব সংক্ষেপেই সারব তোমার সঙ্গে। মিশ্‌কা ডানহাতটা পকেটে ঢোকায়—নাও, কোটটা পরে নাও।

—এসব ছাড়ো দিকি, মিখাইল। আমার গায়ে হাত তুলতে যেও না ··

—বলছি এসো আমার সঙ্গে।

—কোথায়?

—বিপ্লবী কমিটির দপ্তরে।

—আমার তেমন ইচ্ছে নেই।—ফ্যাকাশে হয়ে গেছে কিরিল, তবু মুখে কৌতুকের হাসি এনে বলে।

বাঁ দিকে একটু ঝুঁকে, মিশ্‌কা পকেট থেকে পিস্তল বের করে উঁচিয়ে ধরে।

—আসবে কি আসবে না? নিচু গলায় প্রশ্ন করে মিশ্‌কা।

একটা কথাও না বলে কিরিল এগোচ্ছিল বড়ো ঘরের দিকে। কিন্তু মিশ্‌কা পথ আগলে দাঁড়াল। চোখ দিয়ে ইশারা করে বাইরের দরজা' দিকে দেখাল।

যেন তেমন কিছুই হয়নি এমনি ভান করে কিরিল উঁচু গলায় বললে—ভাইসব! আমাকে প্রায় গ্রেপ্তার করে রেখেছে এখানে। আমায় বাদ দিয়েই তোমরা ভদ্‌কাটা শেষ করে ফেল।

বড়োঘরের দরজাটা সটান খুলে গেল একেবারে. আখ্‌ভাতকিন চেষ্টা করছিল চৌকাঠ ডিঙিয়ে আসার। কিন্তু পিস্তল সামনে উঁচোনো দেখে সে ঝট্‌ করে দরজার আড়ালে সরে গেল।

মিশ্‌কা হুকুম করলে কিরিলকে—চলে এসো।

সদর্পে পা ফেলার ভঙ্গি করে কিরিল এগোলো দরজার দিকে, ধীরে ধীরে শেকলটা তুলেই আচম্‌কা একলাফে বাইরে ছুটে গিয়ে সদরের ফটকটা সশব্দে বন্ধ করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। সামনে নিচু হয়ে ঝুঁকে বাগানের দিকে ছুটে যাবার সময় মিশ্‌কা তাকে লক্ষ্য করে দু'বার গুলি ছুঁড়ল, কিন্তু আঘাত করতে পারল না। দু'পা দুদিকে অনেকখানি ফাঁক করে বাঁ হাতের বাঁকা কনুইটার ওপর পিস্তলের নল রেখে কশেভয় এবার সরাসরি লক্ষ্য স্থির করল। তৃতীয় গুলিটাতে কিরিল যেন একটু হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল, কিন্তু সামলে নিয়েই

চট্‌পট্‌ বেড়া ডিঙিয়ে গেল লাফ দিয়ে। মিশ্‌কা সিঁড়ি-বারান্দা থেকে নেমে ছুটল। পেছনের বাড়ি থেকে একটা রাইফেলের আওয়াজ এল। বুলেটের আঘাতে সামনে একটা চালাঘরের চুনকাম-করা দেয়াল থেকে সশব্দে কাদা খসে গেল আর পাথরের ধূসর টুকরো ছিটকে পড়ল মাটিতে।

কিরিল ছুটছিল তাড়াতাড়ি সাবলীল গতিতে। আপেলগাছের সবুজপাতার ফাঁক দিয়ে তার ঝুঁকে-পড়া মূর্তিটা একেক ঝলক দেখা যাচ্ছিল। মিশ্‌কাও লাফিয়ে বেড়া ডিঙোলো, কিন্তু পড়ে গেল। শুয়ে পড়েই দু'দুবার গুলি ছুঁড়ল পলাতককে লক্ষ্য করে, তারপর বাড়িটার দিকে মুখ ফেরাল। সদরের দরজা একেবারে খোলা। কিরিলের মা সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। চোখের ওপর হাতের আড়াল করা, বাগানের দিকে তাকিয়ে আছে। মিশ্‌কা মনে-মনে ভাবল, অতশত কথাবার্তা না বলে তখনই সোজা গুলি করলে হত! বেড়ার ধারে বেশ কমিনিট ওইভাবেই পড়ে থাকল সে বাড়িটার দিকে চেয়ে। তারপর ধীরে ধীরে যন্ত্রচালিতের মতো উঠে হাঁটুর ধুলো ঝাড়তে লাগল। অবশেষে উঠে দাঁড়িয়ে ধরে-ধরে বেড়া ডিঙিয়ে ফের বাড়িটার দিকেই এগোলো হাতের পিস্তলের নলচেটা মাটির দিকে ফিরিয়ে।

॥ পাঁচ ॥

গ্রমফের সঙ্গে সঙ্গে আথ্‌ভাংকিন আর সেই অপরিচিত আগন্তুকটিও পলায়ন করেছিল। রাতে আরো দুজন কসাক গ্রাম থেকে অদৃশ্য হল। ডন চেকার একটা ছোট দল তাতারস্ক থেকে ভিয়েশেনস্কায় এসেছিল। তারা কয়েকজন কসাককে গ্রেপ্তার করল। ফৌজ থেকে দলিলপত্র না নিয়েই পালিয়ে এসেছিল এমন চারজনকে ওরা ভিয়েশেনস্কায় পাঠালো পিটুনি ফৌজের কাছে।

কশেভয় সারাদিন বিপ্লবী কমিটির ঘরে বসেই কাটিয়ে দেয় আর বাড়ি ফেরে সন্ধ্যার মুখে। কার্তুজভরা রাইফেলটা সব সময় বিছানার পাশে থাকে। বালিশের নিচে পিস্তল রেখে কাপড়চোপড় না বদলেই শুয়ে পড়ে। কিরিলের সেই ঘটনার তিনদিন বাদে কশেভয় বললে দুনিয়াকে .

—আজ সিঁড়িবারান্দার ঘরে শোয়া যাক।

—সে কী গো? অবাক হয়ে বললে তুনিয়া।

—জানলা দিয়ে গুলি করতে পারে। বিছানাটা জানলার কাছেই।

একটি কথাও না বলে তুনিয়া বিছানা টেনে নিয়ে গেল সিঁড়িবারান্দায়। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় সে বললে :

—আচ্ছা আর কতদিন এমনিভাবে খরগোশের মতো পালিয়ে পালিয়ে থাকব? শীত এসে পড়ল, সিঁড়ির ধারেই খুপরি বেঁধে থাকতে হবে নাকি?

—শীতের এখনও দেরি আছে, এর মধ্যে এইভাবেই কাটাতে হবে।

—'এর মধ্যে' মানে কতদিন?

—যতদিন না কিরিলকে ধরতে পারি।

—ও কি তোমার ফাঁদে মাথা দেবার জন্য বসে আছে ভেবেছ?

—দেবেই একদিন।—কশেভয়ের জবাবে আত্মবিশ্বাস।

কিন্তু ভুল করেছিল কশেভয়। কিরিল গ্রমফ আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা ডনের ওপারে কোনো জায়গায় আত্মগোপন করে। শ্বেতরক্ষীদের কমাণ্ডার মাখনো জেলার কাছাকাছি এসেছে শুনে ওরা ডন নদী পেরিয়ে ক্রাসনোকুৎস্ক গ্রামে হাজির হয়, মাখনোর দলের কিছু সিপাই নাকি সেখানে আগেই এসে পড়েছিল। তাতারস্কে রাত কাটিয়ে পালাবার মুখে প্রোখর জাইখফের সঙ্গে কিরিলের রাস্তায় দেখা হয়। কিরিল তাকে বলে যেন সে কশেভয়কে জানিয়ে দেয় যে শিগগিরই সে ফিরে আসবে মিশ্‌কার সঙ্গে দেখা করতে। পরদিন সকালে প্রোখর মিশ্‌কাকে জানালো কিরিলের সঙ্গে ওর দেখা হওয়ার কথা।

প্রোখরের কথা শুনে মিশ্‌কা বললে, ভাল কথা। আসুক ফিরে। একবার উদ্ধার পেয়ে গেছে বটে, কিন্তু এবার আর পালাতে হবে না। ওর মতো লোকের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয় তা ও-ই আমাকে শিখিয়েছে। সেজন্য ওকে ধন্যবাদ।

* *

মাখনো আর তার দলবল সত্যি-সত্যিই উজানি ডন এলাকায় হাজির হয়েছিল। ভিয়েশেনস্কা থেকে একটা পদাতিক ফৌজ পাঠান হয়েছিল ওদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে। কনকফের কাছে একটা ছোট্ট লড়াইয়ে সে-ফৌজ বিধ্বস্ত হল। তাই বলে এলাকার কেন্দ্রের দিকে এগোল না মাখনো, সে চলল মিলেরোভো স্টেশনের দিকে। স্টেশনের উত্তর দিকে রেললাইন পেরিয়ে স্তারোবেলস্কের দিকে পেছু হটে গেল। কসাকদের মধ্যে সবচেয়ে সক্রিয় অংশটা মাখনোর দলে ভিড়েছিল। কিন্তু অধিকাংশ কসাকই ঘরে থেকে গেল কি ঘটে তাই দেখবার জন্য।

কশেভয় কান খাড়া রাখে, গ্রামের সব ঘটনা খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করে। কিন্তু তাতারস্কের জীবনযাত্রা মোটেই সুখের নয়। অভাব-অভিযোগের ব্যাপার নিয়ে আজকাল কসাকরা সোভিয়েত সরকারকে প্রাণ খুলে গালাগাল দেয়। স্থানীয় সমবায় সমিতি সম্প্রতি যে ছোট দোকানটা খুলেছিল সেখানে প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না। সাবান, চিনি, নুন, পারাফিন্, দেশলাই, তামাক, গাড়ির চাকার তেল এইসব অতি দরকারী জিনিস একেবারেই দুষ্প্রাপ্য। খালি তাকের উপর দামী সিগারেটের প্যাকেট আর লোহার জিনিসপত্র সাজানো, মাসের পর মাস সেগুলো অবিক্রীতই পড়ে থাকে।

গলা মাখন আর চর্বি ব্যবহার করে গ্রামবাসীরা। কলের তামাকের বদলে ঘরে-তৈরি তামাক চালু হয়। দেশলাই-এর অভাব পূরণ করে কামারের হাতে-গড়া চকমকি আর লাইটার। সূর্যমুখীর ছাই আর জল মিশিয়ে তাতে কাঠকয়লা ভিজানো হয় যাতে তাড়াতাড়ি আগুন ধরে। কিন্তু এত করেও আগুন পাওয়া শক্ত। বিপ্লবী কমিটির দপ্তর থেকে সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পথে মিশ্‌কা অনেক বারই দেখেছে কোনো এক জায়গায় হয়তো জটলা করে বসে তামাকখোরেরা প্রাণপণে চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করছে আর চাপা গলায় অভিশাপ দিচ্ছে : হে সোভিয়েত রাজ, আমাদের আলো দাও। অবশেষে হয়তো ওদের একজন অতিকষ্টে এক ফুলকি আগুন দিয়ে কাঠকয়লা ধরায়। একটু আঁচ উঠতেই সবাই মিলে প্রবল উৎসাহে ফুঁ দিতে থাকে সেই ক্ষীণ শিখাটির উপর। সিগারেট ধরিয়ে ওরা চুপচাপ হাঁটু মুড়ে বসে দেশের খবরাখবর শোনে। সিগারেট পাকাবার কাগজও পাওয়া দুষ্কর। এক এক করে গির্জা ঘরের চাঁদার খাতাগুলো বেবাক উজাড় হয়ে গেল। সেগুলো শেষ হয়ে যাবার পর কসাকরা নিজেদের ঘরের কাগজপত্র ছিঁড়ে সিগারেট বানাতে লাগল—ছেলেদের পুরোনো পাঠশালার পুঁথি আর বুড়োদের ধর্মশাস্ত্রের পাতা দিয়ে।

মেলেখফদের বাড়িতে নিয়মিত যাওয়া আসা করত প্রোখর জাইথফ। মিখাইলের কাছে যত কাগজ পাওয়া যায় সব নেবার পর সে দুঃখ করে বললে আমার গিন্নির পৈতৃক সিন্দুকের ডালায় পুরনো খবরের কাগজ সাঁটা ছিল। আমি সেগুলো ছিঁড়ে নিয়ে সিগারেট পাকিয়েছি। একখানা বাইবেলের 'নতুন নিয়ম' ছিল ঘরে—ধম্মের কেতাব মনে করো।—সেও তামাক খেয়ে পুড়িয়েছি। তারপর খেয়েছি বাইবেলের 'পুরাতন নিয়ম।' সেকালের সাধুরা তো এর চেয়ে বেশী লিখে যেতে পারেননি। আমার গিন্নির কাছে ছিল তার পরিবারের ঠিকুজি; মৃত জীবিত সব রকম আত্মীয়ের নাম তাতে লেখা। সে বইও আমি ধোঁয়া করে উড়িয়ে দিয়েছি। এখন কি করি, শেষটায় কি বাঁধাকপির পাতা ব্যবহার করব কাগজের বদলে?

না, মিখাইল, তোমার যা খুশী বলো, কিন্তু একখানা খবরের কাগজ দয়া করে দাও। সিগারেট না খেলে বাঁচব না। যখন জার্মান যুদ্ধে ছিলাম এক চিম্‌টি তামাকেব জন্য আমার রুটিব বরাদ্দ বিলিযে দিয়েছি।

সে-বছর শরৎকালে তাতারস্কের জীবনযাত্রা মোটেই সুবিধার হযনি। গাডির চাকায় তেল পডেনি বলে চলার সময সেগুলো কর্কশ আওযাজ তোলে। চর্বির অভাবে চামডার জুতো আব ঘোডাব সাজ শুকিযে কুঁচকে যায। কিন্তু সবচেয়ে প্রকট হযে দেখা দিল লবণের অভাব। মিখাইলকে তিতিবিরক্ত করে তুললো এই হতচ্ছাডা লবণ। একদিন একদল বুডো এল সোভিযেত দপ্তরে। গম্ভীব ভাবে সভাপতিকে নমস্কার কবে টুপি খুলে ওরা বেঞ্চি দখল কবে বসল।

ওদের একজন বললে—সভাপতি মশাই, গাঁয়ে তো এক চিম্‌টি নুন নেই।

—এখন আর মশাই-টশাই নেই। মিশ্‌কা তাকে শুধরে দিলে।

—মাপ করুন, ওটা অভ্যাসের দোষে হয়ে যায। তা মশাই-টশাই না হলেও চলতে পারে, কিন্তু নুন না হলে যে আর চলে না।

—বেশ, আপনাবা কি চান বলুন।

—গাঁয়ে নুন নিযে আসবাব কিছু ব্যবস্থা আপনাকে করতেই হবে। গরুর গাডিতে করে মানিচ্ থেকে এতটা পথ আনা সম্ভব নয়।

—ব্যাপারটা আঞ্চলিক কমিটিকে জানিয়েছি। তারা সব খবরই রাখে। শিগ্‌গিরই কিছু লবণ তারা নিশ্চযই পাঠাবে।

—সাত মণ তেলও পুডেছে আব রাধাও নেচেছে।—মেঝেব দিকে তাকিযে এক বুডো মন্তব্য করলে।

মিশ্‌কা ক্ষেপে গিয়ে টেবিল ছেডে উঠে দাঁডায। রেগে মুখ কালো কবে সে নিজের পকেট উল্টে দেখায

—আমার কাছে কোন লবণ নেই। দেখতেই পাচ্ছেন—লবণ কি আমি সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেডাই? নাকি আপনাদের জন্য পয়দা করতে পারি? বুঝতে পেরেছেন কর্তারা?

কুঁজো বুডো চুমাকফ এক মুহূত চুপ করে থেকে প্রশ্ন করলে—আচ্ছা, এই লবণ গেল কোন্ জাহান্নমে? অবাক হয়ে চারদিকটা এক চোখে চেয়ে নিয়ে ফের বললে—আগের দিনের সাবেক গবরমেণ্টর আমলে কাউকে লবণের কথা বলতে হত না সব জায়গায রাশি রাশি পডে থাকত, কিন্তু এখন চেষ্টা করেও এক চিম্‌টি নুন খুঁজে বার কর দেখি।

মিশ্‌কা এবার নরম হয়ে বলে এ ব্যাপারে আমাদের সরকারের কোন হাতই নেই। এর জন্য যদি কাউকে দোষ দিতে হয় সে হল আপনাদের পুরনো

ক্যাডেট সরকার। তারা এমন ভাবেই সব নষ্ট করে দিয়ে গেছে যে লবণ বয়ে নিয়ে যাবার গাড়িটা পর্যন্ত পাওয়া যায় না। সমস্ত রেললাইন, এমনকি ট্রাকগুলো পর্যন্ত ধ্বংস করে গেছে।

তারপর সে অনেকক্ষণ ধরে বুড়োদের বোঝাল কেমন করে শ্বেতরক্ষীরা পশ্চাদপসরণের সময় রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ধ্বংস করে গেছে, কারখানা উড়িয়েছে, গুদামঘরগুলো পুড়িয়ে দিয়েছে।

লড়াইয়ের সময় মিশ্‌কা নিজের চোখেই দেখেছিলো কিছু কিছু। শুনেছিলো আরো অনেক। বাকিটুকু সে কল্পনায় সৃষ্টি করল—যার একমাত্র উদ্দেশ্য সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভটাকে ঘুরিয়ে দেওয়া। গালাগালের হাত থেকে গবরমেণ্টকে বাঁচাবার জন্য সে একধার থেকে মিথ্যে কথা বলে আর ধাপ্পা দিয়ে চলল আর সেই সঙ্গে ভাবতে লাগল এই শুয়োরগুলোর মুণ্ডু যদি ঘুরিয়ে দিতে পারি বাজে কথা বলে, তাতে এমন কি ক্ষতি? এমনিতেই ওরা শুয়োরের দল, এতে ওদের লোকসান কিছুই নেই, বরং আমাদেরই লাভ।

—তোমরা কি মনে কর বুর্জোয়াদের মাথায় ঘিলু নেই। তারা বোকা নয়। সমস্ত চিনি আর লবণ ওরা সারা রাশিয়া থেকে মজুত করেছিল হাজার হাজার মণ। ক্রিমিয়াতে পাচার করে তারা সেগুলো জাহাজে বোঝাই করেছে, অন্য দেশে পাঠিয়েছে বিক্রি করতে।—বলতে বলতে চক চক করে উঠল মিশ্‌কার চোখ।

কুঁজো চুমাকফ্ অবিশ্বাসের সুরে বলে, গাড়ির চাকার তেলও কি ওরা পাচার করেছে নাকি?

—সেগুলো ওরা পিছনে ফেলে রেখে যাবে আপনি তাই ভেবেছিলেন দাদু। আপনাদের জন্য কিংবা কোনো মেহনতী মানুষের জন্য ভাবতে ওদের বয়ে গেছে। ওরা এমন কি ঐ তেল বেচার লোকও খুঁজে নেবে। সম্ভব হলে ওরা সবই পাচার করত যাতে এখানকার মানুষ না খেয়ে মরে।

বুড়োদের একজন সায় দিলে—তা যা বলেছ। ধনীরা সবাই ঐ রকম, শেষ দানাটি অবধি ওদের চাই। যত ধনী হবে তত বেশী লোভী—মান্ধাতার আমল থেকে চলে এসেছে এই বিধান। ভিয়েশেনস্কার এক এক ব্যবসায়ী প্রথমবার পালিয়ে যাবার সময় তার যথাসর্বস্ব গাড়িতে তুলেছিল। তুলোর শেষ বাণ্ডিলটাও অবধি নিয়ে পালাচ্ছিল। এদিকে লালফৌজ তখন খুব কাছে এসেছে, কিন্তু সে তখনও গাড়ি নিয়ে বেরুবার জন্য তৈরি হয়নি। ভেড়ার চামড়ার কোট পরে দৌড়াদৌড়ি করছিল আর সাঁড়াশি দিয়ে দেয়ালের পেরেক তুলছিল। ঐ হতভাগাদের জন্য একটি পেরেকও আমি রেখে যাব না।—এই কথা ভাবছিল সে। তাহলেই ভেবে দেখ ওরা যদি সঙ্গে করে গাড়ির চাকার তেল নিয়ে গিয়ে থাকে তা হলে অবাক হবার কিছু নেই।

আলোচনার শেষ দিকে বুড়ো মাকসায়েফ জিজ্ঞেস করলো—সবই তো বুঝলাম কিন্তু লবণ ছাড়া আমাদের চলে কি করে ?

সাবধানে জবাব দিলে মিশ্‌কা—আমাদের মজুররা শিগ্‌গিরই আরও লবণ তুলবে, এই অবসরে আপনারা মানিচে গাড়ি পাঠাতে পারেন।

—আমাদের লোকজন সেখানে যেতে চায় না। কালমিকরা আমাদের জ্বালাতন করে, হ্রদ থেকে লবণ তুলতে দেয় না, গরু-বলদ চুরি করে। আমার এক পরিচিত লোক কেবল তার চাবুকটা সম্বল করে পালিয়ে এসেছে। এক রাতে তিনজন সশস্ত্র কালমিক ঘোড়ায় চেপে এসেছিল। তারা বলদগুলো নিয়ে পালায়। বলে, ভাল চাস তো মুখ বুজে থাক্, নয়ত দিন ঘনিয়ে আসবে তোদের। আর সেইখানে তুমি যেতে বলছ আমাদের।

চুমাকফ নিশ্বাস ফেলে বলে—আরও ক'দিন সবুর করতে হবে আমাদের।

বুড়োদেব সঙ্গে যাও বা একটা বফা করতে পারল মিশ্‌কা, বাড়িতে এসে ডুনিয়ার সঙ্গে এই লবণ নিয়ে এক তুমুল বিতণ্ডা। মোটের উপব বউয়ের সঙ্গে মিশ্‌কার সম্পর্কটা বড ভাল যাচ্ছিল না। প্রোথরের সামনে গ্রিগরকে নিয়ে যে আলোচনা হয় সেই স্মরণীয় দিন থেকেই ব্যাপারটার শুরু।

সেদিনের সেই কথা কাটাকাটি কেউই ভোলেনি। একদিন রাতে খেতে বসে মিশ্‌কা বললে .

—গিন্নি, তোমার ঝোলে নুন হয়নি। লবণ কি কম পড়েছে, না আড়ালে সরিয়ে রেখেছ ?

—এ গবরমেণ্টের আমলে কিছুদিনের মধ্যে আব নুন-টুন খাওয়া চলবে না। জান কতটা লবণ ঘরে আছে ?

—কতটা ?

—দুমুঠো।

—তা হলে তো অবস্থা খারাপ। মিশ্‌কা নিশ্বাস ফেলে।

—আর সবাই গরম কালে মানিচে গেল লবণ আনতে কিন্তু তোমার আর তা নিয়ে ভাববার ফুরসতই হলো না। তিরস্কার করে ডুনিয়া।

—যাব যে তার গাড়ি কোথায় ? অবশ্য আমাদের বিয়ের প্রথম বছরটায় তোমাকে গাড়িতে যুতলে ঠিক হত না, আর যদি সত্যিকারের বলদের কথা বল ···

—তোমার রসিকতা এখন রাখ দেখি। আলুনি খাবার খেতে বসে ইয়ারকিও করতে পার।

—তা আমাকে নিয়ে পডলে কেন ? কোথায় লবণ পাব বল। তোমরা মেয়েমানুষরা যে কী জাত! 'চুরি করে হোক ডাকাতি করে হোক লবণ জোগাড় করে আন!' কিন্তু ধর যদি লবণ না থাকে তাহলে ?

—আর সবাই বলদ গাড়ি নিয়ে মানিচে গিয়েছিল। এখন তারা লবণ পেয়েছে, সবই পেয়েছে, আমরা শুধু বসে জাবর কাটছি ...।

—সবই ঠিক হয়ে যাবে তুনিয়া। ওরা নিশ্চয় খুব শিগ্‌গিরই লবণ পাঠাবে। আমাদের কি ও জিনিস খুবই বাড়ন্ত?

—হ্যাঁ, জিনিস তো সবই তোমাদের অচেল।

—'তোমাদের' মানে?

—মানে লালফৌজের আর কি।

—তুমি তাহলে কী?

—আমি যা দেখছ তাই। তোমরা তো সব কথার ঝুড়ি 'দেশ নাকি চাল ডালে ভরে যাবে, আমরা সবাই এক সমান হয়ে মহা সুখে থাকব...' এই কি তোমাদের সুখে থাকা? তরকারিতে নুন অবধি জোটে না?

মিশ্‌কা শঙ্কিত ভাবে স্ত্রীর দিকে চেয়ে থাকে। ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

—এসব কী তুনিয়া? কী বলছ তুমি? অমন কথা বল কি করে?

কিন্তু তুনিয়া আজ ক্ষেপে গেছে। সেও রাগে অভিমানে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। গলা চড়িয়ে বলতে লাগল

—এ ভাবে আমরা বাঁচব কি করে বল? অমন হাঁ করে চেয়ে দেখছ কি। জান সভাপতি মশায়, এর মধ্যেই নুনের অভাবে লোকের মাড়ি ফুলতে শুরু করেছে। লোনা জলের বিল থেকে মাটি খুঁড়ে আনছে। একেবারে সেই নেচাএফ পাহাড় অবধি যাচ্ছে। এই মাটি তারা তরকারিতে মিশিয়ে খাচ্ছে

এমন কথা শুনেছ কখনো?

—সবুর অত চেঁচিও না আচ্ছা, তারপর?

—তুনিয়া হাতে তালি বাজিয়ে বলে এর পরেও কী চাও?

—এই ভাবেই আমাদের আপাতত চালিয়ে যেতে হবে, তাই না?

—বেশ, তুমিই চালিয়ে নাও।

—আমি ঠিকই চালিয়ে নিচ্ছি, কেবল তুমিই তোমাদের মেলেখফ পরিবারের চরিত্রটা এবার বেশ ফুটে বেরুচ্ছে।

—কী চরিত্র শুনি?

—তোমাদের প্রতি-বিপ্লবী চরিত্র, এই আর কি। ভারী গলায় কথাটা বলে মিশ্‌কা টেবিল ছেড়ে উঠে দাড়ায়। মেঝের দিকে চেয়ে থাকে, চোখ তুলে তাকায় না স্ত্রীর দিকে। বলে

—ও ভাবে যদি ফের কথা বল তাহলে আমাদের আর একসঙ্গে থাকা চলবে না, সেকথা জেনে রেখ। তোমার কথাগুলো দুশমনের মতো শোনাচ্ছে...।—কথাগুলো বলবার সময় ওর ঠোঁট কাঁপে।

তুনিয়া কী যেন আপত্তি জানাতে যাচ্ছিল কিন্তু মিশ্‌কা আড় চোখে ওর দিকে তাকিয়ে হাতের মুঠি উঁচিয়ে দেখায়। খসখসে গলায় বলে—মুখ সামলে।

দুনিয়া ওর দিকে তাকিয়ে থাকে নির্ভয়ে। নির্ভেজাল কৌতূহল ওর চোখে, এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে শান্ত আর খুশী গলায় বলে :

—যাক্‌গে, কি এক বাজে ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া শুরু করেছি আমরা।··· নুন ছাড়াই চালিয়ে নেব।—এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে অবশেষে মিশ্‌কার প্রিয় সেই মিষ্টি হাসিটুকু হেসে বলে: রাগ করো না মিশা। যদি আমাদের মেয়েমানুষদের সামান্য কথায় এত চটো, তাহলে যে :তোমার চটারই শেষ হবে না কোনো দিন। মুখ্‌খু-সুখ্‌খু মানুষের কাছে আর কী আশা করো? একটু ঝোল দেব, নাকি একটু দই এনে দেব?

দুনিয়ার বয়স কম হলেও ওর সাংসারিক বুদ্ধি এর মধ্যে যথেষ্ট পেকে উঠেছিল। ও জানত তর্কের সময় কখনো একগুঁয়ে হতে হয়, আব কখনো প্রয়োজন হয় আপোস করে পিছু হটার।

* * + * *

হপ্তা-দুয়েক বাদে গ্রিগরের কাছ থেকে চিঠি আসে। লিখেছে ব্যাঙ্গেল রণাঙ্গনে সে আহত হয়েছিল, তারপর সেরে উঠে খুব সম্ভব ফৌজ থেকে ছাড়া পাবে। চিঠির বক্তব্য পড়ে শোনায় দুনিয়া। সাবধানে জিজ্ঞেস করে—মিশা, গ্রিগর বাড়ি ফিরে এলে আমরা কী ব্যবস্থা করব?

—নিজেদের ডেরায় গিয়ে উঠব। ও এখানে একাই থাকতে পারবে। সম্পত্তি আমবা ভাগ করে নেব।

—একসঙ্গে থাকা আমাদের নিশ্চয় চলবে না। ভাব-সাব দেখে মনে হয় আকসিনিয়াকে এখানে নিয়ে আসবে।

—একসঙ্গে থাকা যদি বা সম্ভব হত তবু তোমাব ভাইয়ের সঙ্গে এ বাড়িতে থাকা আমার চলবে না।—মিশ্‌কা সিধে জানিয়ে দিলে।

—অবাক হয়ে ভুরু তুলে দুনিয়া বলল

—কেন পারবে না মিশ্‌কা?

—সে তুমি ভাল করেই জান।

—শ্বেতরক্ষীদের চাকরি করেছিল বলে?

—ঠিক ধরেছ!

—তুমি ওকে দু'চক্ষে দেখতে পার না। অথচ এক সময় তোমাদের দুজনের মধ্যে কত ভাব ছিল।

—ওকে এত খাতির করার কী কারণ আছে আমার? এক সময়ে আমরা বন্ধু ছিলাম বটে কিন্তু অনেকদিন আগেই সে বন্ধুত্বের শেষ হয়ে গেছে।

দুনিয়া বসেছিল চরকা নিয়ে। ঘর্‌ ঘর্‌ করে চাকা ঘুরছিল একটানা। হঠাৎ সুতো ছিঁড়ে গেল। হাতের তেলোয় চাকার ধারটা চেপে ধরে

সুতোর দুই প্রান্ত একসঙ্গে গিঁট দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল স্বামীর দিকে না তাকিয়ে :

—কসাকদের কাছে চাকরি করেছিল বলে তার ফিরে আসার পর সেই ব্যাপার নিয়ে কি কিছু ঘটবে ?

—বিচার হবে। আদালতের বিচার।

—কিন্তু তার শাস্তি কী হতে পারে ?

—সে তো আমার জানার কথা নয়। আমি বিচারক নই।

—ওকে কি গুলি করে মারতে পারে ?

বিছানায় মিশাৎকা আর পলিউশ্‌কা ঘুমিয়ে ছিল, মিশ্‌কা ওদের দিকে চেয়ে ওদের একটানা নিশ্বাসের শব্দ শুনতে শুনতে নিচু গলায় জবাব দিলে —সেটা অসম্ভব নয়।

আর কোন প্রশ্ন করে না দুনিয়া। পরদিন সকালে গরু দোয়ানোর পর দুনিয়া যায় আকসিনিয়ার কাছে।

—গ্রিশা ফিরে আসছে শিগ্‌গিরই। তাই তোমাকে খবরটা দিয়ে খুশী করতে এলাম।

আকসিনিয়া নীরবে উনুনে এক কেৎলি জল চাপিয়ে হাত দুটো বুকের কাছে রাখে। ওর উজ্জ্বল মুখখানার দিকে তাকিয়ে দুনিয়া বলে :

—অত বেশী খুশী হয়ে উঠো না। আমার কর্তা বলছে আদালতের হাত থেকে রেহাই সে পাবে না। কী শাস্তি তারা দেবে তা ভগবানই জানেন।

আকসিনিয়াব সজল আর উজ্জ্বল চোখ দুটোয় মুহূর্তেকের জন্য ফুটে ওঠে ভীতির চিহ্ন।

ঠোঁটের কোণে অনেক দেরি করে ফুটে ওঠা হাসিটাকে তখনও ঠেলে সরাতে পারেনি আকসিনিয়া। কাঁপা গলায় বলে—কেন ?

—বিদ্রোহ করেছিল বলে তা ছাড়া আরও অনেক কিছু।

—বাজে কথা : ওর বিচার হতে পারে না। তোমার মিখাইল এ সম্বন্ধে কিছুই জানে না। একেবারে সবজান্তা তো সে একজন !

—বিচার হয়তো ওরা করবে না।—খানিক চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে দুনিয়া বললে, ও তো আমার ভাইয়ের ওপর দারুণ খাপ্পা। ব্যাপারটা আমার এমন খারাপ লাগে যে তোমায় বলে বোঝাতে পারব না ! গ্রিগরের জন্য আমার দারুণ দুঃখ হয়। আবার ও জখম হয়েছে। জীবনটাই ওর কেমন যেন খাপছাড়া হয়ে গেল।

—ফিরে তো আসুক আগে ! ছেলেপিলেগুলোকে আমরা কোথাও লুকিয়ে রাখব।—আকসিনিয়া বললে উত্তেজিত স্বরে।

কোনো কারণে মাথার ওপর থেকে ওড়নাটা সে সরিয়ে নিয়েছিল, ফের

সেটা বেঁধে নিয়ে বেঞ্চির ওপর থালা-বাসনগুলো সরাতে লাগল উদ্দেশ্যহীন ভাবে। প্রচণ্ড উত্তেজনার ভাবটাকে কিছুতেই সে দমাতে পারছিল না। বেঞ্চিতে বসে ও যখন হাঁটুর ওপর পুরোনো ছেঁড়া আঙ্রাখার ভাঁজগুলো সোজা করছিল তখন দুনিয়া লক্ষ্য করলে ওর হাতজোড়া কেমন থর্‌থর্ করে কাঁপছে।

দুনিয়ার গলার ভেতরটায় কি যেন একটা ঠেলে উঠছে। ওর ইচ্ছে হচ্ছিল কোথাও গিয়ে খুব যেন কাঁদে একা একা।

নিচু গলায় বললে—মা বেঁচে থেকে ওর ফিরে আসাটা দেখতে পেল না।...যাক আমি চলি। উনোনে আঁচ দিতে হবে।

সিঁড়ি-দরজা অবধি এসে আকসিনিয়া আচম্‌কা হড়বড় করে ওর গালে চুমু খেয়ে বসলো। তারপর ওর হাতখানা চেপে ধরে চুমু খেলো আবার:

দুনিয়া ভাঙা নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল—খুশী হয়েছো তুমি?

কাঁপা হাসির আড়ালে চোখের জল ঢেকে তামাসা করবার চেষ্টা করলে আকসিনিয়া—হ্যাঁ, তা একটু হয়েছি, অল্প একটুখানি।

॥ ছয় ॥

মিলেরোভো স্টেশনে এসে ফৌজ থেকে ছাড়া-পাওয়া লাল ফৌজী কমাণ্ডার হিসাবে গ্রিগরের হেফাজতে এল একখানা গাড়ি আর ঘোড়া। বাড়ি ফেরার পথে প্রত্যেকটা উক্রেইনীয় পল্লীতে গ্রিগর ঘোড়া বদল করতে করতে এল। যেদিন রওনা হয়েছিল সেদিনই উজানী ডন এলাকার সীমানায় এসে হাজির হল সে। কিন্তু একেবারে প্রথম যে কসাক গ্রামটিতে ও ঢুকল সেখানকার বিপ্লবী কমিটির সভাপতি লালফৌজ-ফেরত এক ছোকরা তাকে বললে:

—কমরেড কমাণ্ডার, আপনাকে এবারে যে বলদ জোগাড় করে নিতে হচ্ছে! গোটা গাঁয়ে আমাদের একটিমাত্র ঘোড়া সম্বল, সেটিও আবার তিন পায়ে খুঁড়িয়ে চলে। পিছু হটে আসার সময় সব ঘোড়া ফেলে আসা হয়েছিল কুবানে!

রসিক সভাপতির খুশীভরা চোখ দুটোর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে টেবিলের ওপর আঙুল বাজাতে বাজাতে গ্রিগর বললে—হয়ত ওই ঘোড়াতেই আমার চলে যাবে?

—জীবনেও ঘরে পৌঁছুতে পারবেন না। হপ্তাভর চালিয়েও নয়। যাক ঘাবড়াবার কিছু নেই। ভাল ভাল দুটো বলদ আছে, তাড়াতাড়ি চলতে পারবে। তা ছাড়া এমনিতেও একটা গাড়ি পাঠাতে হবে ভিয়েশেন্‌স্কায়। লড়াইয়ের পর কতগুলো টেলিফোনের তার এখানে জমে গিয়েছিল সেগুলো পাঠানো দরকার। তাই গাড়িখানা আপনাকে বদলাতে হচ্ছে না, একেবারে নিজের বাড়ির দোর গোড়া অবধি যেতে পারবেন।—চেয়ারম্যানটি এর পর বাঁ-চোখ মটকে একটু হেসে বললে: আমাদের সেরা বলদজোড়া পাচ্ছেন আর সেই সঙ্গে একটি জোয়ান বিধবা, গাড়োয়ানের কাজ করবে। আমাদের এ তল্লাটে একজন আছে, একেবারে চোঁক-চোঁক করছে, এমন মুখিয়ে আছে যে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। এর সঙ্গে পথ চললে আপনার বাড়িই নজর ফসকে যাবে। আমি নিজেও তো ফৌজে কাজ করেছি, সেপাইদের সব রকম চাহিদা জানা আছে আমার…।

গ্রিগর মনে মনে হিসেব করে দেখলে, আবার কবে ঘরমুখো কোন গাড়ি পাবে তার জন্য অপেক্ষা করে লাভ হবে না, পায়ে হেঁটে অতোখানি পথ যাওয়াও কঠিন। তাই বরং রাজী হয়ে যাওয়া মন্দ নয় এ-প্রস্তাবে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এসে হাজির হল গাড়ি। পুরনো জিনিস। চাকাগুলো করুণভাবে আর্তনাদ করছে। পেছনের কাঠামোটা ভেঙে একটেরে হয়ে গেছে। এলোমেলো বোঝাই-করা খড়ের গোছ এদিক-ওদিক থেকে ঠেলে বেরিয়ে আছে। লক্কড় জিনিসটার দিকে তাকিয়ে গ্রিগর ভাবলে—এই তো, একেই বলে যুদ্ধ! বলদদুটোর পাশে লম্বা-লম্বা পা ফেলে হাতের চাবুক নাচাতে নাচাতে আসছিল মেয়ে গাড়োয়ানটি। নিঃসন্দেহই সুন্দরী বলা চলে, সুগঠনও বটে। দেহের উচ্চতার তুলনায় বেমানান বুকমের বড়ো স্তনদুটো খানিকটা গড়ন খারাপ করে দিয়েছে। গোল চিবুকের ওপরকার টেরচা দাগটা যেন মুখের মধ্যে একটা দূষিত অভিজ্ঞতার চিহ্ন; লাল্‌চে মুখমণ্ডলে সেটা বয়েসের ছাপও ফেলেছে বলে মনে হয়। নাকের আশেপাশে সোনালি ছিটেফোঁটা পড়েছে জনাবের বিচির মতো। মাথার ওড়নাটা গুছিয়ে মেয়েটি চোখ কুঁচকে গ্রিগরকে এক-নজর দেখে নিয়ে বললে:

—আপনাকেই নিতে হবে বুঝি আমার গাড়িতে?

গ্রিগর সিঁড়ি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে জোব্বাকোটখানা গায়ে চড়ালে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তারগুলো গাড়িতে তোলা হয়েছে?

—ওই হতচ্ছাড়া চিজ্ বুঝি গাড়িতে তুলতে হবে?—কাঁই কাঁই করে উঠল মেয়েটা—রোজ আমাকে বলবে কোথাও না কোথাও যেতে, আর

ওদের যত কাজ করিয়ে নেবে। আমাকে ওরা কী পেয়েছে? তার-ফার ওরাই বোঝাই করুক। আর না করে তো আমি খালি-গাড়িই চালিয়ে নিয়ে যাব, ব্যস্।

তবু সে তারের বাণ্ডিলগুলো টেনে নিয়ে গাড়িতে তোলে। সেই সঙ্গে শ্রাদ্ধ করে সভাপতির—চেঁচায় তবে তেমন ঝাঁজ নেই তাতে, আর কেবলি আড়চোখে গ্রিগরকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। সভাপতি সমানে হাসে আর তারিফের চোখে তাকিয়ে থাকে জোয়ান বিধবাটির দিকে। মাঝে মাঝে গ্রিগরকে চোখ টিপে ইশারা করে, বোধ হয় বলতে চায়—দেখেছ হে, এই জাতের সব মেয়ে আমাদের। বললে তো বিশ্বাস করবে না।

গ্রামের ওপারে শরতের বাদামী ফ্যাকাশে তৃণপ্রান্তর মিশে গেছে সুদূরের কোলে। রাস্তার ওধারে চষা-ক্ষেতজমি থেকে একটা কপোত-ধূসর ধোঁয়ার ফিতে মাথা জাগিয়েছে। চাষীরা আগাছায় আগুন দিয়েছে, আগুন দিয়েছে শুকনো শনের গোছায় আর মাঠের মরা ঘাসে। ধোঁয়ার গন্ধে গ্রিগরের মনে করুণ স্মৃতি জাগে, এক সময় নির্জন হৈমন্তী স্তেপ-প্রান্তরে ক্ষেত-জমিগুলোতে লাঙল দিয়েছে সে-ও। তাকিয়ে থেকেছে রাতের তারাভরা কালো আকাশের দিকে। কান পেতে শুনেছে মাঝগগন দিয়ে সারি বেঁধে উড়ে-যাওয়া বালিহাঁসের কলরব। খড়ের গাদার ওপর এপাশ-ওপাশ করে গ্রিগর তাকালো গাড়ির চালকের মুখের দিকে।

—তোমার বয়েস কত হবে গো?

শুধু চোখের কোণে একটু হেসে রস করে জবাব দিলে মেয়েটি এই ষাটখানিক হল।

—না, তামাশা নয়, সত্যি বল।

—এই একুশে পা দিলাম।

—তার ওপর বিধবা?

—হ্যাঁ।

—তোমার স্বামীর কী হয়েছিল?

—মারা গেছে লড়াইয়ে।

—অল্পদিন?

—দু বছর হতে চলল।

—তাহলে সেই বিদ্রোহের সময় বলো?

—তারও পরে। শরৎকালে।

—তাহলে তোমার চলে কী করে?

—এই কোনোরকমে চালিয়ে নি।

—জীবনটাকে একঘেয়ে মনে হয় না?

মেয়েটি ওর মুখের দিকে মনোযোগ দিয়ে ছাখে, ঠোঁটের ওপর রুমাল

চাপা দিয়ে হাসে। এবার যখন জবাব দেয়, গলার স্বরটা শোনায় একটু অন্য ধরনের, ভারি ভারি :

—কাজের সময় একঘেয়েমির আর জায়গা কোথায় ?

—কিন্তু স্বামী নেই বলে একঘেয়ে লাগে না ?

—শাশুড়ির কাছে থাকি, দু'জনে মিলে কত কী কাজ করি ক্ষেত-খামারির।

—কিন্তু স্বামী না থাকাতে তোমার চলে কী করে ?

গ্রিগরের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকায় মেয়েটি। কালচে মুখের ওপর একঝলক রক্তিম আভা খেলে, চোখে বিদ্যুতের ঝিলিক দেখা দিয়ে আবার মিলিয়ে যায়।

—কী বলতে চান ?

—ঠিক যা বলনুম তাই।

ঠোঁটের ওপর থেকে রুমাল সরিয়ে মেয়েটি টেনে টেনে বলে

—হ্যাঁ তা এজীবনে সে সৌভাগ্যের অভাব হয়নি মোটেই। ভালো মরদের তো একেবারে ঘাটতি নেই এ দুনিয়ায়।—খানিক থেমে সে আবার বলতে থাকে—জীবনে স্বামীর সঙ্গসুখ তো বড়ো একটা সোয়াদ করতে পারিনি। একটি মাস একসঙ্গে কাটিয়েছিলাম শুধু, তারপরেই তার ডাক পড়ল লড়ায়ে। কোনোরকমে চালিয়ে নিচ্ছি তার অভাবে। এখন তো জোয়ান কসাকরা গাঁয়ে ফিরে আসছে তাই খুব সহজ। আগে বড়ো মুশকিল হত। নিন্ এবার উঠুন বড়ো কত্তা! মাথা তুলুন! এখন তো সব জানলেন সেপাই সাহেব! এই তো আমার জীবন!

আর কিছু বললে না গ্রিগর। এ প্রসঙ্গ নিয়ে ব্যঙ্গের সুরে আর বেশী আলোচনা করতে মন চাইল না। আদৌ শুরু করেছিল কেন তাই ভেবে বরং আপসোস হতে লাগল।

অতিকায় নধর দুটি বলদ সমান তালে পা ফেলে হেলেদুলে চলেছে একনাগাড়ে। ওদের মধ্যে একটি কোনোকালে তার ডান শিঙখানা হারিয়েছিল। আবার যে-শিঙ গজিয়েছে সেটা বেঁকে মাথার ওপর ট্যারা হয়ে নেমে এসেছে। গ্রিগর গাড়িতে শুয়ে আছে কনুয়ে ভর রেখে, চোখ আধবোজা। ছেলেবেলায় এবং পরে আরো বড়ো হয়ে যে-সব বলদ নিয়ে সে কাজ করেছে তাদের কথা মনে পড়তে থাকে। ওদের হরেক রঙ, গায়ে-গতরে স্বভাবে নানা রকমফের, এমন-কি শিঙের মধ্যেও তাদের আপন বৈশিষ্ট্য। একবার ওর হাতে পড়েছিল ঠিক এমনি আরেক বলদ, তারও শিঙ দুমড়োনো। বদমেজাজী ঘোড়েল বলদটা কেবল আড়চোখে চাইত আর লাল-লাল চোখ ঘোরাত। পেছন দিকে কেউ গেলে পা ছুঁড়ত আর চরানির দিনে যখন সন্ধ্যের পর স্তেপের মাঠে ঘাস খেতে ছেড়ে

দেয়া হত তখন সেটায় ঝোঁক থাকত থালি বাড়িমুখো ফেরায়। দুষ্টুমি করে কখনো আবার জঙ্গলে কিংবা দূরের পাহাড়ি খাতে লুকিয়েও থাকত। একেক সময় গ্রিগর ঘোড়ার পিঠে চড়ে সারাদিন কাটিয়েছে বলদটার তল্লাস করে। তারপর যখন একেবারে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে তখন হয়ত হঠাৎ তাকে আবিষ্কার করেছে খাতের একেবারে নিচে, ঘন কাঁটা ঝোপের মধ্যে কিংবা লতাপাতা-ছড়ানো বুড়ো আপেল গাছটার তলায়। শিঙ-বাঁকা শয়তানটা খাটালের খোঁটা আলগা করে নিত কৌশলে, তারপর রাতের আঁধারে ফটকের হুড়কো তুলে বাইরে বেরিয়ে আসত। ডন নদী সাঁতরে ওপারের ঘেসো জমিতে গিয়ে ঘোরাঘুরি করত। গ্রিগরকে জানোয়ারটা যথেষ্ট নাকাল করেছে, বহু কষ্ট দিয়েছে।

—তোমার ওই শিঙ বাঁকা বলদটা কেমন? ঠাণ্ডা মেজাজ?—মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে গ্রিগর।

—হ্যাঁ। কিন্তু সেকথায় কী কাজ?

—না, এই এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম।

—এমনি। কাজের কোনো কথা না থাকলে 'এমনি'-টাই সবচেয়ে সুবিধে।—নাক সিঁটকে মন্তব্য করে মেয়েটি।

গ্রিগর আবার চুপ হয়ে যায়। অতীতের কথা ভাবতে ভালোই লাগে। সেই শান্তিময় দিন, সেই কাজের ব্যস্ততা, সেই কত-কিছু যার সঙ্গে যুদ্ধের কোনো সম্পর্কই নেই। দীর্ঘ সাত বছরের লড়াই তার মনে এমন ঘৃণা ধরিয়ে দিয়েছে যে তা আর বলার নয়। যুদ্ধের সামান্য স্মৃতি, পল্টন জীবনের দু'একটা ঘটনার কথা মনে পড়লেও তার যেন গা-বমি করে। একটা অব্যক্ত বিরক্তির অনুভূতি জাগে।

লড়াই সে অনেক করেছে, আর নয়।

এখন সে বাড়ি ফিরছে নিজের কাজে ফিরে যাবে বলে, ছেলেপিলেদের সঙ্গে, আকসিনিয়ার সঙ্গে থাকবে বলে। রণাঙ্গনে থাকতেই সে সংকল্প করেছিল আকসিনিয়াকে ঘরে নিয়ে আসবে ওর ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করবার জন্য আর সব সময় ওর পাশে থাকবার জন্য। সে নাটকেরও আজ সমাপ্তি ঘটানো চাই, যত তাড়াতাড়ি ঘটে ততই মঙ্গল।

কল্পনা করে তৃপ্তি পায় বাড়ি ফিরে কী-ভাবে সে উর্দি-বুট সব খুলে রাখবে, চওড়া চটি-জুতো পায়ে দিয়ে কসাকী কায়দায় সাদা উলের মোজার ভেতর পাতলুনের পা-দুটো গলিয়ে দেবে। গরম জামার ওপর ঘরে-বোনা কোটখানা চাপিয়ে মাঠের দিকে রওনা হবে। লাঙলের হাতলের ওপর হাতদুটো রেখে ও যখন ভিজে-মাটির ওপর লাঙলের দাগ ধরে এগোবে আর ভাঙা মাটির কাঁচা সোঁদা গন্ধের ঘ্রাণ নেবে প্রাণভরে লোভীর মতো,—লাঙলের ফালে উপড়ানো ঘাসের তেতো নিশ্বাস, তখন কী আনন্দই

না হবে। বিদেশে এমন-কি এই মাটি আর ঘাসের গন্ধও আলাদা। পোল্যাণ্ডে, ইউক্রেনে আর ক্রিমিয়ায় থাকতে কতবার সে দুহাতের তেলোয় সোমরাজের ধূসর ডাঁটা রগড়ে শুঁকে দেখেছে আর মনটা আকুলি-বিকুলি করেছে : নাঃ, এ তো সে গন্ধ নয়, এ যে একেবারে আলাদা।

কিন্তু গাড়িতে ওর সাথীর তখন একেবারে হাঁফিয়ে ওঠার অবস্থা। কথাবার্তা না বললে আর চলছে না। বলদ দাবড়ানো বন্ধ করে ও বেশ জুত করে বসেছিল। চাবুকের ডগায় চামড়ার গোছাটা নাড়াচাড়া করছে আর আড়চোখে অনেকক্ষণ ধরে গ্রিগরকে লক্ষ্য করছে, দেখছে তার আধবোজা চোখ আর একাগ্র ভাবনায় ডুবে থাকা মুখখানা। লোকটার বয়েস তো খুব বেশী নয় অথচ চুলে পাক ধরেছে। কেমন অদ্ভুত লোকটা যাই বলো। দেখলে মনে হয় জীবনে অনেক দুর্ভোগ সয়েছে। কিন্তু তাই বলে দেখতে খারাপ নয়। শুধু একরাশ পাকা চুল, গোঁফটাও প্রায় পেকে গেছে। কিন্তু তা ছাড়া খারাপ নয় একটুও। এত কী ভাবছে লোকটা? প্রথমে মনে হয়েছিল বুঝি একটু আনন্দ ফুর্তি করবে, কিন্তু তারপর হঠাৎ মুখ বুজল। কোনো কারণে বলদটার কথা একবার জিজ্ঞেস করেছিল। নাকি কী নিয়ে আলাপ করতে হবে তা জানে না? কিংবা হয়তো একটু লাজুক। দেখলে তো তা মনে হয় না। চোখদুটোর দৃষ্টি বড় কড়া। না, লোকটা ভাল কসাক, তবে একটু যেন অদ্ভুত ধরনের। আচ্ছা বেশ, থাকো মুখ বুজে, কুঁজো শয়তান। তোমার জন্য তো ভাবি আমার বয়ে গেছে। আমিও মুখ বুজে থাকতে পারি। যদি বউয়ের কাছে ফিরবে ভেবেছ তো সে-গুড়ে বালি। যাক, মুখ বন্ধই রাখো, তোমার তাতে উপকারই হবে হয়তো।

গাড়ির কাঠামোর বেড়ের ওপর মাথা হেলিয়ে দিয়ে মেয়েটি নিচু গলায় গাইতে শুরু করে।

গ্রিগর মুখ তুলে সূর্যের দিকে চেয়ে দ্যাখে। এখনও বেলা পড়তে দের দেরি। গেলবছরের একটা শুকনো কাঁটাগাছ রাস্তার ধারে ... প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে। তার ছায়া পড়েছে হাতখানেক মাত্র লম্বা হয়ে, ... সম্ভব বেলা দুটোও বাজেনি এখন অবধি।

যেমন মায়ামুগ্ধের মতো মৃত্যু নিথর তৃণপ্রান্তর। সূর্যের উত্তাপ তেমন জোরালো নয়। লালচে-বাদামী শুকনো ঘাস নিঃশব্দে নড়ে ... হাল্কা হাওয়া পেয়ে। না শোনা যায় পাখির কাকলি, না শোনা যায় ... ইঁদুরের শিস। শীতল হাল্কা-নীল আকাশে একটা চিলের দেখা নেই, নেই ডানা ছড়ানো ঈগল। একবার শুধু একটা ধূসর ছায়া সরে গেল রাস্তার ওপর দিয়ে, মাথা না তুলেই গ্রিগর শুনতে পেল বড়ো-বড়ো ডানা ঝাপটানোর ভারি শব্দ. একটা ছাই ধূসর বড়ো বাস্টার্ড উড়ে গিয়ে দূরের এক টিলার কাছাকাছি বসেছে। সেখানে দূরের নীলচে-বেগনি ছায়ার আঁধারিতে

মিশে গেছে একটা নিচু খাত। যুদ্ধের আগের দিনগুলোয় শুধু শরতের শেষাশেষিই এমনি বিষণ্ণ গম্ভীর নীরবতা দেখতে পেত গ্রিগর স্তেপের প্রান্তরে। তখন মনে হত তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে হাওয়ায়-ওড়ানো সামান্য যে বন-ওকড়া শুকনো ঘাসের ওপর দিয়ে সর্‌সর্‌ করে চলে যায় দূর-দূরান্তে, তারও আওয়াজ বুঝি কানে ঠেকছে।

পথের বুঝি আর শেষ নেই। ঢাল বেয়ে পাক খেয়ে ওপরে উঠেছে, কখনো নেমেছে খাদের অতলে, আবার কোনো-এক টিবির মাথায় চড়ে গেছে সোজা। আর সেই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি—দৃষ্টির সীমানা ছাড়িয়ে স্তেপের নির্জন চারণভূমি চারদিকেই পরিব্যাপ্ত।

ঢালু খাতের ওপর একটা মেপ্‌লের ঝোপ দেখতে পেয়ে গ্রিগরের চোখ খুশী হয়ে ওঠে। প্রথম তুষারের ছোঁয়ায় ঝলসানো পাতাগুলোর রঙ শ্যামল-নীলিমা, যেন নিভন্ত কয়লার আগুনের ছাই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়া তার সর্বাঙ্গে।

চাবুকের বাঁট দিয়ে আল্‌তো করে গ্রিগরের কাঁধ ছুঁয়ে মেয়েটি বলে, তোমার নাম কী দাদু?

চমকে উঠে মুখ ফিরিয়ে তাকায় গ্রিগর। মেয়েটি অন্যদিকে চোখ ঘুরিয়ে নেয়।

—গ্রিগর। তোমার নাম?

—যা খুশি বলে ডাকতে পার।

—তুমি তাহলে মুখ বুজে থাক 'যা খুশি'।

—মুখ বুজে থেকে তো হাঁপিয়ে উঠেছি। সারাদিন চুপ করে আছি, গলা শুকিয়ে গেল। তোমার এত মুখ ভার কেন গ্রিশা দাদু?

—কেন, এত আনন্দরই বা কী হল?

—ঘরে ফিরে যাচ্ছ, আনন্দ হবে না?

—আনন্দের বয়েস চলে গেছে।

—যাও, যাও। খুব বুড়ো দেখানো হচ্ছে। কিন্তু অল্প বয়সে তোমার চুলে পাক ধরল কেন?

—সবই তোমার জানা চাই দেখছি। তা যেমন চমৎকার জীবনটা কাটিয়েছি, চুল পাকবে না!

—তোমার বিয়ে হয়েছে, গ্রিশা দাদু?

—হ্যাঁ। তুমি এবার বরং চট্‌ করে অন্য বর খুঁজে নাও।

—কেন?

—তুমি একটু উশ্‌খুশে আছ তো…

—সেটা কি এমন সংঘাতিক হল?

—সাংঘাতিক হতে পারে। আমি এমনি একজন মেয়েকে জানতাম, সেও ছিল বিধবা; নষ্টামি করে করে, শেষে তার নাক খসে পড়ার জোগাড়।

—ওমা, কী ভয়ানক !—কপট ভয়ের ভান করে মেয়েটি, তারপর যেন গম্ভীর হয়ে কাজের কথায় আসে : বিধবামানুষের জীবনই ওই রকম। যদি বাঘের ভয় তো বনে না গেলেই হয় !

গ্রিগর তাকায় ওর দিকে। নিঃশব্দে হাসছে মেয়েটি, সুন্দর সাদা দুপাটি দাঁত চেপে চেপে। ওপরের ফুলো ঠোঁটটা একটুখানি বাঁকা বাঁকা, বুজে-আসা চোখের পাতার নিচে চোখদুটোয় দুষ্টুমির ঝিলিক। অজ্ঞাতসারেই হেসে ফেলে গ্রিগর। মেয়েটির উষ্ণ বর্তুল হাঁটুর ওপর রাখে হাতখানা।

অনুকম্পার সুরে বলে : বেচারির কী দুর্ভাগ্য। মাত্র কুড়িটা বছর বয়েস, এরই মধ্যে জীবনের কতো দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছে।

মুহূর্তের মধ্যে সবটুকু খুশি উধাও হয়ে গেল মেয়েটির। ঠেলে গ্রিগরের হাতখানা সরিয়ে দিয়ে ভুরু কুঁচকে রইল সে। মুখটা এতখানি লাল হয়ে উঠেছে যে নাকের ওপরের ছিটফোঁটা দাগগুলো আর নজরে পড়ছে না।

—ঘরে ফিরে তোমার বউকে দরদ দেখিও। এমনিতেই আমার সমবেদনা জানাবার লোক ঢের আছে, তোমাকে না-হলেও চলবে।

—অতো চোটো না। একটু সবুর।

—চলোয় যাও তুমি !

—তোমার জন্য আমার সত্যিই দুঃখ হয়েছিল, তাই ও-কথা বলেছি।

—দুঃখ তোমার ধুয়ে খাওগে' !—মুখের ওপর খুব অনায়াসে আর সহজেই পুরুষালি খিস্তিটুকু এসে গিয়েছিল। আঁধার চোখের মধ্যে আগুনের জ্বালা।

গ্রিগর ভুরু উঁচোয়। বোকার মতো বিড়বিড় করে বলে : হাঁঃ, যা খুশি গালাগাল করতে পারো বটে, তাতে সন্দেহ নেই। কী দুর্দান্ত মেয়েমানুষ বাবা !

—আর তুমি ? গেরুয়াধারী সন্নিসি হয়েছ বড়। তোমাকে আমার বোঝা হয়ে গেছে। বিয়ে করেছ, এখন বেশ চালিয়ে যাচ্ছ আর কি। কিন্তু এত উশখুশুনি কতদিন ধরে ?

গ্রিগর হেসে বলে—খুব বেশীদিন নয়।

—তাহলে আমার বেলায় এত হিতোপদেশ কিসের শুনি ? সে কাজে আমার শাশুড়ীই তো রয়েছেন।

—আচ্ছা, হয়েছে এবার, থাক্। এত চটে যাবার কী হল তোমার, আচ্ছাই গাধা তো। কেবল একটু ঘুরিয়ে বলছিলাম কথাটা।—গ্রিগর আপোসের সুরে বলতে চেষ্টা করে।

—ওই গেল যা। কথা বলতে বলতে বলদ দুটো যে এদিকে রাস্তা ছেড়ে চলে এসেছে।

গাড়ির ভেতর আরেকটু হাত-পা ছড়িয়ে শু'ল গ্রিগর। চটুলা বিধবাটির দিকে একবার চট্ করে চোখ বুলিয়ে নিতে গিয়ে লক্ষ্য করল তার চোখে জল। মনে মনে ভাবল, নাও ঠেলা এবার ! এ মেয়েমানুষগুলোর ধাতই এই…।

খানিকক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল গ্রিগর চিত হয়ে। জোব্বাকোটের একধারটা টেনে দিয়েছিল মুখের ওপর। একেবারে বিকেল নাগাদ ঘুম ভাঙল। সন্ধ্যের আকাশে মিট্‌মিট্‌ করছে তারাগুলো। ঘাসের টাটকা মনমাতানো গন্ধ নাকে ঠেকে।

মেয়েটি বললে, বলদ দুটোকে এবার দানাপানি দিতে হয়।

—বেশ তো, থামাও।

গ্রিগর নিজেই বলদজোড়া খুলে দিলে। পুঁটলি থেকে একটিন মাংস আর রুটি বের করল সে। শুকনো ডালপাতা এক বোঝা জড়ো করে গাড়ির কাছেই আগুনের কুণ্ড তৈরি হল।

মেয়েটিকে গ্রিগর ডাকলো, বোসো না, কিছু খেয়ে নাও। অনেকক্ষণ ধরে খুব খিদে পেয়েছে নিশ্চয়।

আগুনের ধারে বসে মেয়েটি। মুখে একটি কথাও না বলে থলি ঝেড়ে রুটি আর বাসি একটুকরো শুকরের চর্বি বের করে। খেতে বসে দুএকটি কথা হয় বেশ বন্ধু ভাবেই। তারপর মেয়েটি গাড়িতে ওঠে ঘুমোবে বলে। গ্রিগর বলদের শুকনো গোবর দুএক টুকরো ছুঁড়ে দেয় আগুনটাকে জীইয়ে রাখার জন্যে। আগুনের পাশে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল গ্রিগর পান্টেলী কায়দায়। খানিকক্ষণ পুলিন্দাটার ওপর মাথা রেখে শুয়ে তারাভরা আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে আবোলতাবোল ভাবতে থাকে—ছেলেপিলেদের কথা আকসিনিয়ার কথা। তারপর কোন্ সময় ঝিমুনি এসে যায়। একটা চাপা মেয়েলি গলার আওয়াজে চট্‌কা ভাঙে.

—ঘুমিয়ে পড়েছ সেপাইসায়েব? ঘুমিয়েছ, না ঘুমোওনি?

মাথা উঁচোয় গ্রিগর। কনুইয়ে ভর দিয়ে প্রায় শরীরের অর্ধেকটা বাইরে ঝুঁকিয়ে রেখেছে মেয়েটি, নিবু-নিবু আগুনের অস্পষ্ট আলো ওর মুখের ওপর, রাঙা আর ঝকঝকে দেখাচ্ছে, দাঁত আর মাথার ওড়নার লেস-বোনা কিনারাটা অন্ধকারে সাদা ধবধবে মনে হয়। আবার হাসে মেয়েটি। নখি কথা বন্ধ দুজনায়। ভুরু নাচিয়ে বলে·

—আহা, ওখানে যে শীতে জমে যাবে। ঠাণ্ডা মাটি। যদি খুব শীত লাগে তো আমার কাছে এলেই হয়। আমার ভেড়ার-চামড়ার কম্বলটা কী গরম, বেজায় গরম। আসবে নাকি? আসবে না?

এক মুহূর্ত ভাবে গ্রিগর, তারপর নিঃশ্বাস ফেলে জবাব দেয়.

—ধন্যবাদ। দরকার নেই। অবিশ্যি যদি এক বা দুবছর আগের ব্যাপার হত। আগুনের পাশে ঠাণ্ডায় জমে যাব বলে তো মনে হয় না।

মেয়েটিও দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, যা তোমার মর্জি।—তারপর কম্বলটা টেনে মুড়ি দেয়।

খানিক বাদে উঠে দাঁড়াল গ্রিগর।. জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নিল। মনে

মনে ও ঠিক করেছে হেঁটেই চলে যাবে যাতে ভোরের আগে তাতারস্কে পৌঁছানো যায়।

যুদ্ধ-ফেরত একজন কমাণ্ডার হয়ে ওর পক্ষে প্রকাশ্য দিনের আলোয় বলদগাড়িতে চড়ে বাড়ি ফেরা বড়ো বিশ্রী দেখাবে। ওভাবে ফিরলে কত হাসাহাসি হবে, কথা হবে।

মেয়েটিকে জাগাল সে।

—আমি হেঁটেই চললাম। স্তেপের মাঠে একা ছেড়ে গেলে ভয় করবে না?

—না। আমি ঘাবড়াবার পাত্রী নই। তাছাড়া কাছে পিঠে গ্রামও আছে। কিন্তু কী হল বলো তো? খুব অস্থির হয়ে উঠেছ বুঝি?

—ঠিক ধরেছ। আচ্ছা, এবার আসি। আমার সম্পর্কে কিছু খারাপ ধারণা কোরো'না যেন।

ভোব্বাকোটের কলার তুলে দিয়ে এবার পথ ধরল গ্রিগব। তুষার পড়তে শুরু করেছে, চোখের পাতায় তারই প্রথম পরত এসে লাগল। বাতাসটা এখন উত্তব দিক থেকে বইছে। গ্রিগব কল্পনা করলে এবার উত্তরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় হয়তো ওব চিবকালের চেনা বরফের মিষ্টি গন্ধটা পাওয়া যাবে।

* *

কশেভয় ভিয়েশেনস্কায় গিয়েছিল। সন্ধ্যের সময় সে ফিরে এল। জানলা দিয়ে ওকে দেখতে পেয়েছিল দুনিয়া। ফটকেব দিকে এগিয়ে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি কাঁধের ওপর ওড়নাটা টেনে দিয়ে ও উঠোনে নেমে এল।

—গ্রিশা আজ সকালে বাড়ি ফিরেছে।—ফটকের কাছে এসে স্বামীর মুখের দিকে উৎকণ্ঠাভবে চেয়ে বললে সে।

—তাহলে তো তোমার খুবই আনন্দ! মিশ্‌কাব জবাবে ওর মনের ভাব বোঝা গেল না, শুধু একটু কৌতুকেব ছাপ।

ঠোঁট চেপে রেখে সে বান্নাঘরে চলে যায় সোজা। চোয়ালের মাংসপেশীগুলো যেন একটু কাঁপছিল। গ্রিগরের হাঁটুর ওপব চড়ে বসেছে পলিউশ্‌কা। ওর পিসিমা ওকে বেশ ধোপদুরস্ত জামা পবিয়ে দিয়েছে। গ্রিগর সাবধানে বাচ্চাটাকে মেঝেব ওপর নামিযে হাসতে হাসতে এগিয়ে এল ভগ্নিপতির দিকে প্রকাণ্ড কালচে হাতখানা বাড়িয়ে দিযে। মিখাইলকে প্রায় আলিঙ্গন করতেই গিয়েছিল। কিন্তু ওর বিরস চোখের কঠিন বন্ধুত্বহীন দৃষ্টিটুকু লক্ষ্য করে সামলে নিল নিজেকে।

—এই যে মিশা, নমস্কার।

—নমস্কার।

—সেই কতদিন আগে শেষ দেখা হয়েছিল বলো তো! প্রায় এক যুগ হতে চলল!

—হ্যাঁ, তা অনেকদিন।···এবার ঘরে ফিরে এসো।

—ধন্যবাদ। তাহলে আমরা এখন কুটুম হয়ে গেলাম, না?

—সেই রকমই তো মনে হয়।···তোমার গালে ওটা রক্তের দাগ না?

—ও কিছু নয়। তাড়াহুড়ো করে ক্ষুর চালাতে গিয়ে কেটে ফেলেছি।

টেবিলের ধারে বসে দুজন দুজনকে নীরবে লক্ষ্য করে। একটা অসুবিধাজনক দূরত্বের অনুভূতি দুজনের মধ্যেই। একটা গুরুতর আলোচনা হওয়া দরকার পরস্পরের মধ্যে অথচ ঠিক এই মুহূর্তেই সেটা যেন অসম্ভব মনে হয়। মিখাইল নিজেকে অবিশ্যি সংযত রেখেছিল পুরোপুরিই। ক্ষেত-খামারি, তার নানা অদলবদলের কথা সে ধীরেসুস্থে বলতে থাকে।

গ্রিগর জানলা দিয়ে তাকিয়ে গ্যাখে বাইরে—বছরের প্রথম নীলাভ তুষারে মাটি ঢাকা পড়েছে। আপেল গাছের শাখা শূন্য।

খানিক বাদে মিশা বেরিয়ে এল বাইরে। সিঁড়ি-দরজায় বসে খুব যত্ন করে শান দিতে লাগল নিজের ছুরিখানায়। দুনিয়াকে বললে:

—কাউকে ধরে আনতে যাচ্ছি একটা ভেড়ার বাচ্চা জবাই করিয়ে নেবার জন্য। হাজার হলেও বাড়ির কর্তা যখন, ভালোমতো আপ্যায়ন জানাতেই হবে। একদৌড়ে যাও তো, কিছু ভদ্‌কাব জোগাড় কর। না, সবুর! প্রোখরকে গিয়ে ধর, বলো তাকে যেখান থেকে পারে কিছু ভদ্‌কা এনে দিক, জুতোব শুকতলা ক্ষয়ে গেলেও কাজটা তাকে করতেই হবে। তোমার চেয়ে ও-ই বেশী সুবিধে করতে পারবে। সন্ধ্যের সময় খেতেও ডেকো ওকে।

খুশিতে ডগমগ হয়ে দুনিয়া স্বামীর দিকে তাকায় নীরব কৃতজ্ঞতাভরা চোখে।··প্রোখরের বাড়ির দিকে এগোবার পথে মনে ওর অনেক আশা জাগে—এবার হয়তো সব ভালোর দিকেই ফিরবে। লড়াই তো ওরা অনেক করেছে। এখন আর ওদের করার কী আছে? ঈশ্বর ওদের সুবুদ্ধি দিন!

আধঘণ্টাও হয়নি প্রোখর ছুটতে ছুটতে এল হাঁপাতে হাঁপাতে।

—গ্রিগর পান্তালিয়েভিচ! আরে বুড়ো খোকা আমি তো আশাই করতে পারিনি। এ-দিনটা দেখার সৌভাগ্য হবে ভাবতেই পারিনি।—চেঁচিয়ে কাঁদো-কাঁদো উঁচুগলায় কথাগুলো বলতে গিয়ে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল, আরেকটু হলে ভদ্‌কার পাত্রটা গুঁড়িয়েই ফেলেছিল আর কি।

গ্রিগরকে জড়িয়ে ধরে ও ফোঁস-ফোঁস করে কাঁদে আর হাতের মুঠো দিয়ে চোখের জল মোছে। গোঁফ বেয়ে চোখের জল পড়ছিল বলে গোঁফটাও মোছে। গ্রিগরেরও গলার কাছটা কেমন করে। কিন্তু নিজেকে সে সামলে নিয়েছিল। মনটায় ওর খুবই নাড়া লেগেছে। বিশ্বস্ত আরদালির পিঠ সজোরে চাপড়ে দিয়ে অসংলগ্নভাবে বলে:

—তা হলে তো আমাদের আবার দেখা হল···মানে, আমার খুশী লাগছে, প্রোখর, দারুণ খুশী! তা তুমি এত কাঁদছ কেন গো, বুড়ো খোকা? লাগাম আর টানতে পারছ না? নাকি নাট-বল্টু ঢিলে হয়ে গেল? তোমার হাত কেমন এখন? বউ বুঝি এখনো আরেকটা হাত ছিঁড়ে নেয়নি দয়া করে?

প্রোখর সজোরে নাক ঝাড়ে। গায়ের জামাটা খোলে।

—আজকাল বুড়ী আর আমি কপোত-কপোতীর মতো আছি হে। দ্বিতীয় হাতখানা তো আমার আস্তই দেখতে পাচ্ছ। কিন্তু পোলগুলো আমার যে হাতখানা কেটে নিয়েছিল সেটা আবার গজাতে শুরু করেছে, মাইরি বলছি। বছরখানেকের মধ্যেই দেখবে নতুন আঙুল দেখা দিয়েছে।—চিরাচরিত ফুর্তির মেজাজে জামার শূন্য হাতাটা দুলিয়ে দুলিয়ে বলে প্রোখর।

লড়াইয়ের ভেতরে থেকে ওদের দুজনেই শিখেছে কেমন করে হাসির আড়ালে মনের আসল ভাবকে চাপা দিতে হয়, রুটির সঙ্গে সঙ্গে কথার মধ্যেও একটু ঝাল-নুনের সোয়াদ দিতে হয়। তাই গ্রিগর আগের মতোই তামাশার সুরে জেরা চালাতে থাকে:

—তা বুড়ো ছাগল, তোমার দিন কাটছে কী ভাবে? কেমন লাফ-ঝাঁপ চলছে?

—বুড়ো হয়েছি, তেমন হুড়োহুড়ি তো নেই।

—আমায় ছাড়ার পর কিছু আর মারা-টারা হল?

—কী বলতে চাচ্ছ?

—কেন, গেল বছর শীতের সময় দোয়েলপাখি এনে দিয়েছিলে আমায়···

—পান্তালিয়েভিচ! ক্ষ্যামা দাও! এখন আর ওসব বাবুগিরিতে কাজ কী? তাছাড়া একহাতে আর কত ভালো শিকার করব বলো? এসব হল তোমাদের ছেলেছোকরাদের কাজ। আমার এখন গিন্নির ভরসায় সব ছেড়ে দিয়ে শুধু পাত্রের তলানিটুকু চাটা, এই হল কর্তব্য।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এ ওর দিকে চায়। লড়াইয়ের ময়দানের দুই পুরনো সাথী। এতদিন বাদে দেখা হবার পর হাসাহাসি আর আনন্দে কাটে।

—এবার ঘরে ফিরলে তো একেবারে? প্রশ্ন করে প্রোখর।

—হ্যাঁ, একেবারে। আর যাওয়া-টাওয়া নয় কোথাও।

—কতদূর পর্যন্ত উন্নতি হয়েছিল?

—রেজিমেণ্টের সহকারী কমাণ্ডার হয়েছিলাম!

—তাহলে এত তাড়াতাড়ি খালাস করে দিল কেন?

গ্রিগরের মুখটা আঁধার হয়ে ওঠে। সংক্ষেপে জবাব দেয়:

—আমাকে আর ওদের দরকার হল না।

—তার কারণ?

—জানি না। হয়তো আমার আগের ইতিহাসের জন্য।

—কিন্তু তুমি তো ঢুকেছিলে বিশেষ বিভাগ কমিশনের মারফত, যারা সব অফিসারদের বাছাই করে নিয়েছে। তাহলে আজ কেন পুরনো ব্যাপার টেনে আনছে ?

—কে বলবে ?

—কিন্তু মিখাইল কোথায় ?

—উঠোনে। ভেড়া জবাই করছে।

প্রোখর গ্রিগরের কাছ ঘেঁষে চাপা গলায় বলে :

—মাসখানেক আগে ওরা প্লাতন রীয়াবচিকফকে গুলি করে মেরেছে।

—সে কী কথা ?

—ঠিকই বলছি।

সিঁড়ির দিকের দরজাটায় আওয়াজ হল।

প্রোখর ফিসফিস করে বললে—পরে কথা হবে।

তারপর গলা উঁচিয়ে বলে : তা, কমরেড কমাণ্ডার। এই মহা আনন্দের দিনে একটু উৎসব করা যাক। গিয়ে মিখাইলকে ডেকে আনি ?

—হ্যাঁ, যাও।

টেবিল সাজায় দুনিয়া। ভাইকে কীভাবে যে খুশী করবে তা সে ভেবেই পায় না। ওর হাঁটুর ওপর একটা পরিষ্কার তোয়ালে রেখে নুন-মাখানো তরমুজের থালাটা এগিয়ে দেয়। ওর গেলাসখানা অন্তত পাঁচবার মুছে দেয়।

দুনিয়া ওকে আগের মতো 'তুমি' না বলে 'আপনি' বলছে তা লক্ষ্য করে গ্রিগর মনে মনে কৌতুক বোধ করে।

টেবিলে বসে মিখাইল কিন্তু গোঁজ হয়ে আছে মুখে একটি কথাও নেই। মন দিয়ে শুনছে গ্রিগরের কথা। সামান্য মদ খাচ্ছে, তাও অনিচ্ছাভরে। কিন্তু প্রোখর একেকবারে পুরো গেলাস ঢেলে নিচ্ছিল। ফ্যাকাশে হয়ে গেছে ওর মুখখানা। মাঝে-মাঝেই ধবধবে সাদা গোঁপখানা চুমরে নিচ্ছে।

ছেলেমেয়েদের খাইয়ে বিছানায় পাঠিয়ে দেবার পর দুনিয়া একটা মস্ত থালায় করে ভেড়ার স্টু এনে রাখল টেবিলে। গ্রিগরকে চুপি চুপি বললে :

—দাদা, আমি ছুটে গিয়ে আকসিনিয়াকে ডেকে আনছি। তোমার আপত্তি নেই তো ?

কথা না বলে গ্রিগর শুধু মাথা ঝোঁকালে। সমস্ত সন্ধ্যেটা ওর কেটেছে একটা উন্মুখ প্রত্যাশায়, তবু ওর নিশ্চিত ধারণা কেউ সেটা লক্ষ্য করেনি। কিন্তু দুনিয়া দেখেছে বাইরের দরজায় যেই কোনো রকম শব্দ হয়েছে অমনি কান খাড়া করে আড়চোখে চেয়েছে গ্রিগর। মেয়েটার অনাবশ্যক তীক্ষ্ণ নজর এড়াবার জো-টি নেই !

প্রোখর বলে—কুবানের সেই তেরেশেঙ্কো কি এখনো পল্টনের সেনাপতি

আছে ?—হাতের গেলাসটা এমনভাবে আঁকড়ে রয়েছে প্রোখর যেন কেউ বুঝি কেড়ে নিতে এল।

—না, সে ল্ভোভে মারা গেছে।

—স্বর্গলাভ করুক তার আত্মা। বেশ ভালো ঘোড়সওয়ার সেপাই ছিল বটে।—প্রোখর চট্ করে ক্রুশ-প্রণাম করে। কশেভয়ের মুখের বিষময় হাসিটুকু নজর না করে সে গেলাসে চুমুক দেয়।

—আর সেই অদ্ভুত নামওলা লোকটার খবর কি ? ওই যে ফৌজের ডানপাশে থেকে ঘোড়া দাবড়াত···দূর ছাই, কী যেন নামটা, মে-বিয়ার্ড না কি ? উক্রেইনের লোক, বেশ গাঁট্টাগোট্টা আর ফুর্তিবাজ। ব্রোদাতে এক পোলিশ অফিসারকে কেটে দুফাঁক করে দিয়েছিল যে-লোকটা। বেঁচেবর্তে ভালো আছে তো ?

—হ্যাঁ, একেবারে মদ্দ ঘোড়ার মতো। মেশিনগান-ফৌজে বদলি হয়ে গেছে।

—আর তুমি কার জিম্মায় দিলে তোমার ঘোড়া ?

—তার আগেই আমার নতুন ঘোড়া জুটে গিয়েছিল।

—তাহলে সেই তারা-কপালেটার কী হল ?

—কামানের গোলার টুকরো লেগে মারা গেছে।

—লড়াইয়ে ?

—একটা ছোট শহরে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। দারুণ গুলিগোলা চলছিল তখন। খুঁটিতে বাঁধা অবস্থাতেই মারা গেল।

—আহা বেচারা। কী চমৎকার ঘোড়া ছিল। প্রোখর নিশ্বাস ফেলে আবার গেলাসে ঠোঁট লাগায়।

বাইরের দরজায় শেকল খোলার আওয়াজ। চমকে ওঠে গ্রিগর। আকসিনিয়া চৌকাঠ পেরিয়ে এসে অস্পষ্ট স্বরে বলে : নমস্কার। হাঁপাচ্ছে আকসিনিয়া। মাথার ওড়নাটা খুলতে খুলতে গ্রিগরের দিকে বিস্ফারিত উজ্জ্বল চোখে তাকিয়েই থাকে এক নাগাড়ে। টেবিলের কাছে এসে দুনিয়ার পাশে বসে পড়ে। ওর ভুরু চোখের পাতায় আর ফ্যাকাশে গালের ওপর ছোট ছোট বরফের দানা গলে পড়ছিল। চোখদুটো কুঁচকে হাতের তেলো দিয়ে মুখখানা মুছে ফেলে আকসিনিয়া। গভীর একটা নিঃশ্বাস ফেলে এতক্ষণে একটু সামলে নিয়ে সে গ্রিগরের দিকে তাকিয়েছে—আবেগঘন চোখে।

প্রোখর বলে : আকসিনিয়া আমার লড়াইয়ের সাথী। একসঙ্গে আমরা পেছু হটে এসেছি, একসঙ্গে উকুনের পাল্লায় পড়েছি। ··কুবানে যদি ফেলেও এসে থাকি তোমায়, কী আর আমাদের করবার ছিল বল ?—প্রোখর তার গেলাসটা সামনে এগিয়ে দিতে গিয়ে খানিকটা ভদ্কা চল্‌কে পড়ে টেবিলে—নাও, গ্রিগর পান্তালিয়েভিচের নামে খেয়ে নাও এটুকু ! ঘরে ফিরে

এসেছে। সম্ভাষণ জানিয়ে দাও।···আমি তো বলেই ছিলাম তোমাকে, ও ফিরে আসবে ভালোয় ভালোয়, দেখলে তো: এখন কুড়িটা টাকা ফেলে ওকে নিয়ে যাও! আরে গেল-যা! ও যে দেখছি বেকুফের মতো বসে আছে!

গ্রিগর হাসতে হাসতে প্রোখরের দিকে চোখ ঠেরে বলে—এর মধ্যেই কুপোকাৎ হয়ে গেছে, ওর কথায় আর কান দিও না পড়শি!

আকসিনিয়া গ্রিগর আর দুনিয়াকে লক্ষ্য করে মাথা ঝুঁকিয়ে টেবিল থেকে গেলাসটা অল্প একটু উঁচু করে ধরে। ওর ভয় হচ্ছিল বুঝি কেউ ওর হাতের কাঁপুনিটা নজর করে থাকবে।

—গ্রিগর পান্তালিয়েভিচ, তুমি এসেছ বলে, আর দুনিয়া, তুমি খুশী হয়েছ বলে

—বারে! আর তুমি বুঝি খুব দুঃখ পেয়েছ?—হো-হো করে হেসে ফেলে প্রোখর, কনুইয়ের খোঁচা মারে মিখাইলকে।

আকসিনিয়া লাল হয়ে ওঠে। এমনকি ওর কানের ছোট নতি দুটোও আগুনের মতো রাঙা দেখায়। কিন্তু তবু প্রোখরের দিকে কঠিন রাগত চোখে তাকিয়ে বলে:

—হ্যাঁ আমার আনন্দ হয়েছে! খুব আনন্দ হয়েছে!

এতখানি অকপট স্বীকৃতিতে প্রোখর একেবারে বেচাল হয়ে পড়ে, মনে ওর খুবই লাগে কথাটা। বলে: খেয়ে নাও শেষ অবধি, ভগবানের দোহাই। কীভাবে সিধে বাত করতে হয় তা বেশ জানো, সোজাসুজি খেতেও জানো! কেউ ভালো মদ ছেড়ে দিলে আমার প্রাণে বড্ডো লাগে, বুকে যেন ধারালো ছুরি বেঁধে।

এর পর আকসিনিয়া আর বেশীক্ষণ বসেনি। ওর মতে যতক্ষণ না বসলেই নয় তার বেশী আর নয়। যতক্ষণ ছিল, বড়ো-একটা তাকায়নি ওর প্রিয় মানুষটির দিকে, তাকালেও সে মাত্র মুহূর্তের জন্য। জোর করে অন্যদের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছে, এড়াবার চেষ্টা করেছে গ্রিগরের দৃষ্টি, কারণ উদাসীনতার ভান করা যায় না আবার বাইরের লোকের সামনে নিজেকে প্রকাশ করে দিতেও সে চায় না। একবার শুধু গ্রিগর দেখেছে ওর চোখের দৃষ্টি, যখন ও চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল—একটি সোজা নজরের মধ্যে গ্রিগর দেখেছে সুগভীর ভালোবাসা আর নিষ্ঠা। কিন্তু ওই একটি দৃষ্টিতেই সবখানি বলা হয়ে গেল। গ্রিগর ওকে এগিয়ে দিতে বেরিয়ে এল বাইরে। পেছন থেকে মাতাল প্রোখর চেঁচাচ্ছে· বেশী দেরি কোরো না! তাহলে আমরা সবটুকু খেয়ে শেষ করব!

দরজার বাইরে এসে গ্রিগর একটি কথাও না বলে চুমু খেল আকসিনিয়ার কপালে, ঠোঁটে। জিজ্ঞেস করলে: ভাল তো, আকসিনিয়া?

—অনেক কথা, বলতে পারব না ··কাল আসবে ?

—আসব।

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বাড়ি ফেরে আকসিনিয়া, যেন ঘরে কতো জরুরী কাজ পড়ে রয়েছে তার। একেবারে নিজের দরজার কাছে এসে তবে সে ধীরে ধীরে হাঁটে, সাবধানে সিঁড়ি ডিঙোয়। এখন যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ও একলা হয়ে থাকতে চায় নিজের মনকে সঙ্গী করে, অপ্রত্যাশিত এই সুখটুকু বুকে নিয়ে।

জামা আর ওডনা খুলে ঘরের বাতি না জালিয়েই ও সোজা চলে যায় শোবার ঘরে। খডখড়ি তুলে-দেয়া জানালাটা দিয়ে রাতের ঘন বেগুনি আভা চুপি-চুপি এসে পড়েছে কামরার ভেতর। উনোনের পেছনে একটা উচ্চিংড়ে সজোরে ডেকে চলেছে। খানিকটা অভ্যাসের বশেই আকসিনিয়া তাকালো আয়নাটার দিকে অন্ধকারে যদিও নিজের চেহারাটা দেখতে পেল না তবু চুল সমান করে নিয়ে বুকের কাছে মসলিন-ব্লাউজেব কুঁচিগুলো টেনে দিলে। তারপর জানালার পাশে গিয়ে ক্লান্তভাবে বসে পডল বেঞ্চের ওপর।

জীবনে অনেকবারই ওর আশা-অকাঙ্ক্ষা অন্যায্য প্রতিপন্ন হযেছে, তাই হয়তো এবারও ওর মনে আনন্দের জায়গায় উদ্বেগ এসে বাসা বাঁধছে ক্রমাগত। এবাব কোন্ দিকে মোড নেবে ওর দিনগুলো? ভবিষ্যতে কী অপেক্ষা করছে ওর জন্য? অবশেষে মেয়েমানুষের তিক্ত সুখভাগ্য অনেক বিলম্ব করে ওব ওপর প্রসন্ন হল না কি?

সমস্ত সন্ধ্যাটুকু যে অধীর উত্তেজনায় কেটেছিল তার ফলে এখন ক্লান্ত আকসিনিয়া। জানালার ঘষা-কাঁচের ঠাণ্ডায় গালটা চেপে ধরে, শান্ত ব্যথাতুর চোখেব দৃষ্টি মেলে দেয় আঁধারের দিকে। সে আঁধার খুব সামান্যই দূর হয়েছে তুষারপাত হলেও।

* * *

টেবিলেব ধারে বসেছে গ্রিগর। পুরো এক গেলাস নিজেব জন্য ঢেলে নিয়ে এক ঢোঁকে সবটুকু খেয়ে ফেললে।

—ভাল্লো লাগল? জিজ্ঞেস করলে প্রোখর।

—বলতে পারি না। এক যুগ পরে আজ খেলাম।

প্রোখর বেশ জোর দিয়ে বললে—ঠিক জাব আমলের ভদ্‌কার মতো মাইরি!—তারপর একটু ঝোঁক সামলে মিশ কাকে জড়িয়ে ধরে বললে—তুমি তো মিশ্‌কা এসব ব্যাপারে একেবারেই আনাড়ি, বাছুরে যেমন ঢক ঢক করে গেলা বোঝে না। কিন্তু মদের কথা যদি বলো তো ঠিক কোন্ জিনিসটে কেমন তা এ-বান্দাই বলতে পারে। আরে সে আমাদের কালে যা-সব মাল

খেয়েছি। এমন মদ আছে যা বোতলের ছিপি খোলার আগেই পাগলা কুত্তার মতো ফেনিয়ে ওঠে—মাইরি বলছি একটুও মিথ্যে নয়কো। প্যোলাণ্ডে থাকতে একবার ফ্রণ্ট ভেঙে এগিয়ে যাচ্ছি বুদিয়নির সঙ্গে, পোলদের একটু শিক্ষা দেব বলে। সেখানকার একটা জমিদারী মহাল ঝাঁপিয়ে পড়ে দখল করা গেল। মহালের বাড়িটা দোতলা কি তেতলা সমান উঁচু। আঙিনায় গোরু-ভেড়া সব শিঙ্ ঠেকিয়ে গাদাগাদি। নানা জাতের মুরগি চরে বেড়াচ্ছে, থুতু ফেলবার জায়গাটুকু নেই। মোদ্দা কথা, জমিদারটি রাজার হালে থাকেন। আমাদের সেপাইরা যখন ঘোড়ায় চেপে ঢুকে পড়ল তখন অফিসাররা বসে তাঁর সঙ্গে খানপিনা করছিল—একেবারে ভাবতেই পারেনি যে আমরা আসব। ফলবাগিচা পার সিঁড়িতে ফেলে সবগুলোকে কচুকাটা করা হল। খালি একজনকে করা হল বন্দী। চেহারায় মালুম হচ্ছিল লোকটা হোমরা-চোমরা অফিসার কিন্তু গ্রেপ্তার করার পর তার গোঁফজোড়া ঝুলে পড়ল, সারা গা ঘামতে লাগল ভয়ে। গ্রিগর পান্তালিয়েভিচের জরুরি ডাক পড়েছিল সেনাপতিদের ঘরে তাই আমরাই রয়ে গেলাম হেপাজতে। নিচের তলায় ঘরগুলো দেখতে কলুম। সেখানে এক বিরাট টেবিল পড়ে আছে। আর তার ওপর যা কমারি খাবার। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারিফ করছি, কারুর হাত ওঠে না প্রথমে, যদিও পেট তখন সকলেরই চোঁ-চোঁ। ভাবলুম কে জানে রে বা, হয়তো সব বিষ মিশোনো। আমাদের বন্দীটাকে শয়তানের চেলা মনে হল। তাকে হুকুম করলাম নে খা। সে খেল। হামহুম করে নয়, রে খেল। বললুম এবার মদ খা। তাও সে পান করল। প্রত্যেকটা দ থেকে বড়ো বড়ো গরাস আর প্রত্যেক বোতল থেকে এককে গেলাস ক ঠেসে খাওয়ানো হল তাকে। চোখের ওপর দেখতে দেখতে টাঁই হয়ে গল লোকটার পেট, আর এদিকে তখনও আমাদের জিভ থেকে জল বহে। তারপর যখন দেখলুম লোকটা তো মরল না, তখন আমরা লেগেপড়লুম কাজে। খেলুম, ফেনিয়ে ওঠা মদ পেটে ঢাললুম যতক্ষণ না গল অবধি ওঠে। তারপর চেয়ে দেখি সেই অফিসারটা পেট খালি করবেশুরু করেছে—দুদিক থেকেই। ভাবলুম—সব্বোনাশ। আমাদের এবার যে গেল। শয়তানের বাচ্চা ইচ্ছে করেই বিষ-মিশোনো খাবার খেয়ে আমাদেরও যমের দুয়ারে টেনে এনেছে। তলোয়ার খুলে ছুটে গেলুম অরা লোকটার দিকে, সে তখন হাত-পা নেড়ে চেঁচাচ্ছে আপনাদের দয়ায় একটু বেশী খেয়ে ফেলেছি তাই। আপনারা ঘাবড়াবেন না, খাবার অতি শুদ্ধ আমরা ফের ঘুরে এলাম বোতলের কাছে। একটার ছিপি টেনে খুলতেই একবারে বন্দুকের গুলি ছোটার মতো ছিটকে বেরুলো মদ আর ফেনা উঠ লাগল মেঘের মতো, দেখে তো আমাদের হৃৎকম্প। মদের ঝোঁকে গোতে তিনবার ঘোড়া থেকে আছাড় খেয়ে

পড়েছি। যখনি জিনের ওপর চড়ে বসি মনে হয় যেন বোঁ করে শূন্যে উঠে গেলাম। তাই বলছি, ও রকম মদ যদি সব সময় পেতুম, বা খালি পেটে দুএক পাত্তর পড়ত তাহলে আমার একশো বছর পরমাই হত। কিন্তু যা অবস্থা তাতে কেউ অতদিন বাঁচবে বলে মনে হয়? এই এটাকে তোমরা মদ বল? মদ নয়, মহামারী। পেটে পড়লে আর দেখতে হবে না, বয়েস হবার আগেই টেঁসে যাবে।—ভদ্কার বোতলটা মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করে দেখিয়ে প্রোখর আরেক পাত্র ঢেলে নিলে কানায় কানায় ভর্তি করে।

দুনিয়া চলে গেল শোবার ঘরে, বাচ্চা-কাচ্চাদের নিয়ে ঘুমোবে। একটু বাদে প্রোখর ওঠে। ভেড়ার চামড়ার কোটটা কাঁধের ওপর ফেলে বলে:

—বোতলটা আর নেব না। খালি বোতল নিয়ে ঘরে ফিরতে আমার মন চায় না। যখন ঘরে ফিরব বউ তো আমার কুরুক্ষেত্র বাধাবে। সে কাজে সে খুব দড়ো! জানি না কোথেকে অত জঘন্য সব ভাষা খুঁজে পায়? একটু মাল টেনে হয়তো ঘরে ফিরলুম, ব্যস আমার ওপর লঙ্কি। বলে: ওরে মাতাল কুকুর, হাতকাটা কুত্তা, তুই অমুক, তুই তমুক, আরো কতো কি। আমি খুব ভদ্রভাবে নরমসরম হয়ে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করি। বলি: আরে হতচ্ছাড়ি মুখ্যু, কুলীন ছানা, মাতাল কুকুর, তুই কবে কোথায় দেখলি, তাছাড়া হাত-কাটা কুত্তা কখনো হয়? অমন জিনিসের অস্তিত্ব নেই সংসারে। আমি ওর নিলজ্জো কথা একটা যদি কেটে দিলুম তো আরেকটা বানাবে। সেটা যদি কাটলুম তো তিন নম্বর একটা বলে অপমান করবে। এই সারা রাত ভোর অবধি চলে। শুনতে শুনতে একেক সময় হয়রান হয়ে চালাঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। আবার অনেক সময় এক পাত্তর টেনে হয়তো বাড়ি ফিরেছি, ওর মুখে রাগটি নেই, গালিগালাজ নেই, তখন আমার ঘুমই আসে না, সত্যি বলছি। মনে হয় যেন কী হল-না হল-না, উশখুশ করতে থাকি, ঘুমতে পারি না। ওভাবে কাঁহাতক আর চলে। শেষমেষ গিন্নিকে ছুঁতেই সে গাল পাড়তে থাকে যতক্ষণ-না আমিই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠি। আমার নিকেশ করে ছাড়ে, আমিও যেন ঝগড়া না করে পারি না। চালিয়ে যাক যতো পারে, ওই বেশী কাজের লোক হবে। সত্যি কিনা বলো? আচ্ছা, আমি চলি। বিদায়! বাকি রাতটা আস্তাবলেই কাটাব গিন্নিকে আর বিরক্ত না করে?

গ্রিগর হেসে বলে—ঘরে ঠিকমতো ফিরতে পারবে তো?

—হ্যাঁ, কাঁকড়ার মতো গুঁড়ি মেরে মেরে যাব! আমি কি কসাক নই, পান্তালিয়েভিচ? তোমার অমন প্রশ্ন শুনলে মাথা খারাপ হয়ে যায়।

—বেশ, তাহলে ঈশ্বর তোমার যাত্রার সহায় হোন্। গ্রিগর ওর বন্ধুকে বাইরের ফটক অবধি এগিয়ে দিয়ে এল। তারপর ফিরল রান্নাঘরে।

যাক্ এবার একটু কথাবার্তা হোক, মিখাইল ?

—বেশ তো।

টেবিলের ত্বপাশে মুখোমুখি বসে ত্বজনে। খানিকক্ষণ চুপচাপ। অবশেষে গ্রিগর বলে :

—আমাদের ত্বজনেব মধ্যে কেমন একটা মন কষাকষির ভাব এসে পড়েছে। ··তোমাব মুখ দেখলে বুঝতে পারি কোথাও কিছু গোলমাল হয়েছে। আমি আসতে তুমি খুশী হওনি ? নাকি আমারই বোঝার ভুল ?

—না, তুমি ঠিকই ধবেছ, আমি খুশী হইনি।

—কেন হওনি বলো তো ?

—অনর্থক ত্বশ্চিন্তা বাড়িয়েছ।

—আমি বোধহয নিজেই নিজেব খোবাকির ব্যবস্থা কবে নিতে পাবব।

—সেকথা আমি ভাবিনি।

—তাহলে কিসের কথা ভেবেছ ?

—তুমি আব আমি পবস্পরেব শত্রু

—শত্রু আগে ছিলাম।

—হ্যা, এবং ভবিষ্যতেও থাকব সেটা পবিষ্কার।

—আমি বুঝতে পারছি না। কেন আমাদের শত্রুতা হবে ?

—তোমার ওপব ভরসা কবা চলে না।

—এ তুমি আন্দাজে বলছ, একেবাবে বাজে কথা।

—না, আন্দাজে নয। এই বকম সময তোমার পল্টন থেকে ছুটি হয়ে গেল কেন ? আমাকে সিধে বলতে পারবে সেকথা।

—আমি জানি না।

—হ্যাঁ, জানো, কিন্তু বলতে চাও না। তোমাকে ওরা বিশ্বাস করত না—ঠিক কিনা বল ?

—বিশ্বাস না কবলে আমাকে একটা স্কোযাড্রনেব ভার দিত না ওবা।

—সে তো যখন তুমি প্রথম যোগ দিলে কাজে। কিন্তু তারপর ফৌজে আর রাখল না তোমায, ব্যাপারটা তাই একেবাবে পবিষ্কার, ভাই।

—কিন্তু তুমি তো আমাকে বিশ্বাস করো ?—সোজা মিশকার দিকে তাকিয়ে গ্রিগর প্রশ্ন করে।

—না। বুনো নেকড়েকে যতই খাওয়াও তার মন পড়ে থাকবে বনের দিকেই।

—তুমি আজ বড্ডো মদ খেয়েছ মিখাইল।

—ছাড়ান দাও ও-কথা। তোমার চেয়ে কিছু বেশী খাইনি আমি। তোমাকে ওখানে যেমন ওরা ভরসা করতে পারেনি এখানেও তার চেয়ে বেশী ভরসা করবে না, সেকথা মনে রেখ।

গ্রিগর চুপচাপ নিস্পৃহভাবে থালা থেকে এক টুকরো নুন-মাখানো শশা তুলে নেয়, চিবিয়ে থুথু করে আবার ফেলে দেয়।

মিখাইল বলে—বউ তোমাকে কিরিল গ্রমফের কথা বলেছে?

—হাঁ্যা।

—ওর ফিরে আসার ব্যাপারটাও আমি পছন্দ করিনি। যেদিন শুনতে পেয়েছিলাম সেদিনই…

গ্রিগর ফ্যাকাশে মেরে যায়, রাগে চোখ বড়ো বড়ো করে বলে : তোমার কাছে আমি তাহলে কিরিল গ্রমফেরই সমগোত্র?

—চেঁচিও না। কোন দিক থেকে তুমি ওর চেয়ে সেরা?

—দেখ, তুমি তো জানো…

—জানাজানির ব্যাপার নয়। জানি আমরা অনেক আগে থেকেই। ধরো যদি মিৎকা করশুনফ এসে হাজির হয়, তাহলেও কি আমি খুব খুশী হব? না, তার চেয়ে তুমি গাঁয়ে এসে মুখ না দেখালেই বোধহয় ভাল হত।

—ভাল হত তোমার পক্ষে?

—আমার পক্ষে, লোকজনের পক্ষে। আস্তে—

—আঃ কিরিলের সঙ্গে আমার তুলনা কোর না।

—আমি তো আগেই বলেছি গ্রিগর, এ ব্যাপারে অত উত্তপ্ত হবার কিছু নেই, ওদের চেয়ে তুমি এমন-কিছু উঁচুদরের নও। বরং তুমি আরো বিপজ্জনক।

—কী ভাবে? কী বলতে চাও তুমি?

—ওরা তো সাধারণ কসাক, কিন্তু বিদ্রোহ পাকিয়েছ তুমি।

—আমি পাকাইনি, আমি কেবল একটা ডিভিশনের সেনাপতি ছিলাম, ব্যস্।

—এবং সেটা কিছুই নয়?

—বেশী কি কম, প্রশ্ন সেটা নয়। যদি লালফৌজের লোকরা সেদিন সন্ধ্যায় আমাকে মারবার ফন্দি না করত তাহলে হয়তো বিদ্রোহে যোগই দিতাম না।

—অফিসার না হলে তোমাকে কেউ স্পর্শও করত না।

—তাহলে বলব ফৌজে আমাকে যদি না নিত তাহলে আমি অফিসারও হতাম না। সে বলতে গেলে এক মহাভারত হয়ে যায়।

—হ্যাঁ, সে এক লম্বা নোংরা কেচ্ছা হয়ে যায়।

—যাই হোক সে পুরোনো বৃত্তান্ত ঘেঁটে লাভ নেই, যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে।

দুজন নীরবে ধূমপান করে। নখ দিয়ে সিগারেটের ছাই ঝেড়ে কশেভয় বলে :

—তোমার বীরত্বের কাহিনী সবই জানি, সবই শুনেছি। আমাদের বহু লোককে তুমি মেরেছ, চোখের সামনে তোমাকে দেখলে তা ভোলা বড সহজ নয়। ··এত তাডাতাডি ভোলা যায় না!

গ্রিগর ব্যঙ্গভবে হাসে।

—স্মৃতিশক্তি তোমার ভালোই। আমাব ভাই প্রিয়োত্রাকে তুমি খুন করেছিলে। কিন্তু সে-কথা তোমাকে স্মরণ কবিযে দিতে চাই না।···সবই যদি আমাদের মনে কবে রাখতে হয তাহলে তো নেকডের মতো খেয়োখেয়ি করেই জীবন কাটাতে হবে।

—হ্যাঁ, আমি পিয়োত্রাকে মেরেছিলাম তা অস্বীকাব কবি না। আর সে-সময় যদি তুমি আমাব থপ্পরে পডতে তাহলে তোমাকেও ময়দানে শুইয়ে দিতাম।

—কিন্তু আমি ···ইভান আলোসিয়েভিচকে যখন ওরা থপার নদীর ওপারে বন্দী করেছিল, আমি তখন তাডাতাডি ঘবে ফিবে এলাম তুমি ওদের সঙ্গে ধরা পডেছ সেই আশঙ্কা করে। আমাব ভয় হয়েছিল, কসাকবা হয়তো তোমায় মেরে ফেলবে। এখন মনে হচ্ছে অত তাডাতাডি না এলেই পারতুম।

—ওরে আমাব রক্ষাকর্তা বে! লডাইযে জিতলে আমাব সঙ্গে কি আর এই সুবে কথা বলতে, একেবাবে ফালা ফালা করে কাটতে আমায। এখন নেহাতই দাযে পডে এতো দযালু সেজেছ।

—অন্যরা হযতো তোমার জ্যান্ত ছাল ছাডিযে নিত কিন্তু আমি তোমায মেবে হাত নোংবা কবব না।

—তাহলে তুমি আব আমি একেবাবেই আলাদা ধাতেব মানুষ। দুশমনকে মেবে হাত নোংরা কবতে কখনই আমাব বাধেনি, এখনও দবকাব পডলে একটুও হাত কাঁপবে না। —বাকি ভদ্‌কাটুকু গেলাসে ঢেলে মিখাইল জিজ্ঞেস কবলে—খাবে ·

—ঠিক আছে, নেশাটা একটু বেশী বকম কেটে গিয়েছিল।

নীরবে গ্লাস ঠেকিয়ে ওরা পান করে। কাত হয়ে টেবিলেব ধারে বুক ঠেকিয়ে গ্রিগব গোঁফে তা দেয় আব আধবোজা চোখে মিখাইলেব দিকে তাকিয়ে থাকে।

—কিন্তু তোমার এত ঘাবডাবার কি হল মিখাইল। সোভিয়েত সরকাবের বিরুদ্ধে আমি আবার বিদ্রোহ করব বলে ভয় হচ্ছে?

—ভয় আমার কিছুতেই নেই। তবে হঠাৎ যদি কিছু ঘটে যায় তাহলে তুমি হয়ত ·· ার পক্ষের দিকে সরে পডবে এই ভাবনা।

—পোলদের বেলায়ও তো আমি তাই করতে পারতাম। আমাদের গোটা রেজিমেন্টটাই তো ওদের দিকে চলে গিয়েছিল।

—সেটা বুঝি করে উঠতে পারোনি?

—না তা নয়, আসলে আমি তা চাইনি। চাকরির কাল আমার শেষ হয়েছে। আর কারও সেবা করার এতটুকু ইচ্ছা আমার নেই। বয়সের তুলনায় ঢের লড়াই লড়েছি, এখন আমার আর ক্ষমতা নেই। কিছুতেই আমার আর উৎসাহ নেই, বিপ্লবেও নয় প্রতিবিপ্লবেও নয়। গোল্লায় যাক চুলোয় যাক সব। আমি আমার বাকি জীবনটুকু বাঁচতে চাই ছেলেপুলেদের নিয়ে, আবার জমি-জিরেত করে, ব্যাস! মিখাইল, বিশ্বাস করো, এ আমার একেবারে প্রাণের ভিতরের কথা।

ব্যাপার যাই হোক, হাজার ভরসা দিয়েও মিখাইলকে বোঝানো যাবে না। গ্রিগর তা বুঝতে পেরে চুপ করে গেল। মুহূর্তের জন্য নিজের ওপর বিতৃষ্ণা এল ওর। কীসের দরকার পড়েছিল অমন করে সাফাই দেবার চেষ্টা করার নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করার? মাতালের মতো তর্ক চালিয়ে আর মিখাইলের নির্বোধ বক্তৃতা শুনে কোনো কাজ হল ওর? চুলোয় যাক্ সব! উঠে দাঁড়াল গ্রিগর।

—এসব অর্থহীন কথাবার্তায় কোনো লাভ নেই। যথেষ্ট হয়েছে! আমার শেষ কথাটুকু তোমায় শুধু শুনিয়ে দিতে চাই। যতক্ষণ হুকুমত আমার টুঁটি [illegible] না ধরছে ততক্ষণ আমি তার বিরুদ্ধে কিছুই করব না। কিন্তু যদি সে হাত বাড়ায় তাহলে আমিও নিজের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করব। মোটের ওপর বিদ্রোহের নাম করে আমার মাথা বেচতে পারব না, যেমনটি করেছে প্লাতন রীয়াবচিকফ।

—কী বলতে চাও?

—ঠিক যা বলছি। লালফৌজের কাজ আমি করেছি তার হিসেব নিক ওরা, কতগুলো জখম রয়েছে শরীরে দেখুক। বিদ্রোহের জন্য আমি জেলে যেতে রাজী, কিন্তু তার মানে যদি হয় গুলি খেয়ে মরা, তাহলে মাপ করবেন! ওটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে।

মিখাইল বিদ্রূপের হাসি হাসে।

—মাথায় এক আজগুবি ধারণা ঢুকেছে তোমার! বিপ্লবী আদালত বা চেকা তোমাকে জিজ্ঞেস করবে না কী তোমার চাই আর কী না-চাই, তারা তোমার সঙ্গে দর কষাকষিও করবে না। যদি একবার অপরাধী হিসেবে ধরা পড়েছ তাহলে কড়ায় গণ্ডায় ওরা মাশুল তুলে নেবে! পুরোনো পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে নিক্তির ওজনে।

—বেশ, তাহলে তখনই দেখা যাবে।

—সে তো দেখব, বটেই তো!

গ্রিগর বেল্ট্ আর জামা খুলে ফেলে। তারপর বুট জোড়া টানাটানি করে খোলে সশব্দ প্রয়াসে।

জুতোর তলাটা খানিকটা হাঁ হয়ে বেরিয়ে এসেছিল, অনাবশ্যক

মনোযোগ দিয়ে তাই দেখতে দেখতে গ্রিগর প্রশ্ন করে—খামারটা তাহলে ভাগাভাগি করে নিই?

—ভাগ বাঁটরা করতে সময় লাগবে না। আমি আমার কুঁড়েঘরটা মেরামত করে নিয়ে ওখানেই গিয়ে উঠব।

—হ্যাঁ, মোট কথা আলাদা হয়ে যাওয়াই ভাল আমাদের। তোমার আমার কখনো বনিবনা হবে না।

—যা বলেছ। মিখাইল সায় দেয়।

—আমার সম্পর্কে শেষে তোমার এই ধারণা হবে আমি ভাবতে পারিনি যাক্ সে কথা।

—আমার সিধে বাত। যা মনে ভেবেছি তাই বললুম তোমায়। ভিয়েশেন্স্কায় কখন যাচ্ছ?

—কাল-পরশুর মধ্যেই যে কোনো সময় যাওয়া যাবে।

—'যে কোনো সময়' নয়, কালকেই তোমাকে যেতে হবে।

—পঁচিশ মাইল রাস্তা পায়ে হেঁটে এসেছি। খুবই ক্লান্ত আমি। কালকের দিনটা বিশ্রাম করে পরশুদিন গিয়ে রেজিস্ট্রি করে আসব।

—হুকুম আছে রেজিস্ট্রি করতে হবে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই। কালই চলে যাও।

—আমার বুঝি বিশ্রামের দরকার নেই? পালিয়ে যাচ্ছি না তো।

—শয়তানই জানে তোমার মতলব। তোমার দায়িত্ব নেবার এতটুকু ইচ্ছে আমার নেই।

—তুমি যে একটা শুয়োর হয়ে দাঁড়িয়েছ মিখাইল। পূর্বেকার বন্ধুর কঠিন মুখখানা সত্যিই অবাক হয়ে দেখতে দেখতে কথাটা বলেছে গ্রিগর।

—শুয়োর-টুয়োর বোলো না আমাকে। ও শোনার অভ্যেস নেই আমার।—মিখাইল নিঃশ্বাস চেপে গলার আওয়াজ উঁচিয়ে বলে—তোমার ওইসব অফিসার-মার্কা হালচাল ছাড়তে হবে, বুঝলে। আমি বলছি কাল তুমি ভিয়েশেনস্কায় যাবে। যদি নিজের ইচ্ছায় না যাও, তাহলে সেপাই সঙ্গে দিয়ে পাঠাব সেটা বুঝে নিও।

—এখন আমি সবই বুঝে নিয়েছি।—গ্রিগর ঘৃণাভরা চোখে তাকায় ওর ভগ্নিপতির দিকে। মিখাইল তখন নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছে। ও নিজেও গিয়ে শুয়ে পড়ে কাপড় জামা না ছেড়েই।

হ্যাঁ, ঠিক যেমনটি হবার কথা ছিল তেমনটিই হল। আর ওর জন্যই বা আলাদা রকম অভ্যর্থনা হবার কী কারণ থাকতে পারে? সত্যিই তো ও কেন ভেবেছিল যে লালফৌজে ওর সংক্ষিপ্তকালের বিশ্বস্ত দেশসেবা আগেকার সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত ঘটাবে? সব কাজেরই ক্ষমা নেই, পুরোনো দেনা কড়ায়-গণ্ডায় শুধতে হবে—মিখাইলের এই বক্তব্যই হয়তো ঠিক।

ঘুমিয়ে গ্রিগর স্বপ্ন দেখলে, বিরাট স্তেপের মাঠে একটা ফৌজী রেজিমেণ্ট আক্রমণের জন্য মোতায়েন হয়েছে। তারপর যেন দূর থেকে একটা টানা সুরে হুকুম এল :—স্কোয়া··ড্ রন্! গ্রিগর টের পেল ওর ঘোড়ার পেটের নিচে জিন-সাজটা শক্ত করে বাঁধা হয়নি। শরীরের সমস্ত ভারটা ও ছেড়ে দিল ডান পায়ের ওপর—জিনটা নিচে থেকে হড়কে বেরিয়ে যাচ্ছে। লজ্জা আর ভয়ের অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে ও ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল সাজের রশি শক্ত করবার জন্য, আর সেই মুহূর্তে ওর কানে এল অসংখ্য ঘোড়ার খুরের বজ্রনাদ, নিমেষের জন্য জোরালো হয়েই আবার ক্ষীণ হয়ে দূরে সরে যাচ্ছে। ওকে বাদ দিয়েই রেজিমেণ্ট আক্রমণে সামিল হয়েছে।

পাশ ফিরে শুতে ঘুম ভেঙ্গে যায় গ্রিগরের। ওর নিজেরই অস্পষ্ট গোঙানি শুনতে পায়।

জানলার বাইরে দিনের আলো সব ফুটতে শুরু করেছিল। রাতে নিশ্চয়ই হাওয়ার তোড়ে কাঠের খড়খড়ি খুলে গেছে, পুরোনো ঘষা কাঁচের ভেতর দিয়ে অস্তগামী চাঁদের সবুজাভ থালাটা নজরে পড়ে। তামাকের থলি হাতড়ে ও একটা সিগারেট ধরায়। হৃৎপিণ্ডটা যেন তখনো দুরদুর করছে [illegible]। চিত হয়ে শুয়ে ও হাসে এমন বিশ্রী স্বপ্নও দেখে মানুষ! লড়াই থেকে বরবাদ ভোরের সেই মুহূর্তটিতে ও ভাবতেও পারেনি যে ওকে আবার [illegible] লড়াইয়ে সামিল হতে হবে বার-বারে—শুধু স্বপ্নের মধ্যেই নয় রীতিমতো জেগে থেকেই

॥ সাত ॥

ভোর থাকতেই উঠে পড়ে দুনিয়া। গাই দোহাতে হবে। গ্রিগর নিঃশব্দে রান্নাঘরের কাছে ঘুরছিল আর মাঝে মাঝে কাশছিল। বাচ্চাদের গায়ের উপর কম্বল টেনে দিয়ে দুনিয়া চট্‌পট্ পোশাক পরে রান্না ঘরে ঢুকলো। দেখল ওর দাদা কোটের বোতাম আঁটছে।

—এত সকালে কোথায় যাচ্ছ দাদা?

—এই একটু গাঁয়ের ভিতর দিয়ে পায়চারি করে আসি।

—তার আগে কিছু খেয়ে গেলে হতো না ?

—ইচ্ছা করছে না, মাথা ধরেছে।

—সকালের খাওয়ার আগে ফিরবে তো ? আমি উনুন ধরাতে যাচ্ছি।

—আমার জন্য অপেক্ষা করার দরকার নেই ; তাড়াতাড়ি ফিরতে পারব না।

রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল গিগর। সকালের দিকে সামান্য বরফ গলতে শুরু করেছিল, দক্ষিণের বাতাস খানিকটা ভিজে আর ঈষৎ উষ্ণ জুতোর গোড়ালিতে বরফ-মিশানো কাদা লেগে যাচ্ছে। গাঁয়ের মাঝখান বরাবর ধীরে ধীরে হেঁটে যাওয়ার সময় গ্রিগর আশৈশব চেনা বাড়িঘরগুলো এমন ভাবে খুঁটিয়ে দেখছিল যেন ও কোনো অচেনা পাড়ায় এসে পড়েছে। গেল বছর কশেভয় সদাগর-দের বাড়ি আর দোকানপাটে আগুন লাগিয়েছিল, তারই পোড়া ইট-কাঠ কালো হয়ে আছে চত্বরের মাঝে।

গির্জা-ঘরের ধসে-পড়া দেয়াল জায়গায় জায়গায় হাঁ হয়ে আছে। গ্রিগর নির্বিকারভাবে ভেবে নিলে—ইটগুলো আর কিছু না হোক, উনুন তৈরির কাজে লেগেছে! গির্জা-ঘরটা সেই আগের মতোই পুরনো, ছোট, এক কোণে গুঁড়ি মেরে বসে আছে যেন। ছাদে বহুকাল রঙ পড়েনি, মরচে ধরে গেছে। নোনা-ধরা দেয়ালে চিত্র-বিচিত্র বাদামি দাগ। যেখানে চুনকালি খসে পড়েছে, সেখানে দগদগে টাটকা লাল ইট বেড়িয়ে পড়েছে।

রাস্তা জনশূন্য। শুধু দু'তিনটি স্ত্রীলোক ঘুম-চোখে ওর পাশ কাটিয়ে চলে গেল কুয়োর কাছে। বাইরের লোক ভেবে ওরা প্রথমে গ্রিগরকে নীরবে নমস্কার করেছিল, কিন্তু পাশ দিয়ে চলে যাবার পরই ওরা থমকে দাঁড়িয়ে হাঁ করে চেয়ে দেখতে লাগল গ্রিগরকে। গ্রিগর ঘুরে দাঁড়াল। ভাবল একবার কবরস্থানে গিয়ে মাকে আর নাতালিয়াকে দেখে আসা উচিত। গোরস্থানের রাস্তা ধরে এগোয় কিন্তু খানিকটা গিয়েই ফের দাঁড়িয়ে পড়ে। মনটা ওর এমনিতেই বড় ভারি হয়ে আছে। আর একসময় যাওয়া যাবে স্থির করে প্রোখরের বাড়ির দিকে সে পা চালায়।

—আমি এলাম কি এলাম না সবই ওদের কাছে সমান। এখন ওরা শান্তিতেই আছে। ওদের আর তো কোনো মায়া নেই সংসারে। বরফে ওদের কবর ঢাকা। কিন্তু মাটির ভিতরে নিশ্চয় আরও ঠাণ্ডা···যতদিন ওদের বাঁচার ছিল বেঁচেছে, তারপর যেন স্বপ্নের মতো সবাই মিলিয়ে গেল। ওখানে ওরা ঘুমিয়ে আছে একসঙ্গে, পাশাপাশি। আমার বৌ, মা, পিয়োত্রা আর দারিয়া। ···গোটা পরিবারটাই যাত্রা করেছে ওপারে। ভালই আছে ওরা ওখানে। শুধু বাবাই একা পড়ে রইল কোন্ ভিন্‌দেশের মাটির তলায়। ওখানে অচেনাদের মাঝে তার নিশ্চয় ভাল লাগছে না।···

গ্রিগর আর তাকিয়ে দেখল না আশপাশে। সোজা পায়ের দিকে

তাকিয়ে পথ চলতে লাগল। সাদা গলন্ত বরফ অল্প ভিজে আর খুব নরম, এত নরম যে পায়ের তলায় টেরই পাওয়া যায় না, হাঁটতে গেলে শব্দ হয় না একটুও।

এবার ছেলেপিলেদের কথা মনে পড়ল। বয়সের তুলনায় ওরা সব কেমন যেন গম্ভীর আর বিষণ্ণ, ওদের মা বেঁচে থাকতে ওরা তো অমন ছিল না? মৃত্যু বুঝি অনেকটা বেশিই ছিনিয়ে নিয়েছে ওদের কাছ থেকে, তাই হয়তো ভয় পায়। কাল পলিউশ্কা ওকে দেখে কেন কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল? ছোটরা তো সাধারণত কাউকে অনেক দিন বাদে দেখলে অমন করে কাঁদে না? কি ভাবছিল মেয়েটি? ওর হাতটা গ্রিগর নিজের হাতে তুলে নিতে চোখে যেন ওর জল উপচে উঠল? হয়তো এতকাল ধরে ভেবেছিল যে ওর বাবা মরে গেছে, হয়তো আর কখনো ফিরে আসবে না, তারপর তাকে দেখতে পেয়ে ভয় পেয়ে গেছে। সে যাই হোক ওদের জন্য নিজেকে তিরস্কার করবার কোন কারণ নেই গ্রিগরের। কিন্তু আকসিনিয়াকে বলতেই হবে যাতে ওদের একটু যত্ন করে, যতদূর সম্ভব ওদের মায়ের স্থান পূরণ করতে চেষ্টা করে। হয়তো বা সৎমাকে ওরাও ভালবাসতে শিখবে। আকসিনিয়া তো মানুষ খুবই ভালো। দরদী মেয়ে। গ্রিগরের প্রতি ওর টান আছে বলে হয়তো ছেলেপিলেগুলোকে ভালবাসবে।

বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করতে মনে বড় তিক্ততা ও ব্যথা জাগে। ব্যাপারটি অত সহজ নয়। এই সেদিন পর্যন্ত জীবনটাকে যত সরল হবে বলে ও মনে করেছিল এখন আর তত সরল মনে হচ্ছে না। ছেলেমানুষি এক মূঢ় সরল বিশ্বাসে ও ধরে নিয়েছিল যে শুধু ঘরে ফিরে পল্টনের উর্দি ছেড়ে চাষীর কোর্তা পরলেই বুঝি সব হাসিল হয়ে যাবে বাঁধা-ধরা নিয়মে। কেউ ওকে একটি কথাও বলবে না, কেউ গালমন্দ করবে না, সব আপনা থেকেই ঠিকঠাক হয়ে যাবে আর সেও জীবনের বাকি দিনগুলো কাটিয়ে দেবে শান্তিপ্রিয় চাষা আর আদর্শ গ্রামবাসী হিসেবে। কিন্তু না, বাস্তব তো অত সহজ সরল মনে হচ্ছে না।

সাবধানে প্রোখর জাইকফের বাড়ির ফটকটা খুলল গ্রিগর, একটা কব্জার ওপর ঝুলছিল ফটকের পাল্লা। তালি-লাগানো একজোড়া ঢাউস্ বুটজুতো পরে, তেকোণা টুপিটা ভুরুর ওপর টেনে দিয়ে, প্রোখর হেঁটে যাচ্ছিল সিঁড়ির দিকে—দুধ-দোহাবার খালি বালতিখানা দোলাতে দোলাতে।

—ভালো ঘুম হল, কমরেড কমাণ্ডার? গ্রিগরকে সম্ভাষণ জানাল প্রোখর।

—ধন্যবাদ!

—আর দেখছ কি! মাতলামির সাজা মিলল হাতে হাতে!

—কিন্তু বালতিটা খালি যে? নিজেই গরু দোহাচ্ছিলে বুঝি?

মাথা নেড়ে প্রোখর টুপিটা মাথার পেছনদিকে ঠেলে দেয়। এবার গ্রিগরের নজরে পড়ল বন্ধুর মুখখানা শুকনো শুকনো!

—আমি না তো কি শয়তানে দুইয়ে দেয়? হ্যাঁ, আমিই দোহাচ্ছিলাম হতচ্ছাড়ীকে। বেটির নাড়ি ব্যথা হোক!—রাগে ঝটকা মেরে বালতিটা ছুঁড়ে দিয়ে প্রোখর চলে—চলো, ঘরে চলো।

গ্রিগর দ্বিধাভরে বললে—তোমার বউ?

—শয়তানে তার মাথা চিবিয়ে খেয়েছে। ভোরের আলো না ফুটতেই তিনি সেজেগুজে বেরিয়েছেন ক্রুঝিলিনস্কি থেকে রান্নার কাঠ কুড়িয়ে আনতে। কাল তোমাদের ওখান থেকে বেরিয়ে এসে বাড়ি ঢুকেছি কি ঢুকিনি, পড়ে গেলাম তার খপ্পরে। তারপর বক্তিমে দিয়ে আমাকে নানারকম বোঝানো হল। শেষে হঠাৎ বললে, 'আমি রান্নার কাঠ জোগাড় করতে বেরুব একটু। মাকসায়েফের বউঝিরা আজ যাচ্ছে, আমিও ওদের সঙ্গে যাব।' আমি ভাবলুম —'তা যাও না, বেশ তো। কাঠ কেন, পেয়ারাও কুড়িয়ে আনো, রাস্তা তোমার জন্য নিষ্কণ্টক হোক!' ঘুম থেকে উঠে উনোন ধরালাম, গরু দোহাতে গেলাম। দুইয়েছিলাম ঠিকই। তা একটিমাত্র হাতে এত কাজ করা বেটাছেলের পক্ষে সোজা নাকি বল?

—কোনো মেয়েছেলেকে বললে না কেন করে দিতে, গাধা!

—সে তো 'গোয়ালার আশি বছরে বুদ্ধি' না কি বলে, তাই। আমি তো জীবনে গাধা ছিলাম না কোনকালেও। ভেবেছিলাম নিজেই করে নিতে পারব। তা করেও ছিলাম ঠিকই। গরুটার নিচে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকলাম, কিন্তু হতচ্ছাড়ী কিছুতেই থির হয়ে দাঁড়াবে না, কেবলই ছটফট করবে। যাতে ভয় না পায় তাই টুপিটা অবধি খুলে নিলাম, কিন্তু তাতে কোনো ইতরবিশেষ হল না। দুধ দোহাতে দোহাতে ঘেমেচুমে জামা ভিজে গেল, তারপর সবে হাত বাড়িয়েছি তলা থেকে বালতিটা সরাবো বলে, ব্যস, অমনি এক লাথি। বালতি গেল একদিকে, আমি গেলুম আরেকদিকে। এইভাবে দোয়ালুম গাই। গাই তো নয়, শিংওয়ালী ডাইনী। ওটার মুখে থুতু ফেলে তবে ছাড়লুম। দুধ না হলেও আমার চলে যাবে। একটু মদ্যপান হবে?

—আছে কিছু ঘরে?

—এক বোতল। খুবই সরেস।

—বেশ, ওতেই হয়ে যাবে।

—ভেতরে এসো, আমার ঘরে পা দাও। ডিম ভেজে দেব? দুটো দুটো করে তৈরি করি, কি বল!

গ্রিগর একটু শুয়োরের চর্বি কেটে নিয়ে প্রোখরকে সাহায্য করতে লেগে গেল চুল্লির আঁচ তুলতে। কথাবার্তা না বলে ওরা দেখতে লাগল কড়ায়

লালচে চর্বি চড়বড় করে গলে গলে ছড়িয়ে পড়ছে। তারপব দেবীপটের কুলুঙ্গি থেকে প্রোখর একটা ধুলোমাখা বোতল বের করলে।

—গিন্নির কাছে গোপন করে আমাব সব জিনিস এইখানেই রাখি।—সংক্ষেপে কৈফিয়ত দেয় প্রোখব।

ছোট্ট উষ্ণ ঘরটিতে বসে দু'জনে খেল। মদ পান করে নীচু গলায় কথা-বাতা চলতে লাগল ওদের।

প্রোখব ছাড়া আব কাকেই বা গ্রিগব তাব মনেব গোপন কথাগুলো শোনাবে? দীর্ঘ পেশল পা দুটো একেবারে ছড়িয়ে টেবিলেব ধারে বসেছে সে। গলার গভীর আওয়াজ ঘসঘসে শোনায়:

—যখন পল্টনে ছিলাম, বাড়ি ফেরার পথে কেবলি ভাবতাম মাটির কত কাছাকাছি আবাব ঠাঁই নেব, লড়াইয়েব শয়তানি আপদ থেকে দূরে সরে পরিবারের সকলের মধ্যে গিয়ে বিশ্রাম করব। ধরতে গেলে আটটি বছর ঘোড়াব পিঠে একনাগাড়ে থাকা চাট্টিখানি কথা তো নয়। এমন-কি স্বপ্নের মধ্যেও, রাতের পর রাত দেখা স্বপ্নের মধ্যে সেই একই ঘটনা—হয় কাউকে মারছি, আর নয়তো নিজেই মরছি। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি প্রোখর, যা ভেবেছিলাম তা তো হতে যাচ্ছে না। দেখছি জমিতে লাঙল দিয়ে ওর যত্ন করতে যাচ্ছে অন্য মানুষরা, আমি তো নই।

—মিখাইলেব সঙ্গে কাল কথা হয়েছিল তোমাব?

—হ্যাঁ। সে সুমধুর সৌভাগ্য হয়েছিল।

—কী বললে সে?

গ্রিগব আঙুল দিয়ে ইশারা করে দেখালে।

—আদায় কাঁচকলায় আমাদেব বন্ধুত্ব এখন। একবার শ্বেতরক্ষীদেব দলে কাজ করছিলাম সেই তুরুপের টেক্কাই নাচাচ্ছে আমার নাকের উপর। ওর ধারণা নতুন সরকারের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র আমি মনে মনে ভাঁজছি, জামাব তলায় ছুরি লুকিয়ে রেখেছি। ওর ভয় একটা বিদ্রোহ হবে, কিন্তু কেন যে আমি সেটা চাইব তা সে নিজেও জানে না, এমনই গাধা।

—আমাকেও এই কথা বলেছিল মিখাইল।

নিরানন্দ হাসি হাসলে গ্রিগব।

—পোল্যাণ্ডে আমরা হামলা করাব সময় এক উক্রেইনীয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। নিজের গ্রাম রক্ষার জন্য সে আমাদের কাছে হাতিয়ার চায়। দস্যুরা সে দেশে ঢুকে লুটপাট করেছে, ওদের গরুবাছুর মেরেছে। আমাদের রেজিমেণ্টের কমাণ্ডার আমার সাক্ষাতেই তাকে বললে, তোমাদের হাতিয়ার দেব, আর তোমরা গিয়ে দস্যুদের দলে ভিড়বে তো? কিন্তু উক্রেইনীয় লোকটা হেসে বললে, আমাদের আগে অস্ত্র দিন কমরেড, তারপর আমরা দস্যুদের তো তাড়াবই, আপনাদেরও গ্রাম থেকে ভাগাব। এই মুহূর্তে আমি সেই উক্রেইনীয়

লোকটির মতোই ভাবছি: তাতরস্কে আজ যদি লাল বা সাদা কেউই না থাকত সেটা হত সবচাইতে ভাল। আমার মতে মিৎকা করশুনফ আর মিখাইল কশেভয়, দুজনেই এক ধাতুতে গড়া। মিখাইল মনে করে শ্বেতরক্ষীদের আমি এমনই ভক্ত যে ওদের না হলে আমি বাঁচব না। নিকুচি করেছে! ভক্তি তো ওদের ওপর আমার কতোই! এই তো সেদিন, ক্রাইমিয়াতে আমাদের সেপাইরা এগিয়ে যাচ্ছিল, লড়াইয়ে কর্নিলভ দলের এক অফিসারের একেবারে মুখোমুখি পড়েছি—বেঁটেখাটো কর্নেল, ইংরিজি কায়দায় গোঁফ চুমরিয়েছে নাকের নিচে ডবল শুঁড়ের মতো। তাকে এমন কায়দায় ঘায়েল করলুম যে আনন্দে আমার হৃদয় নেচে উঠছিল! বেচারি পুঁচকে কর্নেলটির ধড়ের ওপর রইল শুধু আদ্ধেকটি মাথা আর আদ্ধেক টুপি, তার অফিসারী সাদা চুড়ো-টুপি কোথায় গড়াগড়ি।…ওদের ওপর এই তো আমার ভক্তি! আমার জীবনটাকে ওরাও কম বিষিয়ে তোলেনি। নিজের গায়ের রক্ত ঝরিয়ে তবে ওই হতচ্ছাড়া অফিসারের পদে আমার জায়গা হয়েছিল। কিন্তু অফিসারদের দলে আমি ছিলাম হংস মধ্যে বকো যথা। শুয়োরগুলো কোনদিনই আমাকে মানুষ বলে গণ্য করেনি, আমার হাতে হাত মেলাতে ঘেন্না হত ওদের। এর পরেও তুমি ওকথা ভাবতে পারো। ··চুলোয় যাক ওরা। এসব কথা বলতেও আমাব বমি আসে। আর বলছে কিনা ওদের রাজত্ব আমি আবার ফিরিয়ে আনতে চাই! সেনাপতি ফিৎজেরাউলফ্‌দের আবার মসনদে বসানো' সে খেলা একবার খেলে দেখেছি, তারপর একটি বছর কেবল হেঁচ্‌কি তুলেই কেটে গেল। যথেষ্ট হয়েছে, নিজে ভুগে শিখেছি।

গরম চর্বিতে রুটি ডুবিয়ে প্রোখর বললে:

—কোনো বিদ্রোহই আর হতে পারছে না। প্রথম কথা। ক'জন কসাকই বা আছে দেশে। যারা ফিরে এসেছে তাদের যথেষ্ট শিক্ষাও হয়ে গেছে। ভাইদের রক্ত ঝরিয়েছিল হুকুম তামিল করতে গিয়ে, তারপর এখন আবার এমন শান্ত সুবোধ হয়েছে যে গলায় দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে গেলেও মাথাটি তোলানো যাবে না। তাছাড়া, একটু শান্তির জীবনের জন্যে তারা আঁকুপাঁকু করেছে। এবার গরমকালে সবাই কী আন্দাজ খেটেছে তা যদি দেখতে! খড়ের বড়ো-বড়ো গাদা বানিয়েছে, ফসলের শেষ দানাটি অবধি কেটে তুলেছে ঘরে। খাটুনিতে কাতরালেও এমন উৎসাহে জমি চষে ফসল বুনছে যেন সবাইকেই একশো বছর বাঁচতে হবে। না, না, ওসব বিদ্রোহের কথায় কাজ নেই। গাধা না হলে ওকথা কেউ তোলে না। তবে শয়তানই জানে কসাকদের মাথায় ফের কী দুর্বুদ্ধি ঢুকে বসবে।…

—কী দুর্বুদ্ধি ঢুকতে পারে? কী বলতে চাচ্ছ?

—পড়শিদের মাথায় এখন ঢুকেছে……

—আচ্ছা ?

—'আচ্ছা' বলো আর যাই বলো। ভয়োনেঝ জেলায় বগুচাবের ওপারে একটা বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে।

—যত সব বাজে কথা !

—কেন বাজে ? কাল আমার চেনা-জানা এক মিলিশিয়ার লোক বললে একথা। কর্তারা বোধ হয় সেখানে মিলিশিয়া-ফৌজ পাঠাতে মনস্থ করেছে।

—কিন্তু 'সেখানে' মানে কোথায় ?

—মনাস্তিরশিজ্না, স্থখয দনিযেৎস, পাসেকা, স্তারা, নোভা কালিৎভা এইসব জায়গায়। বেশ বড বিদ্রোহ নাকি।

—কাল সেকথা বললে না কেন হতভাগা নিষ্কম্মা ?

মিখাইলের সামনে ভাঙতে চাই নি। তাছাড়া এসব কথা আলোচনা করে কোন আনন্দ পাই না। এ ব্যাপাব নিয়ে দ্বিতীয় কোনো কথা শুনতে আমি একেবাবে নাবাজ।

গম্ভীর হযে যায় গ্রিগব। অনেকক্ষণ কী ভেবে বলে :

—এ তো খারাপ খবর শুনছি।

—তোমার তাতে আর কী আসে যায় ? খখলরাই (উক্রেইনবাসীরা) মাথা ঘামাক্। চাবকানি খেয়ে পাছায় ঘা হয়ে গেলে বুঝবে কীভাবে মাথা তুলতে হয়। কিন্তু তার সঙ্গে তোমাব আমার কী সম্পর্ক বল ? ওদের জন্য আমাব একটুও দুঃখ নেই।

—তবে আমার পক্ষে একটু কঠিন হয়ে দাঁডাল যে অবস্থাটা।

—তা কেন হবে ?

—দেখতে পাচ্ছ না ? আমার সম্পর্কে কশেভয়ের যা ধারণা সেটা যদি এলাকার কর্তাদের সকলেরই ধারণা হয় তাহলে তো অপ্রীতিকর অবস্থাটা এড়াতে পারব না। পাশের প্রদেশে বিদ্রোহ আর এখানে আমি একজন পুরনো অফিসার, তার ওপর মণিকাঞ্চন, আমি নিজেও ছিলাম বিদ্রোহী। এবার বুঝতে পারছ তো ?

রুটি চিবানো বন্ধ রেখে প্রোখর চিন্তা করতে বসল। এ বিশেষ ব্যাপারটি তো ওর মাথায় আগে আসেনি। মদে গুলিয়ে গেছে সব। তাই ধীরে, অতি কষ্টে চিন্তা করতে হয়।

—কিন্তু এর মধ্যে তুমি কীভাবে আসতে পারো, পান্তালিয়েভিচ ? —সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে প্রোখর।

গ্রিগর বিরক্ত হয়ে ভুরু কোঁচকায়, জবাব দেয় না। খবরটায় ও নিঃসন্দেহেই বিচলিত হয়েছে। প্রোখর ওকে গেলাসটা এগিয়ে দিতে গিয়েছিল, কিন্তু গ্রিগর ওর হাত ঠেলে সরিয়ে দিয়ে দৃঢ় গলায় বললে :

—আর দরকার নেই আমার।

—কিন্তু আরেকটা গেলাসও হবে না? যতক্ষণ না একেবারে বুঁদ হয়ে যাবে ততক্ষণ চালিয়ে যাও। এমন আনন্দময় জীবনকে টুঁটি টিপে মারতে হলে চাই ভদ্‌কা।

—'বুঁদ তুমি হও গে'। এর মধ্যেই তো বেশ বেহেড হয়েছ, আজ হোক কাল হোক তুমি এতেই মরবে। আজ আমাকে ভিয়েশেনস্কা যেতেই হচ্ছে নাম দাখিল করতে।

গ্রোখর একদৃষ্টে চেয়ে থাকে ওর দিকে। রোদে-পোড়া জলে-ভেজা মুখখানা ঘোর বাদামি রঙ ধরেছে, শুধু কপাল থেকে পেছনে-আচড়ানো চুলের একেবারে গোড়াটুকুতে চামড়ার ফ্যাকাশে সাদা রঙ এখনো নজরে পড়ে। জীবনে অনেক কিছু দেখেছে এই সৈনিকটি, তবু এতটুকু অধীরতা নেই। যুদ্ধ আর আপদের মধ্যে প্রোখর ওর আত্মীয়তা পেয়েছিল। গ্রিগরের দুটি বড়ো-বড়ো চোখে বিষণ্ণ দৃষ্টি যেন, তাতে রূঢ় ক্লান্তির আভাস।

—ওরা যে তোমায় জেলে পুরবে তোমার ভয় করছে না? জিজ্ঞেস করে প্রোখর।

গ্রিগর আবেগ প্রকাশ করে বলে—সেইটেই তো আমার ভয়, বুড়ো খোকা। আগে কখনো জেলখানায় যাইনি জেলকে আমি মৃত্যুর চেয়েও বেশী ভয় করি। কিন্তু এখন প্রবিদ্বার মনে হচ্ছে সে-আনন্দের অভিজ্ঞতাও আমার হবে এবার।

প্রোখর দুঃখ করে বলে বাড়ি ফিরে না এলেই পারতে।

—কিন্তু তা না হলে যেতাম কোথায়?

—কোনো শহরে-টহরে লুকিয়ে থাকতে, অবস্থা শান্ত হয়ে আসার পর তখন না হয় বাড়ি ফিরে আসতে।

গ্রিগর হাত নেড়ে কথাটাকে নস্যাৎ করে দেয়। হেসে বলে—সে আমার পন্থা নয়। 'যতক্ষণ না ধরা পড়ো সবর করে থাকো'—সে যে আরো খারাপ। তাছাড়া আমার ছেলেপিলেদের ফেলে রাখি কি করে বলো?

—বাঃ, চমৎকার! তোমাকে ছাড়াই ওরা এতকাল কাটায়নি? পরে ওদের নিয়ে যেতে পারতে, তোমার প্রেয়সীকেও। হ্যাঁ, ভালো কথা, তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। যুদ্ধের আগে যাদের ঘরে তুমি আর আকসিনিয়া কাজ করতে, সেই মুনিবরা দুজনেই মারা গেছে।

—লিস্তনিৎস্কিরা?

—হ্যাঁ গো, তারাই। আমার আত্মীয় জাখার ছোট লিস্তনিৎস্কি-কর্তার আরদালি হয়ে ওদের সঙ্গে পালিয়েছিল। সেই বলেছে যে বুড়ো কর্তা নাকি মরোজভস্কিতে টাইফাস্ হয়ে মারা গেছে। কিন্তু ছোট কর্তা একেবারে ইয়েকাতেরিনোদার অবধি গিয়েছিল। সেখানে তার গিন্নি নাকি

সেনাপতি পকরোভ্‌স্কির সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করেন। ছোট কর্তা তা সইতে না পেরে চটেমটে গুলি খেয়ে আত্মহত্যা করেছে।

গ্রিগর নির্লিপ্তভাবে বলে—মরুক্ গে, চুলোয় যাক্ ওরা। ভালো-ভালো কত লোক মরে গেল, দুঃখ হয় তাদের জন্যই। ও দুটোর জন্য শোক করবে কে?—উঠে দাঁড়িয়ে গ্রিগর জোব্বাকোটটা গায়ে চাপায়। দরজার হাতলটা ধরে আবার কী চিন্তা করতে করতে বলে: অবিশ্যি কেন জানি না, বরাবরই আমি ছোট লিস্ত্‌নিৎস্কি আর কপেভয়, এদের মতো লোকদের ঈর্ষা করে আসছি।...একেবারে শুরু থেকেই যেন ওদের কাছে সব পরিষ্কার ছিল অথচ আমি এখন পর্যন্ত কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। ওদের দুজনের সামনেই ছিল সোজা রাস্তা, সে-রাস্তার শেষ অবধি ওরা দেখেছে। অথচ আমি সেই ১৯১৭ সাল থেকে শুরু করে কেবলি পাক খাচ্ছি চরকির মতো। মাতালের মতো টালমাটাল করছি। শ্বেতরক্ষীদের সঙ্গে সম্পর্ক কাটিয়ে দিলাম, অথচ লালফৌজে যোগ দিলাম না। তারপর এঁদো পুকুরের শেওলার মতো ভাসছি। বুঝলে প্রোখর, একেবারে শেষ অবধি লালফৌজে আমার থাকাই উচিত ছিল, তাহলে হয়তো আমার পক্ষে সব দিক দিয়ে ভালো হত। আর তুমি তো জানো প্রথম দিকে আমি সারা মনপ্রাণ দিয়ে সোভিয়েত হুকুমতের সেবা করেছি, কিন্তু তারপর সবই বেচাল হয়ে গেল। শ্বেতরক্ষীদের কর্তাদের মধ্যেও আমি ছিলাম অজানা বাইরের লোকের মতোই। ওরা সব সময় সন্দেহ করত আমাকে। আর করবে নাই বা কেন? চাষীর ছেলে, অশিক্ষিত কসাক—ওদের সঙ্গে আমার কিসের এত নাড়ির টান? ওরা আমাকে বিশ্বাসই করত না। পরে লালফৌজের সঙ্গেও সেই ব্যাপারই হল। হাজার হলেও অন্ধ তো নই, কমিসার আর স্কোয়াড্রনের কমিউনিস্টরা নজর রাখত আমার ওপর। ...লড়াইয়ের সময় কেবলি চোখে চোখে রাখত, আমার প্রত্যেকটা চালচলন লক্ষ্য করত। হয়তো বা ভাবত—ওই শুয়োরটা, পুরনো শ্বেতরক্ষী কসাক অফিসারটা যাতে বেইমানি না করে সেটা আমাদের দেখা দরকার। আর এই ব্যাপার যখনি টের পেতাম আমার মনটা যেন কঠিন হয়ে উঠত। শেষের দিকে তাদের এ অবিশ্বাস আমি আর সইতে পারতাম না। আগুনের তাতে পাথরও ফেটে যায়। ওরা আমাকে ফৌজ থেকে খালাস দিয়ে ভালোই করেছে বলব। অন্তিম কালটা তাড়াতাড়ি ঘনিয়ে এল তাতে।—গলার আওয়াজটা খাঁকারি দিয়ে পরিষ্কার করে নেয় গ্রিগর, তারপর মুহূর্তেকের জন্য চুপ করে থেকে একেবারে অন্য স্বরে বলে প্রোখরের দিকে না তাকিয়ে—খাওয়ালে বলে ধন্যবাদ। এবার আমি বিদায় হই। ভালো ভাবে থেকো। যদি ফিরি তো সন্ধ্যের সময় দেখা করব। বোতলটা সরিয়ে ফেল্গ নয়তো গিন্নি দেখলে তোমার মাথায় হাঁড়ি ভাঙবে।

প্রোখর ওর সঙ্গে সিঁড়ি অবধি এসে কানে-কানে বলে—পান্তালিয়েভিচ, দেখো যেন তোমায় কবজা করে না ফেলে ওরা!

—তা নিশ্চয়ই দেখব। গ্রিগর গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দেয়।

* *

বাড়ি আর ফিরল না গ্রিগর। নদীর ধারে গিয়ে ঘাট থেকে কারুর বাঁধা নৌকো খুলে নিলে। হাত দিয়ে জল ছেঁচে বেড়ার একটা খুঁটি খুলে নিয়ে বরফ ভেঙে নৌকোর পথ করে নিলে সে, তারপর দাঁড় ঠেলে ঠেলে এগিয়ে গেল নদীর ওধারে।

ডন নদীর গাঢ়-সবুজ হাওয়া-আছড়ানো ঢেউ পশ্চিম দিকে গড়িয়ে চলেছে। সে ঢেউয়ের আলোড়নে পাড়ের দিকের নিস্তরঙ্গ জলে স্বচ্ছ পাতলা পল্‌কা বরফ ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। আর মাথা দোলাচ্ছে জলা ঘাসের ফিরোজা-সবুজ ডাঁটিগুলো। বরফে বরফে ঠোকাঠুকি লেগে ছিটিয়ে-ওঠা স্ফটিকদানা নদীর পাড়ে থিতিয়ে বসেছে। জলের ছোঁয়া লেগে মৃদু হিস্‌হিস্ আওয়াজ তুলছে ডাঙার নুড়িপাথরগুলো। কিন্তু মাঝগাঙে যেখানে জোরালো স্রোত একটানা বয়ে চলেছে, সেখানে গ্রিগর শুনতে পায় শুধু নৌকোর বাঁ-দিকে উছলে-পড়া ঢেউয়ের চাপা কল্‌কল্ শব্দ আর ডন-পারের বনে গুমরে-ওঠা বাতাসের অবিশ্রান্ত গর্জন।

জল থেকে নৌকোর আধখানা ডাঙায় টেনে তোলে গ্রিগর। তারপর মাটিতে বসে পা থেকে বুটজোড়া খুলে ফেলে। পায়ের পটিগুলো সযত্নে নতুন করে বাঁধে হাঁটার সুবিধের জন্য।

ঠিক দুপুর নাগাদ ভিয়েশেন্‌স্কায় এসে হাজির হয় গ্রিগর।

আঞ্চলিক জঙ্গী কমিসারিয়েটের দপ্তর-ঘরে লোকের ভিড় আর চেঁচামেচি। টেলিফোনের ঘণ্টা সজোরে বাজছে, দরজার কপাট সশব্দে বন্ধ হচ্ছে, সশস্ত্র সেপাইরা ঢুকছে বেরুচ্ছে, আশপাশের ঘরগুলো থেকে টাইপরাইটারের খট্‌খট্ শব্দ। ভেতরের বারান্দায় গাঁট্টাগোট্টা ছোটখাটো একটি লোককে ঘিরে দু'ডজন লালফৌজী সেপাই দাঁড়িয়ে। আঙারাখায় ঢাকা ভেড়ার-চামড়ার কোর্তা পরনে লোকটার। সেপাইরা উত্তেজিতভাবে কথা বলছে, একে অপরকে বাগড়া দিচ্ছে, আর একেকবার হো-হো করে হেসে উঠছে। বারান্দা ধরে গ্রিগর এগিয়ে যাচ্ছিল। ওপাশের কামরা থেকে দুজন সৈন্য একটা চাকা-বসানো মেশিনগান টেনে বের করল। মেশিনগানের ছোট ছোট চাকা অসমতল কাঠের মেঝেতে মৃদু ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলছিল। সেপাইদের একজন, লালমুখো জোয়ান চেহারা, তামাশা করে সে চেঁচাল : এইও! সরে দাঁড়াও, নয়তো চিঁড়েচ্যাপ্টা করে দেব!

গ্রিগর ভাবলে, মনে হচ্ছে এরা সত্যি সত্যিই বিদ্রোহ দমাতে যাচ্ছে।

রেজিস্টারি করার ব্যাপারে অবশ্য বেশীক্ষণ দেরি করতে হল না গ্রিগরকে। ওর দলিলপত্রগুলো তাড়াতাড়ি দেখে নিয়ে জঙ্গী কমিসারিয়েটের সম্পাদক বললে :

—ডন চেকার রাজনৈতিক বিভাগে চলে যান। পুরনো অফিসার হিসাবে আপনাকে ওদের কাছেই রিপোর্ট করতে হবে।

—ভালো কথা। গ্রিগর জঙ্গী সেলাম করে। মনের চাঞ্চল্য ও হাবেভাবে প্রকাশ করে না একটুও।

চত্বরে এসে ও দাঁড়িয়ে পড়ল দ্বিধাগ্রস্তভাবে। রাজনৈতিক বিভাগে ওর যাওয়া উচিত ঠিকই, তবে এখন ওর সমস্ত সত্তা যেন বিদ্রোহ করছে। 'ওরা তোমায় ফাটক দেবে।'—মনের ভেতর থেকে কেউ যেন বলে ওঠে আর ওর শরীরটা কেঁপে ওঠে ভয়ে, ঘৃণায়। স্কুলবাড়ির বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে থাকে ও। শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকে এবড়ো-খেবড়ো মাটির দিকে আর কল্পনায় দেখে যেন ওর হাত বাঁধা, একটা নোংরা মই বেয়ে কুঠরির ভেতর ঢুকছে, আর একটি লোক ওর পেছনে পিস্তলের বাঁটটা সজোরে চেপে ধরে এগিয়ে আসছে। হাত মুঠো করে বাহুর ফুলে-ওঠা নীল শিরাগুলোর দিকে চেয়ে থাকল গ্রিগর। এই হাতজোড়া বাঁধবে ওরা? মুখ আরক্ত হয়ে ওঠে ওর। না, যাবে না ও আজ সেখানে। কাল না-হয় যাওয়া যাবে, কিন্তু আজ ও ফিরে যাবে গ্রামে। আজকের দিনটা ও কাটাবে ছেলেপিলেদের সঙ্গে, আকসিনিয়ার সঙ্গে দেখা করবে, তারপর কাল আবার আসবে ভিয়েশেন্স্কায়। হেঁটে হেঁটে পা ব্যথা হয়ে যায়, হোক্। একটি দিনের জন্য ও ঘরে ফিরবে, তারপর আবার ফিরে আসবে এখানে—নিশ্চয়ই ফিরবে। কাল যা-হবার হোক, কিন্তু আজ নয়।

—এই যে মেলেখফ! কতকাল পরে, অ্যাঁ ·

ফিরে তাকাল গ্রিগর। ইয়াকফ ফোমিন। পিয়োত্রার ফৌজী রেজিমেন্টের সঙ্গী, ডন ফৌজের বিদ্রোহী ২৮শ নম্বর রেজিমেন্টের প্রাক্তন অধিনায়ক। এগিয়ে আসছে ফোমিন।

ফোমিন এখন আর সেই আতামান ফৌজের জড়ভরত কসাকটি নেই—এককালে গ্রিগর তাকে যেমন দেখেছিল। দু'বছরে তার কী আশ্চর্য পরিবর্তন : ঘোড়সওয়ারী জোব্বাকোটখানা চমৎকার ফিট করেছে শরীরের মাপে। লাল গোঁপজোড়া একটু উদ্ধতভাবে মোচড়ানো। অতিরিক্ত ডাঁট দেখিয়ে হাঁটাচলা আর আত্মতৃপ্ত হাসিটার মধ্যে, ওর পুরো আদলটার মধ্যেই একটা সচেতন কেউকেটার ভাব ফুটে উঠেছে।

গ্রিগরের সঙ্গে করমর্দন করে ওর চোখের ওপর নিজের নীল চোখের দৃষ্টি রেখে ফোমিন বললে—আবার কোন্ ভাগ্যের টানে এখানে চলে এলে?

—ফৌজ থেকে খালাস হয়েছিলাম। জঙ্গী কমিসারিয়েট থেকে এই বেরুচ্ছি।

—বেশ কিছুদিন হল ফিরেছ ?

—কাল এসে পৌছেচি।

—তোমার দাদা পিয়োত্রার কথা প্রায়ই মনে হয়। সাচ্চা কসাক ছিল, তবে ওর মৃত্যুটা বড়ো দুঃখের। ও আর আমি ছিলাম গোপন বন্ধু। গত বছর তোমাদের বিদ্রোহ করা ঠিক হয়নি মেলেখফ। ভুল করেছিলে তোমরা।

গ্রিগরের মনে হল, এবার কিছু বলা দরকার। তাই বললে: হ্যাঁ। কসাকরা ভুল করেছিল ঠিকই।

—তুমি কোন্ বাহিনীতে ছিলে ?

—এক নম্বর ঘোড়সওয়ার ব্রিগেডে।

—কী হিসাবে ?

—স্কোয়াড্রনের নায়ক।

—সত্যি বলছ! আমিও একটা স্কোয়াড্রনের হেপাজত নিয়েছি। ভিয়েশেন্স্কায় আমাদের একটা রক্ষী বাহিনী রয়েছে।—আশপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ফোমিন চাপা গলায় বললে—চলো, একটু সামনে এগিয়ে যাই। এসো আমার সঙ্গে। এখানে লোকজন বড়ো বেশী আলাপ করার সুযোগ নেই।

রাস্তা ধরে এগিয়ে যায় ওরা। আড়চোখে গ্রিগরের দিকে তাকিয়ে ফোমিন প্রশ্ন করে :

—ঘরেই থাকবে বলে ঠিক করেছ ?

—আর কোথায়ই বা যাই ? ঘরেই থাকব।

—খেতখামারি করবে ?

—হ্যাঁ।

ফোমিন সখেদে মাথা নেড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে :

—বড্ডো খারাপ সময়ে এসে পড়েছ হে মেলেখফ। বড্ডো খারাপ সময়…। একবছর কি দু'বছরের মধ্যে তোমার ফিরে না এলেই ভালো হত।

—কেন ?

গ্রিগরের কনুইটা ধরে ওকে একটু কাছে টেনে নিয়ে ফোমিন ফিস্‌ফিস করে বললে :

—এ এলাকায় গোলমাল শুরু হয়েছে। সরকারী খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে কসাকরা ভয়ানক অসন্তুষ্ট। বোগুচার জেলায় বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। আমি তোমায় ভালো কথাই বলছি ভাই, এখান থেকে সরে পড়ো, তাড়াতাড়ি! পিয়োত্রায় আর আমাতে বন্ধুত্ব ছিল যথেষ্ট, সেই সুবাদেই তোমায় বুদ্ধি দিচ্ছি, সরে পড়ো।

—কিন্তু সরে যাবার জায়গা তো আমার নেই।

—নজর করে ছাখ একটু! একথা তোমায় বলছি কারণ রাজনৈতিক বিভাগ থেকে পুরনো অফিসারদের ধরপাকড় করতে শুরু করেছে। এই সপ্তাহেই ভুদারেভ্‌কা থেকে তিনজন এনসাইন আর রেশেতভ্‌কার একজনকে ধরে আনা হয়েছে, আর ডনের ওপার থেকে তো দলকে দল আসছে। এখন আবার সাধারণ কসাক সেপাইদেরও পাকড়াতে শুরু করেছে। এবার তুমিই ব্যাপারটা বুঝে নাও গ্রিগর পান্তালিয়েভিচ।

গ্রিগর তবু একগুঁয়ের মতো বললে: তোমার পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ। তবে আমি সরে পড়ব না মোটেই।

—সে তোমার মর্জি।

ফোমিন এবার এলাকার পরিস্থিতির কথা বলতে শুরু করে। আঞ্চলিক কর্তাদের সঙ্গে, এলাকার জঙ্গী কমিসার শাখায়েফের সঙ্গে তার দহরম-মহরমের কথা বলে। নিজের চিন্তায় মগ্ন হয়ে গ্রিগর ওর কথার অনেকটাই শোনে অন্যমনস্কভাবে। তিনটে বাড়ি পার হয়ে অবশেষে থামলে ফোমিন।

—আমায় একটু টেলিফোন করতে হবে। আচ্ছা আসি তবে।—লোমের টুপির ডগায় হাত রেখে একটা নিরুৎসাহ বিদায় অভিবাদন জানিয়ে ফোমিন চ[illegible] পাশের এক গলির মধ্যে। নতুন কাঁধ-পটিগুলো মস্‌মস্‌ করছিল যখন ফোমিন কাঠের মতো সোজা হয়ে বেমানান রকমের একটা মর্যাদা দেখিয়ে হেঁটে চলে গেল।

রাজনৈতিক বিভাগ দপ্তরের পাথর-সিঁড়ি ধরে উঠবার সময় গ্রিগর ভাবলে:

—যদি শেষে এই থাকে ভাগ্যে, তো যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভাল। শুধু শুধু গড়িমসি করে লাভ কী। গ্রিগর, তুমি ক্ষতি করতে শিখেছিলে, এবার লোকসানের কৈফিয়ত দিতে শেখো!

॥ আট ॥

সকাল আটটা নাগাদ আকসিনিয়া উনুনের কয়লা খুঁচিয়ে একজায়গায় জড়ো করে। বেঞ্চিতে বসে আঙরাখায় মোছে মুখখানা। রাঙা হয়ে

ঘেমে উঠেছিল ও। ভোর হবার আগেই ঘুম থেকে উঠেছিল যাতে তাড়াতাড়ি রান্না সেরে নেওয়া যায়। সিমাই দিয়ে মুরগির মাংস সেদ্ধ করে কাবাব বানিয়েছে। ছোট ছোট বড়া বানিয়ে ওপরে প্রচুর ননী মাখিয়ে উনোনে চাপিয়ে দিয়েছে ভাজবার জন্য। আকসিনিয়া জানে গ্রিগর খুব ভাজা বড়ার ভক্ত। আজ ওর প্রিয় মানুষটির সঙ্গে বসে খাবে এই আশায় ভূরিভোজের ব্যবস্থা করেছিল আকসিনিয়া।

একটা ওজর করে মেলেখফদের বাড়ি যাবার প্রবল তাগিদ সে কেবলি অনুভব করছিল, মিনিট খানেকের জন্য হলেও বা, গ্রিগরকে একটু আড়চোখে দেখে আসা আর-কি। মনে হচ্ছিল এ কী অসম্ভব কথা যে লোকটি তার পাশের বাড়িতেই আছে অথচ ও তাকে দেখতে পাচ্ছে না। তবু ইচ্ছাটাকে দমন করে আকসিনিয়া। যায় না মেলেখফদের বাড়িতে। হাজার হলেও ছেলেমানুষ নয় ও। ওর এ-বয়সে এমনতর অসভ্যতা শোভা পায় না।

স্বাভাবিকভাবে যতটুকু তার চেয়ে একটু বেশী যত্ন করেই আজ ও হাতমুখ ধোয়। একটা পরিষ্কার জামা গায়ে দিয়ে ফুল-তোলা একটা নতুন সায়া পরে। খোলা তোরঙ্গটার সামনে অনেকক্ষণ দোমনা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে—কোন্‌টা পরবে এখন ঠিক করতে হবে যে। আজ কাজকর্মের দিনে ওর সবচেয়ে ভাল পোশাকটা পরা কেমন দেখাবে, অথচ সাদাসিধে ঘরোয়া পোশাক পরতেও মন চায় না। কোনটা বাছাই করে পরবে ঠিক না করতে পেরে ভুরু কুঁচকে ইস্ত্রি করা ঘাগরাগুলো উল্টেপাল্টে দেখে। অবশেষে মন স্থির করে গাঢ় নীল একটা স্কার্ট পরে নেয়, সেইসঙ্গে কালো লেস্‌-দেয়া একটা নীল ব্লাউজ্‌ যা ও আগে বেশী পরেনি। এইটেই ওর সেরা পোশাক। অবিশ্যি পড়শিরা কী মনে করবে তাতে ওর কী আসে-যায়? হোক্‌ গে আজ ওদের কাজের দিন, আকসিনিয়ার কাছে আজকের দিনটা ছুটির। তাড়াতাড়ি পোশাক পরে আয়নার দিকে এগিয়ে যায় ও। ঠোঁটের কোণে জেগে ওঠে একটা মৃদু বিস্মিত হাসি: দুটি যৌবনোচ্ছল উজ্জ্বল চোখ তাকিয়ে আছে ওর দিকে সকৌতুক ঔৎসুক্য নিয়ে। আকসিনিয়া আয়নার খুব কাছে মুখ এনে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে, তারপর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। না, সৌন্দর্য ওর ম্লান হয়নি এখনও। আজও বোধহয় অনেক কসাক রাস্তায় ওকে দেখলে থমকে দাঁড়াবে, বিস্ফারিত চোখের দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করবে ওর চলে-যাওয়া।

আয়নার সামনে ঘাগরাটা গুছিয়ে পরবার সময় ও জোরে-জোরেই বলে ফেলে: এবার তাকিয়ে দেখ গ্রিগর একবারটি। মুখটা ওর রাঙা হয়ে উঠেছে টের পেতেই নিঃশব্দে হেসে ফেলে খুক্‌ করে। এর পরেও কিন্তু রগের দুপাশে দু'চারটে পাকা চুল ওর নজরে পড়ে গেল। সেগুলোকে উপড়ে ফেলল

ও। গ্রিগরের এমন কিছু নিশ্চয়ই দেখলে চলবে না যাতে ওর বয়েসের কথাটা স্মরণ করিয়ে দেয়। ওর কাছে আকসিনিয়া আজ তেমনই যৌবনময়ী থাকতে চায় যেমন সাত বছর আগেও সে ছিল।

দুপুরের খাবার সময় অবধি কোনোরকমে ঘরের ভেতর নিজেকে আটকে রেখেছিল, তারপর কিন্তু আর থাকতে পারল না সে। সাদা লোমের শালটা কাঁধে ফেলে মেলেখফদের বাড়ি গিয়ে উঠল। দুনিয়া একাই বাড়িতে ছিল। আকসিনিয়া ওকে বললে—কী গো, এখনো খাওয়া-দাওয়া করোনি?

—এরা ঘরে থাকার মানুষ হলে তবে না খাব সময় মতো? আমার স্বামীটি আছেন সোভিয়েত দপ্তরে, আর গ্রিগর গেছে ভিয়েশেন্স্কা। ছেলেপিলেদের খাইয়ে দিয়েছি, এখন বসে আছি বড়দের জন্য!

হাবভাবে বা কথায় মনের হতাশাকে একটু প্রকাশ না করে বাইরের শান্ত অবিচল ভাবটা বজায় রেখেই আকসিনিয়া বললে:

—আমি তো ভেবেছিলাম তোমরা সবাই বাড়ি আছ। তো গ্রিশা··· গ্রিশা পান্তালিয়েভিচ্ কখন ফিরবে? আজকেই?

দুনিয়া চট্ করে একবার পড়শির ধোপদুরস্ত পোশাকের দিকে নজর বুলিয়ে অনিচ্ছার সঙ্গে বললে: নাম রেজিস্টরি করতে গিয়েছে।

—কখন ফিরতে পারে বলেছে?

দুনিয়ার চোখে জল চিক্‌চিক্ করে ওঠে। তিরস্কারমিশ্রিত গলার আওয়াজ ওর বাধো বাধো ঠেকে:

—বাঃ··বেশ ভালো সময়েই সেজেছ যাহোক।···কিন্তু জানো না বুঝি··· ও হয়তো একেবারেই ফিরে আসবে না··।

—তার মানে?

—মিখাইল বলছে ওকে ভিয়েশেন্স্কায় গ্রেপ্তার করবে।···কাঁদতে শুরু করে দুনিয়া, শুষ্ক রুষ্ট কান্না। জামার হাতায় চোখ মুছে বলে ওঠে: মরুক গে! গোল্লায় থাক্ এ সংসার। কবে এ সবের শেষ হবে? ও তো চলে গেল আর ছেলেপিলেগুলো?···ওরা যেন পাগল হয়ে গেছে। এক মিনিটও স্বস্তি দিচ্ছে না আমায়, খালি বলছে: বাবা কোথায় গেল, কখন ফিরবে? আমি জানব কী করে বল? ওদের ঘরের বাইরে উঠোনে বের করে দিলাম, কিন্তু বুকটা আমার টন্‌টন্ করে।···অভিশপ্ত ছাড়া কী বলবে এ জীবনকে? সংসারে কারুর শান্তি নেই, যতই চেঁচিয়ে গলা ফাটাও না কেন!

—সন্ধ্যের মধ্যে যদি না ফেরে তো কাল আমি ভিয়েশেন্স্কায় গিয়ে খোঁজ করব।—এমন নিস্পৃহ কণ্ঠে কথাগুলো বললে আকসিনিয়া যেন অতি সাধারণ কোনো বিষয়ের কথা যার জন্য ওর মন বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি।

ওর স্থৈর্য দেখে অবাক হয় দুনিয়া। নিশ্বাস ফেলে বলে:

—এখন আর অপেক্ষা করে লাভ নেই বোঝা যাচ্ছে। ওর নিজের দুর্ভাগ্য টেনে আনতেই বুঝি ফিরে এসেছিল!

—এখন অবধি আমরা কিছুই জানিনে। তোমার কান্নাকাটি থামাও তো, নইলে ছেলেপিলেগুলো কী ভাবতে শুরু করবে? আচ্ছা আসি তবে!

* *

সে-সন্ধ্যায় বেশ দেরিতে বাড়ি ফিরে এল গ্রিগর। ঘরে খানিকক্ষণ কাটিয়ে বেরুল আকসিনিয়াকে দেখতে।

সারাদিন আকসিনিয়া যে উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করেছে তারপর মিলনের আনন্দটুকু যেন ভোঁতা হয়ে যায়। সন্ধ্যে নাগাদ ওর মনে হচ্ছিল যেন সারাদিনে একবারও মেরুদণ্ড অবধি সোজা করতে পারেনি একটানা কাজের চাপে। প্রতীক্ষায় ক্লিষ্ট আর ক্লান্ত হয়ে শেষে বিছানায় শুয়ে পড়েছে তন্দ্রা-চোখে। কিন্তু জানলার বাইরে পায়ের শব্দ কানে যেতেই সে লাফিয়ে উঠল ছোট মেয়েটির মতো।

—ভিয়েশেন্স্কায় যাবে, সে-কথাটি বললে না কেন আমায়?—গ্রিগরকে দু'বাহুতে জড়িয়ে ধরে তার কোটের বোতাম খুলে দিতে দিতে বলে আকসিনিয়া।

—বলার সুযোগ পেলাম কই, তাড়াতাড়িতে?

—এদিকে আমি আর দুনিয়া তো কেঁদেই আকুল, ও ওর মতো, আমি আমার মতো। কারণ আমরা ভেবেছিলাম তুমি আর ফিরে আসছ না।

বিষণ্ণ হাসি হাসে গ্রিগর।

—না অতটা খারাপ নয় ব্যাপারটা।—একটু থেমে ফের সে বলে—এখন অবধি তো নয়।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে টেবিলের কাছে গিয়ে খেতে শুরু করে গ্রিগর। খোলা কবাট দিয়ে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে শোবার ঘর, এক কোণে চওড়া কাঠের পালঙ্কটা, অনুজ্জ্বল তামার বাঁধ-দেওয়া তোরঙ্গটা। সবই ঠিক আগের মতো আছে—সেই যখন তরুণ বয়েসে ও অভিসারে আসত স্তেপান বাইরে থাকলে। কোনো পরিবর্তন নজরে পড়ে না ওর। যেন এ জায়গাটিকে উপেক্ষা করে চলে গেছে কালের প্রবাহ, ভেতরে একবারটি উঁকি দিয়েও যায়নি। এমনকি সেই পুরনো গন্ধটা অবধি রয়ে গেছে: তাজা চোলাই করা বীয়ারের গাঁজলা, ধোয়া মেঝে আর শুকিয়ে-যাওয়া টাইম্-লতার অতি মৃদু প্রায়-অগোচর সুঘ্রাণ! মনে হয় যেন এই সেদিন মাত্র ভোরবেলায় এ বাড়ি ছেড়ে গিয়েছিল গ্রিগর। তবু বাস্তবে তা কত দীর্ঘদিন আগে…।

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে গ্রিগর সিগারেট পাকাতে শুরু করে দেয়, ইচ্ছে করেই। কিন্তু কোনো কারণে ওর আঙুল কাঁপে, হাঁটুর ওপর তামাকের গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়ে হাত থেকে।

আকসিনিয়া তাড়াতাড়ি টেবিল সাজাতে লেগেছে। ঠাণ্ডা সিমাই আবার গরম করতে হবে। চালাঘরে ছুটল কাঠ আনতে। চুল্লীর সামনে কাঠ সাজিয়ে আগুনের ব্যবস্থা করতে থাকে সে হাঁপাতে হাঁপাতে। মুখখানা ফ্যাকাশে। কাঠকয়লায় ফুঁ দিতে গিয়ে আগুনের ফুলকি ওঠে। তবু ওরই ফাঁকে ফাঁকে এক‍েকবার সে গ্রিগরকে দেখে নেয়—এক কোণে চুপটি করে সিগারেট খেয়ে চলেছে গ্রিগর।

—তোমার ব্যাপার কতদূর গড়াল? সব মিটমাট করে নিয়েছ?

—সবই ঠিকমতো হয়েছে।

—দুনিয়ার মাথায় কেমন করে ঢুকল যে ওরা তোমাকে নির্ঘাত গ্রেপ্তার করবে? আমাকেও ভয় পাইয়ে দিয়েছিল কিন্তু।

গ্রিগর ভুরু কোঁচকায়। বিরক্তির ভঙ্গিতে সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

—মিখাইল ওর কানে জপছে দিনরাত। এসব তো সেই পাকিয়ে তুলেছে আর বিপদ ডেকে আনছে আমার মাথায়।

আকসিনিয়া টেবিলের কাছে আসে। গ্রিগর তার হাত টেনে নেয় হাতে।

ওর চোখের দিকে দৃষ্টি মেলে বলে—কিন্তু জানো আকসিনিয়া। আমার ব্যাপারটা খুব সুবিধেরও নয়। রাজনৈতিক বিভাগে যাবার সময় আমার নিজেরই মনে হয়েছিল আর হয়তো বেরিয়ে আসতে পারব না। কিন্তু অস্বীকার করে তো লাভ নেই যে বিদ্রোহের সময় আমি একটা ডিভিশনের নায়ক ছিলাম, আর ছিলাম স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডার আমার মতো লোককে তো ওরা ছেড়ে কথা কইবেই না।

—কিন্তু ওরা তোমাকে কী বললে?

—একটা ফরম দিলে ভর্তি করতে। চাকরির সময় যা কিছু করেছি তার পুরো ফিরিস্তি দিতে হল। কিন্তু লেখা-টেখা তো আমার তেমন আসে না। আমার কালে তো লেখাপড়ার কাজ তেমন ছিলই না। দু'ঘণ্টা বসে আমার আগেকার সমস্ত কাজের বিবরণ দিলাম। তারপর আরো দুজন লোক কামরার ভেতর এসে বিদ্রোহের সব খবর জানতে চাইল। লোক দুটো ভালোই, বেশ বন্ধুর মতো। বয়স্ক লোকটি জিজ্ঞেস করলে, চা খাবে নাকি? তবে স্যাকারিন দিয়ে কিন্তু। আমি ভাবলুম, চায়ে আমার কী কাজ? এখন তোমাদের কাছ থেকে পালাতে পারলে বাঁচি।

মুহূর্তের জন্য থামে গ্রিগর, তারপর যেন কোনো বাইরের লোকের সম্পর্কে মন্তব্য করছে এমনিভাবে বিদ্রূপ করে বলে—যখন হিসেব-নিকেশের সময় এল তখন আমি একেবারে জল হয়ে গিয়েছি। ভীতু ছাড়া কী বলবে।

ভিয়েশেন্স্কায় গিয়ে নিজের ভীরুতা দেখিয়েছে, যথেষ্ট দৃঢ়তা আনতে পারেনি মনে, এই অক্ষমতায় নিজের ওপর ওর রাগ হয়। বিরক্তি আরো বেশী

আসে এই কারণে যে ওর আশঙ্কা নেহাৎ অমূলক প্রমাণিত হয়েছে। ওর সমস্ত উদ্বিগ্নতাই এখন মনে হয় অহেতুক, লজ্জাকর। প্রসঙ্গটা অনুসরণ করে ওর মন অনেকটা দূর চলে গেছে অতীতের দিকে, এবং হয়তো সেই কারণেই আকসিনিয়াকে সব কথা খুলে বলেছিল নিজেকে উপহাস করে আর যা ওর কপালে ঘটেছিল তা খানিকটা বুঝি বাড়িয়েও।

মনোযোগ দিয়ে শোনে আকসিনিয়া ওর কথা। তারপর আলগোছে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে এগিয়ে যায় উনোনের দিকে। আগুনটা উস্‌কে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করে :

—কিন্তু এর পরে কী হবে ?

—হপ্তাখানেকের মধ্যে আমায় গিয়ে আবার হাজিরা দিতে হবে সেখানে।

—কী মনে হয়, ওরা তোমাকে আটকাবে শেষ অবধি ?

—তাই তো মনে হয়। আজ হোক, কাল হোক, ধরবেই।

—তাহলে আমরা কী করব ? কীভাবে আমরা বাঁচব গ্রিশা ?

—জানি না। ওসব কথা পরে হবে'খন। একটু জল দিতে পার হাত মুখ ধোবার ?

খেতে বসে ওরা দুজন। পূর্ণ সুখের যে আস্বাদটুকু আজ সকালে জেগেছিল আকসিনিয়ার মনে, সেটা যেন আবার ফিরে আসতে থাকে। এই তো গ্রিগর রয়েছে এখানে, ওরই পাশে। চোখ না ঘুরিয়েই দেখতে পায় ওকে এখন সোজাসুজি, বাইরের লোকের নজরে পড়ে যাবার ভাবনা নেই। চোখের ভাষায় এখন ও সবই বলতে পারে, কোনো দ্বিধা না করে। ভগবান! কী আকুল ওর প্রতীক্ষা এতদিনের, কীভাবে নিজেকে তিলে-তিলে ক্ষয় করেছে গ্রিশার জন্য, তার বিশাল দুটি নির্দয় হাতের স্পর্শের জন্য কত অধীর হয়েছে ওর দেহ! আকসিনিয়া নিজের খাবার প্রায় ছোঁয়ই না, ক্ষুধার্ত গ্রিগরের খাওয়া ছাখে সামনে ঝুঁকে পড়ে। ওর বাষ্পাচ্ছন্ন চোখদুটি সাদরে গ্রিগরের সর্বাঙ্গে দৃষ্টি বুলোয়, ওর মুখমণ্ডল, উর্দির খাড়া কলারে শক্ত করে আঁটা কালচে গলা, চওড়া কাঁধ আর টেবিলের ওপর ছড়ানো ভারীভারী দুটো হাতের ওপর। গ্রিগরের গা থেকে পুরুষালি ঘামের আর তামাকের মেশানো গন্ধ। গ্রিগরের একান্ত আপন এই অনেক-চেনা দামী গন্ধটুকু প্রাণভরে নিঃশ্বাসে টেনে নেয় আকসিনিয়া। ওর এই গন্ধের জন্যই হাজারটা মানুষের ভেতর থেকেও গ্রিগরকে চোখ বুজে চিনে বের করতে পারে সে। গালদুটো ওর রক্তিম হয়ে ওঠে, বুকের ভেতর স্পন্দন বেড়ে যায়। আজকের সন্ধ্যায় ওর পক্ষে বুঝি সত্যিকারের মনোযোগী গৃহিণী হওয়া সম্ভব নয়, কারণ চারদিকে এখন গ্রিগর ছাড়া আর কিছুই সে দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু গ্রিগরও ওর মনোযোগ দাবি করেনি : সে নিজেই রুটি কেটে নিয়েছে। চুল্লির ধার থেকে নুনের ভাঁড় খুঁজে বের করেছে। নিজেই দ্বিতীয় একবাটি সিমাই ঢেলে নিয়েছে।

কৈফিয়তের সুরে একটু হেসে বললে গ্রিগর—একেবারে বাঘের খিদে পেয়েছিল। আজ সকাল থেকে কিছুই পেটে পড়েনি তো।

এতক্ষণে আকসিনিয়ার সম্বিত এল ঘরকন্নার কাজে; চট্ করে উঠে দাঁড়াল ও।

—উঃ দেখেছ কি ভুলো মন আমার! কাবাব আর বড়ার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম! একটু মুরগির মাংস দিই, খাও। আরো বেশী করে খাও লক্ষ্মীটি। এক্ষুনি আমি এনে ফেলছি সব।

কিন্তু কত সময় নিয়ে গুছিয়ে-গাছিয়ে খেল গ্রিগর। যেন হপ্তাখানেক আহারই জোটেনি! ওকে ভুরিভোজ দেয়ার প্রয়োজনই হয় না আলাদা করে। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে আকসিনিয়া। কিন্তু শেষ অবধি আর সবুর করতে পারে না। গ্রিগরের পাশে বসে পড়ে। বাঁ হাতে ওর মাথাটা নিজের কাছে টেনে নেয়, ডান হাতে পরিষ্কার ছুঁচের কাজ-তোলা হাতমোছা তোয়ালেটা দিয়ে নিজেই ওর প্রিয় মানুষটির ঠোঁট থুতনি মুছে দেয় সযত্নে। তারপর নিঃশ্বাস চেপে, আধবোজা ছুটি-চোখে সেই আঁধারে নারঙী শিখার ফুল্‌কি ছড়িয়ে, গ্রিগরের ঠোঁটের ওপর সজোরে চেপে ধরে নিজের ঠোঁট।

সত্যি বলতে কি, মানুষ কত সামান্যতেই সুখী হতে পারে। মোটের ওপর সে রাতটিতে আকসনিয়াও সুখী হয়েছিল।

॥ নয় ॥

কশেভয়ের সঙ্গে ফের দেখা করা গ্রিগরের ধাতে সইল না। দেশে ফিরে আসার প্রথম দিনটিতেই ওদের সম্পর্ক যাচাই হয়ে গেছে, এর পর আর কথা বলার কিছু নেই, কথা বলেই বা কী হবে। হয়তো মিখাইলও বিশেষ খুশী হয় না গ্রিগরকে দেখলে। তুজন কাঠমিস্ত্রি ডেকে সে চটপট নিজের ছোট ঘরটাকে মেরামত করে নিলে। ছাদের আধপচা বরগাগুলোর জায়গায় নতুন বরগা লাগিয়ে, নড়বড়ে দেয়াল মেরামত করে নতুন জানলার কাঠামো, দরজা ইত্যাদি বসানো হল।

ভিয়েশেনস্কা থেকে ফিরে গ্রামের বিপ্লবী কমিটির অফিসে এসে হাজির

হল গ্রিগর। জঙ্গী কমিসারিয়েটের সুপারিশ-করা দলিলপত্র কশেভয়ের হাতে দিয়ে যেমন এসেছিল তেমনি বেরিয়ে গেল বিদায় না নিয়েই। আকসিনিয়ার সঙ্গে থাকবে সে এখন থেকে। ছেলেপিলেদের সঙ্গে নিজের কিছু জিনিসপত্র নিয়ে সেখানেই গিয়ে উঠল। ওর নতুন বাড়িতে ওঠার সময় বিদায় দিতে এসে দুনিয়া কেঁদে ফেললে।

—দাদামণি, আমার ওপর রাগ করো না। আমি তোমার কোনো ক্ষতি করিনি।—মিনতিমাখা চোখে দুনিয়া তাকায়।

—রাগ করব কেন দুনিয়া? যাও, অতো উতলা হয়ো না।—সান্ত্বনা দেয় গ্রিগর—মাঝে মাঝে এসে দেখা কোরো, কেমন? আমিই তো পরিবারের একটিমাত্র মানুষ রয়ে গেছি তোমার কাছে, আগেও তোমার জন্য আমার দুঃখ হত। এখনো হয়। ·কিন্তু তোমার স্বামীটি—তার কথা অবিশ্যি আলাদা। তোমাতে আমাতে মিল তাতে নষ্ট হবার নয়।

—বাড়ি আমরা শিগগিরই ছেড়ে দেব। তুমি রাগ কোরো না।

—না, বাড়ি কেন ছাড়বে?—বিরক্তির সুরে বলে গ্রিগর—বাড়িতে তোমরা থাকো, অন্তত শীতটা চলে যাওয়া অবধি। তোমায় নিয়ে তো আমার ঝামেলা নেই। আর আকসিনিযার কাছেও ছেলেপুলে নিয়ে আমার বেশ জায়গা হয়ে যাবে।

—ওকে তুমি বিয়ে করবে গ্রিশা?

—বিয়ের সময় হাতে অনেক রয়েছে।—উড়ো উড়ো জবাব দেয় গ্রিগর।

—ওকে তুমি বিয়ে কর দাদা। মেয়েটি ভাল।—দুনিয়া সিধে জানায় কথাটা—আমাদের মা বলত ও-ই তোমার একমাত্র বউ হবার যুগ্যি। শেষের দিকে তো মা ওকে বেশ ভালোই বাসতে আরম্ভ করেছিল, মরার আগে প্রায়ই ওকে দেখতে যেত।

—তুই যেন আমাকে ধরে বেঁধে বিয়ে দিতে চাইছিস্ মনে হচ্ছে?—হাসে গ্রিগর—ওকে ছাড়া আর কাকেই বা বিয়ে করব? থুথ্‌ড়ে বুড়ী আন্দ্রোনিখাকে?

তাতারস্কের সবচেয়ে থুনথুনে বুড়ী মানুষটি আন্দ্রোনিখা। বয়েস একশো পার হয়ে গেছে অনেকদিন। বুড়ীর ছোট্ট কুঁজো চেহারাটা মনে পড়তেই দুনিয়া হেসে সারা হয়।

—তুমি যে কী সব বল দাদা। আমি শুধু জিজ্ঞেস করছিলাম। কাউকে বোলো না যেন আমি জিজ্ঞেস করেছি।

—যাকেই বলি আর না-বলি, আমার বিয়েতে তোর নেমন্তন্ন থাকবে নিশ্চয়।—বোনের পিঠে তামাশা করে চাপড় মেরে গ্রিগর বেরিয়ে গেল। খুশীমনেই ওর পুরনো বাড়ি ছাড়ল গ্রিগর।

আসল কথা শান্তিতে থাকা, কোথায় থাকল তা নিয়ে অত ভাবনা

গ্রিগরের ছিল না। কিন্তু শান্তি বস্তুটার সন্ধান ও কোনোদিনই পেল না। কয়েকটা দিন ওর কেটে যায় অসহ্য কুঁড়েমির মধ্যে। আকসিনিয়ার খামারে গিয়ে কিছু কিছু কাজ দেখবার চেষ্টা করে সে, কিন্তু বেশ বুঝতে পারে ওর দ্বারা কিছুই হবে না। কোনো জিনিসের দিকে ওর ঝোঁকই নেই। নিজের অনিশ্চয় অবস্থাটা যন্ত্রণাকর ঠেকে, ওকে সংসারের আগ্রহ থেকে সরিয়ে দেয়, এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারে না যখন-তখন ও গ্রেপ্তার হতে পারে, কপাল ভাল থাকলে জেলে যাবে, নয়তো গুলি খেয়েও মরতে পারে।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে উঠে আকসিনিয়া অনেক সময় ওকে পুরো সজাগ দেখতে পায়। সাধারণত চিত হয়ে মাথার পেছনে হাত রেখে শুয়ে থাকে অন্ধকারের দিকে চেয়ে। চোখের পাতাজোড়া ঠাণ্ডা আর শক্ত। আকসিনিয়া জানে ও কী ভাবে। কিন্তু কোনো রাস্তা জানা নেই ওকে সান্ত্বনা দেবার। ওকে অত কষ্ট পেতে দেখে আকসিনিয়ার নিজেরই কষ্টের সীমা থাকে না। গ্রিগরের সাহচর্যে ঘর বাঁধবার আশা আবার দূরে সরে যেতে বসেছে। কোনো বিষয়ে অবিশ্যি প্রশ্ন করে না ও গ্রিগরকে। যা ব্যবস্থা করার নিজেই করুক। শুধু একবার, একটি রাতে, আকসিনিয়া ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখতে পেয়েছিল সিগারেটের স্তিমিত আগুন। ও বলেছিল :

—গ্রিশা, তুমি তো ঘুমোও না একদম। হয়তো কিছুদিনের মতো গ্রাম ছেড়ে সরে থাকলে ভাল হয়? নয়তো চল দুজনে কোথাও পালিয়ে গা ঢাকা দিই?

আকসিনিয়ার পায়ের ওপর কম্বলটা টেনে দেয় গ্রিগর চিন্তিতভাবে, তারপর অনিচ্ছার সঙ্গে জবাব দেয় :

—ভেবে দেখব'খন। তুমি ঘুমোও।

—পরে ফিরে আসতাম, এখানকার সবকিছু সুস্থির হয়ে গেলে? তা কি হয় না গ্রিগর?

আবার অনিশ্চিতভাবে জবাব দেয় গ্রিগর, যেন কোনো সিদ্ধান্তই সে এখনো করে উঠতে পারেনি :

—দেখা যাবে অবস্থা কী দাঁড়ায়। তুমি ঘুমোও, আকসিনিয়া।—সাবধানে আর আলগোছে আকসিনিয়ার রেশমের মতো স্নিগ্ধ খোলা কাঁধটির ওপর নিজের ঠোঁট চেপে রাখে গ্রিগর।

বাস্তবে কিন্তু গ্রিগর এর মধ্যেই মনস্থির করে ফেলেছে. ভিয়েশেনস্কায় ও আর যাচ্ছে না। গতবার রাজনৈতিক বিভাগের দপ্তরে যে লোকটি ওর সঙ্গে কথা বলেছিল সে এবার বৃথাই বসে থাকবে ওর অপেক্ষায়। জোব্বাকোট কাঁধে ফেলে, টেবিলের ধারে বসে হাত-পা টান করে গিঁটে-গিঁটে মটমট আওয়াজ তুলে লোকটা গ্রিগরের মুখে বিদ্রোহের কাহিনী শুনতে শুনতে কেবলই কৃত্রিমভাবে হাই তুলছিল। সে-লোকটিকে এবার আর কিছু শুনতে হচ্ছে না। কাহিনীর সবটুকু বলা হয়ে গেছে।

যেদিন রাজনৈতিক দপ্তরে ওর যাবার কথা সেদিনই গ্রিগর গ্রাম থেকে সরে পড়বে। প্রয়োজন হলে দীর্ঘদিনের জন্য সরে পড়বে। কোথায় যাবে তা ও নিজেও জানে না, কিন্তু যাবার জন্য দৃঢ়সংকল্প করেছে গ্রিগর। জেলে বসে থাকার বা মরার কোনো সদিচ্ছা গ্রিগরের নেই। মন ও আগেই ঠিক করে ফেলেছিল কিন্তু আকসিনিয়াকে আগে ভাগে কিছু বলতে চায়নি। শেষ কটা দিন আকসিনিয়া ওর সঙ্গ পাবে, তা বিষিয়ে তোলার কোনো মানে হয় না—এমনিতেই তো মনমরা হয়ে দিন কাটছে। একেবারে শেষ দিনটিতে কথাটা তুলবে, স্থির করেছে গ্রিগর। এখন ঘুমোক্, শান্তিতে ঘুমোক গ্রিগরের বগলের নিচে মাথা গুঁজে। আকসিনিয়া সে-রাতগুলোতে প্রায়ই বলত: 'তোমার ডানাব নিচে ঘুমিয়ে থাকাই আমার ভাল।' বেশ তো, ঘুমিয়ে নিতে দাও ওকে। হায়রে হতভাগিনী, এমনভাবে গ্রিগরের বুকের কাছে শুয়ে থাকতে আর কটা দিনই বা পারবে!

* *

দিনের বেলায় গ্রিগর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একটু খেলা করে নিরুদ্দিষ্টভাবে বেরিয়ে পড়ে গাঁয়ের পথে। লোকজনেব সঙ্গে মেলামেশা করে তাও খানিকটা স্ফূর্তি আসে মনে। একদিন প্রোখর প্রস্তাব করলে মিকিতা মেলনিকফদের বাড়িতে আড্ডা দেবাব, সেখানে রেজিমেণ্টের পুরনো সাথী তরুণ কসাকরা জুটে মদ্যপান করবে। প্রস্তাবটা সরাসরি অগ্রাহ্য করলে গ্রিগর। গাঁয়ের লোকদের কথাবার্তায় ও বুঝতে পেরেছিল সরকারী খাদ্যসংগ্রহ নীতির ফলে অসন্তোষ জেগে উঠছে, এখন মদের আড্ডায় বসলে নির্ঘাত আলোচনাটা সেই দিকেই মোড় নেবে। নিজের ওপর পুলিশের সন্দেহ ডেকে আনবার বাসনা ওর নেই, চেনা-পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হলেও রাজনীতির আলোচনা ও এড়িয়ে চলে সযত্নে। রাজনীতি ও অনেক দেখেছে, এর মধ্যেই ওর যথেষ্ট লোকসানি করেছে রাজনীতি।

ওব এত সাবধানতা সত্যিই যে বাড়াবাড়ি নয় তার প্রমাণ খাদ্যসংগ্রহ নীতির শোচনীয় ব্যর্থতা, আর তারই ফলে তিনজন বৃদ্ধ গ্রেপ্তার হয়েছে জামিন হিসেবে। সেপাই সঙ্গে দিয়ে তাদের ভিয়েশেন্স্কায় পাঠানো হয়েছে।

পরদিন সমবায় সমিতির দোকানের কাছে জাখার ক্রাম্স্কফের সঙ্গে দেখা হল গ্রিগরের। জাখার প্রাক্তন গোলন্দাজ-বাহিনীর সেপাই, সবে লালফৌজ থেকে ফিরেছে। লোকটা পাঁড় মাতাল হয়ে টলে-টলে হাঁটছিল। কিন্তু গ্রিগরের সামনে পড়তেই নোংরা জামার সব বোতামগুলো চট্পট এঁটে ভাঙাগলায় বললে:

—নমস্কার গ্রিগর পান্তালিয়েভিচ্।

—নমস্কার।—গাঁট্টাগোট্টা সুঠাম চেহারার গোলন্দাজ সেপাইটির সবল হাতটা ধরে ঝাঁকুনি দিলে গ্রিগর।

—চিনতে পারো আমাকে?

—কেন পারব না, নিশ্চয় পেরেছি।

—মনে আছে গেল-বছর বস্‌কোফ্‌স্কয়ের কাছে আমাদের কামানগুলো কীভাবে তোমায় বাঁচিয়ে দিয়েছিল? আমরা না থাকলে তোমার ঘোড়-সওয়ার ফৌজ নাকানি-চোবানি খেতো। উঃ কী আন্দাজ লাল সেপাই মেরেছিলাম সেদিন। আমার ছিল এক নম্বর কামানটা নিশানা করার ভার।—হাতের মুঠো দিয়ে চওড়া বুকখানা ঠুকলে দুম্‌দুম্‌ আওয়াজ করে।

গ্রিগর চঞ্চলভাবে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখছিল—খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে কয়েকজন কসাক ওদের লক্ষ্য করছে, ওদের কথাবার্তাও শুনছে। গ্রিগরের ঠোঁঠের কোণা কাঁপে, রাগে দাঁত খিঁচিয়ে ওঠে ও। সাদা শক্ত দাঁতের সারি।

—মাতাল হয়েছ। দাঁতে দাঁত চেপে নিচু গলায় বলে গ্রিগর—যাও, ঘুমিয়ে নেশা কাটাও, আর অত বেশী বোকো না।

নেশায় বুঁদ গোলন্দাজ-সেপাইটা চেঁচায়: না, না, মাতাল আমি হইনি। তা বলতে পারো··বড়ো দুঃখের বিষ গিলে মাতাল। ঘরে ফিরলাম, কিন্তু এ যে কী জীবন দেশ-গাঁয়ের, নরক। নরক। কসাকরা আর বেঁচে নেই, মরে গেছে, তাছাড়া কসাক আছেই বা কে। চল্লিশ পুড গম দখল করে নিয়েছে আমার, একে তুমি কী বলবে বল? সে-গম কি ওরা বুনেছিল যে কেড়ে নিয়ে যাবে? অধিকার ফলাচ্ছে। জানে ওরা ফসল কীসে ফলে?

বোধশক্তিহীন রক্তলাল চোখ মেলে তাকায় লোকটা, তারপর হঠাৎ গ্রিগরকে দুহাতের থাবায় চেপে ধরে। ওর মুখের ওপর কড়া ভদ্‌কার নিশ্বাস ছাড়ে ফোঁস্ করে।

—ডোরাদার পাতলুন কোথায় গেল হে তোমার? চাষীদের খাতায় নাম লিখেছ বুঝি? সেটি হতে দিচ্ছি না। বুঝলে বাছা গ্রি র পান্তালিয়েভিচ। আবার লড়তে হবে আমাদের। যেমন গত বছর বলেছিলাম তেমনি আবার বলব: কমিউন নিপাত যাক্, তবে বেঁচে থাক্ সোভিয়েত হুকুমত।

গ্রিগর রূঢ়ভাবে ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বিড়বিড় করে বলে:

—যাও বাড়ি যাও, মাতাল শুয়োর। কী বলছ খেয়াল আছে?

ক্রাম্‌স্কফ এক হাত সামনে বাড়িয়ে, তামাকের দাগধরা আঙুলগুলো উঁচিয়ে বলে:

—যদি বেফাঁস কিছু বলে থাকি তো মাপ কোরো। মাপ কোরো, তবে তোমাকে মন খুলেই যা বলবার বলেছি, আমার কমাণ্ডারকে যেভাবে বলা দরকার।··আমার নিজের কমাণ্ডার বাপকে বলেছি: আমাদের লড়তে হবে!

নীরবে ফিরে চলে গ্রিগর, চত্বর পার হয়ে বাড়ির রাস্তা ধরে। অসময়ের এই সাক্ষাৎকার সন্ধ্যে অবধি ওর মনে দাগ কেটে বসে থাকে। কেবলি মনে পড়তে থাকে ক্রাম্‌স্‌কফের মাতাল চিৎকার, কসাকদের নীরব সমর্থন আর হাসি। ও ভাবে আমাকে কিন্তু তাড়াতাড়ি সরে পড়তে হবে। এসবের পরিণতি ভালো দাঁড়াবে না!···

* * *

শনিবার ভিয়েশেন্‌স্কায় যাবার কথা। আর তিনদিনের মধ্যে ওকে গ্রাম ছেড়ে সরে পড়তে হবে। কিন্তু তা হবার যো ছিল না; বৃহস্পতিবার রাতে গ্রিগর সবে ঘুমোবার জোগাড করেছে এমন সময় দরজায় কে যেন সজোরে ঘা মারতে লাগল। আকসিনিয়া বেরিয়ে এল সিঁড়ি-দরজায়। গ্রিগর শুনতে পেল আকসিনিয়ার গলার আওয়াজ—কে ওখানে? জবাবটা বুঝতে পারল না, কিন্তু একটা অস্পষ্ট আশঙ্কার অনুভূতি জাগল গ্রিগরের মনে। বিছানা ছেডে উঠে জানালার কাছে এগিয়ে আসে সে। দরজার শেকলে শব্দ হয়। প্রথমেই ঢুকলে দুনিয়া। ওর পাংশু মুখখানা গ্রিগরের নজরে পড়ে। ওকে কিছু জিজ্ঞাসা করে জানবার আগেই গ্রিগর বেঞ্চির ওপরে থেকে নিজের টুপি আর জোব্বাকোটখানা তুলে নিয়েছে।

—দাদা···

—কী হয়েছে? কোটের আস্তিনের ভেতর হাত গলিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করে গ্রিগর শান্তকণ্ঠে।

দুনিয়া হাঁপাতে হাঁপাতে বলে:

—দাদা, এক্ষুনি সরে পড়ো! ভিয়েশেন্‌স্কা থেকে চারজন ঘোডসওয়ার এসেছে। ওরা সব বড়ো ঘরটাতে বসে আছে।···নিজেদের ভেতর কানাকানি করছিল কিন্তু আমি শুনেছি···দরজার কাছে আড়ি পেতে সব শুনেছি। মিখাইল বলছিল তোমাকে গ্রেপ্তার করা উচিত।·· তোমার সব কথা মিখাইল ওদের শুনিয়েছে।···তুমি চলে যাও দাদা!

গ্রিগর চট্‌ করে এগিয়ে গিয়ে দুনিয়াকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে ওর গালে সজোরে চুমু খায়।

—বেঁচে থাক্‌ বোনটি। তুই এবার ফিরে যা, নয়তো ওরা লক্ষ্য করবে তুই বেরিয়ে এসেছিস্‌। বিদায়!—আকসিনিয়ার দিকে ফিরে ও বলে—রুটি! শিগগির! না, পুরোটা নয়, ছিঁড়ে দাও একটুকরো!

সংক্ষিপ্তকালের শান্তির জীবন, এইভাবেই শেষ হয়ে গেল।···গ্রিগরের তৎপরতা শুরু হয় লডাইয়ের ময়দানের মতো, দ্রুত অথচ দৃঢ়-সংকল্প। শোবার ঘরে গিয়ে সাবধানে ছেলেমেয়েদের চুমু দেয় তারপর আকসিনিয়াকে টেনে নেয় বুকের মধ্যে।

—যাই তা'হলে! আমার খবর তুমি শিগগিরই পাবে। প্রোখরই বলবে তোমাকে। বাচ্চাগুলোকে দেখো। দরজায় শেকল দিয়ে দাও। যদি ওরা কড়া নাড়ে, বোলো আমি ভিয়েশেন্স্কায় গেছি। তাহলে বিদায় আকসিনিয়া, দুঃখ কোরো না কিন্তু!—চুমু খেতে গিয়ে ঠোঁটে চোখের জলের উষ্ণ নোনতা আস্বাদ টের পায় গ্রিগর।

আর সময় নেই সান্ত্বনা দেবার, ওর অসহায় ভাঙা-ভাঙা কথাগুলো শোনবার। জড়িয়ে-ধরা দুটো বাহুকে আলগোছে ছাড়িয়ে দিতে হয়। লম্বা লম্বা পা ফেলে সিঁড়িদরজা অবধি গিয়ে কান পেতে শোনে গ্রিগর। তারপর বাইরের দরজাটা পুরো খুলে দেয়। ডনপারের ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা এসে মুখে লাগে। এক মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করে গ্রিগর, অন্ধকারে দৃষ্টিটা ঠাহর করে নিতে হয়।

গ্রিগরের পায়ের চাপে বরফ মুচমুচ করে ভেঙে যাচ্ছে—শুনতে পায় আকসিনিয়া। প্রতিটি পায়ের শব্দে ওর বুকে কাঁটা বেঁধে যেন। তারপর সে পায়ের শব্দও ক্ষীণ হয়ে এল, বাইরের ওয়াটল্-লতার বেড়ায় ক্যাঁচ্ করে আওয়াজ হয়। সব একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেছে এবার। শুধু ডনের ওপারের বনে বাতাসের হাহাকার।

বাতাসের গর্জনের ভেতর দিয়েও আকসিনিয়া কান পেতে শুনতে চেষ্টা করে, কিন্তু কোনো সাড়া পায় না। হঠাৎ খুব ঠাণ্ডা লাগতে থাকে ওর। রান্নাঘরের ভেতর গিয়ে বাতিটা নিবিয়ে দেয়।

পলাতক

॥ এক ॥

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের হেমন্তকাল। শস্য-দখল নীতির ফলাফল মোটেই আশানুরূপ হয়নি দেখে সোভিয়েত সরকার যখন শস্য-সংগ্রহকারী বাহিনী গঠন করা প্রয়োজন মনে করলেন তখন ডন এলাকার কসাক জনতার মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। ছোট ছোট সশস্ত্র দল মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল শুমিলিনস্ক্, কাজান্স্কা, মিগুইলিন্স্ক্, মিশকভ্স্কি; ভিয়েশেন্স্কা, ইয়োলান্স্কা প্রভৃতি উজানি ডন জেলাগুলোর মধ্যে। সরকারী শস্য-সংগ্রাহক সংগঠনের পাল্টা জবাব হিসেবে এই দলগুলোকে খাড়া করেছে ধনী কসাকেরা। শস্যদখল নীতি ক্রমেই কড়াকড়িভাবে চালু করার ব্যবস্থা করেছিলেন সোভিয়েত সরকার আর তারই মোকাবিলা করতে গড়া হয়েছে এইসব দল।

একেক দলে পাঁচজন থেকে কুড়িজন লোক। দলগুলোর বেশীরভাগই স্থানীয় কসাকদের নিয়ে গড়া যারা একসময় ছিল সক্রিয় শ্বেতরক্ষী। এদের দলে আছে এমন সব লোক যারা ১৯১৮-১৯ সালে পিটুনি ফৌজে কাজ করেছিল, অথবা সেপ্টেম্বর মাসে সোভিয়েতের ফৌজ সমাবেশের সময় ডন-বাহিনীর যে-সব বে-কমিশন আর আনকোরা অফিসাররা ফাঁকি দিয়েছিল তারাই। এ ছাড়াও আছে বিদ্রোহীরা, যারা গতবছর উজানী ডন এলাকায় বিদ্রোহের সময় লড়াইয়ের মধ্যে বা লালফৌজী বন্দীদের হত্যা করার ব্যাপারে বেশ কারদানি দেখিয়েছে। মোটের ওপর এরা এমন জাতের লোক যারা কোনো অবস্থাতেই সোভিয়েত রাজত্বে বসবাস করতে পারবে না।

গ্রামে গ্রামে খাদ্যসংগ্রাহক ফৌজের উপর হামলা করে এই দলগুলো। গ্রামবাসীরা সংগ্রহ-ঘাঁটিতে গাড়ি করে শস্য নিয়ে এলে ওরা তাদের ফিরিয়ে দেয়। সোভিয়েত সরকারের অনুগত কমিউনিস্ট ও পার্টিনিরপেক্ষ কসাকদের হত্যা করে আর নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধি আর ক্ষমতা অনুযায়ী যথাসাধ্য লড়াই করে।

উজানী ডন এলাকায় এইসব দলগুলোকে নিকেশ করার ভার পড়েছিল

এক গ্যারিসন ব্যাটেলিয়ন ফৌজের ওপর; তাদের ঘাঁটি ভিয়েশেন্‌স্কায়। কিন্তু বিস্তীর্ণ ডন এলাকার সর্বত্র ছড়িয়ে-থাকা এই দলগুলোকে ধ্বংস করার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হতে লাগল, তার প্রথম কারণ স্থানীয় লোকেরা বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতিশীল, তারা ওদের খাদ্য জোগায়, লালফৌজের সেপাইদের চলাফেরার খবরাখবর দেয়, এমনকি তাড়া খেয়ে এলে ওদের লুকোবার জায়গাও দেয়। কিন্তু এ-সবেরও ওপরে রয়েছে ব্যাটেলিয়নের কমাণ্ডার কাপারিন স্বয়ং। লোকটা সোশ্যাল রেভল্যুশনারী দলের। জার-বাহিনীর প্রাক্তন সেনানীমণ্ডলীর ক্যাপটেন। নিজের এলাকায় প্রতিবিপ্লবীদের উচ্ছেদ-সাধনে তার মোটেই উৎসাহ নেই, বরং সুযোগ পেলেই বিদ্রোহ দমনের ব্যবস্থা সবরকমে বানচাল করার চেষ্টা করে। শুধু কালেভদ্রে পার্টির আঞ্চলিক কমিটির তাগিদে পড়ে সৈন্যসামন্ত নিয়ে ছোটখাট অভিযান করে। তারপরেই আবার চট্ করে ফিরে আসে এই অছিলায় যে সৈন্যদল বেশীরকম ছড়িয়ে দিলে অথবা অবিবেচকের মতো ঝুঁকি নিলে কাজটা ঠিক হবে না, কারণ তাতে ভিয়েশেন্‌স্কা এবং আশপাশের আঞ্চলিক সংগঠন আর সরকারী গুদোমগুলো একেবারে অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে যাবে। তাই, ব্যাটেলিয়নের চারশো বেয়নেটধারী আর চোদ্দজন মেশিনগান সেপাই গ্যারিসনের নানা কাজ করছে, যেমন বন্দীদের পাহারা দেয়া, জল তোলা, জঙ্গলের গাছ কাটা। এছাড়া ওদের আবশ্যিক শ্রমদানের একটা বিশেষ কাজ ওকগাছের ফল কুড়োনো—কালি তৈরি করার জন্য। অসংখ্য আঞ্চলিক সংগঠন ও দপ্তরকে ব্যাটেলিয়ন সাফল্যের সঙ্গে কাঠ ও কালি সরবরাহ করে আসছিল, কিন্তু এরই মধ্যে আবার ছোটোখাটো বিদ্রোহী দলের সংখ্যা এ-অঞ্চলে শঙ্কাজনকভাবে বেড়ে গেছে। তাই ডিসেম্বর মাস নাগাদ যখন উজানি ডন এলাকার গা ঘেঁষে ভরোনেঝ প্রদেশের বোগুচার জেলায় বেশ বড়সড় রকমের একটা বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিলে তখন বাধ্য হয়েই গাছ-কাটা আর ওকফল কুড়োনো বন্ধ রাখতে হল। ডন এলাকার ফৌজী সেনানায়কের হুকুমে তিন কোম্পানী সেপাই আর মেশিনগান দিয়ে ব্যাটেলিয়নকে পাঠানো হল বিদ্রোহ দমন করতে। ওদের সঙ্গে গেল সৈন্যঘাঁটির ঘোড়সওয়ার স্কোয়াড্রন, বারোনম্বর খাদ্য-সংগ্রাহক রেজিমেন্টের প্রথম ব্যাটেলিয়ন এবং দুটো ছোট ছোট স্থানীয় প্রতিরক্ষীদল।

সুখোই দনিয়েৎস্ গ্রামের প্রবেশপথে যে লড়াই হল তাতে ইয়াকফ ফোমিনের পরিচালনায় ভিয়েশেন্‌স্কার ঘোড়সওয়ার-ফৌজ পাশ থেকে বিদ্রোহীদের ব্যূহ আক্রমণ করে একেবারে ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেল। ওদের পেছু তাড়া করে প্রায় একশো সত্তর জনকে তলোয়ার দিয়ে কোতল করেছিল এরা অথচ এদের পক্ষে মারা গেছে মাত্র তিনজন সৈনিক। দুয়েকজন বাদে স্কোয়াড্রনের প্রত্যেকটি মানুষই কসাক, উজানী ডন এলাকার বাসিন্দা। এ-যুদ্ধেও তাদের

প্রাচীন কসাক প্রথাটাকে তারা ভোলেনি : স্কোয়াড্রনের দুজন কমিউনিস্টের হাজার বারণ সত্ত্বেও তাদের প্রায় অর্ধেক সেপাই পুরনো-জোব্বাকোট আর তুলো-দেওয়া জ্যাকেটের বদলে মৃত বিদ্রোহীদের গা থেকে ভালো-ভালো ভেড়ার চামড়ার জামাগুলো কেড়ে নিয়েছে।

বিদ্রোহ দমন করার দিনকয়েক বাদেই স্কোয়াড্রনকে ডেকে পাঠানো হল কাজান্স্কায়। জঙ্গী জীবনের বোঝা হাল্কা করবার জন্য ফোমিন এখানে বিশ্রাম নিলে, যথাসাধ্য আনন্দ করে কাটালে। স্ত্রীলোকের পেছু নেয়া ফোমিনের মজ্জাগত স্বভাব, তার ওপরে সে ফুর্তিবাজ আর মিশুক কসাক। রাতের পর রাত সে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায় আর আস্তানায় ফেরে ভোর হবার কিছু আগে। একদিন ওর সেপাইরা—কমাণ্ডারের সঙ্গে ওদের খুবই ওঠ-বোস—ফোমিনকে দেখলে সন্ধ্যের সময় রাস্তার মোড়ে, ঝকঝকে পালিশ জুতো পরা। পরস্পর চোখ টেপাটেপি করে তারা ফোড়ন কাটলে :

—এবার তাহলে আমাদের ঘোড়া আবার চললেন বাজিমাত করতে। ভোরের আগে আর ফিরবেন না।

কিছু কিছু কসাক আছে যাদের সঙ্গে ভালোরকম দোস্তি ফোমিনের, ওরা যখনই খবর দেয় কোথাও অঢেল ভদ্‌কা আর মাইফেলের আয়োজন হয়েছে তখনই তাদের আস্তানায় হানা দেয় ফোমিন। ওর এ অভ্যাসটির কথা কিন্তু স্কোয়াড্রনের কমিসার বা রাজনৈতিক উপদেষ্টার অজানা। এই সব আসা-যাওয়া ঘটে প্রায়ই। কিন্তু হঠাৎ যেন বেপরোয়া কমাণ্ডার সাহেবের মেজাজ বিগড়ে গেল। আর তেমন উৎসাহ দেখা যায় না, তামাশা ফুর্তির ব্যাপারগুলো যেন একেবারেই ভুলতে বসেছে। সন্ধ্যে হলে আর আগের মতো জুতো পালিশও করে না। রোজ দাড়ি কামানোরও ধার ধারে না। স্কোয়াড্রনের পাড়াপড়শি সঙ্গীদের বাড়িতে এখনো মাঝে-মাঝে মদটদ খেতে যায় বটে, তবে আলাপ-আলোচনায় খুব একটা যোগ দেয় না।

ফোমিনের আচরণের এই পরিবর্তন ঘটেছে ভিয়েশেন্স্কা থেকে সম্প্রতি একটা খবর পাওয়ার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই। ডন 'চেকা'র রাজনৈতিক-দপ্তর সংক্ষেপে ওকে জানিয়েছিল যে উস্ত্-মেদভেদিৎসার মিখাইলভ্‌কা এলাকায় এক গ্যারিসন ব্যাটেলিয়ন বিদ্রোহ করেছে, তাদের কমাণ্ডার ভাকুলিনও বিদ্রোহে যোগ দিয়েছে।

ভাকুলিন আবার ফোমিনের পল্টনী সহকর্মী, তার ব্যক্তিগত বন্ধুও বটে। বিদ্রোহী মিরনোভ বাহিনীতে ওরা এক সময় একসঙ্গে কাজ করেছিল, তারপর বুদিয়নির ঘোড়সওয়ার দল ওদের বাহিনীকে ঘিরে ফেললে ওরাই দুজনে মিলে হাতিয়ার সরঞ্জাম সব জড়ো করে। ফোমিন আর ভাকুলিনের বন্ধুত্বের সম্পর্ক কোনোদিনই ভাঙেনি। এমন কি সেদিনও সেপ্টেম্বরের গোড়ায় ভাকুলিন ভিয়েশেন্স্কায় এসেছিল দেখা করতে। সেদিন সে পুরনো বন্ধুর

কাছে দাঁতে দাঁত চেপে নালিশ করেছিল "কমিসারদের মাতব্বরি" সম্পর্কে। "ওরাই শস্য দখল করে চাষীদের সর্বনাশ করছে আর দেশটা নিয়ে যাচ্ছে গোল্লায়"—বলেছিল ভাকুলিন। মনে-মনে ভাকুলিনের বক্তব্যে পুরো সায় থাকলেও ফোমিন নিজেকে কথাবার্তায় ধরা দেয়নি—ওর স্বভাবসিদ্ধ ধূর্তামিটুকুই বুদ্ধির অভাব পূরণ করে থাকে সময়ে অসময়ে। ফোমিন এমনিতে সাবধানী, কখনো তড়বড় করে না বা তখন-তখুনি নিজেকে প্রকাশ করে বসে না কোনো রকমভাবে। কিন্তু ভাকুলিনের পল্টনদের বিদ্রোহের সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওর অভ্যাসগত সাবধানতায় একটু ঢিলে পড়েছিল। একদিন সন্ধ্যায় স্কোয়াড্রনের ভিয়েশেন্স্কা যাত্রার ঠিক আগেই, পল্টন-নায়ক আলফেরফের ঘরে কয়েকজন কসাক এসে জড়ো হয়েছে। একটা বড়ো ঘোড়ার বালতি ভর্তি ভদ্‌কা। টেবিল ঘিরে চলেছে উত্তেজিত আলোচনা। ফোমিনও উপস্থিত ছিল পানোৎসবে, চুপচাপ বসে আলোচনা শুনছিল আর নীরবেই বালতি থেকে ভদ্‌কা তুলে পরিবেশন করছিল সবাইকে। স্থখোই দনিয়েৎসের কাছে কীভাবে বিদ্রোহীদের আক্রমণ করেছিল সে বর্ণনা দিচ্ছিল একজন কসাক। ফোমিন আর থাকতে না পেরে লোকটার কথায় বাধা দিলে গোঁপ চুমরোতে চুমরোতে

—উক্রেইনীগুলোকে আমরা সাবাড় করেছি ভালোমতোই, ভাইসব, কিন্তু আমাদের আবার না আপসোস করতে হয় শিগগিরই। ধরো যদি ভিয়েশেন্স্কায় ফিরে গিয়ে আমরা দেখতে পাই খাদ্য সংগ্রহ ফৌজ আমাদেরই গোলাঘর থেকে সব শস্য কেড়ে নিয়ে গেছে, তাহলে? কাজানস্কার লোকরা তো ওদের ওপর হাড়ে চটা। ওরা নাকি শেষ দানাটি অবধি তলা থেকে ঝেঁটিয়ে নিয়ে যায়।

ঘরের সবাই নিস্তব্ধ। ফোমিন সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে জোর করে মুখে হাসি এনে বললে,

—এই একটু তামাশা করছিলাম। খেয়াল রেখো, এ নিয়ে আর বলাবলি কোরো না। তামাশার কথাই আবার কার কানে কেমন ঠেকবে কোন শয়তান জানে?

ভিয়েশেন্স্কায় ফিরে এসে ফোমিন তার ঘোড়সওয়ারদের আধা ফৌজ সঙ্গে নিয়ে রুবিয়েঝিন গাঁয়ে নিজের বাড়িতে এল। সোজা বাড়ির ভেতর না ঢুকে ফটকের কাছেই ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল সে। সেপাইদের এক জনের হাতে লাগামটা ছেড়ে দিয়ে গট গট করে বাড়ির ভেতরে ঢুকলে।

বউয়ের দিকে উদাসীন ভাবে চেয়ে একটু মাথা নাড়লে। তারপর ভক্তি-ভরে মাকে নমস্কার করে তার হাত ঝাকুনি দিলে। ছেলেমেয়েদের বুকে জড়িয়ে ধরলে।

—কিন্তু বাবাকে দেখছি না যে?—একটা টুলের ওপর বসে জিজ্ঞেস করলে ফোমিন দু'হাঁটুর কাছে তলোয়ারটা রেখে।

মা জবাব দিলেন—কারখানায় গেছে।—ছেলের দিকে চেয়ে কঠিন স্বরে বললেন—টুপি খুলে ফেল্ মেলেচ্ছ কোথাকার। টুপি মাথায় দিয়ে কেউ দেবীপটের নিচে বসে? ইয়াকফ, তোর মাথাই তোর সব্বনাশ করবে!

জোর করে হেসে ফোমিন টুপি খোলে, কিন্তু বাইরের পোশাকটা খুলবার কোনো চেষ্টাই করে না?

ওর মা ফের বলেন—কোটটা খুলছিস না কেন?

—বাড়ি এলুম দু'এক মিনিটের জন্য দেখা করতে, কাজের ফাঁকে তো সময়ই পাই না।···

—কাজ যে তোমার কতো জানা আছে।—বুড়ী মহিলা ঝাঁজ দিয়ে বললেন কথাটা ছেলের উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রা আর ভিয়েশেন্স্কায় বাবনারী-সঙ্গকে ইঙ্গিত করে। ওর চালচরিত্র সম্পর্কে নানা গুজব অনেককাল হল রুবিয়েঝিনে ছড়িয়েছে।

ফোমিনের স্ত্রী অকালে বুড়ী হযে গেছে। ফ্যাকাশে মুখ, সংসারের চাপে ভেঙে পড়া। সভয়ে শাশুড়ীর দিকে তাকায় সে। চুল্লির দিকে এগিযে যায়, স্বামীকে খুশী করবার জন্য কিছু একটা করতে চায। ওকে একটু তুষ্ট করা, অন্তত স্বামীর সদয় দৃষ্টিটুকুর জন্যই হোক। চুল্লিব ধার থেকে একটা নেকড়া বের করে হাঁটু গেড়ে বসে ঝুঁকে পড়ে ফোমিনের পায়ের ওপর, বুটজোড়ায় লেগে থাকা পুরু কাদা ঘষে তুলতে যায়।

—কী সুন্দর জুতোজোড়া তোমার ইয়াশা। আহা, কাদা লেগে গেছে। দাও পরিষ্কার কবে দিচ্ছি, একেবারে ঝকঝকে করে দেব। প্রায় শোনা যায না এমনিভাবে নিচু গলায় বলে ফোমিনের বউ, মাথা ওপ্পরে তোলে না, হাঁটু গেড়ে বসে থাকে স্বামীর পায়ের কাছে।

বছরের পর বছর কেটে গেছে স্বামীর সঙ্গ ছাড়া, বছরের পর বছর একটা অস্পষ্ট, অবজ্ঞামিশ্রিত অনুকম্পা ছাড়া ফোমিনের কোনো অনুভূতিই নেই এই স্ত্রীলোকটির ওপর—যাকে সে যৌবনে ভালোবেসেছিল। কিন্তু ফোমিনের প্রতি ভালোবাসার কার্পণ্য ছিল না মেয়েটির, ওর শত অপরাধ সে ক্ষমা করেছে, মনের সঙ্গোপনে আশা রেখেছে একদিন-না-একদিন সে ফিরে আসবেই। বহু দীর্ঘ বছর ধরে খেতখামার দেখাশোনা করেছে। ছেলেমেয়েদের বড়ো করেছে। খেয়ালী শাশুড়ীকে খুশী করতে সব কিছু করেছে। খামারের কাজের সমস্ত বোঝা ওর ওই রোগা কাঁধ দুটির ওপর। অতিরিক্ত পরিশ্রম আর দ্বিতীয় সন্তানটির জন্মের পর থেকে একটা বিশেষ রোগ ওর শরীরের সমস্ত শক্তি শুষে নিয়েছে, এখনো নিচ্ছে। খুবই শীর্ণ হয়ে গেছে মেয়েটি। মুখের সে লাবণ্য নেই। অকাল বার্ধক্য মাকড়সার জালের মতো কুঞ্চনরেখা

ফেলেছে। বুদ্ধিমান রুগ্ন জন্তুর চোখে যে শঙ্কিত মিনতির দৃষ্টি তারই আভাস ওর চোখেও। ও নিজেই জানে না কত তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যাচ্ছে সে, প্রতিটি দিনের সঙ্গে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছে। তবু আঁকড়ে রয়েছে আশা। তাই কচিৎ যখন ওদের দেখা-সাক্ষাৎ হয় তখন ভীরু ভালোবাসা আব বিস্ময়-মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকে সুপুরুষ স্বামীর দিকে।

স্ত্রীর শোচনীয় ধনুকের মতো বাঁকা পিঠ আর জামার তলা দিয়ে জেগে ওঠা রোগা তীক্ষ্ণ কাঁধের হাড জোড়া লক্ষ্য করে ফোমিন। আর চেয়ে ছাখে ওর বড়ো-বড়ো কাঁপা হাত দুটো এক নাগাড়ে বুট জুতোর কাদাগুলো সাফ করে যাচ্ছে সযত্নে। ফোমিন ভাবে—সুন্দরী ছিল বটে, সন্দেহ নেই। আর এরই সঙ্গে শুতাম এক সময়। কিন্তু কী দারুণ বুড়িয়ে গেছে। এত বয়েস বেড়ে গেল!

স্ত্রীর হাত থেকে পা দুটো ছাড়িয়ে নিয়ে বিরক্তির সুরে বললে ফোমিন: থাক্, হযেছে! ফের তো কাদা লেগেই যাবে।

পিঠটা কাতরে সোজা কবে উঠে দাঁড়াল ফোমিনের স্ত্রী। ওর পাঁশুটে গালের ওপর ফুটে উঠেছে একটা রক্তিম আভা। ওব ভিজে চোখদুটোর মধ্যে ভালোবাসা আর কুকুরের মতো ভক্তি প্রকাশ পেতে দেখে ফোমিন মাথা ঘুরিয়ে নেয়। মাকে জিজ্ঞেস করে:

—থাক্, তোমাদেব সব কেমন চলছে?

—যেমন চলছিল।—বিসন্ন জবাব বুড়ীর।

—গাঁয়ে শস্য-দখল ফৌজ এসেছিল?

—এই তো কাল তারা নিঝনি-ক্রিভস্কার দিকে রওনা হয়ে গেল।

—আমাদের ফসল কিছু নিয়েছে?

—হ্যাঁ। কতখানি নিয়েছেরে দাভিদ্‌কা?

—দাদু দেখেছিল, দাদুই জানে। মনে হয দশ বস্তা।

—অ্যাঁ!·····ফোমিন খাড়া হযে উঠে আড চোখে ছে ্র দিকে চায আর তলোয়ারের বেল্ট্‌ সোজা করে। ফ্যাকাশে মুখ করে শুধোয়. ওদেব বলেছিলে কার জিনিসে ওবা হাত দিচ্ছে?

বুড়ী হাত নেড়ে একটু হাসলে অবজ্ঞার ভাব দেখিযে:

—ওরা তোমাকে নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না। ওদের কমাণ্ডার বললে, 'বাডতি ফসল সব্বাইকেই দিতে হবে, ছোট-বড়োর তফাত নেই। ফোমিনই হোক্ আর স্বয়ং এলাকার চেয়ারম্যানই হোক্, বাডতি শস্য আমরা নিয়ে নেবই।' এই বলে তারা পিপে ঝেড়েপুঁছে সব দেখলে।

—আমি ওদের শায়েস্তা করব মা! শায়েস্তা করব!—ভারি গলায় বলে ফোমিন। তারপর তাডাহুড়ো করে বিদায় নেয়।

এর পর থেকে ফোমিন ওর স্কোয়াড্রনের সেপাইদের মনোভাব খুঁটিয়ে

যাচাই করতে শুরু করে। এবং অচিরেই এই সিদ্ধান্তে এসে হাজির হয় যে তাদের অধিকাংশই সরকারের শস্য-দখল নীতিতে বিক্ষুব্ধ। ওদের বউরা আসে, আত্মীয়-স্বজন আসে নানা জেলা গ্রাম থেকে আর বলে শস্য-দখলকারী ফৌজ নাকি বাড়ি বাড়ি খুঁজে দেখছে। শুধু বীজ আর খাবারের শস্যটুকু ছেড়ে দিয়ে বাকি সব নিয়ে যাচ্ছে। ফলে জানুয়ারি মাসের শেষদিকে বাজ্কিতে যে গ্যারিসন সভা হল সেখানে ঘোড়সওয়ার ফৌজের সেপাইরা খোলাখুলিই এলাকার সামরিক কমিসারের বক্তৃতায় বাধা দিলে। দলের ভেতর থেকে চিৎকার হতে লাগল :

—দখলকারী ফৌজ হটিযে নাও!

—আর আমাদের ফসল কাড়া চলবে না।

—শস্য-দখলকারী কমিসাবরা নিপাত যাক্।

জবাবে গ্যারিসন কোম্পানির লালফৌজী সেপাইরা চেঁচাল :

—বিপ্লবের শত্রু!

—শুয়োরের দলটাকে ভেঙে দাও। অন্য পল্টনে পাঠিয়ে দাও।

দীর্ঘ, উত্তেজনাময় সভা। গ্যারিসনের স্বল্পসংখ্যক কমিউনিস্টের মধ্যে একজন ফোমিনকে উৎকণ্ঠিতভাবে বললে :

—আপনি কিছু বলুন, কমরেড ফোমিন। আপনার স্কোয়াড্রানের সেপাইরা কী খেলা খেলছে দেখুন চেয়ে।

গোঁপের তলায় হেসে ফোমিন বললে :

—কিন্তু আমি তো দলনিরপেক্ষ লোক। আমার কথা কি ওরা শুনবে ভেবেছেন?

মুখ খুললে না ফোমিন একবারও। সভা শেষ হওয়ার অনেক আগেই সে চলে গেল। ব্যাটেলিয়ন কমাণ্ডার কাপারিনের সঙ্গে বেরিয়েছিল ও। ভিয়েশেন্স্কার পথে দুজনে আলাপ শুরু করলে এখনকার পরিস্থিতি নিয়ে। দু'এক কথার পরই দুজনের বক্তব্যে যথেষ্ট মিল দেখা গেল। হপ্তাখানেক পর ফোমিনের ঘরে আলাপ-আলোচনার সময় কাপারিন তাকে খোলাখুলিই বললে :

—হয় আমাদের এখুনি কিছু করতে হয় আর নয়তো একেবারে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হয়, সে-কথা পরিষ্কার, ইয়াকফ এফিমোভিচ্। সুযোগের সদ্ব্যবহার করাই তো ভাল। এখনই সবচেয়ে ভালো সময়। কসাকরা আমাদের সমর্থন করবে। গোটা এলাকায় তোমাকে সবাই খুব মানে। লোকের মনের অবস্থাও এখনই সব চাইতে সুবিধাজনক। চুপ করে আছ কেন? মন ঠিক করে ফেল।

—কী ব্যাপারে মন ঠিক করব?—ধীরে ধীরে টেনে-টেনে কথাগুলো বলে ফোমিন আর ভুরুর তলা দিয়ে তাকায়—জবাব তো তৈরিই আছে—

শুধু প্ল্যানটা ঠিক করা দরকার যাতে নির্বিঘ্নে কাজ হয়, কোনো গণ্ডগোল না বাধে কোথাও। সেটাই ঠিক করা যাক, এসো!

ফোমিন আর কাপারিনের সন্দেহজনক বন্ধুত্ব কিন্তু দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারেনি। ব্যাটেলিয়নের কয়েকজন কমিউনিস্ট মিলে ওর গতিবিধির ওপর নজর রাখল। তারা রাজনৈতিক দপ্তরের কর্তা আর্তেমিয়েফকে খবরটা জানিয়েছে, সামরিক কমিসার শাখায়েফকেও ওদের সন্দেহের কথা বলেছে।

আর্তেমিয়েফ হেসে বলেছিল—ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। কাপারিন ভীতু লোক, সে কি এমন একটা চরম রাস্তা বেছে নেবে? ফোমিনের ওপর আমরা অবশ্য নজর রাখব। অনেক দিন থেকেই ওকে লক্ষ্য করছি, তবে ফোমিন নিজে কিছু করতে সাহস করবে মনে হয় না। এ সবই তোমাদের কল্পনা।—সিদ্ধান্ত করে ফেলেছে আর্তেমিয়েফ।

কিন্তু ফোমিনের ওপর নজর রাখা হল বড় দেরিতে। কারণ চক্রান্তকারীরা এর মধ্যেই নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে ফেলেছে। ঠিক হয়েছে ১২ই মার্চ সকাল আটটায় শুরু হবে বিদ্রোহের অভ্যুত্থান। ব্যবস্থা হয়েছে ফোমিন সেদিন সেপাইদের নিয়ে যাবে সকালের কুচকাওয়াজে পুরোদস্তুর হাতিয়ারবন্দ করে। তারপর তারা ভিয়েশেনস্কায় শহরতলিতে যে মেশিনগান ঘাঁটিগুলো বসানো হয়েছে তাদের অতর্কিতে আক্রমণ করবে। তাদের মেশিনগান কেড়ে নেবে এবং পরে গ্যারিসন কোম্পানিকে সাহায্য করবে আঞ্চলিক সংগঠনগুলোকে "নিষ্কাশন" করার ব্যাপারে।

পুরো ব্যাটেলিয়নের সাহায্য পাওয়া যাবে কিনা সে বিষয়ে কাপারিনের মনে খটকা ছিল, সে-কথা সে ফোমিনকেও জানাল। ফোমিন মন দিয়ে ওর সব কথা শুনে বললে:

—মেশিনগানগুলো যদি দখল করতে পারি তো তোমার ব্যাটেলিয়নকে আমরা জোড়ায় জোড়ায় সাবাড় করে দিতে পারব।

* * *

ফোমিন আর কাপারিনের ওপর কড়া নজর রেখেও বিশেষ লাভ হল না। দেখাসাক্ষাত ওরা কমই করত। করলেও কাজের ব্যাপারে। অবশেষে ফেব্রুয়ারির শেষাশেষি এক রাতে রাস্তায় ওদের দুজনকে একসঙ্গে দেখতে পায় এক প্রহরী। ফোমিন তার জিন-আঁটা ঘোড়াটার লাগাম ধরে হাঁটছিল, কাপারিন তার পাশে পাশে। সেপাই পরিচয় জিজ্ঞেস করতে কাপারিন জবাব দেয়—'দোস্ত!' কাপারিনের ডেরাতে ঢোকে দুজনে। সিঁড়ি-বারান্দার থামে ঘোড়া বাঁধে ফোমিন। কাপারিনের ঘরের আলো ওরা জ্বালেনি। ভোর চারটে অবধি সেখানে থেকে ফোমিন ঘোড়ায় চেপে ফিরে আসে

নিজের আস্তানায়। প্রহরী শুধু এইটুকু খবরই পাকাপাকি জোগাড় করতে পেরেছিল।

আঞ্চলিক জঙ্গী কমাণ্ডার শাখায়েভ ফোমিন আর কাপারিন সম্পর্কে তার সন্দেহের কথা সাঙ্কেতিক টেলিগ্রামের মারফত জানালে ডন প্রদেশের ফৌজী সেনাপতিকে। কয়েকদিন বাদে জবাব এল সেনাপতির দপ্তর থেকে—ফোমিন আর কাপারিনকে তাদের পদ থেকে সরিয়ে গ্রেপ্তার করতে অনুমতি দেয়া হয়েছে।

আঞ্চলিক পার্টি কমিটির দপ্তরে এক সভায় ঠিক হল ফোমিনকে জানানো হবে এলাকার জঙ্গী কমিসারিয়েটের হুকুম-বলে তাকে নভোচেরকাসে ফিরিয়ে এনে ফৌজী কমাণ্ডারের হেপাজতে রাখা হচ্ছে এবং স্কোয়াড্রনের ভার তাকে তুলে দিতে হবে সহকারী অভ্‌চিন্নিকফের হাতে। একই দিনে স্কোয়াড্রনকে কাজানস্কায় পাঠানো হবে সেখানে একদল সশস্ত্র বিদ্রোহী উপদ্রব করছে এই অজুহাতে এবং পরদিন রাতে চক্রান্তকারীদের গ্রেপ্তার করা হবে। ভিয়েশেন্‌স্কা থেকে স্কোয়াড্রনকে সরাবার সিদ্ধান্ত হল পাছে ফোমিনের গ্রেপ্তারের খবর শুনে তারা বিদ্রোহ করে। গ্যারিসন ব্যাটেলিয়নের দু'নম্বর কোম্পানির কমাণ্ডার ত্‌কাচেঙ্কো নামে একজন কমিউনিস্ট। তার ওপর দায়িত্ব থাকল বিদ্রোহের সম্ভাবনা সম্পর্কে ব্যাটেলিয়নের কমিউনিস্ট সদস্যদের ও পল্টন-অধিনায়কদের আগে থাকতে সাবধান করে দেয়ার এবং কোম্পানি ও মেশিনগান বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রাখার।

পরদিন সকালে ফোমিনকে জানানো হল নোভোচেরকাসে এসে রিপোর্ট করার হুকুম হয়েছে তার ওপর।

শুনে ধীরভাবে ফোমিন বলে—ঠিক আছে, অভ্‌চিন্নিকভ, স্কোয়াড্রনের ভার নাও তুমি। আমি চললুম নভোচেরকাসে। হিসেবপত্রগুলো দেখে নিতে চাও?

অভ্‌চিন্নিকফ অ-দলভুক্ত (অকমিউনিস্ট) সেপাই কমাণ্ডার। আগে থাকতে কিছু শোনেওনি, সন্দেহও করেনি। কাগজপত্রের মধ্যে সে একেবারে ডুবে গেল।

ফোমিন এই ফাঁকে একটা চিরকুট পাঠাল কাপারিনকে, আজই কাজ আরম্ভ করতে হবে। আমাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। প্রস্তুত হও!—বারান্দায় এসে আরদালির হাতে চিরকুটখানা দিয়ে চুপিচুপি বললে :

—মুখের ভেতর রেখে দাও। আস্তে আস্তে হাঁটা-চালে ঘোড়া চালিয়ে যাও। বুঝলে তো? কাপারিনের কাছে যাও ঘোড়াকে হাঁটা-চালে চালিয়ে। চিঠিখানা তার হাতে দিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে ফিরে এসো। যদি রাস্তায় কেউ আটকায়, গিলে ফেলো চিঠিখানা।

কাজানস্কা জেলা-কেন্দ্রে স্কোয়াড্রন নিয়ে যাবার হুকুম পেয়ে অভ্‌চিন্নিকফ

গির্জার চত্বরে কসাক সৈন্যদের কুচকাওয়াজ করালে—মার্চের জন্য প্রস্তুত হতে হচ্ছে। ফোমিন এগিয়ে এসে বললে :

—স্কোয়াড্রনকে এবার বিদায় সম্ভাষণ জানাতে পারি ?

—নিশ্চয় ! তবে একটু তাড়াতাড়ি করুন, আমাদের আর আটকাবেন না।

স্কোয়াড্রনের সামনে নিজের চঞ্চল ঘোড়াটাকে স্থির করে দাঁড় করিয়ে ফোমিন সেপাইদের দিকে চেয়ে বললে :

—তোমরা তো আমাকে ভালোকরেই চেনো বন্ধুগণ। তোমরা জানো আমি চিরদিন কিসের জন্য লড়েছি। তোমাদের সঙ্গে রয়েছি সর্বদাই। কিন্তু আজ এমন একটা অবস্থা আমি মেনে নিতে পারি না যাতে করে কসাকদের ওপর লুঠতরাজ চলে, যারা ফসল ফলায় তাদের ওপরেই চলে জুলুম। এবং সেই জন্যই আমাকে আজ কমাণ্ডারের দায়িত্ব থেকে সরানো হয়েছে। আমাকে নিয়ে ওরা কী করবে তাও আমি জানি। তাই তোমাদের কাছে বিদায় চাইতে এসেছি···।

মুহূর্তের জন্য স্কোয়াড্রন সেপাইদের চিৎকার আর হল্লায় ফোমিনের বক্তৃতায় বাধা পড়েছিল। এবার সে ঘোড়ার রেকাবে ভর দিয়ে সোজা হয়ে গলার আওয়াজ তুললে উঁচুতে :

—এ লুটতরাজ থেকে যদি রেহাই পেতে চাও, তাহলে ফসল দখলকারী ফৌজকে তাড়াও, শাখায়েফের মতো কমিসারদের খতম করো। তারা ডনে এসেছে···।

শেষ কথাগুলো ডুবে গেল হর্ষধ্বনির মধ্যে। এক মুহূর্ত সবুর করে সে উচ্চ কণ্ঠে হুকুম দিলে : তিন-তিন জন করে ডান দিকে···ডাইনে ঘোরো···কুইক মার্চ !

স্কোয়াড্রন বাধ্যভাবে হুকুল তামিল করলে। ঘটনার গতিতে অভ্‌চিন্নিকফ একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। ফোমিনের দিকে এগিয়ে এসে সে কৈফিয়ত দাবি করলে : কোথায় চলেছেন কমরেড ফোমিন ?

মাথা না ঘুরিয়েই কৌতুক করে জবাব দিলে ফোমিন—এই গির্জাবাড়িটা একটু ঘুরে আসি।

এতক্ষণে অভ্‌চিন্নিকফ গত কয়েক মিনিটের সমস্ত ঘটনা উপলব্ধি করে। সারি থেকে বেরিয়ে আসে ও, পেছন পেছন আসে রাজনৈতিক উপদেষ্টা, সহকারী কমিসার ও আরেকজন লোক। ফোমিন দুশো পা এগিয়ে যাবার পর লক্ষ্য করল ওরা সরে পড়ছে। ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে ও হুকুম করলে : অভ্‌চিন্নিকফ, থামো !

চারজন ঘোড়সওয়ার ঘোড়া উশ্‌কে দিলে দুল্‌কি চাল থেকে জোর কদমে। ঘোড়াদের খুরের ধাক্কায় আধা-গলা বরফের দলা ছিটকে উঠতে লাগল। ফোমিন আবার হুকুম দিলে :

—হাতিয়ার সামাল! অভ্‌চিন্নিকফকে পাকড়াও। এক নম্বর ট্রুপ, ছোটো ওদের পেছনে!

এলোমেলো গুলি ছোঁড়ার শব্দ জাগে। একনম্বর দলের ষোলজন সেপাই তাড়া করে ছোটে। এর মধ্যে ফোমিন স্কোয়াড্রনের বাকি সেপাইদের দুভাগে ভাগ করে ফেলেছে। তিন নম্বর ট্রুপের নায়ক চুমাকফের হেপাজতে একদলকে পাঠায় মেশিনগান চালকদের হাতিয়ার কেড়ে নেবার জন্য, আর বাকি দলটাকে নিজে নিয়ে যায় গ্যারিসন কোম্পানির ঘাঁটির কাছে। গ্রামের উত্তর দিকে বড়বড় আস্তাবলের মধ্যে ঘাঁটি করেছিল গ্যারিসন কোম্পানি।

পয়লা নম্বর বিদ্রোহী দলটি সদর রাস্তা ধরে জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে গেল ফাঁকা বন্দুক ছুঁড়ে আর তলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে। পথে যেতে চারজন কমিউনিস্টকে ওরা খুন করলে। তারপর তাড়াতাড়ি গাঁয়ের বাইরে এসে জড়ো হল নিঃশব্দে। কোনো উল্লাস চিৎকার না করে ঝাঁপিয়ে পড়ল মেশিনগান-চালক লালফৌজের সেপাইদের ওপর। ওরা তখন আস্তানা থেকে ছুটে বেরুচ্ছিল।

যে-বাড়িতে মেশিনগানধারীরা থাকত সেটা গাঁয়ের একটু বাইরের দিকে। তবে শেষ বাড়িটা থেকে তার তফাত হবে দুশো পা মতো। মেশিনগানের জবাব এল কসাকদের ওপর এলোপাথাড়ি গুলিবর্ষণের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে তারা পেছু হটে আসে। কাছাকাছি গলিতে আশ্রয় নেবার আগেই তিনজন সরাসরি গুলি খেয়ে জিন থেকে উলটে পড়ে।

অযাচিত আক্রমণে মেশিনগানধারীদের কাবু করার চেষ্টা এইভাবে ব্যর্থ হল। বিদ্রোহীরা আর পা বাড়ালো না। দলের নায়ক ওদের সবাইকে আড়ালে এনে লুকোলো। ঘোড়া থেকে না নেমে সে একটা পাথরগাঁথা চালাঘরের কোণ থেকে উঁকি মেরে ব্যাপার দেখছিল।

টুপি দিয়ে কপালের ঘাম মুছে বললে—আরো দুটো ম্যাকসিম-গান বের করেছে দেখছি। তারপর সেপাইদের দিকে ফিরে বললে—চলো হে ফিরে। ফোমিন নিজেই এসে ওদের পাকড়াও করুকগে। ক'জনকে আমরা ফেলে এলাম যেন?...তিনজন? যাক্ এবার ফোমিনই হাত মকশো করুক। গাঁয়ের পূবদিকে আবার গোলাগুলি চলতে শুরু হতেই কোম্পানি অধিনায়ক তকাচেঙ্কো আস্তানা থেকে ছুটে বেরোয়। ব্যারাকের দিকে ছুটতে ছুটতে জামা পাতলুন আঁটে। বাইরে এর মধ্যে প্রায় তিরিশজন লালফৌজী সেপাই সার বেঁধে দাঁড়িয়েছিল। তকাচেঙ্কোকে সবাই প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে:

—কারা গুলি ছুঁড়ছে?

—কী ব্যাপার?

জবাব না দিয়ে তকাচেঙ্কো যে-সব লালসেপাই তখনো ব্যারাক থেকে

ছুটে বেরুচ্ছিল তাদের সার বেঁধে দাঁড়াতে হুকুম করে। আঞ্চলিক সংগঠনের কর্মী বহু কমিউনিস্ট যারা ব্যারাকে ঢুকেছিল তারাও লাইনে দাঁড়ায়। গাঁয়ের পশ্চিম দিকে হাতবোমা ফাটার ভোঁতা আওয়াজ হল। খোলা তলোয়ার হাতে প্রায় পঞ্চাশজন ঘোড়সওয়ারকে ব্যারাকের দিকে ছুটে আসতে দেখে তকাচোস্কো ধীরেসুস্থে পিস্তলটাকে খাপ থেকে বের করে নেয়। সারবাঁধা সেপাইদের মধ্যে তখন কথাবার্তা বন্ধ, সে হুকুম দেবার আগেই তারা রাইফেল তৈরি করে রেখেছে।

একজন লালফৌজী সেপাই চেঁচিয়ে ওঠে—আরে ওরা যে আমাদেরই লোক এগিয়ে আসছে! ওই তো আমাদের ব্যাটেলিয়ন কমাণ্ডার কমরেড কাপাবিন! !

রাস্তা দিয়ে সবেগে ছুটে আসতে আসতে ঘোড়সওয়াররা হঠাৎ যেন কারো হুকুমে ঘোড়াদেব ঘাডেব ওপর একেবারে ঝুঁকে পড়ে তীব্র গতিতে এগিয়ে যায় ব্যারাক বাড়ির দিকে।

তকাচেস্কো তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচায়: খবরদার, কাছে আসতে দিও না ওদের।

বন্দুকের গর্জনে ওর কণ্ঠস্বর ডুবে গেল। লালফৌজী সেপাইদের সারির প্রায় একশো হাত কাছে আসতে চারজন লোক ঘোড়া থেকে উলটে পড়ল, বাদবাকিরা ছত্রভঙ্গ হয়ে ফিরে যেতে লাগল। একেক পশলা গুলির ঝাঁক ওদের পেছু তাড়া করে। একজন ঘোড়সওয়ার, তেমনতরো জখম হয়নি লোকটা, ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েও লাগাম ধবে রইল। কদমে-ছোটা ঘোড়া তাকে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে গেল গজবিশেক। তারপর লোকটা লাফিয়ে উঠে জিনের গোড়ার দিকটা আর একখানা রেকাব চেপে ধরে পবমুহূর্তেই চেপে বসল ঘোড়ার পিঠে। সজোরে লাগাম টেনে ঘোড়াটাকে ও আচমকা ঘুবিয়ে দিল, তাবপর জোর কদমে অদৃশ্য হয়ে গেল কাছাকাছি গলিব মধ্যে।

* * * *

এক নম্বর দলের সেপাইরা বৃথাই অভ্‌চিন্নিকফের পেছু নিয়েছিল। তারা গাঁয়ে ফিরে এল। কমিসার শাখায়েফকেও খুঁজে কোনো লাভ হল না। শাখায়েফ জঙ্গী কমিসারিয়েটের দপ্তরে নেই। তার কোয়ার্টাবেও নেই। গুলিগোলার আওয়াজ শোনা মাত্রই সে ডন নদীর দিকে ছুটে যায়। বরফ জমা নদী ডিঙিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢোকে। তারপর বাজ্‌কি গ্রামে। পরদিন উস্ত্‌-খপেরস্ক্‌ জেলায়। ভিয়েশেন্‌স্কা থেকে পাক্কা চল্লিশ মাইল দূরে।

এলাকার নেতৃস্থানীয় অফিসাররা বেশির ভাগই সময় মতো সবে যেতে পেরেছিল। তাদের খোঁজাও খুব নিরাপদ নয়। কারণ মেশিনগানধারী লালফৌজের সেপাইরা হাত-মেশিনগান সঙ্গে নিয়ে ভিয়েশেন্‌স্কার একেবারে

মাঝখানে চলে এসেছে। চত্বরের দিকে আসার সমস্ত রাস্তা কটাই ওরা নজরে রেখেছে।

ঘোড়সওয়ার-সেপাইরা হাল ছেড়ে দিলে। ডন নদীর পাড় ধরে ওরা এল সেই গির্জাবাড়ির কাছে যেখানে ফোমিন ওদের নিজের তাঁবে এনেছিল। দেখতে দেখতে সমস্ত সেপাই জড়ো হল। আবার সার বেঁধে দাঁড়াল তারা। ফোমিন হুকুম দিলে পাহারাদার বসাবার। বাকি সেপাইরা তাদের ঘাঁটিতে যেতে পারে। তবে তাদের ঘোড়াগুলোকে যেন জিনসাজ পরিয়ে তৈরি রাখে।

ফোমিন, কাপারিন আর পল্টনের কমাণ্ডাররা পল্লীপ্রান্তের একটা বাড়িতে বসে সলাপরামর্শ করে।

কাপারিন ধপ করে একটা বেঞ্চিতে বসে পড়ে হতাশ কণ্ঠে বললে—সব গেল।

ফোমিন আস্তে আস্তে বলে—হ্যাঁ। জেলাকেন্দ্র যখন দখল করা গেল না, এখানেও টিঁকে থাকতে পারা যাবে না।

চুমাকফ প্রস্তাব করে—আমাদের উচিত জেলার ভেতরে গিয়ে ঘোরা। এখন ঘাবড়ে যাবার কোনো মানে হয়? মোদ্দা কথা, মরে গেলে তো মরেই গেলাম। কসাকদের আমরা জাগাব। তারপর জেলা-কেন্দ্র আমাদের হাতে আসতে কতক্ষণ?

ফোমিন কথা না বলে শুধু চেয়ে থাকে চুমাকফের দিকে। তারপর কাপারিনের দিকে ফেরে।

—হুজুরের গলা বুঝি শুকিয়ে গেল? ওসব ন্যাকামির কান্না ছেড়ে দাও। চোরই সাজো আর সাধুই সাজো, রেহাই নেই। একসঙ্গে শুরু করেছি যখন, একসঙ্গেই চললে ভাল হয়। কী বল? ভিয়েশেন্স্কা থেকে হটে গিয়ে আরেকবার চেষ্টা করে দেখবে?

চুমাকফ তৎক্ষণাৎ জবাব দেয়:

—চেষ্টা আর সবাই করুক! আমি আর মেশিনগানের সামনে দাঁড়াচ্ছি না। ও-খেলায় কোনো ফয়দা নেই।

—তোমায় জিজ্ঞেস করিনি! তুমি চুপ করো! ফোমিন চুমাকফের দিকে তাকায়। চুমাকফ মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল আরেক দিকে।

খানিক বাদে কাপারিন বললে:

—হ্যাঁ, যা বলেছ। দ্বিতীয়বার চেষ্টা করার কোনো মানে হয় না। ওদের হাতিয়ার কত! চোদ্দটা মেশিনগান। আমাদের একটিও নেই। ওদের লোকজনও কত বেশী।...এখন বিশ্রাম নিয়ে কসাকদের বিদ্রোহ গড়ে তোলা যাক বরং। সেই আমাদের একমাত্র ভরসা। আর কিছু নেই।

অনেকক্ষণ মুখ বুজে থেকে ফোমিন বলে:

—বেশ, তাহলে এবিষয়ে একটা কিছু ঠিক করা যাক্। টুপ নায়করা! আপনারা এখুনি রসদপত্রের হিসেব নিন। সেপাই পিছু কত কার্তুজ

আছে দেখুন। কড়া হুকুম দিন যেন একটা কার্তুজও বাজে খরচ না হয়। যে হুকুম মানবে না তাকে আমি নিজের হাতে কোতল করব। সেপাইদের বলে দিন সেকথা।—এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সক্রোধে টেবিলের ওপর ঘুষি মারে ফোমিন—আঃ ওই হতভাগা মেসিনগানগুলো! সব তোমারই দোষ চুমাকফ। যদি গোটা চারেকও দখল করতে পারতাম।··· এখন আমাদের এখান থেকে তাড়াবেই। যাক্! ডিস্মিস্। ভিয়েশেনস্কায় রাতটা কাটাব, যদি না খেদিয়ে দেয়। ভোর হলে জেলার ভেতর চলে যাওয়া যাবে।

নীরবে কেটে গেল রাত। ভিয়েশেনস্কার একপ্রান্তে বিদ্রোহী ঘোড়সওয়ার সেপাইরা। আরেকদিকে ঘাঁটিরক্ষী জঙ্গী বাহিনীর লোক যাদের সঙ্গে কমিউনিস্ট ও 'তরুণ কমিউনিস্টরাও' রয়েছে। মাত্র দুটি বাড়ির তফাৎ দুই শত্রুদলের মধ্যে। কিন্তু কোনো পক্ষই রাতে আক্রমণ করতে সাহস পায়নি।

পরদিন সকালে ঘোড়সওয়াররা বিনা লড়াইয়ে গ্রাম ছেড়ে দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে রওনা হল।

॥ দুই ॥

বাড়ি ছেড়ে আসার পর তিন-হপ্তা গ্রিগর ইয়েলান্স্ক জেলার ভিয়েরখ্‌নে-ক্রিভই গ্রামে কাটায়। ওর রেজিমেন্টের সাথী এক চেনা-জানা কসাকের বাড়িতেই উঠেছিল। তারপর এল গরবাতভ্‌স্কি গাঁয়ে। সেখানে আকসিনিয়াব এক দূর-সম্পর্কের আত্মীয়ের সঙ্গে মাসখানেকের বেশী কাটালো সে।

দিনের পর দিন বাড়ির অন্দরের ঘরে থাকে, শুধু রাত হলে আসে বাইরের আঙিনায়। কিন্তু এ জীবন তো জেলখানার চেয়েও খারাপ। মনমরা হয়ে যায়, নিষ্কর্মা জীবন মনে হয় বোঝার মতো। একটা অদম্য টান আসে বাড়ি ফিরে যাবার, ছেলেমেয়েদের কাছে, আকসিনিয়ার কাছে ফিরে যাবার। কতবার বিনিদ্র রাতে বড় কোটখানা টেনে নিয়ে গায়ে চাপিয়েছে তাতারস্কে ফিরে যাবার স্থির সংকল্প নিয়ে। কিন্তু প্রতিবারই মন বদলে আবার কোট খুলেছে, কাতর আওয়াজ করে উপুড় হয়ে শুয়ে

পড়েছে বিছানায়। একেবারে সহ্যের বাইরে চলে গেছে এ কষ্টকর অস্তিত্ব। বাড়ির কর্তা সম্পর্কে আকসিনিয়ার দাদামশাই হয়। সহানুভূতি পুরোমাত্রায় থাকলেও এমন অতিথিকে তো চিরকাল রাখা যায় না ঘরে। একদিন রাতের খাওয়াদাওয়া সেরে গ্রিগর ঘরে গেছে। শুনতে পেল বাড়ির গিন্নি ঘেন্নায়-ভরা সরু গলায় বলছে :

—আর কতকাল এ জ্বালা সইব ?

—জ্বালা মানে ? কিসের কথা বলছ ?—ভারি মোটা গলায় কর্তা জিজ্ঞেস করে।

—কবে এই নিষ্কর্মা ঢেঁকিটা বিদায় হবে তাই জিজ্ঞেস করছি।

—আঃ, চুপ করো !

—না চুপ করব না ! ঘরে একটি দানা নেই, মেনি বেড়ালটি কেঁদে বেড়াচ্ছে এমনই বাড়ন্ত, আর ইদিকে তুমি ওই কুঁজো শয়তানটাকে দিনের পর দিন পুষছ। জিজ্ঞেস করি কতদিন এমনভাবে চলবে ? আর ধরো যদি সোভিয়েতের লোকেরা টের পেয়ে যায় ? তাহলে তারা আমাদের মুণ্ডু নেবে, আমাদের ছেলেমেয়েরাও পথে বসবে।

—চুপ করো, আভ্‌দোতিয়া !

—চুপ থোড়াই করব। ছেলেমেয়েদের কথা ভাবতে হবে না ? ঘরে আর সাতদিনেরও চালডাল আছে কিনা সন্দেহ, আর তুমি এই অকর্মাটাকে পুষছ ! বলি ও তোমার কে ? নিজের মায়ের পেটের ভাই ? নাকি তোমার বেয়াই ? তোমার সাতগুষ্টির কেউ নয়। তা যদি বলো তো ও তোমার সইয়ের মায়ের বোনপো বোনের নাতজামাই। তবু তাকে চালকলা খাইয়ে পুষবে ! বলি টেকো বজ্জাত ! চুপ করতে হয় তুমি করো, আমার দিকে খেঁকিও না, নয়তো কালই আমি নিজে গিয়ে সোভিয়েতের অপিসে খবর দেব, বলব কী রত্ন এনে তুমি ঘরে তুলেছ !

পরদিন কর্তাটি গ্রিগরের ঘরে এসে মেঝের দিকে চোখ নামিয়ে বলে :

—গ্রিগরি পান্তালিয়েভিচ। যাই তুমি মনে করো ভাই, আর তো বেশী দিন তোমার এবাড়িতে থাকা চলে না। তোমাকে শ্রদ্ধা করি, তোমার বাপকেও চিনতাম, বিলক্ষণ ভক্তি করতাম। কিন্তু ঘরে রেখে আর তো ভাই তোমাকে আমাদের খাওয়ানো চলে না। তাছাড়া ভয় হয় কবে গবর্মেণ্টের লোকরা খবর পেয়ে যায়। তোমার জন্য শেষে মাথাটি আমার যাক্ তা চাইনে। মাপ করো, যিশুর দোহাই, এবার আমাদের রেহাই দাও !…

গ্রিগর সংক্ষেপে জবাব দিলে—বেশ তো ! খেতে দিয়েছেন, আশ্রয় দিয়েছেন, তার জন্য ধন্যবাদ। সবকিছুর জন্যই ধন্যবাদ। নিজের চোখেই তো দেখতে পাচ্ছি কত বড় বোঝা হয়ে রয়েছি আপনাদের, কিন্তু যাবোই বা কোথায়, বলুন ? আমার সব রাস্তাই যে বন্ধ !

—যেখানে খুশী যাও।

—বেশ! আজই চলে যাব। আর্তামন ভাসিলিয়েভিচ, সবকিছুর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

—ধন্যবাদ দেবার মতো কিছু হয়নি।

—আপনার দয়া ভুলব না কখনো। হয়তো একদিন আপনারও কোনো উপকার করব আমি।

কর্তার মনটা বড়ো বিচলিত হয়। গ্রিগরের পিঠ চাপড়ে বলে :

—ওসব কথা কেন? আমার নিজের কথা যদি বলো তো আরো দু'মাস তুমি থেকে গেলেও আমার আপত্তি নেই। কিন্তু বউ তো শুনবে না, রোজই কথা শোনায়। নিকুচি করেছে' আমিও কসাক, তুমিও কসাক, গ্রিগর পান্তালিয়েভিচ। তুমি আমি দুজনেই সোভিয়েত হুকুমতের বিরুদ্ধে। আমি তোমাকে মদত দেব। আজই তুমি ইয়াগদনি গাঁয়ে চলে যাও। আমার বেয়াই মশাই থাকেন সেখানে, তোমাকে আশ্রয় দেবেন। তাকে বোলো আর্তামন বলেছে নিজের ছেলের মতো ঘরে ঠাঁই দিতে, সাধ্যমতো থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে। পরে আমি আর তিনি এর হিসেবকেতাব ফয়সালা করব। কেবল এইটুক তোমায় বলছি যে আজই এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাও' তোমাকে এখানে আর রাখব না। গিন্নিই বাড়ির মালিক, তাছাড়া সোভিয়েতের লোকেরা টের পেয়ে যাবে সে ভয় আমার আছে। এখানে যে তুমি থাকতে পেয়েছিলে সেই তো ঢের। আমার নিজের গর্দানটার ওপর মায়া তো আছে খানিকটা'

গ্রিগর অনেক রাত করে বাড়ি ছাড়লো। কিন্তু গাঁয়ের ওপাশে পাহাড়-তলির হাওয়া-কলটা অবধি পৌছুতেই তিনজন ঘোড়সওয়ার যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল। ওকে রুখে দিয়ে লোকগুলো বল' ?—এই হারামজাদা থাম! তুই কে?

গ্রিগরের বুক দুরদুর করছিল। একটি কথাও না বলে সে থামল। এখন দৌড়নো নেহাত পাগলামির কাজ হবে। রাস্তার কাছাকাছি গর্তও নেই, ঝোপঝাড়ও নেই, কেবল খাঁ খাঁ স্তেপের মাঠ। দুগজও যেতে পারত কিনা সন্দেহ।

—কমিউনিস্ট নাকি? ভাগ্ বেটা! শিগগির ফিরে যা।

গ্রিগরের দিকে ঘোড়া চালিয়ে এসে দ্বিতীয় লোকটা হুকুম দেয় : হাত তোলো! পকেট থেকে হাত বের করো! হাত বের করো নয়তো মুণ্ডু খসিয়ে দেব একদম :

গ্রিগর নীরবে বড় কোটের পকেট থেকে হাত দুটো বের করে। এখনো বুঝে উঠতে পারেনি কী ঘটছে, এরাই বা কারা! প্রশ্ন করলে :

—কোথায় যেতে হবে আমায় ?

—গাঁয়ে ফিরে যাও। পেছন ফেরো।

একজন ঘোড়সওয়ার ওকে গ্রাম অবধি এগিয়ে দিতে আসে, অন্য দুজন গোরু-চরা মাঠ পর্যন্ত ওদের দেখে অবশেষে সদর রাস্তা ধরে। গ্রিগর বিনা বাক্যব্যয়ে হেঁটে চলেছে। রাস্তার ওপর এসে চলার গতি কমিয়ে দিয়ে সে প্রশ্ন করে :

—ওহে! তুমি কে বলো তো ?

—চলো, চলো! কথাবার্তা নয়! হাত দুটো পেছনে রাখো, শুনতে পাচ্ছ কী বললাম ?

গ্রিগর নীরবে হুকুম পালন করে। কিন্তু একটু বাদে আবার জিজ্ঞেস করে :

—সে যাই হোক, তুমি কে ?

—গ্রীক অর্থোডক্স্ গির্জার সভ্য।

—আমি নিজেও কিছু 'প্রাচীনপন্থী' খ্রীষ্টান নই।

—তোমার কপাল ভালো বলতে হবে।

—আমায় নিয়ে যাচ্ছ কোথায় ?

—কমাণ্ডারের কাছে। চলো, চলো সাপের বাচ্চা, নয়তো তোমাকে···।

তলোয়ারের ডগা দিয়ে গ্রিগরকে আস্তে খোঁচা দেয় লোকটা। ধারালো ঠাণ্ডা ইস্পাতের কামড় লাগে কোটের ফলায় আর টুপির মাঝে খালি ঘাড়টার ওপর। মুহূর্তের জন্য আগুনের ফুলকির মতো একটা আতঙ্কের ভাব জাগে, তার পরেই আসে নিষ্ফল ক্রোধ। কলারটা তুলে বোঁ করে ঘুরে লোকটার চোখাচোখি তাকায়। দাঁতে দাঁত চেপে বলে :

—উল্লুকের মতো কোরো না বুঝলে ? নয়তো ও জিনিসটা তোমার কাছ থেকে কেড়ে নেব···

—চলো হট্, হারামী। কথা বোলো না। কাড়ার আগে তোমাকেই সরাবো! হাত পেছনে মুড়ে রাখো!

চুপচাপ কয়েক পা এগিয়ে যায় গ্রিগর। তারপর বলে :

—গালিগালাজ না করলেও আমি চুপ করে থাকতাম। এক নম্বরের শুয়োর তুমি!

—পেছন ফিরে তাকিও না!

—পেছন ফিরে তাকাচ্ছি না তো!

—মুখ বুজে চলো তাড়াতাড়ি।

গ্রিগর চোখের পাতার ওপর থেকে বরফের দানাগুলো মুছে ফেলে বলে—এর চেয়ে বোধ হয় দৌড়োলে বেশী খুশী হবে ?

কথার জবাব না দিয়ে লোকটা ঘোড়া ওস্কায়। জানোয়ারটার বুক ঘামে ভিজে উঠেছিল, সেই সঙ্গে আবার সন্ধ্যের ভিজে বাতাস। ঘোড়াটা গ্রিগরকে

পেছন থেকে গুঁতোয়। গ্রিগরের পায়ের কাছে গলা-বরফের মধ্যে ঘোড়ার একটা খুর দেবে যায়।

গ্রিগর জানোয়ারটার বুকে হাতের ঠেলা মেরে চিৎকার করে বলে—আরে রোস্! অতটা নয়!

পাহারাদার লোকটা ওর মাথার বরাবর তলোয়ার উঁচিয়ে চাপা গলায় বলে—ওরে কুত্তীর বাচ্চা, এগো। অতো চেঁচাসনে, নয়তো পুরো রাস্তাটা তোকে নিয়ে যাব কিনা সন্দেহ। আমি আবার এসব ব্যাপারে তর সইতে পারি না! চুপ কর্, আর একটি কথাও নয়।

চুপচাপ গ্রাম অবধি এগোয় ওরা। প্রথম বাড়িটার হাতায় ঢুকেই লোকটা ঘোড়া রোখে ; বলে :

—যাও, ফটকের ভেতব ঢুকে যাও।

একেবারে হাঁটখোলা ফটকের ভেতর দিয়ে ঢুকে পড়ল গ্রিগর। উঠোনের ঠিক মাঝখানে দেখতে পেল একটা বড়োসড়ো পাতটিনের ছাত-দেয়া বাড়ি। একটা চালাবাড়ির ছাঞ্চির নিচে কতগুলো ঘোড়া নাক ঝাড়ছে আর সশব্দে জাবর কাটছে। সিঁড়ি-দরজার সামনে দিয়ে আধ ডজন সেপাই ঘোরাফেরা করছিল। পাহারাদার সেপাইটি খাপে তলোয়ার পুরে ঘোড়া থেকে নামতে নামতে বললে :

—বারান্দা ধরে সোজা বাড়ির ভেতব চলে যাও। বাঁ হাতের প্রথম দরজাটা। এগোও, আশেপাশে চেয়ে দেখো না। কতবার সে-কথা বলতে হবে?

গ্রিগর ধীরে ধীরে সিঁড়ির দিকে এগোলো। রেলিং-এর ধারে লম্বা ঘোড়সওয়ারী জোব্বাকোট আর লালফৌজী টুপি-পরা একটা লোক দাঁড়িয়ে ছিল। সে জিজ্ঞেস করলে :

—কাউকে ধরলে বুঝি এবার?

গ্রিগরের সঙ্গী লোকটা পরিচিত কর্কশ গলায় অনিচ্ছা ভরে জবাব দিলে : হ্যাঁ। হাওয়া-কলের কাছেই ধরেছি।

—কে এ? পার্টির সম্পাদক?

—শয়তান জানে! হবে কোনো শুয়োর। এখুনি জানা যাবে ও কে।

গ্রিগর মনে মনে ভাবলে—হয় এটা শ্বেতরক্ষীদের আড্ডা, নয়তো ভিয়েশেনস্কার 'চেকা' পুলিশ ছল করে শ্বেতরক্ষীর ভান করছে। এ তো বড় ঝামেলায় পড়া গেল যা হোক্।

দরজা খুলে প্রথম যে লোকটাকে দেখল সে হচ্ছে ফোমিন। জঙ্গী পোশাক পরা একদল মানুষের মাঝখানে একটা টেবিল দখল করে বসে আছে। গ্রিগরের অচেনা সবাই। বিছানার ওপর জোব্বাকোট আর ভেড়ার চামড়ার কোট এলোমেলো স্তূপাকার করে রাখা রয়েছে। বেঞ্চের পাশে কারবাইন

বন্দুক পালা করা। বেঞ্চের ওপরেও তলোয়ার, কোমরবন্দ, জিন-থলি আর চামড়ার ব্যাগ ছড়িয়ে আছে। মানুষজন, জোব্বাকোট আর রসদপত্র সব কিছুর মধ্যেই ঘোড়ার ঘামের কড়া গন্ধ পাওয়া যায়।

গ্রিগর ফারের টুপিটা খুলে নিচু গলায় বললে—এই যে!

—মেলেখফ! স্তেপের প্রান্তর এত বিরাট হলে কী হয়, রাস্তা তার সরুই, সত্যি কথা। তাই ভাগ্য আবার আমাদের এক জায়গায় এনেছে। তুমি কোত্থেকে উদয় হলে? কোট খুলে ভেতরে এসে বোসো!—টেবিল ছেড়ে উঠে গ্রিগরের দিকে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল ফোমিন।—এখানে ঘোরাঘুরি করছিলে কেন?

—এ গাঁয়ে এসেছিলাম নিজের কাজে।

—কাজটা কী? তোমার পক্ষে রাস্তাও তো কম দূর নয়।—ফোমিন গ্রিগরের দিকে তাকায় জিজ্ঞাসু চোখে।—কথাটা বলো! এখানে এসে তুমি লুকিয়ে আছো কিনা শুনি?

জোর করে হেসে গ্রিগর বলে—সেইটেই আসলে সত্যি।

—কিন্তু আমার সেপাইরা তোমাকে ধরল কোথায়?

—গাঁয়ের বাইরে।

—কী করছিলে?

—নাক বরাবর হেঁটে আসছিলাম।

গ্রিগরের চোখের দিকে কড়া নজরে চেয়ে ফোমিন হাসলে।

—তুমি ভাবছ তোমাকে ধরে আমরা ভিয়েশেনস্কায় চালান করে দেব? না ভাই, সে রাস্তা আমাদের বন্ধ। ভয় পেয়ো না। আমরা আর সোভিয়েত সরকারের হুকুম তামিল করি না। ওদের সঙ্গে পুষিয়ে চলা আমাদের সইলো না।

—ওদের আমরা তালাক দিয়েছি।—চুল্লির পাশে বসে সিগারেট খেতে খেতে ভারি গলায় বললে এক বয়স্ক কসাক।

টেবিলের ধারে আরেকজন হো-হো করে হেসে উঠল।

—আমার সম্পর্কে কিছু শোনোনি তুমি? ফোমিন জিজ্ঞেস করে গ্রিগরকে।

—না।

—বেশ, টেবিলের পাশে বোসো, আলাপ করছি। ওহে, আমাদের অতিথির জন্য একটু কপির ঝোল আর মাংসের ব্যবস্থা করো!

ফোমিনের একটা কথাও গ্রিগর বিশ্বাস করেনি। নিজেকে সংযত রেখে কোটখানা খুলে বসে পড়ল পাংশুমুখে। একটু ধূমপানের প্রয়োজন। কিন্তু মনে পড়ল গত দুদিন যাবৎ পকেটে তামাক নেই।

ফোমিনকে প্রশ্ন করে—সঙ্গে তামাক-টামাক আছে?

সবিনয়ে চামড়ার সিগারেট কেসটা এগিয়ে দেয় ফোমিন। সিগারেট

নিতে গিয়ে গ্রিগরের হাত কাঁপছিল সেটা তার নজর এড়ায়নি। চুমরোনো লালচে গোঁপের নিচে সে এবারও একটু হাসলে।

—সোভিয়েত রাজত্বের বিরুদ্ধের দাঁড়িয়েছি আমরা। জনগণের সপক্ষে আর কমিসারদের শস্যসংগ্রহ নীতির বিপক্ষে। অনেককাল বোকা বানিয়েছে আমাদের, এবার আমরা ওদের বোকা বানাব। বুঝতে পেরেছ মেলেখফ?

কিছুই বলছিল না গ্রিগর। ঘন ঘন সিগারেট ফুঁকছিল খালি। অবশেষে মাথা ঘোরে ওর, গা গুলোয়। গত একমাস প্রায় অর্ধাশনে ছিল, এখন টের পায় কতটা দুর্বল হয়ে পড়েছে। সিগারেট নিবিয়ে দিয়ে লোভীর মতো খেতে বসে যায়। ফোমিন ওকে সংক্ষেপে বিদ্রোহের কাহিনী শোনায়, বলে প্রথম কটা দিন কীভাবে এ অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে কাটিয়েছে—অবিশ্যি এই ঘুরে বেড়ানোটাকেও জাঁক করে বললে "অভিযান"। নীরবে শোনে গ্রিগর, আর রুটি গেলে, প্রায় না চিবিয়েই গলাধঃকরণ করে তেলগলা নিকৃষ্ট রান্না ভেড়ার মাংসের স্টু।

ফোমিন সদয় হাসি হেসে বলে—কিন্তু পরের বাড়ি অতিথি হয়েও শরীরটা বড়ো রোগা দেখাচ্ছে যে।

তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে গ্রিগর বলে—আমি তো আর শাশুড়ীর ঘরে জামাই-আদরে ছিলাম না।

—তা দেখতেই পাচ্ছি। খেয়ে নাও, যতটা পারো ঠেসেঠুসে নাও। আমরা মনিব খারাপ নই।

—ধন্যবাদ। এবার একটু সিগারেট পেলে হত। সিগারেট হাতে নিয়ে গ্রিগর বেঞ্চির ওপর রাখা পাত্রটার দিকে এগিয়ে গেল। কাঠের মগটা দিয়ে জল তুলে নিলে। ঠাণ্ডা বরফের মতো জল। একটু নোনতা স্বাদ। খাওয়াটা বেশী হয়েছিল! দু'মগ পুরো জল খেয়ে তবে ধূমপান করে আনন্দ হল।

ফোমিন গল্প চালিয়ে যেতে লাগল গ্রিগরের পাশটিতে জায়গা করে নিয়ে।

—কসাকরা আমাদের খুব যে বুকে টেনে নিয়েছে তা নয়। গত বছরের বিদ্রোহের পর কম ঘা তো খায়নি।··· তবু কিছু স্বেচ্ছাসেবক আমরা পেয়েছি। প্রায় চল্লিশ জন আমাদের দিকে যোগ দিয়েছে। কিন্তু ওতে আমাদের কতটুকু হবে? আমরা চাই গোটা এলাকাটাকে জাগিয়ে তুলতে, আশেপাশের এলাকাগুলোকেও জাগাব। থপেরস্ক্, উস্ত্‌মেদভেদিৎসা। তারপর হবে সোভিয়েত হুকুমতের সঙ্গে শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি!

টেবিলে তুমুল আলোচনা চলছিল তখন। গ্রিগর ফোমিনের কথা শুনছে আর লক্ষ্য করছে ওর সঙ্গীদের। একটি মুখও পরিচিত নয়। এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না ফোমিনকে। মনে হচ্ছে ভয়ানক ত্যাঁদড় সে। তাই বুদ্ধিমানের মতো চুপ করে থাকে। কিন্তু সব সময় তো আর মুখ বুজে থাকা যায় না!

—কমরেড ফোমিন, তুমি যখন এতটাই আগ্রহ দেখাচ্ছো, তাহলে খুলে বলো তো কী চাও? নতুন করে লড়াই?—চোখ জড়িয়ে-আসা ঝিমুনিটাকে তাড়াবার চেষ্টা করে গ্রিগর।

—সে তোমাকে আগেই বললুম।

—গবরমেণ্ট বদল করতে চাও?

—হ্যাঁ।

—তার বদলে কাকে বসাবে গদীতে?

—আমাদেব নিজস্ব কসাক গবরমেণ্ট।

—আতামানদের গবরমেণ্ট?

—না, আতামানদের কথা অবিশ্যি পরে ভাবা যাবে। লোকে যে সরকারকে চাইবে, তাকে আমবাই খাড়া করব। কিন্তু সেটা জরুরী প্রশ্ন নয়। আমার কাজ হল কমিসার আর কমিউনিস্টদের খতম করা, আর আমার সহকারী কাপারিন ঠিক কববে কাকে গদিতে বসাতে হবে। যেখানে গবরমেণ্টের প্রশ্ন সেখানে কাপারিনই হল আমার মস্তিষ্ক। লোকটার মাথা আছে, শিক্ষিত কিনা!—গ্রিগরের দিকে ঝুঁকে ফোমিন ফিসফিস করে বলে—ও ছিল জারের সেনাবাহিনীতে ক্যাপ্টেন! চালাক মানুষ। ওপাশের ঘরে ঘুমিয়ে আছে এখন। শরীবটা বিশেষ ভালো নেই, হয়তো এ ধরনের জীবনে ততটা অভ্যস্ত নয় বলে। বেশ লম্বা রাস্তা পেরোতে হচ্ছে তো কদিন যাবৎ।

সিঁড়ি দরজায় হঠাৎ চেঁচামেচি শুরু হয়েছে। পা দাপাদাপি, গোঙানি, চাপা আওয়াজ। কে যেন রুদ্ধ গলায় বললে—দিয়ে দাও আচ্ছা করে! টেবিলের পাশে গুঞ্জন থেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে। ফোমিন উৎসুক চোখে দবজার দিকে তাকায়। দরজা খুলে গেল পুরোটা। ঘরের মধ্যে ঢুকল একরাশ বাষ্পের সাদা মেঘ কুণ্ডলী পাকিয়ে। পেছন থেকে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে ঢ্যাঙা একটি লোক হুড়মুড় করে এগিয়ে এল প্রায় হোঁচট খেতে খেতে। লোকটার মাথায় টুপি নেই, তুলোর আস্তর-দেয়া খাকি কোর্তা গায়ে, ধূসর ফেল্ট্ জুতো পায়ে। চুল্লির ধারে এসে সজোরে কাঁধের ওপর ধাক্কা খেল লোকটা। দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে যাবার আগে সিঁড়ি-দরজা থেকে একটা সকৌতুক চিৎকার এল: এই আরেকজনকে হাজির করলাম!

ফোমিন উঠে দাঁড়িয়ে উর্দির বেল্ট্‌খানা সিধে করে। হুকুমের সুরে জিজ্ঞেস করে—তুমি কে?

খাকি কোর্তাপরা লোকটা হাঁপাচ্ছিল। মাথায় হাত বুলিয়ে কাঁধটা ঝেড়ে নিল। যন্ত্রণায় ভুরু কোঁচকানো। শিরদাঁড়ায় বোধ হয় রাইফেলের কুঁদো জাতীয় ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল।

—কী হে কথা বলতে পারো না? জিভ কেটে নিয়েছে? জিজ্ঞেস করছি কে তুমি?

—লালফৌজের সেপাই।

—কোন বাহিনীর?

—বারো নম্বর শস্য-সংগ্রাহক ফৌজের লোক।

টেবিলের ওধারে বসা একজন হেসে বললে:

—বাহবা, পাওয়া গেছে একজনকে!

ফোমিন জেরা চালাতে থাকে:

—এখানে কী করছিলে?

—চেষ্টা করছিলাম একটা···আমাদের পাঠানো হয়েছিল·· ···।

—আচ্ছা! গ্রামে তোমাদের লোক ক'জন এসেছে?

—চোদ্দজন।

—অন্যরা সব কোথায়?

লালফৌজের লোকটা জবাব দিলে না। মুখ খুলতে তার কষ্ট হচ্ছিল। গলা থেকে একটা ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরুলো। ঠোঁটের বাঁ কোণ থেকে থুতনি গড়িয়ে পড়ছে সরু রক্তের স্রোত। হাত দিয়ে ঠোঁট মুছে হাতের তেলোর দিকে তাকাল লোকটা, তারপর হাতটা মুছল পাতলুনে।

রক্তটা গিলে ঘড়ঘড়ে গলায় বললে—তোমাদের ওই শুয়োরের দল ··ওরাই আমার ফুসফুস জখম করে দিয়েছে।······

গাঁট্টাগোট্টা এক কসাক ঠাট্টা করে বললে—ঘাবড়িও না। তোমাকে সারিয়ে তুলবো!—টেবিল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে অন্যদের দিকে চেয়ে চোখ টিপলে লোকটা।

ফোমিন আবার প্রশ্ন করে—তোমাদের বাকি সব কোথায়?

—মালগাড়ি ধরে ইয়েলান্স্কা গেছে।

—তুমি এসেছ কোথা থেকে? কোন্ জেলায় তোমার জন্ম?

জ্বরাতুর উজ্জ্বল নীল চোখে ফোমিনের দিকে চেয়ে মেঝেয় এক গাদা রক্তের দলা থুতু ফেললে লোকটা, তারপর পরিষ্কার রণ্‌রণে মোটা গলায় জবাব দিলে—প্‌স্‌কফ্‌ জেলায়।

ফোমিন নাক সিঁটকে বললে—হুঁ, শুনেছি ও-জায়গার কথা। তুমি তো দেখছি পরের ধান লুটতে অনেকটা দূর এসেছ হে ছোকরা! যাক্, আর কথা নয়! তোমার এখন কী ব্যবস্থা করা যায়, অ্যাঁ?

—আমাকে ছেড়ে দিতে হবে।

—খুব ভালোমানুষ ছোকরা দেখছি! তবে ছেড়ে হয়তো তোমাকে সত্যিই দেব। কী বলো হে সাগরেদরা?—গোঁপের নীচে হেসে ফোমিন টেবিলের ধারে বসা লোকগুলোর দিকে ঘুরে তাকাল।

গ্রিগর খুঁটিয়ে নজর করছিল। রোদে জলে পোড়-খাওয়া বাদামি মুখগুলোর মধ্যে শান্ত সমঝদারের হাসি লক্ষ্য করল সে।

ওদের মধ্যে একজন বললে—আমাদের সঙ্গে মাস দুই কাজ করতে পারে। তারপর না হয় ওকে ছেড়ে দেব, বউয়ের কাছে ফিরে যাবে।

ফোমিন বৃথাই হাসি চাপবার চেষ্টা করে বললে—কী হে, কাজ করবে আমাদের দলে? একটা ঘোড়া আর জিন দেব। তোমার ওই ফেল্ট্ জুতোর বদলে নতুন বুটজুতো পাবে।······তোমাদের কমাণ্ডাররা ভালো জামাজুতো দেয় না দেখছি। ওটাকে তুমি জুতো বলো? বাইরে বরফ গলছে আর তুমি ফেল্ট্জুতো পরে ঘুরে বেড়াচ্ছ। আমাদের দলে যোগ দেবে?

—ও চাষা-ভুষো মানুষ। জীবনে কোনোদিন ঘোড়ার পিঠে চাপেনি। —ভাঁড়ামির সুরে একজন কসাক বললে কৃত্রিম সরু গলায়।

লালফৌজের লোকটা নীরব। চুল্লিতে পিঠ ঠেকিয়ে সে চারিদিক চেয়ে দেখছে। চোখের ঘোলাটে ভাব কেটে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তখন। মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় ভুরু কোঁচকাচ্ছে আর নিশ্বাস নিতে কষ্ট হলেই হাঁ করছে।

—কী হে আমাদের দলে যোগ দেবে, নাকি? ফোমিন আবার প্রশ্ন করে।

—কিন্তু তোমরা কে?

—আমরা কারা?—ফোমিন ভুরু উঁচিয়ে জুলফিতে হাত বুলিয়ে বললে—আমরা মেহনতী মানুষের জন্য লড়ি। আমরা কমিউনিস্ট আর কমিসারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে—এই হল আমাদের পরিচয়।

এবার সহসা গ্রিগরের নজরে পড়ল লোকটার মুখে হাসি।

—ওঃ, তাই বলো!···আমি তো ভাবছিলাম তোমরা আবার কারা!—বন্দী সেপাই হাসল রক্তমাখা দাঁত বের করে। কথা শুনলে মনে হয় যেন এই সংবাদটি পেয়ে কতোই না আনন্দ আর বিস্ময় হয়েছে তার। কিন্তু ওর গলার স্বরে এমন একটা ইঙ্গিতও ছিল যার ফলে ঘরের সবাই কান খাড়া করে রইলো।—তাহলে তোমরা নিজেদের বলো জনগণের সহযোদ্ধা? হুঁম্! কিন্তু আমাদের ভাষায় তোমরা স্রেফ্ ডাকাত। আমি তোমাদের চাকরি করব, এই চাও? তোমরা ঠাট্টা করছ, একেবারেই তামাশা।

—তুমি একটু বেশী বক্বক্ করো। দেখতে পাচ্ছি!

—চোখ কোঁচকায় ফোমিন। সংক্ষেপে প্রশ্ন করে:

—তুমি কমিউনিস্ট?

—না, নিশ্চয়ই না। আমি কোনো দলের লোক নই।

—কথা শুনে তো তা মনে হয় না।

—হলপ করে বলছি আমি 'অদলীয়'।

ফোমিন গলা খাঁকারি দিয়ে টেবিলের দিকে ফেরে:

—চুমাকফ! একে সাবাড় করো!

—আমাকে খুন করে কোনো লাভ হবে না।—শান্ত কণ্ঠে বলে লোকটা। জবাবে কেবল নীরবতা। সুগঠিত-দেহ চুমাকফ সুপুরুষ কসাক। পরনে

তার ইংরিজি চামড়ার জার্কিন। অনিচ্ছাভরে টেবিল ছেড়ে উঠে সে কটা চুলগুলো হাত দিয়ে সমান করে, যদিও চুল আগেই পরিপাটি ছিল।

—একাজে আমার ঘেন্না ধরে গেল।—চুমাকফ সাহস করে কথাটা বলে নিজের চওড়া তলোয়ারটা তুলে নিলে বেঞ্চির ওপর থেকে, বুড়ো আঙুল দিয়ে ধারটা একটু পরখ করে নিলে।

ফোমিন ওকে পরামর্শ দিলে—কাজটা তো আর নিজের হাতে করতে হচ্ছে না তোমাকে। উঠোনের ওই সেপাইদের বলো।

চুমাকফ বন্দীর আপাদমস্তক লক্ষ্য করলে কঠিন শীতল দৃষ্টি দিয়ে। তারপর বলে :

যাও, সামনে এগিয়ে যাও হে ছোকরা!

লালফৌজের সেপাই চুল্লির ধার ছেড়ে টলতে টলতে এগোয়। ধীরে ধীরে দরজার কাছে যায়। মেঝের ওপর ভিজে ফেল্ট্ জুতোর ছাপ পড়ে।

বন্দীর পেছু পেছু হাঁটে চুমাকফ আর কৃত্রিম বিরক্তি দেখিয়ে বলে—ঘরে ঢোকবার সময় জুতো জোড়া মুছে নিতেও পারোনি! সারা জায়গাটিতে জুতোর দাগ ফেলেছ হে, একেবারে কাদা করেছ মেঝেটা…কী নোংরা জানোয়ার তুমি হে!

ফোমিন পেছন থেকে চেঁচায়—ওদের বলো গলিটার ভেতর নিয়ে যাক্ ছোকরাকে, কিংবা ফসল-মাড়াইয়ের আঙিনায়। বাড়ির কাছেপিঠে কাজটা না হলেই ভাল, বাড়ির মনিবরা আবার ভড়কে যাবে!

গ্রিগরের কাছে এল ফোমিন। ওর পাশে বসে প্রশ্ন করলে : ওদের ছোটখাটো একটা বিচারও হয়ে গেল, কী বল?

—হ্যাঁ।—ফোমিনের চোখের দিকে না চেয়ে গ্রিগর জবাব দেয়।

নিশ্বাস ফেলে ফোমিন।

—উপায় নেই। এখন এরকমটা হতেই হবে।—আরো কিছু বলতে গিয়েছিল সে কিন্তু সিঁড়ির কাছে দুদ্দাড় করে পায়ের শব্দ হল। কে যেন চেঁচিয়ে উঠল। তারপরেই একটা গুলির আওয়াজ।

ফোমিন রাগত স্বরে বলে উঠল—নরকে জায়গা হয় না বাইরের ওই লোকগুলোর?

টেবিলের ধারে বসা একটি লোক লাফিয়ে উঠে লাথি মেরে দরজা খোলে। আঁধারের দিকে তাকিয়ে চেঁচায়—কী হচ্ছে বাইরে?

চুমাকফ ঘরে ঢুকে উত্তেজিতভাবে বললে—বেজায় ধড়িবাজ লোকটা! শয়তানটাকে সামলাতে পারি! ওপরের সিঁড়ি থেকে লাফ দিয়ে পড়ে ছুটে পালাল। ওর ওপরে কার্তুজও খরচা হল একটা। বাইরের সেপাইরা অবিশ্যি ওকে সাবাড় করে দিচ্ছে……।

—ওদের বলো বাড়ির আঙিনা থেকে বের করে গলির ভেতর নিয়ে যাক।

—আগেই বলে দিয়েছি, ইয়াকফ এফিমিচ্‌।

ঘরটা মুহূর্তের জন্য নিস্তব্ধ। তারপর একজন হাই তুলতে গিয়ে কোন্‌রকমে চেপে গিয়ে বললে—আবহাওয়া কেমন চুমাকফ? পরিষ্কার হচ্ছে?

—মেঘলা।

—বৃষ্টি হলে শেষ বরফটুকু ধুয়ে যাবে।

—কিন্তু বৃষ্টি চাচ্ছ কেন?

—আমি চাইছি না। কাদার ভেতর ছপাৎ ছপাৎ করে বেড়াবার কোনো ইচ্ছেই নেই।

গ্রিগর বিছানার কাছে গিয়ে টুপিটা তুলে নেয়।

ফোমিন জিজ্ঞেস করে—কোথায় চললে?

—একটু ঠাণ্ডা হাওয়ায় দম নিতে।

সিঁড়ি-দরজায় এসে দাঁড়ায় ফোমিন। মেঘের ভেতর ফ্যাকাশে চাঁদ। খোলা আঙিনা, চালাঘরের ছাদ, পপলার গাছের মাথাগুলো, খুঁটিতে বাঁধা কম্বলঢাকা ঘোড়াগুলো—সবই মাঝরাতের স্বচ্ছ কপোত-নীল আলোয় উজ্জ্বল। সিঁড়ির কয়েক গজ দূরে লালফৌজী সেপাইটির দেহ পড়ে রয়েছে। মাথাটা এক চিলতে গলা বরফ জলের মধ্যে। তিনজন কসাক দেহটার ওপর ঝুঁকে পড়ে কী যেন করছিল আর বলাবলি করছিল চাপা গলায়।

একজন বিরক্তি প্রকাশ করে—আরে, এখনো দম নিচ্ছে দেখছি! কেন ওকে এভাবে খুন করলি আনাড়ি শয়তান? বললাম মাথা তাক করতে! কোনো কম্মের নোস্‌!

যে লোকটা গ্রিগরকে ধরে এনেছিল সে এবার কর্কশকণ্ঠে বলে—সাবাড় হয়ে যাবে! একবার হেঁচকি তুলেই টেঁশে যাবে! কিন্তু মাথাটা একটু তুলে ধরো তো। কোটটা কিছুতেই খুলে নিতে পারছি না। চুলের মুঠি ধরে উঁচু করো। হ্যাঁ। এবার একটু ধরে থাকো।

জলের ওপর ছপাৎ করে একটা শব্দ শুনতে পেল গ্রিগর। বন্দীর পাশে ঝুঁকে থাকা একটি লোক এবার সোজা হয়ে দাঁড়াল। কর্কশকণ্ঠ সেই কসাকটি এবার হাঁটু গেড়ে বসেছে। বন্দীর দেহ থেকে তুলোর আস্তর-দেয়া কোটটা টেনে খুলতে গিয়ে ঘোঁত ঘোঁত আওয়াজ করছে। খানিকবাদে সে বললে:

—হাতটা আমার বেজায় নরম তো, নাহলে কখন পটল তুলত। দেশের বাড়িতে থাকতে যখন শুয়োরটুয়োর কাটতে হত···আরো উঁচু করে তুলে ধরো, পড়তে দিও না! তুশ্‌! হ্যাঁ যা বলছিলাম—শুয়োর কাটতে বসলাম তো সিধে গলার ওপর ছুরি চালিয়ে দিলাম, একেবারে ঘাড় অবধি বিলকুল ছুরি বসিয়ে দিলাম, তবু হারামজাদা জানোয়ার খাড়া হয়ে উঠে আঙিনার ভেতর চলাফেরা করতো। বেশ খানিকক্ষণ অবধি হেঁটে চলে বেড়াবে! হয়তো

সারা গা দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে, তবু বেঁচে থাকবে। আমার হাতটা নিশ্চয় নরম হাত। ব্যস্‌ ব্যস্‌ এবার নামিয়ে দাও।...এখনো দম নিচ্ছে? ওকথা বোলো না! আমার তলোয়ার ওর মাথা ফাঁক করে একেবারে ঘিলু অবধি পৌঁছেছিল।

তৃতীয় লোকটা মৃতব্যক্তির কোটখানা হাতের ওপর ছড়িয়ে রেখে বললে:

—বাঁ পাশটা একেবারে রক্তারক্তি হয়ে গেছে।...হাতে আঠার মতো সেঁটে যাচ্ছে! এ্যাঁ, কি বিচ্ছিরি!

—ও আপনিই মুছে যাবে। এ তো আর তেল নয়। হেঁড়েগলা লোকটা আবার হাঁটু গেড়ে বসে।—আপনিই মুছে যাবে, নয়তো ধুয়ে যাবে। তেমন মারাত্মক কিছু নয়।

—এখন আবার কী করতে যাচ্ছ? পাতলুনটাও খুলে নেবে নাকি?—প্রথম কসাকটা বিরক্ত হয়ে বলে।

হেঁড়েগলা কসাক চট করে জবাব দেয়—যদি তাড়াতাড়ি থাকে তোমার বা ঘোড়া ধরার দরকার থাকে তো তোমাকে বাদ দিয়েই আমরা চালিয়ে নেব। ভালো ভালো জিনিস আমরা বেকার ছেড়ে দিতে পারি না।

এবার পেছন ফিরে বাড়ির দিকে চলল।

ফোমিন চট্‌ করে নজর বুলিয়ে ওকে একবার দেখে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে: চলো পাশের ঘরে গিয়ে কথা বলি। বড্ডো গোলমাল এখানে।

বডোসডো উষ্ণ কামরাটায় ইঁদুর আর শনের বিচির গন্ধ। খাকি পোশাক পরা ছোটখাটো একটি লোক বিছানায় হাত পা ছড়িয়ে ঘুমোচ্ছিল। মাথার পাতলা চুল এলোমেলো, তুলের আঁশ আর ছোট ছোট পালক লেগে রয়েছে। একটা নোংরা বালিশের টিকিনে গাল থেবড়ে শুয়ে আছে। ছাদ থেকে ঝোলা লম্পর আলো এসে পড়েছে লোকটার ফ্যাকাশে, অনেকদিন-না-কামানো মুখখানার ওপর।

ফোমিন তাকে জাগিয়ে তুলে বললে:

—ওঠো কাপারিন। আমাদের একজন অতিথি এসেছে। এই আমার বন্ধু গ্রিগর মেলেখফ। প্রাক্তন কোম্পানি কমাণ্ডার।

বিছানার ধারে পা ঝুলিয়ে জামার আস্তিনে মুখ মুছে উঠে বসল কাপারিন। গ্রিগরের সঙ্গে করমর্দন করে মাথা একটু ঝোঁকাল।

—অত্যন্ত খুশী হলাম পরিচয় পেয়ে। আমি স্টাফ ক্যাপটেন কাপারিন।

ফোমিন ভদ্রতা করে একটা চেয়ার ঠেলে দিলে গ্রিগরের দিকে আর নিজে বসল একটা সিন্দুকের ওপর। গ্রিগরের মুখ দেখে সে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিল যে বন্দীহত্যার দৃশ্যটা গ্রিগরের মনকে বিলক্ষণ ক্ষুণ্ণ করেছে। তাই সে বললে:

—আমাদের সব বন্দীদের ওপরে একই রকম কঠোর ব্যবহার করি সে-

কথা মনে কোরো না। ও লোকটা ছিল শস্য-সংগ্রাহক ফৌজের লোক। এসব লোকদের কিংবা ওই কমিসারদের আমরা বেকসুর ছেড়ে দিতে পারি না।···তবে আর সবাইকে ছেড়ে দিই। গতকাল তিনজন মিলিশিয়া (পুলিশ) সেপাইকে ধরেছিলাম। ওদের ঘোড়া জিন আর রসদ কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দিয়েছি। মেরে কোনো লাভ হত না।

গ্রিগর নীরব। হাঁটুর ওপর হাত রেখে ওর নিজেরই চিন্তায় মগ্ন হয়ে ছিল।

ফোমিনের গলার আওয়াজ যেন স্বপ্নের ঘোরে শোনার মতো ঠেকছিল ওর কানে।

ফোমিন বলে চলেছে— তাহলেই দেখছ এইভাবে আমরা লড়ে যাচ্ছি। তবে কসাকদের আমরা জাগাতে পারব ভরসা রাখি।

সোভিয়েত হুকুমত খতম হতেই হবে। লক্ষণ দেখে মনে হয় লড়াই সর্বত্রই চলছে। সব জায়গায় বিদ্রোহ। সাইবেরিয়ায়, উক্রেইনে, এমনকি পেত্রোগ্রাদেও।··কী নাম যেন, ওই জায়গাটার নৌদুর্গের গোটা নৌবাহিনী সেখানে বিদ্রোহ করেছে।···

কাপারিন সায় দিলে—ক্রন্‌স্টাড্‌ট্।

গ্রিগর মাথা তুলে শূন্য-দৃষ্টি মেলে চাইল ফোমিনের দিকে, তারপর কাপারিনের দিকে।

ফোমিন সিগারেট কেস্ এগিয়ে দিয়ে বললে—সিগারেট খাও। হ্যাঁ পেত্রোগ্রাদ দখল হয়েছে। ওরা এগিয়ে আসছে মস্কোর দিকে। সব জায়গায় একই সুরে বাঁধা। সুতরাং আমরা কেন নিদ্রা যাব তাও না বুঝি। আমরা কসাকদের জাগিয়ে তুলব, সোভিয়েত রাজত্ব খতম করব। আর ক্যাডেটরা যদি আমাদের সাহায্য করে তো সোনায় সোহাগা। ওদের শিক্ষিত লোকরা সরকার গঠন করুন, আমরা মদত দেব।—মুহূর্তের জন্য চুপ করে এবার সে প্রশ্ন করলে—তোমার মত কী মেলেখফ? ক্যাডেটরা যদি কৃষ্ণসাগরের দিক থেকে জোর আক্রমণ চালায় আর আমরা ওদের সঙ্গে মিলি, তাহলে লালফৌজের পেছন দিকে প্রথম সামরিক অভ্যুত্থানের কৃতিত্ব হবে আমাদেরই, তাই না? কাপারিনের তো তাই মত। ধরো ১৯১৮ সালে আমি আটাশ নম্বর রেজিমেন্টকে লড়াই থেকে সরিয়ে নিয়ে দু'বছর ধরে সোভিয়েত গবরমেণ্টের চাকরি করেছি—সেটা তারা নিশ্চয়ই আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ হিসাবে খাড়া করবে না?

গ্রিগর অনিচ্ছাসত্ত্বেও হেসে মনে মনে ভাবলে—ও-ও, সেইটেই বুঝি তোমার আসল মতলব। গাধা হলেও শয়তান তো কম নয়।

ফোমিন ওর জবাবের অপেক্ষায় ছিল।

স্পষ্টই সে এই সমস্যাটা নিয়ে রীতিমতো চিন্তিত। গ্রিগর অনিচ্ছার সঙ্গে জবাব দিলে:

—সে বলতে গেলে এক মহাভারত হয়ে যাবে।

—তা বটে, তা বটে।—সোৎসাহে রায় দিলে ফোমিন—পরে আরো ভালো করে খতিয়ে দেখা যাবে। তবে এখন উঠে পড়ে লাগতে হবে, কমিউনিস্টদের আমরা পেছন থেকে ধ্বংস করব। মোটকথা ওদের বাঁচতে দেয়া চলবে না। ওরা মালগাড়িতে তুলেছে পদাতিক সেপাইদের, উদ্দেশ্য আমাদের তাড়া করে আসা। চেষ্টা করে দেখুক। ঘোড়সওয়ার ফৌজ ওদের সাহায্য করতে আসার আগেই আমরা গোটা এলাকাটাকে ওলটপালট করে দেব।

গ্রিগর আবার নিজের পায়ের দিকে চেয়ে থাকে। কাপারিন ওদের কাছে বিদায় নিয়ে শুয়ে পড়ে।

—বড়ো ক্লান্ত আমি। পাগলের মতো মার্চ করে যাই, আর ঘুম হয় নাম মাত্র—ক্ষীণ হাসির সঙ্গে কথাগুলো বলে কাপারিন।

ফোমিন উঠে দাঁড়ায়। গ্রিগরের কাঁধে ভারী হাতখানা রাখে—চলো আমরাও শুয়ে পড়িগে। মেলেখফ, সেদিন ভিয়েশেন্স্কায় আমার বুদ্ধি শুনে তুমি ভালোই করেছিলে। না লুকিয়ে থাকলে ওরা তোমার পেছনে লাগত। এতদিনে তুমি ভিয়েশেন্স্কাতেই পড়ে থাকতে আর তোমার নখগুলো পচে গলে যেত। আমার চোখে সেটা দিনেব আলোর মতো স্পষ্ট। তা, কী ঠিক করলে বলো। তারপর না হয় শুতে যাওয়া হবে।

—কীসের কথা বলব।

—আমাদের দলে যোগ দিবে কিনা? লোকের বাড়িতে গা ঢাকা দিয়ে তো আর সারা জীবন কাটাতে পারবে না।

গ্রিগরও এই প্রশ্নটাই আশঙ্কা কবেছিল। এবার একটা পথ বেছে নিতেই হবে: গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ানো, ক্ষুধার্ত গৃহহীন জীবন, অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়ে। যতক্ষণ না কোনো গৃহকর্তা তাকে পুলিশের হাতে বেইমানি করে তুলে দেয় অথবা সে নিজেই রাজনৈতিক বিভাগে গিয়ে আত্মসমর্পণ করে। কিংবা এই সবকিছুর বদলে—ফোমিনের দলে যোগ দেয়া। পথ বেছে নিলে গ্রিগর।

এই প্রথম সে ফোমিনের মুখের দিকে সোজা তাকাল, ঠোঁট কুঁচকে একটু হেসে বললে:

—রূপকথার গল্পের নায়ক যেমন উভয় সংকটে পড়ে আমারও প্রায় তাই: বাঁ দিকে হাঁটলে ঘোড়া মাবা পড়ে, ডানদিকে হাঁটলে নিজে মাবা পড়ি। আমার সামনে তিনটে পথ—কোনোটাই আমার নিজের পথ নয়।...

—রূপকথাব গল্প না বলে নিজেব কথা বল। রূপকথা্র গল্প আমরা পরে শোনাব।

—যাবার আমার কোনো জায়গাই নেই, তাই পথ আমি বেছে নিয়েছি এর মধ্যেই।

—সত্যি ?

—তোমাদের আড্ডায় যোগ দেব।

ফোমিন তেমন খুশী না হতে পেরে ভুরু কোঁচকায়। গোঁপ কামড়ায়।

—ও কথাটা বাদ দাও। আড্ডা বলছ কেন? কমিউনিস্টরা ও শব্দটা আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। কিন্তু তুমি কেন করবে? এই রাজত্বের বিরুদ্ধে আমরা কয়েকজন মানুষ দাঁড়িয়েছি—বিদ্রোহী। ব্যস এই হল মোদ্দা কথাটা।

ওর অসন্তোষটা অবশ্য ক্ষণিকের জন্য। গ্রিগরের সিদ্ধান্তে সে বেশ খুশীই হয়েছিল। সে আনন্দ আর সে চাপতে পারল না। সোৎসাহে দু'হাত রগ্‌ড়াতে রগ্‌ড়াতে সে বললে .

—এবার আমাদের রেজিমেণ্টে আরেকজন এল। শুনতে পেয়েছ স্টাফ ক্যাপটেন? তোমায় একদল সেপাই দেব মেলেখফ। আর যদি এক ট্রুপ সেপাইয়ের নায়ক হতে না ইচ্ছে করে তো কাপারিনের সহকারী সেনাপতি হয়ে যেতে পারো। আমার নিজের ঘোড়াটা তোমায় দেব। একটা বাড়তি ঘোড়া আমার আছে।

॥ তিন ॥

ভোরের দিকে হাল্‌কা তুষারপাত হল। এখানে ওখানে জমে-থাকা জলের ওপর স্বচ্ছ নীল বরফের আস্তর পড়েছে। তুষার ক্রমে কর্কশ হল। দানা দানা বরফের আস্তরের ওপর ঘোড়ার খুরের অস্পষ্ট অস্থায়ী গোলাকার ছাপ পড়েছে। আর যে সব জায়গায় গতকাল বরফ গলার ফলে ক্ষয়ে গিয়ে মাটি বেরিয়ে এসেছিল গেল বছরের মরা ঘাস বুকে নিয়ে, সেখানে শুধু ঘোড়ার খুরের সামান্য দাগ, মাঝে মাঝে চিড় খেয়ে গেছে।

গ্রামের বাইরে সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছিল ফোমিনের দলবল। রাস্তা ধরে অনেকটা দূরে ছ'জন টহলদারী ঘোড়সওয়ার সেপাইকে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছিল।

ফোমিন গ্রিগরের কাছে ঘোড়া চালিয়ে এসে হাসিমুখে বললে—এই তো

আমার ফৌজ! এমন বাহাদুর ছেলেদের নিয়ে আমরা শয়তানকেও ঘায়েল করতে পারি।

গ্রিগর ফৌজের সারির ওপর নজর বুলিয়ে আপসোস করলে মনে মনে—তুমি আর তোমার এই ফৌজ নিয়ে আমার বুদিয়নি ঘোড়সওয়ার বাহিনীর সামনে যদি পড়তে তো আধঘণ্টার মধ্যে ছাতু হয়ে যেতে বাছা!

ফোমিন চাবুক দিয়ে ইশারা করে দেখিয়ে বললে:

—কী মনে হয় ওদের দেখে?

—বন্দীদের খুন করতে আর মরা সেপাইদের উর্দি হাতিয়ে নিতে বেশ দড়ো, তবে যুদ্ধ করতে গিয়ে কেমন হবে তা বলতে পারি না।—শুকনো কণ্ঠে জবাব দেয় গ্রিগর।

হাওয়ার দিকে পিঠ ঘুরিয়ে ফোমিন একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল। বললে:

—লড়াইয়েও দেখতে পাবে ওদের হিম্মত। আমাদের বেশীর ভাগ সেপাই পেশাদার লড়িয়ে একেবারে বসিয়ে দেবে না পথে।

জোড়া-ঘোড়ায় টানা ছ'খানা গাড়ি রসদ হাতিয়ারপত্র বোঝাই হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সৈন্যসারির মাঝখানে। ফোমিন সামনে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে এগোবার হুকুম দিলে। টিলার ওপর এসে ফের গ্রিগরের কাছে এগিয়ে এল। প্রশ্ন করলে:

—বেশ, তো আমার ঘোড়াটা কেমন দেখলে? পছন্দ হয়?

—বেশ ভাল ঘোড়া।

কিছুক্ষণ নীরবে পাশাপাশি ঘোড়া চালায়, তারপর গ্রিগর বলে:

—তাতারস্কের ভেতর দিয়ে যাবে স্থির করেছ?

—কেন, ঘরের লোকদের দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে বুঝি?

—দেখলে মন্দ হত না।

—তা করা যেতে পারে। এই মুহূর্তে চিরা নদীর দিকে ঘুরে যাবার কথা ভাবছি—কসাকদের একটু ধাক্কা দিয়ে ঠেলে তোলার জন্য।

কিন্তু কসাকরা "ধাক্কা খেয়ে জাগবার" লোক নয়। দলের সঙ্গে প্রথম কটা দিন কাটিয়েই গ্রিগর তা বুঝে নিয়েছিল। কোনো গ্রাম বা জেলাকেন্দ্র দখল করা হলেই ফোমিন হুকুম জারি করে নাগরিক সভা ডাকত। সাধারণত সে নিজেই বক্তৃতা দিত, কখনো কখনো কাপারিন। কসাকদের ওরা হাতিয়ার ঘাড়ে নিতে বলত, সোভিয়েত সরকার চাষীদের ঘাড়ে যে "বোঝা" চাপিয়েছে তার কথা বলত, আর বলত "সোভিয়েত গবরমেণ্টকে অচিরে উৎখাত না করতে পারলে তার অবশ্যম্ভাবী ফল হবে সমূলে বিনাশ।" ফোমিন অবশ্য কাপারিনের মতো শুদ্ধ ব্যাকরণ বজায় রেখে গুছিয়ে গাছিয়ে বলতে পারে না, তবে তার ভাষা জোরালো, কসাকদের বোধগম্য। সাধারণত

বক্তৃতার শেষে একটা বাঁধাধরা গৎ সে নিশ্চয়ই আওড়াবে: আজ হতে শস্য দখলের দায়িত্ব থেকে আপনাদের মুক্তি দিচ্ছি আমরা। ওদের আডতে ফসলের আর একটি দানাও পাঠাবেন না আপনারা। অকর্মা কমিউনিস্টদের বসে বসে খাওয়া বন্ধ করতে হবে। আপনাদের খেয়ে ওরা মোটা হয়েছে, কিন্তু আজ থেকে বিদেশী কর্তৃত্বের অবসান হল। আপনারা এখন স্বাধীন মানুষ। হাতিয়ার তুলে আমাদের হুকুমতকে সাহায্য করুন। জয়, কসাকদের জয়।

কসাকরা মাটির দিকে চেয়ে থাকে, বিষণ্ণ আর নীরব। কিন্তু জিভ ক্ষুরধার হয়ে ওঠে মেয়েদের। ওদের দল থেকে আসে হুল-ফোটানো প্রশ্ন আর চিৎকার:

—তোমাদের হুকুমত? শুনতে ভালো। তবে সাবান এনেছ আমাদের জন্য, সাবান?

—তোমাদের গবরমেণ্ট কোথায় রেখেছ··জিনের থলিতে?

—তোমরাই বা বেঁচে আছ কাদের ফসল খেয়ে?

—এখুনি বুঝি দরজায় দরজায় হাত পাততে শুরু করবে?

—আরে ওদের তো তলোয়ার আছে! মুরগি জবাই শুরু করে দেবে বেধড়ক!

—আমাদের ফসল দেয়া বন্ধ করতে বলছ, শুনতে তো খুবই ভাল। কিন্তু আজ তোমরা এখানে। কাল বোধহয় কুকুর দিয়ে খুঁজলেও তোমাদের পাত্তা পাওয়া যাবে না। তখন জবাবদিহি করতে হবে আমাদের।

—আমাদের স্বামীদের আর দলে ভিড়তে দিচ্ছি না। লড়াই করতে হয় নিজেরা করো!

এ ছাড়াও আরো যা-নয়-তাই শুনিয়ে দিল মেয়েরা উচ্চকণ্ঠে। লড়াইয়ের বছরগুলোয় তাদের চালচলন হয়েছে অন্যে ধরনের। নতুন যুদ্ধের কথায় ভয় পায়, আশঙ্কাব্যাকুল হয়ে আঁকড়ে ধরে থাকে তাদের স্বামীদের।

উদাসীনভাবে ওদের অসংলগ্ন চিৎকার শোনে ফোমিন। ওদের দৌড় জানা আছে তার। তাই যতক্ষণ না ওরা চুপ করে ততক্ষণ সে সবুর করে থাকে। তারপর কসাকদের দিকে ফেরে। এবার কসাকরা বিশেষ উত্তেজিত না হয়ে জবাব দেয় সংক্ষেপে:

—কমরেড ফোমিন, আমাদের জ্বালা আর বাড়াবেন না। যথেষ্ট লড়াই করেছি আমরা।

—বিদ্রোহের চেষ্টা করে দেখেছিলাম, ১৯১৯ সালেও।

—বিদ্রোহ করার মতো কিছু আমাদের নেই, অযথা কেন বিদ্রোহ করব। এই মুহূর্তে বিদ্রোহের কোনো প্রয়োজনই দেখি না।

—এখন ফসল বোনার সময়। লড়াইয়ের সময় নয়।

একদিন জনতার পেছন থেকে কে একজন চিৎকার করে বলেছিল :

—এখন তো বড মিষ্টি মিষ্টি কথা কিন্তু ১৯১৯ সালে যখন আমরা বিদ্রোহ করেছিলাম তখন তুমি কোথায় ছিলে? ফোমিন, বড দেবিতে তোমার বুদ্ধি খুলেছে হে।

গ্রিগব দেখলে ফোমিনেব চেহাবা অন্য বকম হয়ে গেল। কিন্তু, কামাণ্ডার সাহেব সেদিন নিজেকে সামলে নিয়েছিল, কোনো জবাব দেযনি।

প্রথম সপ্তাহে ফোমিন সভাগুলোতে বসে কেবল শুনে গেল কসাকদের আপত্তি আর ওদেব সবাসরি অসহযোগিতাব কথা। এমনকি মেয়েদের চিৎকার আর গালাগালিতেও ও বিশেষ টলেনি। গোঁপ বেঁকিয়ে হেসে বলেছে "ঠিক. আছে, ব্যবস্থা করব।" কিন্তু যখন ওর স্থিব ধারণা হল যে কসাক জনতার একটা বড়ো অংশই ওকে সমর্থন কবছে না, তখন ওর আচরণ সম্পূর্ণ বদলে গেল সভার শ্রোতাদেব ওপব। ঘোড়া থেকে না নেমেই এখন সে বক্তৃতা দেয, আব তর্কেব বদলে শুরু হয় বীতিমতো শাসানি। কিন্তু ফল দাঁড়ায় একই : যাদের ওপব এত ভবসা করেছিল সেই কসাকবা নীরবে শোনে ওব কথা, আর নীরবেই সভাভঙ্গ কবে চলে যায।

একটি গ্রামে ফোমিনেব বক্তৃতার পব জবাব দিতে উঠল একজন কসাক বিধবা। বিপুলবপু ভাবিক্কি চেহাবা, গলাব আওযাজ প্রায পুরুষালি। বেটাছেলের মতোই সজোরে হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলে। বসন্তের দাগে ভরা চওড়া মুখমণ্ডলে ক্রুদ্ধ সংকল্পের কঠোবতা ফুটে উঠেছে, আর পুরু চওড়া ঠোঁটদুটো অনবরত কুঁচকে আছে তির্যক বিদ্রূপেব বক্রতায। ফুলো-ফুলো লাল হাতটা বাড়িয়ে ফোমিনের দিকে দেখিযে সে যখন গলার স্বরে বিষ ঢেলে দিচ্ছিল তখন ফোমিন পাথবেব ' তা নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছে তার ঘোড়াব জিনে

—এখানে আবাব উৎপাত টেনে এনেছ কেন? কোন্ চুলোয় ঠেলে দিতে যাচ্ছ আমাদেব কসাকদের, কোন্ জাহান্নমে? এই নবকেব লড়াইয়ে এর মধ্যেই কত মেযে বিধবা হয়েছে, কত হাজাব শিশু অনাথ হয়েছে। এব পরও আমাদেব মাথাব ওপব নতুন সর্বনাশ ডেকে আনছে? আর ইনি কোন্ মুক্তিদাতা সম্রাট উদয হলেন রুবিযেঝিন গ্রাম থেকে? আগে আপনারা নিজেব ঘর সামলান, নিজেব সবনাশ ঠেকান, তাবপব আমাদের শেখান কোন্ রাস্তায় চলতে হবে, কোন্ গবর্নমেণ্ট বেছে নিতে হবে। কারণ আপনার নিজের ঘরে আপনার নিজের স্ত্রী তার গলার ফাঁস খুলতে পারেনি সে-খবর আমাদেব জানা! আর আপনি দিব্যি গোঁপ চুমরে ঘোড়া দাবড়ে লোক খেপিয়ে বেড়াচ্ছেন! অথচ আপনার নিজের খামারের চাল কবে পড়ে যেত

যদি না নেহাত কপালজোরে টিঁকে থাকত। বড়ো শেখাতে এসেছ! এখন কেন মুখে কথা সরে না? এসব কি আমি মিছে কথা বলছি?

জনতার মধ্যে একটা হাসির গুঞ্জন ঢেউ খেলে আবার হাওয়ার মতো কলকলিয়ে মিশে গেল। ফোমিনের বাঁহাতটা জিনের ডগায় ছিল, এবার লাগাম ধরল ধীরে আঙুল বাড়িয়ে। একটা চাপা রাগে মুখ অন্ধকার হয়ে গেছে তার। কিন্তু তবু সে চুপচাপ। এমন বেয়াড়া অবস্থা কাটিয়ে ওঠার একটা সম্মানজনক পথ খুঁজতে লাগল সে।

বিধবাটি তখনও সোৎসাহে বলে চলেছে মনের সমস্ত বিক্ষোভ একত্র করে: আর তোমার এই গবরমেণ্টটাই বা কী যাকে তুমি সমর্থন করতে বলছ?

কোমরে দুহাত রেখে সে আস্তে আস্তে ফোমিনের দিকে এগিয়ে এল তার প্রশস্ত পশ্চাদ্‌ভাগ আন্দোলিত করে। হাসি চেপে রেখে জনতা তার জন্য পথ করে দিলে। হাসি উপচে ওঠা চোখ তাদের মাটির দিকে। নাচের আসর তৈরি করার মতো মাঝখানে অনেকটা জায়গা গোল রেখে ফাঁকা করে দিল তারা।

—তুমি চলে যাবার পর এক মুহূর্তও টিঁকবে না তোমার রাজত্ব। —নিচু মোটা গলায় বললে বিধবা মহিলা—এ গরবমেণ্ট তোমার পেছন পেছন্‌ চলে, একেক জায়গায় এক ঘণ্টারও বেশী টেঁকে না। 'আজ আকাশের চাঁদ ধরছ, কাল মাটিতে গড়াগড়ি', এই হলে তুমি আর তোমার গবরমেণ্ট।

ফোমিন সজোরে ঘোড়ার পাঁজরায় লাথি মেরে তাকে ভিড়ের মধ্যে নিয়ে যায়। লোকজন সরে পড়ে এদিক ওদিক। শুধু বিধবা মহিলাটিই একা দাঁড়িয়ে থাকে ফাঁকা গোল জায়গাটার মাঝখানে। জীবনে সে অনেক কিছুই দেখেছে, তাই ফোমিনের ঘোড়ার দাঁতের পাটির দিকে সে অবিচল নেত্রে তাকিয়ে থাকে, আর চেয়ে দ্যাখে ফোমিনের ক্রুদ্ধ ফ্যাকাশে মুখখানা।

বিধবা স্ত্রীলোকটির সামনে ঘোড়া এগিয়ে এনে মাথার ওপর চাবুক তোলে ফোমিন।

—চোপরাও হতভাগী, ভাগাড়ের মড়া। এখানে কেন লোক খেপিয়ে বেড়াচ্ছিস?

লাগামের টানে মুখ উঁচিয়ে ঘোড়াটা দাঁত বের করে রয়েছে বেপরোয়া স্ত্রীলোকটির ঠিক মাথার ওপর। দাঁতের ফাঁক দিয়ে এক দলা হালকা সবুজ ফেনা উড়ে এসে পড়ল তার ওড়নায়, তারপর গালে। হাত দিয়ে গালটা মুছে স্ত্রীলোকটি এক পা পেছিয়ে গেল।

ফোমিনের দিকে আগুন-ঝরা বড় বড় চোখে তাকিয়ে সে বললে উঁচু গলায়—ওঃ, তুমিই বক্তিমে করবে, আর আমরা কথা বলতে পারব না?

ফোমিন তাকে আঘাত করলে না। কেবল চাবুকটা নেড়ে গর্জন

করে উঠল—ওরে নোংরা বলশেভিক! চাবকে তোকে সিধে করব! তোর মাথার ওপর ঘাগরা তুলিয়ে ডাণ্ডার বাড়ি লাগাবার হুকুম দেব। তখন তোর বুদ্ধি খুলে যাবে!

আরো দু'পা পেছিয়ে গিয়ে হঠাৎ বিধবা স্ত্রীলোকটা বোঁ করে ফোমিনের দিকে ফিরে মাথা নিচু করে ঘাগরা ওপরে তুলে দিলে।

—এরকম আগে কখনো দেখিস্‌নি; হ্যাঁরে আনিকা বীর বাহাদুর? —বলেই অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সোজা হয়ে ফোমিনের দিকে ফিরলে সে—আমাকে? তুই আমাকে চাবকাবি? তোর নাকে বুঝি এখনো দড়ি পড়েনি!

ফোমিন ক্ষিপ্ত হয়ে থুতু ফেলে। ভড়কে পিছিয়ে যাওয়া ঘোড়ার লাগাম টেনে রাখে।

—মুখ সামলা এই বাঁজা ঘুড়ী! তোর লাশে কিছু চর্বি জমেছে বলে বেজায় তোর জাঁক হয়েছে?—উচ্চকণ্ঠে কথাগুলো বলে ঘোড়াটাকে সে ঘুরিয়ে নিলে। মিথ্যেই খুব গুরুগম্ভীর হবার চেষ্টা করছিল সে।

জনতার মধ্যে আবার একটা চাপা হাসির ঢেউ। অধিনায়কের অমর্যাদা হতে দেখে ফোমিনের এক সহকারী ছুটে এল বিধবাটির দিকে কার্বাইনের বাঁটটা দোলাতে দোলাতে। কিন্তু ওর চেয়েও দু'মাথা উঁচু একজন জোয়ান কসাক তার চওড়া কাঁধটা দিয়ে বিধবাকে আড়াল করে দাঁড়াল। নিচু গলায় অথচ বেশ দৃঢ় কণ্ঠে সে বললে:

—ব্যস্‌, ব্যস্‌। ওসব চলবে না!

আরো তিনজন গ্রামবাসীও তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছিল। বিধবাটিকে টেনে সরিয়ে নিলে তারা। ওদের একজন, অল্প বয়েস খাড়া খাড়া চুলওয়ালা, ফোমিনের সহকারীটিকে কানে কানে বললে:

—রাইফেল দোলাচ্ছ কেন হে অমন করে? একটা মেয়েছেলেকে মারা কিছু কঠিন কাজ নয়। যাও, লড়াইয়ের ময়দানে গিয়ে বাহাদুরি দেখাও গে। অন্দরমহলে সবাই বীরত্ব দেখাতে পারে।

ঘোড়াটাকে হাঁটা-চালে বেড়ার পাশে চালিয়ে নিয়ে গেল ফোমিন। তারপর রেকাবে পা রেখে খাড়া হয়ে উঠে বললে:

—কসাকগণ! তোমরা একটু ভাল করে ভেবে দ্যাখো।

জনতা তখন কেটে পড়তে শুরু করেছে।

—এখন ভদ্রভাবেই অনুরোধ করছি। কিন্তু এক হপ্তার মধ্যে আবার ফিরে আসব। তখন কথা বলব অন্য ভাষায়!

কোনো কারণে ফোমিনের মেজাজ হঠাৎ খুশী হয়ে উঠল। হাসতে হাসতে চঞ্চল ঘোড়াটাকে সামলে সে উঁচু গলায় বলতে লাগল:

—আমরা কাপুরুষ নই! মেয়েছেলের···পাছা দেখিয়ে আমাদের ঘাবড়ে দিতে পারবে না! ওরকম জিনিস অনেক দেখেছি—বসন্তের দাগওলা,

হাজার রকম দাগওয়ালা। আমরা ফিরে আসিব। আর তখন যদি তোমাদের কেউ আমাদের ফৌজী দলে স্বেচ্ছায় যোগ না দেয় তো জোর করেই জোয়ান কসাকদের আমরা পল্টনে ভর্তি করব। সেটা বুঝে দেখো! তোমাদের তোয়াজ করবার আর মুখের দিকে চেয়ে থাকার সময় আমাদের নেই!

এবার শ্রোতাদের মধ্যে আবার হাসি আর সোৎসাহ আলাপ চলতে লাগল। ফোমিন হাসিমুখ করেই হুকুম দিলে: ঘোড়ায় ওঠো!

অনেক কষ্টে হাসি চেপে গ্রিগর তার নিজের সেপাইদের দিকে ঘোড়া চালিয়ে এগিয়ে গেল।

কর্দমাক্ত রাস্তা ধরে ফোমিনের ফৌজীদল ঘোড়া চালিয়ে এল টিলার মাথাটায়। চোখের আড়ালে অদৃশ্য হল আতিথেয়তা-বিমুখ গ্রামখানি। কিন্তু গ্রিগর তখনো মনে মনে ভাবছিল আর হাসছিল: আমরা কসাকরা পরিহাস রসিক সেটাই আশার কথা। দুঃখের চেয়েও রসিকতাই আমাদের বেশী আপনার জন। ঈশ্বর করুন যেন এইটেই বরাবর থাকে, কারণ জীবন যদি সবটাই গুরুগম্ভীর হত তাহলে কবে আমি ফাঁসি দিয়ে মরতুম।

অনেকক্ষণ অবধি গ্রিগরের এই প্রফুল্ল ভাবটা বজায় ছিল। শুধু যখন ওরা সবাই থামল তখন গ্রিগরের মনে একটা ক্ষুব্ধ, তিক্ততার ভাব এল, কসাকদের জাগাবার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হতে যাচ্ছে বলে। ফোমিনের সমস্ত পরিকল্পনাই অনিবার্যরূপে বিফল হতে বাধ্য।

॥ চার ॥

এল বসন্তকাল। সূর্যের তেজ আরও প্রখর হয়েছে। পাহাড়ের দক্ষিণ ঢালে বরফ গলতে শুরু করেছিল। দুপুরের দিকে মাটি থেকে একটা স্বচ্ছ বেগুনি বাষ্প উঠতে থাকে। গেল বছরের লালচে মরা ঘাসে ঢাকা মাটি। পাহাড়ের ঢিবিগুলোর ওপর বড় বড় বেলপাথরের চাঁইগুলোর নিচে এক-আধ চিলতে উষ্ণ মাটি—সেখানে কচি দুর্বোঘাসের প্রথম উজ্জ্বল সবুজ উঁকি দেয়। লাঙল-চষা রিক্ত জমি। নির্জন শীতের রাস্তাগুলো ছেড়ে দাঁড়কাকের দল এখন ভিড় করেছে ফসল মাড়াইয়ের আঙিনায়, বরফগলা

জলে ডোবা শীত-ফসলের ক্ষেতগুলোয়। পাহাড়ী খাত আর খানাখন্দের মধ্যে বরফ এখনো নীল হয়ে জমে আছে, খালি ওপরটুকু গলে তলতলে দেখায়। এই প্রান্ত থেকেই এখনো হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে আসে। কিন্তু সোঁতাগুলোর মধ্যে ফল্গুধারার মতো বাসন্তী স্রোত এর মধ্যেই কলকণ্ঠে ছুটতে শুরু করেছে বরফের তলা দিয়ে—ক্ষীণধারায়। আর বনের পথে পপলার গাছের শাখায় শাখায় কেবল সবুজ কিশলয় প্রায় দুর্লক্ষ্য বসন্তের আবির্ভাব জানিয়ে দিচ্ছে।

চাষবাসের মৌশুম এসে পড়ছিল। একেকটি দিন কাটে আর ফোমিনের দলবল ক্রমেই কোথায় মিলিয়ে যেতে থাকে। রাতে হয়তো কোথাও আস্তানা নিল তারা, পরদিন ভোর হতে দেখা গেল দু-একজন বেপাত্তা। একদিন তো দলের অর্ধেকই অদৃশ্য হয়ে গেল। ঘোড়া-রসদ নিয়ে আটজন অবশেষে ভিয়েশেনস্কায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করলে। এখন জমি চষা ফসল বোনার সময়। মাটির ডাক এসেছে। কসাকদের কাজের আহ্বান। আর লড়াইয়ে লাভ নেই বুঝে ফোমিনের দলের অনেকেই গোপনে দল ছেড়ে ভেগে পড়ল। পালিয়ে এল নিজেদের বাড়িতে। দলে রয়ে গেল শুধু কয়েক-জন বেপরোয়া পলাতক যাদের কোনোক্রমেই ফেরা চলবে না, যাদের অপরাধ এতই বেশী যে সোভিয়েত সরকারের কাছে তাদের ক্ষমার আশা করাই বৃথা।

এপ্রিলের প্রথম দিন কটিতে ফোমিনের হেপাজতে ছেয়াশিজনের বেশী সেপাই রইল না। গ্রিগর তখনো দলে রয়েছে। বাড়ি ফিরে যাবার সাহস ছিল না তার। ওর এখন দৃঢ় ধারণা ফোমিনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। আজ হোক কাল হোক দল ভেঙে যাবেই। ও জানত লালফৌজের কোন নিয়মিত ঘোড়সওয়ার বাহিনীর সঙ্গে প্রথম সংঘাতেই দল ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। তবু সে ফোমিনের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে, কোনোরকমে গ্রীষ্মকাল অবধি কাটিয়ে দেবে এই গোপন ইচ্ছা মনে রেখে। তারপর দলের একজোড়া সেরা ঘোড়া বেছে নিয়ে রাতের অন্ধকারে চম্পট দেবে তাতারস্কের দিকে। তারপর আকসিনিয়াকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণমুখো। ডন পারের স্তেপভূমি অতি বিশাল, সেখানে অনেক নির্জন পথঘাট রয়েছে, প্রান্তরও রয়েছে। গ্রীষ্মের সময় সব রাস্তাগুলোই চলাফেরার যোগ্য থাকে, সর্বত্রই আশ্রয় পাওয়া যেতে পারে। ঘোড়াগুলোকে কোথাও ছেড়ে দেবে তারপর আকসিনিয়াকে সঙ্গে নিয়ে হেঁটেই চলে যাবে কুবানে, ককেসিয়ার পাহাড়তলিতে—জন্মভূমি থেকে অনেক দূরে! আপদের দিনগুলো সেখানেই কাটিয়ে দেবে। ওর কাছে মনে হয় এ ছাড়া আর গত্যন্তর নেই।

কাপারিনের উপদেশ শুনে ফোমিন ঠিক করেছিল বরফ ভাঙতে শুরু হবার আগেই ডনের বাঁ পাড়ে গিয়ে উঠবে। খপেরস্ক অঞ্চলের বন এলাকায় প্রয়োজন হলে গা ঢাকা দিয়ে থাকা যাবে এই আশা করে সে।

রিবনি গাঁয়ের কাছে ডন নদী পার হল ওরা। একেক জায়গায় স্রোতের বেগ বেশী ছিল বলে এর মধ্যেই বরফ সরে গিয়েছে! এপ্রিলের উজ্জ্বল রোদে রূপোলি মাছের আঁশের মতো চিকচিক করছে নদীর জল। কিন্তু যেখানে শীতের সময় সাময়িক পথ তৈরি করা হয়েছিল বরফের চেয়ে ফুট দুয়েক উঁচু করে, সেখানে ডন নদী অনড় দাঁড়িয়ে আছে। পথের ভাঙা কিনারাগুলোর ওপর কঞ্চি ডাল বিছিয়ে ঘোড়াগুলোকে এক এক করে পার করে নিলে ওরা। ওপাশে একসঙ্গে জড়ো হবার পর একটা টহলদারি দল আগে পাঠিয়ে দিলে খোঁজ নেবার জন্য। তারপর সবাই ইয়েলান্স্কা জেলার দিকে এগোতে লাগল।

পরদিন তাতারস্কের এক প্রতিবেশীর সঙ্গে গ্রিগরের হঠাৎ দেখা। এক-চোখ কানা বুড়ো তার আত্মীয়দের কাছে যাচ্ছিল গ্রিয়াজ্নভ্স্কিতে। গাঁয়ের কাছেই গ্রিগরের দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ। বুড়োকে একপাশে ডেকে নিয়ে গ্রিগর জিজ্ঞেস করে:

—আমার ছেলেমেয়েরা বেঁচেবর্তে আছে তো দাদু?

—ঈশ্বর ওদের রক্ষা করুন গ্রিগর পান্তালিয়েভিচ। ওরা সব ভালোই আছে।

—একটা বড়ো কাজ করে দিতে হবে কিন্তু দাদু। আমার তরফ থেকে ওদের আর আমার বোন ইয়েভ্দোকিয়াকে অন্তরের ভালবাসা জানিও, আর প্রোখর জাইকফকেও জানিও। আকসিনিয়া আস্তাখফাকে বোলো যে শিগ্রিই আমি আসব। শুধু আমাকে যে দেখেছ সেকথা যেন কাউকে বোলো না, বুঝলে?

—তাই করব কর্তা। নিশ্চয় বলব। ঘাবড়িও না, ঠিক যেমনটি বলেছ তাই ওদের জানিয়ে দেব।

—গাঁয়ের আর কী খবর?

—তেমন কিছুই নেই। আগেও যেমন ছিল তেমনিই।

—কশেভয় এখনো চেয়ারম্যান?

—হ্যাঁ।

—আমার পরিবারের কোনো উন্নতি করেনি তো সে?

—সেরকম কিছু শুনিনি যখন, ওদের ওপর হাত তোলেনি নিশ্চয়। আর কেনই বা তা করবে? তোমার জন্য তো ওরা দায়ী নয়।

—গাঁয়ের লোকেরা আমার সম্বন্ধে কিছু বলে?

বুড়ো নাক ঝাড়লে। অনেকক্ষণ ধরে গোঁপে তা দিয়ে লাল উড়ুনি দিয়ে দাড়ি মুছলে, তারপর একটা এড়ানোর মতো জবাব দিলে:

—ভগবান জানেন।…সবরকম কথাই তো শুনি, যা মনে আসে বলে। সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে তোমরা শান্তি করে ফেলবে তো শিগগিরই?

এর কী জবাব দেবে গ্রিগর? দলের পেছু নিতে উদ্‌গ্রীব ঘোড়াটাকে সামলে রেখে গ্রিগর একটু হেসে বললে:

—তা তো জানি না দাদু। এখন পর্যন্ত কিছুই বলতে পারি না।

—তা কেন? আমরা সির্কাশিয়ানদের সঙ্গে লড়েছি, তুর্কিদের সঙ্গে লড়েছি, শেষ অবধি তো শান্তি এসেছে। অথচ তোমরা হলে আমাদের আপনারই লোক, একই দেশের মানুষ। তাহলে কেন ফয়সালা করে নিতে পারবে না?···ভালো নয়, গ্রিগর পান্তালিয়েভিচ, বলছি এ ভালো নয়। ঈশ্বরের অপার দয়া, তিনি তো সবই দেখেন। তিনি তোমাদের ক্ষমা করবেন না। সে কথা আমার শুনে রাখো। জিজ্ঞেস করি, আমরা রুশ, খাঁটি খ্রীষ্টান ধর্মবিশ্বাসী, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করা আমাদের বুদ্ধির কাজ? তাও আবার ক্ষান্তি না দিয়েই? তা একটু আধটু লড়াই করেছ তো করেছ··· কিন্তু আজ যে চার বছর হতে চলল একে অন্যের টুঁটি চেপে ধরে আছ। আমার বুড়োর বুদ্ধিতে তো বলে, এসব এখন থামাও।

বুড়োর কাছে বিদায় নিয়ে গ্রিগর দ্রুত ঘোড়া ছোটায় দলের সবাইকে ধরবার জন্য।

লাঠিতে ভর দিয়ে বুড়ো অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে আর জামার আস্তিনে ছানিপড়া চোখটা মোছে। যে চোখটায় এখনো দৃষ্টির জোর আছে সেটা দিয়ে চেয়ে থাকে গ্রিগরের দিকে। আর ওর নির্ভীক ব্যক্তিত্বের তারিফ করে আপন মনে বলে:

—সাচ্চা কসাক! সব গুণই আছে, মানুষের মতো মানুষ, তবু একেবারে বয়ে গেল। পথ হারিয়েছে মানুষটা। ওর উচিত ছিল সিরকাশিয়ানদের সঙ্গে লড়া, তাহলেই মানাত। তা নয় কী এক বুদ্ধি মাথায় ঢুকেছে! এ গবরমেণ্ট নিয়ে ও অত মাথাই বা ঘামায় কেন? আজকালকার এ-সব জোয়ান ছোকরা কসাক যে কী ভাবে! গ্রিশাকে বলে কোনো লাভ নেই। এ যুগের দস্তুরই এই। সবাই বয়ে গেছে। ওর বুড়ো বাপ পান্তালিমনও ছিল এই এক ধাতে গড়া। মনে আছে ওর দাদু প্রকোফিকে···মানুষ তো ছিল না, একেবারে বাঘা তেঁতুল। কিন্তু আর সব কসাক যে কী ভাবনা ভাবে· ঈশ্বর করুন, জানিনে বাপু!

* *

আজকাল আর ফোমিন নতুন কোনো গ্রাম দখল করলে জনসভা ডাকে না। ও বেশ বুঝেছে প্রচারকার্য করে কোনো ফল হবে না। নিজের লোকজন সামলে রাখাই দায় হয়েছে, নতুন লোক দলে ভেড়ানো তো দূরের কথা। আজকাল সান্ত্বনা পায় শুধু ভদ্‌কা পান করে। কোনো গ্রামে রাত্রি যাপন করবার সুযোগ পেলেই ওদের পানোৎসব চলে। দলের মোড়লের

উদাহরণ দেখে বাকি সবাই মদ খায়। শৃঙ্খলা ক্রমেই ভেঙে পড়ছে। লুট-পাট বেড়ে চলেছে। ওদের দল হানা দিতে এলে যে-সব সোভিয়েত কর্মচারী গা-ঢাকা দেয় তাদের ঘর-দোরের আর কিছু থাকে না। শেষ আলপিনটি অবধি ঘোড়ার পিঠে তুলে নিয়ে চলে যায় ওরা। ওদের জিনথলি জিনিসের ভারে ফেটে পড়ার অবস্থা হয়। একদিন গ্রিগর দেখলে দলের এক সেপাই একটা সেলাইকলও বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। জিনচুড়োর ওপর লাগাম ছেড়ে দিয়ে বাঁ বগলে মেশিনটাকে আগলে রেখেছে। চাবুকের ঘা লাগিয়ে তবে গ্রিগর কসাকটাকে বাধ্য করতে পেরেছিল তার লুটের সম্পত্তি হাতছাড়া করতে। সেদিন সন্ধ্যায় ফোমিনের সঙ্গে গ্রিগরের একচোট ঝগড়া হয়ে গেল। ঘরে ওরা একলাই ছিল। ফোমিন টেবিলের ধারে বসে রয়েছে। অতিরিক্ত মদ খেয়ে মুখ চোখ ফোলা, এদিকে গ্রিগর লম্বা লম্বা পা ফেলে পায়চারি করছে।

—বসো না, কী খালি চোখের সামনে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছ। ফোমিন চটা মেজাজে বলে।

ওর দিকে নজর না দিয়ে গ্রিগর অনেকক্ষণ ছোট ঘরটার মধ্যে পায়চারি করে শেষে বলে :

—যথেষ্ট হয়েছে, ফোমিন, আর নয়! এই লুটতরাজি আর মদ খাওয়া বন্ধ করো।

—কাল রাতে খারাপ স্বপ্ন দেখেছিলে নাকি?

—আবার তামাশা।...কিন্তু লোকে যে তোমাদের সম্পর্কে যা-তা বলতে শুরু করেছে।

ফোমিন অনিচ্ছাভরে বললে—তুমিও জানো, আমিও জানি, এদের হাজার বলেও কোনো লাভ নেই।

—কিন্তু তুমি তো ওদের বোঝাতে চেষ্টাই করছ না।

—তুমি আর মাষ্টারি ফলিও না আমার ওপর! তাছাড়া লোকদের নিয়ে অত মাথা ঘামাবার দরকারও নেই। আমরা কষ্ট করছি ওই হারামজাদাদের জন্য, কিন্তু ওরা...! আমি নিজের চিন্তা নিয়ে আছি, সেই আমার ঢের।

—তোমার নিজের সম্পর্কেও বোধহয় নিজেরই কোনো ধারণা নেই। হৈ-হল্লা মাতলামি করে চিন্তা করার সময়ই বা পাবে কখন? আজ চারদিন হল তোমার বে-হেড অবস্থা, বাকিরাও সবাই মদ চালিয়ে যাচ্ছে। এমন-কি টহলদারি ডিউটিতে থাকলেও মদ খায়, রাতে তো পাইকিরি ব্যবস্থা। তোমাদের ইচ্ছাটা কী? মাতাল হয়ে দলবল সমেত ধরা পড়ে কোথাও একেবারে কচুকাটা হয়ে যাই, এই চাও?

—তুমি ভেবেছ আমরা রেহাই পাব তা থেকে?—ফোমিন বিদ্রূপ করে

বলে—একদিন তো মরতেই হবে। আগে যে-পাত্রে জল বয়ে আনা হত এখন তার তলা ফুটো। তা জানো তো?

—তাহলে চলো কাল ভিয়েশেনস্কায়। গিয়ে হাত তুলে বলি: আমরা ধরা দিচ্ছি, আমাদের গ্রেপ্তার করো।

—না। আরো কিছুদিন জীবনটা উপভোগ করা যাক।...

গ্রিগর টেবিলের উল্টো দিকে দু'পা ফাঁক করে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে বললে:

—যদি দলের মধ্যে শৃঙ্খলা না আনতে পারো, যদি মদ খাওয়া আর লুটতরাজি না থামাতে পারো তাহলে আমি তো চলে যাবই, সঙ্গে দলের অর্ধেক লোককে নিয়ে যাবো।

—চেষ্টা করে দেখ। ফোমিন শাসিয়ে বলে।

—চেষ্টার দরকার হবে না, এমনিতেই হয়ে যাবে!

—তুমি...তুমি আমাকে চোখ রাঙাবে না বলে দিচ্ছি। ফোমিন পিস্তলের বাঁটে হাত রাখে।

—পিস্তল হাতিও না, তার আগেই টেবিলের ওপাশে আমার হাত চলে যাবে!—গ্রিগর পাংশুমুখে তলোয়ারের খানিকটা খাপ থেকে খুলে ফেলেছিল।

ফোমিন এবার টেবিলে হাত রেখে হাসলে:

—আমাকে কেন খোঁচাচ্ছ? এমনিতেই যন্ত্রণায় মাথা আমার ফেটে পড়ার জোগাড়, তার ওপর তুমি যতসব বাজে কথা শুরু করেছ! তলোয়ার খাপের ভেতরেই রাখো। তোমার সঙ্গে কি একটু ঠাট্টাও করতে পারি না? বড্ড বেশী কড়া হয়ে যাচ্ছ! ঠিক ষোল বছরের মেয়ের মতো...।

—আমি যা চাই তা তো আগেই বলেছি, এখন তুমি তোমারটা দেখ! সকলের মন তো তোমার মতো নয়।

—তা আমি জানি!

—সেটাই জেনে রেখো আর মনে রেখো! কাল তোমাকে হুকুম দিতে হবে যেন সব তল্পিতল্পা খোলা হয়! এটা আমাদের ঘোড়সওয়ার ফৌজ-মালটানা গাড়ি নয়। ছিনিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দাও মালপত্র! এরা নিজেদের বলে কিনা জনগণের সৈনিক। লুটের জিনিস কাঁধে করে গাঁয়ে গাঁয়ে বিক্রি করে বেড়াচ্ছে ফিরিওয়ালার মতো! লজ্জায় আমার মাথা কাটা যায়! কী কুক্ষণে তোমাদের দলে যোগ দিয়েছিলাম?—রাগে ফ্যাকাশে হয়ে থুতু ছুঁড়ে জানলার দিকে সরে গেল গ্রিগর।

ফোমিন হো-হো করে হেসে বললে:

—এখনো তো শত্রুর কোনো ঘোড়সওয়ার ফৌজ আমাদের ধাওয়াই করেনি। খেয়ে-দেয়ে পেট মোটা নেকড়ে বাঘকে যখন শিকারীরা তাড়া করে তখন সে যা কিছু খেয়েছে সব বমি করতে করতে ছোটে। আমাদের

শয়তানগুলোও সব ফেলে দিয়ে পালাবে যখন সত্যি-সত্যি তাড়া খাব আমরা। ঠিক আছে মেলেখফ, অতো উত্তেজিত হয়ো না, আমি দেখব ব্যাপারটা। কী হয়েছে জানো : আমিও একটু ইচ্ছে করেই ঢিলে দিয়েছিলাম। আবার লাগাম কষব। দলটাকে তো এভাবে ভেঙে দিতে পারি না। দুঃখের পেয়ালা আমাদের সকলের সঙ্গেই ভাগ করে খেতে হবে।

কথাবার্তা ওরা শেষ করতে পারল না। বাড়ির গিন্নি ঘরে ঢুকল গরম ধোঁয়া-ওঠা কপির ঝোলের পাত্র হাতে নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে চুমাকফ আর একদল কসাকও এসে পড়ল।

কিন্তু আলোচনায় ফল হয়েছিল। পরদিন সকালে ফোমিন হুকুম দিল তল্পিতল্পা খুলতে। নিজে দাঁড়িয়ে তদারক করতে লাগল সে। তদারকির সময় সবচেয়ে দাগী লুটেরাদের মধ্যে একজন একটু বাধা দিতে গিয়েছিল, লুটের মাল ছাড়াতে চাইছিল না। ফোমিন তাকে সৈন্যসারির মধ্যে দাঁড়ানো অবস্থাতেই গুলি করে মেরে ফেলল।

লাশের ওপর বুটের ঠোকর লাগিয়ে ধীরভাবে সে বললে :—জানোয়ারটাকে সরিয়ে নিয়ে যাও!—তারপর লোকজনদের দিকে চেয়ে উঁচু গলায় বললে—পরের সিন্দুক হাতানো যথেষ্ট হয়েছে কুত্তার বাচ্চারা! সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে তোমাদের জাগিয়ে তুলেছিলাম এজন্য নয়। শত্রু যদি মৃত হয় তার কাপড়জামা খুলে নিতে পারো, মায় পাতলুন অবধি। কিন্তু তাদের পরিবারের ওপর হাত তুলতে পারো না। আমরা মেয়েমানুষদেব সঙ্গে লড়ছি না। কেউ যদি বাধা দেয় তার শাস্তি হবে এই নোংরা হতচ্ছাড়ার মতো।

চাপা গলায় একটা গুঞ্জন উঠে আবার মিলিয়ে গেল সৈন্যসারিব মধ্যে।

* * *

শৃঙ্খলাও খানিকটা ফিরে এসেছিল বোধহয়। দু'তিন দিন ধরে দলটা ডন নদীর বাঁ পাড় ধরে এগিয়ে চলেছে স্থানীয় আত্মরক্ষী বাহিনীর ছোট ছোট দলগুলোকে ধ্বংস করতে করতে।

শুমিলিন্স্কি জেলা অবধি পৌঁছুবার পর কাপারিন প্রস্তাব করলে ভরোনেঝ প্রদেশের ভেতর ওদের ঢুকে পড়া উচিত। ওর বক্তব্য হল ভরোনেঝে সম্প্রতি সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়েছিল, তাই সাধারণ লোকের বিপুল সমর্থন তারা নিঃসন্দেহেই পাবে। কিন্তু ফোমিন যখন কসাকদের সামনে প্রস্তাবটা রাখল তখন সবাই একবাক্যে জানিয়ে দিলে : নিজেদের এলাকা ছেড়ে আমরা বেরুব না। দলের বৈঠক হল। সিদ্ধান্ত পালটাতে হল। তারপর ক্রমাগত চারদিন ধরে ওরা এক নাগাড়ে পুব দিকে হটে যেতে লাগল—কাজানস্কা জেলা থেকে যে অশ্বারোহী

বাহিনী ওদের পায়ে পায়ে তাড়া করে আসছিল তাদের সঙ্গে যুদ্ধটা ওরা এড়িয়ে যেতে লাগল।

একেবারে আত্মগোপন করে চলা বড়ো সহজ কাজ ছিল না, কারণ তখন বসন্তকাল, সর্বত্রই ক্ষেত-খামারের কাজ চলছে, স্তেপের অতি সুদূর প্রান্তেও লোকজন কাজে ব্যস্ত। ওদের দলটা রাতের আঁধারে পশ্চাদপসরণ করে চলে। কিন্তু সকালে কোথাও থেমে হয়তো ঘোড়াগুলোকে সবে দানাপানি দিচ্ছে এমন সময় শত্রুপক্ষের ঘোড়সওয়ার তদারকি সেপাই কাছেই এসে হানা দিল, হয়তো হাত-মেশিনগান ছুটতে লাগল পট্‌পট্‌ করে, অমনি ফোমিনের দলবল তাড়াতাড়ি আবার ঘোড়ার মুখে লাগাম পরাতে লেগে যায়। ভিয়েশেন্‌স্কা জেলার মেলনিকফ গ্রামে ফোমিন বেশ চালাকি করে শত্রুপক্ষকে ধোঁকা দিয়ে সট্‌কে যেতে পেরেছিল। নিজের টহলদার তদারকি সেপাইয়ের কাছে সে খবর পেয়েছিল যে বুকানভস্কি জেলার একজন এক-গুঁয়ে চালাকচতুর কসাক নাকি লাল ঘোড়সওয়ার বাহিনীর অধিনায়ক। এও জানতে পেরেছিল যে ওদের সেপাইয়ের সংখ্যা প্রায় ফোমিন-দলের দ্বিগুণ, ছ'টা হালকা মেশিনগান আছে, আর আছে তরতাজা ঘোড়া যেগুলো দীর্ঘ রাস্তা হেঁটে ক্লান্ত হয়নি। এই সব অবস্থা বিবেচনা করে যুদ্ধটা এড়ানোই প্রয়োজন যাতে দলের লোকজন আর ঘোড়াগুলো একটু বিশ্রাম নিতে পারে। তারপর যখন সুযোগ আসবে তখন লাল ঘোড়সওয়ার ফৌজকে ভেঙে দেয়া যাবে, সম্মুখ-যুদ্ধে নয়, আচম্বিত আক্রমণ করে। এইভাবে ওদের একনাগাড়ে পেছু-নেয়া খানিকটা তো ঠেকানো যাবেই উপরন্তু শত্রুর খরচায় কিছু মেশিনগান আর রাইফেল বুলেটও হস্তগত হবে।

কিন্তু হিসেবে ভুল হয়ে গিয়েছিল ওর। দলের সম্পর্কে গ্রিগরের যা ভয় ছিল সেটাই সত্যি হয়ে দাঁড়াল আঠারোই এপ্রিল তারিখে। আগের সন্ধ্যায় ফোমিন এবং সাধারণ সেপাইদের বেশির ভাগই প্রচুর মদ্য পান করেছিল। যে গ্রামে ঘাঁটি করেছিল সে গ্রাম ত্যাগ করলে ওরা ভোর বেলায়। রাতে অনেকের ঘুম হয়নি, এখন তাই অনেকেই ঝিমুচ্ছে। সকাল নটা নাগাদ অঝোগিন গ্রামের কাছে এক বনের ধারে এসে থামলে ওরা। ফোমিন পাহারা বসিয়ে ঘোড়াদের দানা দেবার হুকুম দিলে।

পুব দিক থেকে সজোর দম্‌কা হাওয়া দিচ্ছিল। দিগন্ত ঢেকে গেছে বাদামী ধুলোর মেঘে। স্তেপের উঁচু আকাশের গায়ে কুয়াশা। সে কুয়াশা ভেদ করে সূর্যের আলো আসতে পারছে না। সেপাইদের জোব্বাকোটের কিনারা হাওয়ায় উড়ছে, ঘোড়াদের বালামচি আর লেজ উড়ছে। ঘোড়া-গুলো হাওয়ার দিকে পেছন ফিরিয়ে বনের ধারের কাঁটা ঝোপের মধ্যে মাথা গুঁজতে চেষ্টা করছিল। ধুলোবালি পড়ে চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছিল সেপাইদের, কাছাকাছি নজর করে দেখাও কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গ্রিগর সাবধানে ঘোড়ার মুখের বলগা আলগা করে দানার থলিটা তার গলায় ঝুলিয়ে দিলে। কাপারিনের দিকে এগিয়ে এল সে। কাপারিন তার জোব্বাকোটের কোঁচড়ে দানা রেখে ঘোড়াকে খাওয়াচ্ছিল।

গ্রিগর জঙ্গলের দিকটায় চাবুক দেখিয়ে বললে—বিশ্রাম নেবার বেশ ভালো জায়গা বেছে নিয়েছেন যাহোক!

কাপারিন কাঁধ ঝাঁকুনি দেয়।

—সে কথা আমিও বলেছিলাম গাধাটাকে। কিন্তু কোনো কথা বোঝাবার উপায় আছে তাকে!

—স্তেপের মাঠে কিংবা গাঁয়ের বাইরে কোথাও থামা উচিত ছিল।

—বনের দিক থেকে হামলা হতে পারে বলে ভয় হচ্ছে?

—হ্যাঁ, তা হচ্ছে।

—শত্রু তো অনেক দূরে।

—শত্রু খুব কাছেও হতে পারে। ওরা তো পায়দল সেপাই নয়।

—বন তো ফাঁকা। এলে দেখতেই পাবো।

—দেখবার লোক কে আছে? প্রায় সবাই তো ঘুমে অচেতন। মনে হচ্ছে পাহারাদাররাও ঘুমিয়ে পড়েছে!

—গেল-রাতের হৈহল্লার পর দাঁড়িয়ে থাকার অবস্থা কারুর নেই, ওদের ওঠাতে পারবে কী।—যেন যন্ত্রণায় ভুরু কোঁচকাল কাপারিন। নিচু গলায় বললে—এ রকম নেতা নিয়ে তো আমরা গেছি। বোতলের মতো ফাঁপা, আর তেমনি গর্দভ, অবিশ্বাস্য রকমের গাধা। তুমি কেন ফৌজের ভার হাতে নাও না? কসাকরা তোমাকে সম্মান করে। স্বেচ্ছায় তোমাকে মেনে নেবে।

গ্রিগর শুকনো গলায় জবাব দেয়—আমি তা চাই না। দুদিনের অতিথি আমি।

মুখ ফসকে মনের কথাটা বেরিয়ে আসায় আপসোস হচ্ছিল গ্রিগরের। সে তার ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল।

কাপারিন কোট ঝেড়ে বাকি দানা কটা মাটিতে ছড়িয়ে দিলে, তারপর তাড়াতাড়ি ছুটলো গ্রিগরেব পেছু পেছু।

—বুঝলে মেলেখফ—বলতে বলতে এগোলো সে। কাঁটাগাছের ছোট ডাল ভেঙে নিয়ে শক্ত মোটা দানাগুলো নখ দিয়ে খুঁটতে খুঁটতে বললে—কোনো বড়ো সোভিয়েত-বিরোধী দলের সঙ্গে যদি যোগ না দিতে পারি তাহলে বেশীদিন আমরা টিকতে পারব মনে হয় না। যেমন ধরো মাস্‌লাকের দলে। মাস্‌লাক দক্ষিণ দিকের এলাকায় কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে। পথ করে বেরিয়ে গিয়ে মিলতে হবে ওর সঙ্গে, নয়তো কোন্‌দিন এখানেই সদলবলে কোতল হয়ে যাব।

—এখন বানের সময়। ডন পেরুনো যাবে না।

—এখুনি নয়। জল একটু কমলে আমাদের পশ্চাদপসরণ করতেই হবে। তোমার তা মনে হয় না?

খানিকক্ষণ চিন্তা করে গ্রিগর জবাব দেয়:

—আপনি ঠিক বলেছেন। এই এলাকা থেকে বেরিয়ে যেতে হবে আমাদের। এখানে কিছুই করার নেই।

স্বপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে প্রবল উৎসাহ এসে গেল কাপারিনের। ও ব্যাখ্যা করে বোঝাতে লাগল যে-জনসমর্থনের ওরা প্রত্যাশা করেছিল তার পেছনে যুক্তি ছিল না। এখন যেমন করে হোক ফোমিনকে বোঝাতে হবে যাতে সে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে না বেড়িয়ে কোনো সবলতর বাহিনীর সঙ্গে হাত মেলায়।

ওর বক্তৃতা শুনে হয়রান হয়ে গিয়েছিল গ্রিগর। ঘোড়ার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে সে। যেই থলিটা খালি হল, সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার মুখে বল্‌গা এঁটে জিনের বাঁধুনিগুলো টেনে দিল ও।

—এখনো আমাদের এখান থেকে সরতে বহু দেরি। অত তাড়াহুড়ো করার দরকার কী! কাপারিন বললে।

—আপনি বরং গিয়ে আপনার ঘোড়া তৈরি রাখুন, কারণ পরে জিন বাঁধার সময় পাবেন না।—জবাব দেয় গ্রিগর।

কাপারিন ওর দিকে কড়া নজরে তাকায়। তারপর মালগাড়ির ধার ঘেঁষে দাঁড়ানো ঘোড়াটার দিকে এগোয়।

নিজের ঘোড়ার লাগাম ধরে হাঁটিয়ে গ্রিগর ফোমিনের কাছে আসে। কমাণ্ডার তখন জোব্বাকোট বিছিয়ে অলসভাবে দুপা ফাঁক করে শুয়ে একটা সেদ্ধ মুরগির বাচ্চার ডানা চুষে চুষে খাচ্ছিল। কাত হয়ে, গ্রিগরকে ইশারায় বসতে বলল পাশে।

—বোসো, একটু বিশ্রাম নাও।

—এখুনি চলে যেতে হবে। এটা বিশ্রামের সময় নয়।—বললে গ্রিগর।

—আগে ঘোড়াগুলোকে দানাপানি দিই, তারপর র৹ না হব।

—দানাপানি পরেও দেয়া যাবে।

—এত তাড়াহুড়ো কীসের?—মুরগির হাড়টা ছুঁড়ে ফেলে নিয়ে আস্তিনে মুখ মোছে ফোমিন।

—ওরা এখানেই আমাদের পাকড়াবে। এ জায়গাটা সবচেয়ে প্রশস্ত সেদিক থেকে।

—তা কী করে পারবে? এই মাত্র পাহারাদার এসে খবর দিল পাহাড়ের দিকে একটি প্রাণীকেও দেখা যাচ্ছে না। ওরা আসলে আমাদের সন্ধান পাচ্ছে না, নয়তো কখন এসে পেছু নিত। বুকানভ্‌স্কি জেলা থেকে আক্রমণের ভয় নেই। ওখানকার ামরিক কমিসার ওস্তাদ লড়াকু বটে

তবে সেপাই তেমন নেই হাতে। এতদূর এসে আমাদের মোকাবিলা করবে বলে মনে হয় না। ভালোমতো একটু জিরিয়ে নেয়া যাক, সন্ধ্যে অবধি থেকে ফের রওনা দেব। বসো বসো, একটু মুরগির মাংস খাও, অমন মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছো কেন? মনে হচ্ছে তুমি বড় ভীতু হয়ে গেছ মেলেখফ। একটু বাদেই হয়তো এমনি করে ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে পালাবে!—হাত নেড়ে নেড়ে দেখায় ফোমিন আর সোল্লাসে হাসে।

মনে মনে ফোমিনের নিকুচি করে গ্রিগর এগিয়ে গিয়ে ঘোড়াটাকে একটা ঝোপের ডালের সঙ্গে বাঁধে।

জোব্বাকোটের কিনারা তুলে দিয়ে হাওয়াটাকে ঠেকাতে চেষ্টা করে। বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দে ঘুম পেয়ে যাচ্ছিল ওর। মাথার ওপর সর সর করছে উঁচু উঁচু শুকনো ঘাস একঘেয়ে স্বরে।

* * * *

মেশিনগানের একটানা শব্দে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল গ্রিগর। গুলিবর্ষণের প্রথম পালা শেষ হবার আগেই ঘোড়ার বাঁধন খুলে নিয়েছে সে। সকলের গলার ওপর দিয়ে শোনা গেল ফোমিনের চিৎকার: ঘোড়ায় ওঠো! এবার ডানদিকে বনের ভিতর থেকেও দু'তিনটে মেশিনগানের আওয়াজ এল। ঘোড়ার পিঠে উঠে গ্রিগর একবার চোখ বুলিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা আঁচ করে নিতে চেষ্টা করল। ডানদিকে বনের প্রান্তে ধুলোর মেঘের আড়ালে প্রায় অদৃশ্য গোটা পঞ্চাশজন লালফৌজী সেপাই আক্রমণমুখী হয়ে ছুটে আসছে। পাহাড়ের দিকে পালাবার পথ বন্ধ করে দিয়েছে তারা। ওদের মাথার ওপর চকচক্ করছে খোলা তলোয়ার, অতি পরিচিত সেই হিমশীতল দ্যুতি সূর্যের ম্লান আলোয় নীলাভ দেখায়। বনের দিক থেকে, ঝোপঝাড়-ঘেরা পাহাড়গুলোর দিক থেকে মেশিনগানের গুলি আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে! অতিদ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে তাদের কার্তুজগুলো। বাঁদিকেও প্রায় আধ স্কোয়াড্রন লালফৌজী সেপাই ঘোড়া চালিয়ে আসছে নিঃশব্দে, তলোয়ার নাচাতে নাচাতে, দুদিক থেকে পুরোপুরি ঘেরাও করে ফেলবার উদ্দেশ্যে। পালাবার এখন একটাই পথ খোলা: বাঁ দিকের আক্রমণকারী সেপাইদের পাতলা সারিটা ভেঙে বেরিয়ে গিয়ে ডন নদীর দিকে পেছু হটা। গ্রিগর চেঁচিয়ে বললে ফোমিনকে: আমার পেছন পেছন এসো। তারপর ঘোড়াটাকে পুরো কদমে ছুটিয়ে দিলে হাতের তলোয়ার উন্মুক্ত করে।

প্রায় চল্লিশ গজ যাবার পর ও ফিরে তাকাল। ফোমিন, কাপারিন, চুমাকফ ও আরো অনেকে পূর্ণগতিতে ছুটে আসছিল ওর প্রায় গজ কুড়ি পেছনে। বনের ভেতর মেশিনগান এখন স্তব্ধ। শুধু একেবারে ডানদিকের একটা মেশিনগান এখনও ফোমিনের দলবল যারা মালগাড়িগুলোর কাছে

দৌড়োদৌড়ি করছিল তাদের লক্ষ্য করে সংক্ষিপ্ত ক্রুদ্ধ গুলিবর্ষণ করে যাচ্ছে। কিন্তু সে-মেশিনগানটাও হঠাৎ থেমে গেল। গ্রিগর বুঝল হামলাদাররা এখন ওদের ঘাঁটির একেবারে ওপরে এসে পড়েছে, আর পেছনে-পড়ে-থাকা লোকগুলো একে-একে কোতল হয়ে যাচ্ছে। সেটা আন্দাজ করা যাচ্ছিল ওদের মরীয়া চিৎকার আর আত্মরক্ষার প্রয়াসে দু'একটা গুলি ছোড়ার শব্দে। কিন্তু এখন আর পেছন ফিরে দেখবার সময় নেই গ্রিগরের। সামনে এগিয়ে আসছে জনস্রোত। ঘোড়াটা বেপরোয়া এগিয়ে যেতে গ্রিগর তার লক্ষ্য স্থির করে ফেলল। ওর লক্ষ্য হল খাটো ভেড়ার চামড়ার কোর্তা পরা একটি সেপাই। একটা ধূসর ঘোড়ায় চেপে জোর কদমে এগিয়ে আসছিল লোকটা। বিদ্যুতের ঝলকের মতো এক নিমেষের মধ্যে গ্রিগর দেখতে পেলো ঘোড়াটার মুখের ফেনায় ভেজা বুকের ওপর একটা শ্বেত তারকা। চালকের উত্তেজিত তারুণ্যব্যঞ্জক মুখখানা লাল টকটকে হয়ে উঠেছে আর তার পেছনে সুদূর ডন নদী অবধি পরিব্যাপ্ত স্তেপ প্রান্তরের বিপুল বিস্তার। তার এক মুহূর্ত পরেই গ্রিগরকে এড়াতে হবে একটা আঘাত এবং সামলাতে হবে তলোয়ার। প্রায় দশগজ দূরে থাকতেই গ্রিগর হঠাৎ শরীরটা ঝুঁকিয়ে দিলে বাঁ দিকে। ও শুনতে পেল মাথার ওপর দিয়ে সাঁই করে হাওয়া কেটে গেল একটা তলোয়ার।

জিনের ওপর হঠাৎ সিধে হয়ে গ্রিগর তলোয়ারের ডগা দিয়ে স্পর্শ করল লোকটার মাথা। আঘাতের বেগটা ও প্রায় অনুভবই করতে পারেনি। অথচ ঘাড় ফিরিয়ে দেখল লোকটা ঢলে পড়েছে, ধীরে ধীরে পড়ে যাচ্ছে জিনের ওপর থেকে। দেখল লোকটার হলদে চামড়ার কোর্তার পিঠে ঘন রক্ত গলগল করে নেমে যাচ্ছে। ধূসর ঘোড়াটার গতি এবার কমে গেল, একপাশে সরে যেতে লাগল ঘোড়াটা, যেন নিজের ছায়া দেখেই ভয় পেয়েছে। মাথাটা ছুঁড়ছে পাগলের মতো।

গ্রিগর তার ঘোড়ার কাঁধের ওপর ঝুঁকে পড়ে তলোয়ারটা নামিয়ে নেয় সহজাত বুদ্ধির বলেই। মাথার ওপর দিয়ে সাঁ সাঁ করে গুলি ছুটছে। ঘোড়ার কান দুটো থির থির করে কাঁপছে, কানের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। গ্রিগর শুধু শুনতে পেল প্রচণ্ড শিস্ দিয়ে একটা বুলেট ছুটে গেল। ভয়ানক হাঁপাচ্ছে ওর ঘোড়াটা। আবার পেছন ফিরে চাইল গ্রিগর। ফোমিন আর চুমাকফকে দেখতে পেল। ওদেরও একশ গজ পেছনে আসছে কাপারিন। আরও বহু পেছনে দু' নম্বর পল্টনের একটি মাত্র সেপাই, খোঁড়া স্তেরলাদ্নিকফ। দু'জন সৈনিক ওকে আক্রমণ করতে আসছিল, তাদের পাশ কাটিয়ে এসেছে স্তেরলাদ্নিকফ। ফোমিনের পেছন পেছন যে আটদশ-জন সেপাই আসছিল তারা খতম হয়ে গেছে। শুধু চালকহীন ঘোড়াগুলো শূন্যে লেজ তুলে এদিকে ওদিকে পালাচ্ছে আর লালফৌজের সেপাইরা তাড়া

করে ওদের ধরে ফেলছে। ফোমিনের দলের একটি উঁচু বেঁড়ে ঘোড়া শুধু কাপারিনের পাশাপাশি ছুটে আসছিল তার মৃত মনিবকে টানতে টানতে। লোকটা পড়ে যাবার সময় রেকাব থেকে তার পা-টা ছাড়িয়ে নিতে পারেনি।

টিলার ওপাশে ঘোড়া থামালে গ্রিগর। জিন থেকে লাফিয়ে পড়ে তলোয়ারটা খাপে ঢুকিয়ে নিলে। ঘোড়াটাকে মাটিতে শুইয়ে নিতে মাত্র কয়েক মুহূর্ত লাগল। তারপর টিলার আড়াল থেকে গুলি ছুঁড়তে লাগল। কার্তুজের সমস্ত থাপগুলো শেষ করে ফেলল কিন্তু তাড়াহুড়ো করে নিশানা করার দরুন কেবল তার শেষ বুলেটটা লালফৌজের একটি ঘোড়াকে ঘায়েল করলে। কিন্তু তার ফলে ফোমিনের দলের পঞ্চম সেপাইটির সুবিধা হল এগিয়ে আসতে।

গ্রিগরের কাছাকাছি এসে ফোমিন চিৎকার করে বলল—ঘোড়ায় উঠে পড, নয়তো সাবাড হয়ে যাবে!

* * * * *

এবারকার নিধনযজ্ঞটা পুরো হয়েছিল। গোটা দলের মধ্যে পাঁচজন মাত্র পালাতে পেরেছে। তাড়া খেয়ে আস্তনভ্স্কি গ্রাম পর্যন্ত পেরিয়ে এসেছে ওরা। গ্রামের পাশে বনেব মধ্যে পলাতকরা আশ্রয় না নেওয়া অবধি পশ্চাদ্ধাবন শেষ হয়নি।

পাগলের মতো ছুটে এসেছে ওরা কিন্তু পাঁচজনের একজনও একটি কথা বলেনি।

একটা ছোট নদীর কাছে এসে কাপারিনের ঘোড়া পড়ে গেল, কিছুতেই তাকে দাঁড় করানো গেল না। অন্যদের ঘোডাগুলো পরিশ্রান্ত হয়ে টল্‌ছে, পা নড়াতে পারছে না। মুখ থেকে ঘন সাদা ফেনা ছিটকে পডছে মাটিতে।

ঘোডা থেকে নেমে ফোমিনের দিকে না তাকিয়েই গ্রিগর মন্তব্য করলে—ফৌজের কমাণ্ডার না হয়ে ভেড়া চরানো উচিত ছিল তোমার!

জবাবে একটি কথা না বলে ফোমিন ঘোড়া থেকে নেমে জিন খুলে নিতে লাগল। কিন্তু শেষ অবধি জিনটা না সরিয়ে বুনো ঘাসের ঝোপের ওপর বসে পডল। ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকিয়ে বলল—এবার বোধহয় ঘোড়াগুলো ছেড়ে দিতে হবে।

চুমাকফ প্রশ্ন করলে:

—কিন্তু তারপর?

—তারপর আমাদের পায়ে হেঁটে ডনের ওপারে যেতে হবে।

—ওপারে কোথায়?

—সন্ধ্যে অবধি বনেই কাটাব। তারপর ডন পার হয়ে রুবিয়েঝিন্ গ্রামে গা ঢাকা দেব, ওখানে আমার অনেক আত্মীয় আছে।

কাপারিন চটে গিয়ে বললে—আবার গাধার মতো কথা বললে! ওখানে আমাদের খোঁজ করবে না ভেবেছ? এখন তো ওখানেই আমাদের আশা করবে সব থেকে আগে। ভাববার সময় একটু মগজ খাটিয়ো, বুঝলে?

ফোমিন উদাস ভাবে বলল—তাহলে আমরা যাবই বা কোথায়?

গ্রিগর জিন-থলি থেকে এক টুকরো রুটি আর বুলেটগুলো বের করে বলল:

—কথাবার্তা কয়েই কি সময় কাটিয়ে দেবে? চল চল! ঘোড়াগুলোকে বেঁধে জিন খুলে নিয়ে চল নয়তো লাল সেপাইরা এখানে এসেই পাকড়াবে আমাদের।

চুমাকফ মাটিতে চাবুক ছুঁড়ে দিয়ে পায়ে দলতে লাগল। কাঁপা কাঁপা গলায় বললে:

—আবার শুরু হল পায়ে হেঁটে চলা। দলের আর বাকি রইল না। বাপরে, কি সাংঘাতিক ভড়কে দিয়েছিল! আজকে জ্যান্ত ফিরে আসব ভাবতে পারিনি···একেবারে মরণের মুখোমুখি!

কথাবার্তা না বলে ঘোড়ার জিন খুলে নিল ওরা। একটা এল্ডার ঝোপের ডালের সঙ্গে চারটি ঘোড়াকেই বাঁধলে। তারপর একে একে নেকড়ের সার বেঁধে ডন নদীর দিকে এগোতে লাগল গুটি গুটি। জিনগুলো বগলদাবা করে নিয়েছে। যতদূর সম্ভব ঘন ঘাসের ঝাড়ের আড়ালে আড়ালে চলতে লাগল ওরা।

॥ পাঁচ ॥

বসন্তকালে যখন ডনের বান দুই পাড় ছাপিয়ে ওঠে আর বানের জলে ভেসে যায় আশপাশের নিচু জলাজমিগুলো তখন রুবিয়েঝিন গ্রামের উল্টো দিকে নদীর বাঁ পাড়ে উঁচু একফালি শুকনো জমি মাথা জাগিয়ে থাকে চার-দিকের বন্যার জলের মধ্যেও।

কচি বেতসবন, ওক আর কপোত-নীল ডালপালা ছড়ানো ওসিয়ারের ঝোপে ঢাকা এই দ্বীপটিকে অনেকটা দূর থেকে দেখা যায়, বিশেষ করে ডনপারের পাহাড়গুলোর ওপর থেকে।

গ্রীষ্মদিনে বুনো হপ্‌লতা একেবারে গাছের ডগা অবধি পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ওঠে। ঘন দুর্ভেদ্য ডিউবেরির কাঁটাঝোপে সমস্ত মাটি ছেয়ে যায়। ফ্যাকাশে-নীল অপরাজিতার লতা তখন ঝোপ বেয়ে ওপরে ওঠে। আর দুর্লভ বনভূমিতে ঘাস গজায় অপর্যাপ্ত; উর্বর মাটির রসে পুষ্ট এই মোটা ঘাসগুলো উঁচু হয়ে মানুষের মাথাও ছাড়িয়ে যায়।

গরমের দিনে ভরদুপুরেও বনের ভেতরটা নিস্তব্ধ, শীতল। চির-গোধূলির আলো। শুধু 'বেনে-বউ'-এর ডাকে যা-একটু শান্তির ব্যাঘাত। তার ওপর পাল্লা দিয়ে কোকিল কণ্ঠের চিৎকার, বোধহয় বসন্তের বাকি দিনগুলো পালা করে গোনে ওরা। কিন্তু শীতের দিনে এ বন একেবারেই পরিত্যক্ত, রিক্ত। মৃত্যুর নীরবতা তখন। শীতের ম্লান আকাশের পটে খাঁজ-কাটা গাছের চুড়োগুলো বিষণ্ণ কালো দেখায়। শুধু নেকড়ের বাচ্চারা বছরের পর বছর নিরাপদ আশ্রয় পায় বুনো ঝোপগুলোর নিচে, বরফঢাকা মুড়োঘাসের ওপর গড়িয়ে ওদের দিন কেটে যায়।

ফোমিন, গ্রিগর মেলেখফ ইত্যাদি যারা পালিয়ে বেঁচেছিল, এখন এই দ্বীপেই ঘাঁটি করেছে তারা। কোনোরকমে টিকে আছে বলা যায়। ফোমিনের এক ভাই রাতে নৌকায় করে যা সামান্য খাবার দিয়ে যায় তাইতেই দিন চলে। আধপেটা খায় বটে তবে প্রাণভরে ঘুমোতে পারে মাথার নিচে জিনের গদিগুলো রেখে। আগুন জালায় না পাছে কেউ টের পেয়ে যায় ওদের গোপন আস্তানা।

বানের জল দ্বীপটাকে ঘিরে দক্ষিণমুখো বয়ে চলে। পুরনো পপ্‌লারগাছের বাঁধ ভেঙে যখন বানের জল ছোটে তখন তার গর্জনে রীতিমতো ডর জাগায়। পরক্ষণেই হয়তো আবার সেই জল ঘুমপাড়ানি গানের সুরে কলকলিয়ে ছোটে ডুবে-যাওয়া ঝোপঝাড়ের মাথাগুলো দুলিয়ে।

জলের এই একঘেয়ে শব্দ গ্রিগরের গা-সহা হয়ে গেছে অল্পদিনের মধ্যেই। খাড়া পাড়ের ধারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ও শুয়ে থাকে আর চেয়ে থাকে দূরবিস্তারী জলের দিকে, ওপারের রৌদ্রময় বেগুনি কুয়াশায় ঢাকা খড়িমাটির পাহাড়গুলোর দিকে। কুয়াশারও ওপারে, ওইখানে তার জন্মভূমি, আপন গ্রাম···আকসিনিয়া··· ছেলেপিলেগুলো। বিসন্ন মনটা ধেয়ে চলে ওদিক পানেই। প্রিয়জনদের কথা মনে হতেই মুহূর্তের জন্য একটা প্রবল আকুলতা ওর হৃদয়কে গ্রাস করে একটা নিষ্ফল ঘৃণা জেগে ওঠে মিখাইলের ওপর। কিন্তু মনের আবেগ দমন করে গ্রিগর, চেষ্টা করে ডনপারের পাহাড়গুলোর দিকে না তাকাতে, এসব চিন্তা মন থেকে একেবারে দূর করতে চায়। শুধু দুঃখের স্মৃতি জাগিয়ে তুলে লাভটা কি? জীবন এমনিতেই দুর্বিসহ। মাঝে মাঝে ওর বুকের কাছটা এমন টনটন করে যে মনে হয় বুঝি ওর হৃৎপিণ্ডে বর্শা বিঁধেছে, স্পন্দন বুঝি থেমে গেছে, আর গড়িয়ে পড়ছে রক্তের স্রোত। আগের জখমগুলো, যুদ্ধের কষ্টকর অভিজ্ঞতা আর টাইফাস্ ব্যাধি ওকে দুর্জয় করে তুলেছে। প্রায়ই ও কান পেতে

হৃৎপিণ্ডের একটানা স্পন্দন শোনে। অনেক সময় বাঁ দিকের বুকে কঠিন যন্ত্রণা এমন অসহ্য হয়ে ওঠে যে ক্ষণিকের জন্য ঠোঁট শুকিয়ে যায়, অতি কষ্টে কাতরোক্তি চেপে রাখে। কিন্তু এ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার একটা নিশ্চিত উপায় খুঁজে পেয়েছে ও, ভিজে মাটিতে বাঁ দিকটা চেপে শুয়ে থাকলে ঠাণ্ডা জলে জামা ভিজে যায়, অবশেষে ধীরে ধীরে, প্রায় অনিচ্ছাসত্ত্বেই যেন ব্যথাটা শরীর থেকে দূর হয়ে যায়।

দিনগুলো ক্রমে আরামদায়ক হয়ে ওঠে। মাঝে-মাঝে হাওয়ার দাপটে এলোমেলো সাদা মেঘের টুকরো ভেসে চলে নির্মল আকাশে। আর বন্যার জলের উপর তাদের ছায়া সরে যায় বুনো হাঁসের মতো। সুদূর নদীকূলে তারা মিলিয়ে যায় ক্রমে।

নদীর পাড় ঘেঁষে টগবগিয়ে ছুটে-চলা প্রখর স্রোতের দিকে চেয়ে থাকতে ভাল লাগে। ভাল লাগে শুনতে জলের শতকণ্ঠ কলরব। আর কিছু ভাবার দরকার নেই, মনে কষ্ট জাগাবে এমন কিছু চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। গ্রিগর ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেয়ে থাকে খেয়ালী জলস্রোতের অনবরত বদলে যাওয়া গতি-পথের দিকে। ছোট ছোট ঢেউগুলো ক্রমাগত আকার পরিবর্তন করে যাচ্ছে। এক মুহূর্ত আগে যেখানে একটা নিস্তরঙ্গ স্রোত খেলে যাচ্ছিল নলখাগড়ার কাণ্ডি জমডোনো পাতা আর গোড়া-ওপড়ানো ঘাসের চাপড়া বুকে নিয়ে, এক মুহূর্ত বাদে সেখানে হয়তো উদয় হল এক অদ্ভুত রকমের পাক-খেয়ে-যাওয়া ঘূর্ণি। সে-ঘূর্ণির নাগালের মধ্যে যা কিছু ভেসে আসছে তাকেই সে লোভীর মতো গ্রাস করছে। আবার খানিক বাদেই হয়ত ঘূর্ণির গহ্বরটা অদৃশ্য হয়ে গেল। আর তার জায়গায় ফুঁশে উঠতে লাগল এলোমেলো পাকখাওয়া ঘোলা জল। বাদা ঘাসের কালো শেকড় জেগে উঠল জলে, তারপর এল একটা ছড়ানো ওকপাতা। একপালা খড়ও ভেসে এল কোথা থেকে কে জানে।

একেকদিন সন্ধ্যায় পশ্চিমের আকাশে পলাশ-রাঙা নিভু-আগুনের আভা। চাঁদ উঠেছে উঁচু পপ্‌লার-গাছের আড়ালে। চাঁদের আলো ছড়িয়ে আছে ডন নদীর ওপর হিমেল সাদা শিখার মতো। বাতাসের ঝাপটায় যেখানে জলের ওপর হাল্কা ফেনা ফুটে ওঠে সেখানে টুকরো হয়ে ভেঙে ভেঙে যায় তার প্রতি-বিম্ব, কালো ঢেউয়ের ফাঁকে ফাঁকে। রাতে জলের শব্দের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ডেকে উত্তরমুখো উড়ে যায় অসংখ্য বালিহাঁসের ঝাঁক সমস্ত দ্বীপটাকে এক-টানা কলকণ্ঠে অনুরণিত করে। দ্বীপের পূবদিকেই সাধারণত তারা সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগে আশ্রয় নিয়ে থাকে। বেনো জলে ডোবা বনভূমির ভেতর দিকটায় বালিহাঁস সগর্বে ডাকাডাকি করে। পানকৌড়ি, বুনোহাঁসেরা নিচুগলায় পর-স্পরের জবাব দেয় কলকণ্ঠে। একদিন গ্রিগর চুপচাপ নদীর পাড়ে এসে দ্যাখে দ্বীপের অদূরেই মস্ত একদল হাঁস। সূর্য তখনো ওঠেনি। বনের সীমা ছাড়িয়ে আকাশটা সকালের আলোয় উদ্ভাসিত। জলে আকাশের ছবি রাঙা টকটকে,

সূর্যোদয়ের দিকে মাথা-ফেরানো বড়ো হাঁসগুলোর রাজকীয় অঙ্গও রক্তিমাভ হয়ে উঠেছে। ডাঙায় পায়ের শব্দ পেয়ে সচকিত হয়ে তারা উড়ে গেল কলকণ্ঠে তূর্যনাদ করে—যখন বনের মাথায় উঠে যাচ্ছিল ওদের তুষারশুভ্র ডানার আশ্চর্য আভায় ধাঁধিয়ে গেল গ্রিগরের চোখ।

ফোমিন এবং তার সঙ্গীরা যে যার মতো সময় কাটাচ্ছে আপন মনে। স্তেরলাদ্‌নিকফ খাটিয়ে মানুষ, খোঁড়া পা-টা কোনোরকমে একটু আরামে রেখে সকাল থেকে সন্ধ্যে জামা-জুতো মেরামত করেছে। সারা রাত স্যাঁত-সেঁতে মাটিতে ঘুমিয়ে স্বাস্থ্যের উপকার হয়নি কাপারিনের, তাই পুরো দিনটা সে চামড়ার কোট মুড়ি দিয়ে রোদে শুয়ে কাটাল। ফোমিন আর চুমাকফ কাগজ কেটে তাস বানিয়ে তাই পেটাপেটি করছে একটানা। গ্রিগর দ্বীপটা ঘুরে ঘুরে ছাখে, নদীর পাড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আসনপিঁড়ি হয়ে বসে থাকে। পরস্পরের মধ্যে ওদের কথাবার্তা কম—যা বলবার তা অনেক আগেই বলা হয়ে গেছে। শুধু খাওয়ার সময় একসঙ্গে বসে, আর সন্ধ্যে হলে পথ চেয়ে থাকে কখন ফোমিনের ভাই আসবে। একঘেয়ে জীবন ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে। এর মধ্যে শুধু একদিন গ্রিগর দেখেছিল চুমাকফ আর স্তেরলাদ্‌নিকফকে হঠাৎ অকারণ হাল্‌কা খুশির মেজাজে কুস্তি করতে। এক জায়গায় অনেকক্ষণ পা দাপাদাপি করে, ঘোঁত ঘোঁত করে পরস্পরকে টিট্‌কিরি দিয়ে কেটে গেল। সাদা বালির মধ্যে ওদের গোড়ালি অবধি ডুবে গেছে। খোঁড়া স্তেরলাদ্‌নিকফ-এর গায়ের জোর বেশী হলেও চুমাকফ খুব চটপটে। একে অন্যের কোমর জড়িয়ে ধরে কাঁধ সামনে ঝুঁকিয়ে পরস্পরের পা লক্ষ্য করতে থাকে। অত্যন্ত জোর খাটাবার ফলে ওদের মুখগুলো কঠিন আর ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে, নিশ্বাস ভারি আর দ্রুততর হয়। গ্রিগর সোৎসাহে ছাখে ওদের লড়াই। একটা সুযোগ পেয়ে চুমাকফ হঠাৎ চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল আর প্রতিদ্বন্দ্বীকে টেনে নিয়ে হাঁটু মুড়িয়ে এক ধাক্কায় ছুঁড়ে দিল স্তেরলাদ্‌নিকফকে মাথার উপর দিয়ে। পরমুহূর্তেই সে ক্ষিপ্র আর নমনীয় পাহাড়ী বেড়ালের মতো লাফিয়ে চড়ে বসল স্তেরলাদ্‌নিকফের ওপরে, ওর কাঁধদুটো ঠুসে দিতে লাগল বালির মধ্যে। স্তেরলাদ্‌নিকফ তখন হাসছে, হাঁপাচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে: উঁহু···চোরামি হচ্ছে···মাথার ওপর দিয়ে ছুঁড়ে দেবার তো কথা ছিল না।

ফোমিন বললে—লড়িয়ে জোয়ান মোরগের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে এ-ওর ঘাড়ে। বেশ তো হল এখনকার মতো, এখন ক্ষান্তি দাও, নয়তো সত্যি সত্যি লড়াই শুরু হয়ে যাবে।

কিন্তু ওদের লড়াইয়ের ইচ্ছে আদৌ ছিল না। বন্ধুর মতো হাতে হাত মিলিয়ে ওরা বসে রইল মাটির ওপর। আর চুমাকফ মোটা অথচ মিষ্টি ভারি গলায় গান জুড়ে দিল। স্তেরলাদ্‌নিকফও সুর মেলাল সরু

চড়া গলায়। একসঙ্গে, অপ্রত্যাশিত রকম সুন্দর শোনাতে লাগল গানটা।

কিন্তু স্তেরলাদ্‌নিকফ আর সামলাতে পারল না নিজেকে। উঠে দাঁড়িয়ে আঙুল বাজিয়ে খোঁড়া পা-টা বালির মধ্যে ছুঁড়ে ছুঁড়ে নাচতে শুরু করে দিল সে। গান না বন্ধ করে চুমাকফ তাঁর তলোয়ারটা দিয়ে মাটিতে একটা ছোট গর্ত খুঁড়ে বললে :

—ওরে খোঁড়া শয়তান, একটু সবুর। তোর একটা পা আরেকটার চেয়ে ছোট, সমান ভূঁয়ে তো ভালো নাচতে পারবি না।···হয় তোকে ঢালু জায়গায় নাচতে হবে, নয়তো লম্বা পা'খানা গর্তে রেখে ঠুঁটোটা বাইরে রেখে নাচতে হবে। তোর ভালো পা এই গর্তে রাখ, তারপর নাচ, ছাখ কেমন সুন্দর হবে। নে, এবার শুরু কর্!

স্তেরলাদ্‌নিকফ ভুরু থেকে ঘাম মুছে বাধ্য ছেলের মতো ভালো পাখানা চুমাকফের খোঁড়া গর্তের মধ্যে রাখে। বলে—ঠিক বলেছিস্ রে। এখন বেশ সুবিধে হচ্ছে।

হাসির দমক সামলাতে সামলাতে চুমাকফ হাততালি দেয় আর খুব দ্রুত গাইতে শুরু করে। স্তেরলাদ্‌নিকফও পেশাদার নাচিয়ের মতো গম্ভীর মুখের ভাব করে চঞ্চল পায়ে নেচে চলে। মাঝে মাঝে আবার বসে পড়ে পা ছুঁড়তেও চেষ্টা করে।

দিনগুলো কেটে যায় একঘেয়ে ছন্দে। অন্ধকার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে ওরা ফোমিনের ভাইয়ের আসার অপেক্ষায় থাকে। পাঁচজনই নদীর ধারে জড়ো হয়ে নিচু গলায় কথাবার্তা বলে। ধূমপান করে আর জোব্বা-কোটের আড়ালে সিগারেটের জলন্ত দিকটা লুকিয়ে রাখে। আরো এক সপ্তাহ এ-দ্বীপে ওরা থাকবে ঠিক করেছে। তারপর এক রাতে নদী পার হয়ে দক্ষিণ তীরে উঠবে, ঘোড়া জোগাড় করে রওনা হবে দক্ষিণের দিকে। গুজব যা কানে আসে তাতে মনে হয় মাস্‌লাকের ব্রিগেড এখন দক্ষিণাঞ্চলেই কোথাও টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।

ফোমিন তার আত্মীয়দের ওপর ভার দিয়েছিল উপযুক্ত ঘোড়া জোগাড় করে আনার। সে এলাকায় রোজ যে-সব ঘটনা ঘটে তারও ফিরিস্তি দিতে বলেছিল সে। ওরা যে খবর আনল তা আশ্বাসজনকই বলতে হবে : ডনের বাঁ পাড়ে ফোমিনকেও খোঁজা হচ্ছে। লালফৌজদের লোকেরা রুবিয়েঝিনে হানা দিয়েছিল বটে তবে ফোমিনের বাড়িতে একবার তল্লাসী চালিয়েই আবার সঙ্গে-সঙ্গে সরে গেছে।

চুমাকফ একদিন প্রাতরাশ করতে বসে বললে—চলো এখান থেকে

তাড়াতাড়ি কেটে পড়ি! খামোখা এখানে পড়ে থেকে লাভটা কী? কালই চলে যাওয়া যাক্।

ফোমিন বললে—আগে ঘোড়াগুলোর পাত্তা করতে দাও। এত তাড়া কিসের? শীতকাল অবধি আরাম করে কাটিয়ে দিতে আমার একটুও আপত্তি ছিল না যদি খাওয়া-দাওয়াটা ওরা এর চেয়ে ভালো দিত। দ্যাখো না, কী চমৎকার চারধারটা! বেশ ভালো করে জিরিয়ে নিয়ে তারপর কোমর বেঁধে লাগা যাবে। আমাদের খুঁজে বের করুক, অত সহজে ধরা দিচ্ছি না। আমারই বোকামিতে দলটাকে গুঁড়ো করে দিল, জানি সে-কথা, লজ্জার ব্যাপার সন্দেহ নেই কিন্তু এই তো সবটুকু নয়। আবার লোকজন জোগাড় করব। ঘোড়ার পিঠে একবার চড়তে পারলেই কাছাকাছি গ্রামগুলোর ভেতর যাব। তারপর এক হপ্তার মধ্যে আধ কোম্পানি সেপাই জোগাড় হয়ে যাবে, হয়তো বা পুরো কোম্পানিই। অগুন্তি সেপাই পেয়ে যাব, দিব্যি দিয়ে বলছি!

—বাজে! উৎকট আস্ফালন!—বিরক্ত হয়ে বলে কাপারিন—কসাকবা আমাদেব ডুবিয়ে দিয়েছে। আমাদের নেতৃত্ব তারা মানেনি, মানবেও না। যা সত্যি তার মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস আমাদেব থাকা চাই, মিথ্যা স্তোক দিয়ে নিজেদের ভোলাবার দরকার নেই।

—কেন তারা মানবে না আমাদের?

—প্রথমেই যখন মানেনি তখন ভবিষ্যতেও মানবে না।

—দেখা যাবে!—চ্যালেঞ্জের সুরে বলে ফোমিন—আমি হাতিয়াব ছাড়ছি না।

কাপারিন হতাশভাবে বলে—এ-সব ছেঁদো কথা।

ফোমিন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। বলে—তোমার মাথা! কেন এমন আতঙ্ক ছড়াচ্ছ এখানে? ওই নাকে কান্না শুনে-শুনে আমার পিত্তি চটে গেল! তাহলে আমরা গোড়াতেই বা কেন বিদ্রোহ করেছিলাম? যদি অতই ভয়ে পিট্‌পিট্‌, তবে দলে ভিড়েছিলে কেন? তুমিই তো আমাকে প্রথম উস্‌কেছিলে বিদ্রোহ করতে, কিন্তু এখন তুমি সট্‌কে পড়তে চাচ্ছ। তোমার এবিষয়ে কিছু বলার নেই।

—তোমাকে আমার কিছুই বলার নেই। তুমি গোল্লায় যেতে পারো, গাধা!—কাপারিন উত্তেজিতভাবে কথাটা বলেই চলে গেল ভেড়ার চামড়ায় মুড়িশুড়ি দিয়ে কানের ওপর কলার টেনে তুলে।

—এই উঁচু ঘরের মানুষগুলোর চামড়াই পাতলা! সামান্য কিছু ঘটলেই আর সইতে পারে না, ব্যস্ সব শেষ!—দীর্ঘশ্বাস ফেলে মন্তব্য করে ফোমিন।

খানিকক্ষণ নীরবে বসে থেকে ওরা বানের জলের একটানা প্রবল গর্জন শোনে। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল একজোড়া চখা আর

একটা চখী কর্কশ কোলাহল করে। একদল শুকপাখি সোৎসাহে কলরব করে নেমে আসছিল ফাঁকা বনভূমিটার ওপর কিন্তু মানুষ দেখে আবার ওদের ঝাঁকটা ওপরে উঠে গেল কালো চুলের বেণীর মতো দোলা খেয়ে।

খানিক বাদে ফিরে এল কাপারিন।

ফোমিনের দিকে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করে সে বললে—আজ রাতেই আমি গ্রামে যেতে চাই।

—কেন?

—আচ্ছা প্রশ্ন! দেখতে পাচ্ছ না কী দারুণ সর্দি লেগেছে আমার, দুপায়ে দাঁড়াতে অবধি পারছি না।

—বেশ তো, তা কী হয়েছে? গ্রামে গিয়ে সর্দিটা ঝেড়ে আসবে নাকি ভেবেছ?—ফোমিন একটুও উত্তেজিত না হয়ে প্রশ্ন করে।

—অন্তত কটা রাত আমাকে একটু গরমের মধ্যে থাকতে হবে।

—কোথাও যেতে হবে না তোমাকে।—দৃঢ় কণ্ঠে ফোমিন বলে।

—কী, এখানে বসে পচে-পচে শেষ হব?

—যেমন অভিরুচি।

—কিন্তু কেন যেতে পারব না? রাত্রিবে ঠাণ্ডায় বাইরে ঘুমিয়ে আমি যে একেবারে খতম হয়ে যাব।

—আর যদি গাঁয়ের ভেতর গিয়ে ধরা পড়ে যাও? সে-কথা ভেবে দেখেছ? তাহলে আমাদের সবাইকে শেষ করে দেবে। তোমাকে আমি চিনি না ভেবেছ? প্রথম জেরাতেই তুমি আমাদের ধরিয়ে দেবে। এমনকি তার আগেই, ভিয়েশেন্স্কাব রাস্তাতেই তুমি খবর দিয়ে দেবে ওদের।

চুমাকফ সশব্দে হেসে ওঠে। মাথা নেড়ে সায় দেয়। ফোমিনের সঙ্গে ও সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু কাপারিন একগুঁয়েব মতো বলে:

—আমাকে যেতেই হবে। তোমার হাজারটা যুক্তিও আমাকে টলাতে পারবে না।

—কিন্তু আমি তোমাকে বলেছি স্থির হয়ে বসতে। নড়চড়া কোরো না।

—কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ না, ইয়াকফ ইয়েফিমাভিচ। এভাবে জানোয়ারের মতো বেঁচে থাকতে আমি পারব না। আমার নিউমোনিয়া হয়েছে, সম্ভবত ফুসফুস ফুলে গেছে।

—সব সেরে যাবে। রোদ্দুরে পড়ে থাকো, ভালো হয়ে যাবে।

কাপারিন তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললে—আমি আজ চলে যাবই, মোট কথা। আমাকে আটকাবার কোনো অধিকাব তোমার নেই। যা ঘটে ঘটুক। আমি যাবই।

ফোমিন তার দিকে একদৃষ্টে তাকায়। সন্দিগ্ধভাবে কোঁচকায় ভুরু দুটো। তারপর চুমাকফের দিকে চোখ টিপে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ায়।

—মনে হচ্ছে কাপারিন সত্যিই তুমি ব্যারামে পড়েছ।···গায়ে বুঝি খুব জ্বর···দেখি কপালটা গরম কিনা!—কাপারিনের দিকে হাত বাড়িয়ে ফোমিন এগিয়ে এল কয়েক পা।

ফোমিনের মুখে স্পষ্টই একটা অপ্রীতির ভাব লক্ষ্য করেছিল কাপারিন। পেছিয়ে গিয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললে:

—সরে যাও।

—অমন চিৎকার কোরো না। কেন চেঁচাচ্ছ? আমি শুধু দেখতে যাচ্ছিলাম। মতলবটা কী তোমার? কাপারিনের দিকে এগিয়ে এসে তার টুঁটি চেপে ধরলে ফোমিন।

—ধরা দেবার তালে রয়েছো, না শয়তান? বিড়বিড় করে বলতে বলতে সমস্ত শরীরের জোর খাটিয়ে কাপারিনকে ধরাশায়ী করতে চেষ্টা করলে সে।

অতি কষ্টে দুজনকে ছাড়িয়ে দিতে পেরেছিল গ্রিগর তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে।

* * *

খাওয়াদাওয়ার পর গ্রিগর একটা ঝোপের ওপর ভিজে কাপড় মেলে দিচ্ছে এমন সময় কাপারিন এসে হাজির।

—তোমার সঙ্গে আড়ালে একটু কথা বলতে চাই।··এসো বসা যাক।

একটা পপ্‌লার গাছের পচা গুঁড়ি পড়েছিল, সেটার ওপরেই বসলে দুজনে।

খুক্ খুক্ করে কেশে কাপারিন বললে:

—ও গাধাটার চালচলন দেখে কী মনে হয় তোমার? ঠিক সময় বাধা দিয়েছিলে বলে আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। কাজটা সত্যিকারের মহৎ, একজন অফিসারের যেমনটি করা উচিত। কিন্তু এ যে বড়ো ভয়ানক হল ভাই! আমি আর সইতে পারছি না। ঠিক জানোয়ারের মতো জীবন কাটাচ্ছি আমরা।···কতকাল গরম খাবার খাইনে বলো তো? তার ওপর এই ভিজে মাটিতে শোয়া।···ঠাণ্ডা লেগে গেছে আমার, পাশের দিকে ভয়ানক যন্ত্রণা। হয়তো ফুসফুসের প্রদাহ হয়েছে। এখন একটু আগুনের পাশে বসা, গরম ঘরে ঘুমোনো আর কাপড়টা বদলানো, এই করতে পারলে বেঁচে যাই। পরিষ্কার কাচা কাপড় আর বিছানার চাদরের স্বপ্ন দেখি। ··না, না, এভাবে আমি পারছি না!

গ্রিগর হেসে প্রশ্ন করলে:

—সব রকম আরাম করে লড়তে আসবেন এই কি আপনি ভেবেছিলেন?

—কিন্তু বলো, এও কী একটা যুদ্ধ হচ্ছে?—সোৎসাহে জবাব দেয় কাপারিন—এ যুদ্ধ নয়, দিবারাত্র দৌড়ানো আর সোভিয়েত মজুরদের

আলাদা পেয়ে খুন করা। তারপর আবার পালানো। হ্যাঁ, যুদ্ধ বলা যেত যদি সাধারণ লোকে সমর্থন করত, যদি সত্যিই বিদ্রোহ হত। কিন্তু একে লড়াই বলা…নাঃ এ লড়াই নয় আদপেই!

—আমাদের করার কিছুই নেই। আমরা ধরা দিই তা আপনি নিশ্চয়ই চাইবেন না, কি বলেন?

—সে ঠিক কথা, আমরা তাহলে করব কী?

গ্রিগর ঘাড় নাড়ে। মাঝে মাঝে দ্বীপের এখানে ওখানে শুয়ে থাকলে যে চিন্তাটা ওর মাথায় উদয় হত এখন সেটাই তার কথার মধ্যে প্রকাশ পেল: আরামের জেলখানার চেয়ে দুর্ভাগ্যের স্বাধীনতাও ভাল। জানেন তো কথায় বলে: শেকল শক্ত হলে শয়তানই সবচেয়ে খুশী হয়!

কাপ্লারিন বালির ওপর গাছের ডাল দিয়ে আঁকিবুকি কাটছিল। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে সে বললে:

—ধরা দিতে হবে এমন কোনো কথা নেই, তবে বলশেভিকদের সঙ্গে লড়বার নতুন কায়দা বের করতে হবে। এই হতচ্ছাড়ার কাছ থেকে আমাদের আলাদা হতে হবেই। তুমি তো বেশ বুদ্ধিমান মানুষ · ।

গ্রিগর হেসে বলে: ও কথা কেন ভাবেন? আমি তো উচ্চারণই করতে পারি না কথাটা।

—তুমি অফিসার।

—কিন্তু সে তো দৈবক্রমে!

—না ঠাট্টা নয়। তুমি সত্যিই অফিসার, অফিসারদের সমাজে তুমি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছ। সত্যিকারের মানুষদের তুমি দেখেছ। তুমি ফোমিনের মতো সোভিয়েত আমলের আঙুল-ফুলে কলাগাছ নও। তুমি নিশ্চয় বুঝবে এখানে থাকা আমাদের কত অর্থহীন। আত্মহত্যার সামিল। বনের ভেতর লড়াইয়ে আমাদের ছাতু হয়ে যাওয়ার মূলে রয়েছে ও। ফোমিনের ভাগ্যের সঙ্গে আমাদের গাঁটছড়া বাঁধ স বারে বারে একই ব্যাপার ঘটতে থাকবে। স্রেফ গোমূর্খ, একটা হল্লাব · গাধাকে নিয়ে পড়া গেছে যাহোক! ওর সঙ্গে থাকলে আমাদের খুঁজে পাওয়া যাবে না।

গ্রিগর প্রশ্ন করে—তাহলে আত্মসমর্পণ না করে আপনি ফোমিনের সঙ্গ ছেড়ে যেতে বলছেন? কোথায় যাব আমরা? মাস্‌লাকে?

—না। সে হল আরেক ভাগ্যান্বেষী, তবে একটু বড দরের এই যা তফাত। আমার এখন একেবারে অন্যরকম ধারণা. আমরা মাস্‌লাকের কাছে যাব না· ·

—তবে কোথায় যাব?

—ভিয়েশেন্‌স্কায়!

গ্রিগর বিরক্তিভরে কাঁধ ঝাঁকায়।

—ওতে তো ভালোর চেয়ে মন্দই হবে বেশী। আমার পছন্দ নয় এ প্রস্তাব।

কাপারিন তীব্র দৃষ্টিতে তাকায় গ্রিগরের দিকে।

—তুমি বুঝতে পারনি মেলেখফ। তোমায় বিশ্বাস করতে পারি?

—সম্পূর্ণ।

—সত্যিকারের একজন অফিসারের মতো কথা দিতে পারো?

—সত্যিকার একজন কসাকের মতো কথা দিতে পারি।

ফোমিন আর চুমাকফ বেশ খানিকটা দূরেই ছিল, ওর কথাবার্তা তাদের কানে যাবার কথা নয়, তবু কাপারিন তাদের দিকে তাকিয়ে গলার স্বর নামিয়ে বললে:

—ফোমিন ও তার দলবলের সঙ্গে তোমার যা সম্পর্ক তা তো আমার জানাই আছে। ওদের মধ্যে তুমি যেমন অপরিচিত আগন্তুক, আমিও তেমনি। সোভিয়েত রাজত্বের বিরুদ্ধে তুমি কী কারণে লড়ছ তা জানবার আমার আগ্রহ নেই। যদি সঠিক বুঝতে পেরে থাকি, তোমার অতীত ইতিহাস আর গ্রেপ্তার হয়ে যাবার ভয়, এই দুটোই বোধহয় সেই কারণ, তাই না?

—এইমাত্র আপনি বললেন কারণ জানার আগ্রহ আপনার নেই?

—ও, হ্যাঁ, কথার কথা বললুম আর কি। আমার সম্বন্ধে এখন দু একটা কথা বলি। আগে আমি অফিসার ছিলাম, সমাজতন্ত্রী বিপ্লবী দলের সভ্যও ছিলাম। কিন্তু পরে আমার রাজনৈতিক মতামত সম্পূর্ণ পাল্‌টে ফেলেছি।...রাশিয়াকে বাঁচাতে পারে কেবল রাজতন্ত্র। একমাত্র রাজতন্ত্র! দেশের সামনে এই পথ নিয়তিই দেখিয়ে দিয়েছে। সোভিয়েত সরকারের প্রতীক হল কাস্তে-হাতুড়ি, মানে 'সের্প্‌' আর 'মলত্‌' তাই না?—একটা কাঠি দিয়ে বালুর ওপর লিখল কাপারিন 'সের্প্‌', আর 'মলত্‌' কথা দুটো। তারপরে জ্বল্‌জ্বলে চোখে তাকাল গ্রিগরের মুখের দিকে—এবার উল্টো দিক থেকে পড়ো তো কথা দুটো। কী পাচ্ছ? বুঝতে পারছ? 'প্রেস্‌তলম্‌', মানে 'মসনদের মারফত', একমাত্র রাজসিংহাসনের মারফতই বিপ্লব আর বলশেভিক রাজত্ব খতম হবে। জানো, এই ব্যাপারটা যখন আমি আবিষ্কার করি তখন এক অলৌকিক রহস্যের রোমাঞ্চ জেগেছিল। আমি উত্তেজনায় কেঁপে উঠেছিলাম, কেন জানো? বলতে পারো সেটা ঈশ্বরেরই অঙ্গুলিনির্দেশ, আমাদের সমস্ত সঙ্কটের অবসান হবে, তারই নিশানা।

কাপারিন চুপ করে হাঁপাতে লাগল। ওর তীব্র চাউনির মধ্যে একটা পাগলের দৃষ্টি ফুটে উঠেছিল যেন। কিন্তু গ্রিগর তো কাঁপল না একটুও, কাপারিনের রহস্যানুভূতির কথা শুনেও কোনো অলৌকিক রোমাঞ্চ জাগল না

ওর দেহে। সংসার সম্পর্কে ওর দৃষ্টিভঙ্গি সাদামাটা, ধীরস্থির। তাই জবাবে সে বললে :

—ওটা কোনো নিশানাই নয়! জার্মান যুদ্ধের সময়ে আপনি লড়াইয়ে ছিলেন?

প্রশ্নের ধরনে হতভম্ব হয়ে কাপারিন প্রথমটায় জবাবই দিতে পারল না।

—না তো, কিন্তু ও-কথা কেন জিজ্ঞেস করছ? না, আমি ঠিক রণাঙ্গনে ছিলাম না।

—তাহলে যুদ্ধের সময় আপনি ছিলেন কোথায়? পেছন দিকে?

—হ্যাঁ।

—সব সময়?

—হ্যাঁ, মানে সব সময় নয়, বেশির ভাগ সময়, কিন্তু ও-কথা কেন?

—দেখুন, আমি লড়াইয়ের ময়দানে আছি সেই ১৯১৪ সাল থেকে আজ অবধি। মাঝে দুয়েকবার হয়তো বাদ গেছে। তা আপনার ওই যে ঈশ্বর অঙ্গুলিনির্দেশে বলছেন···ঈশ্বরের আঙুল আসবে কোথ্‌থেকে যখন ঈশ্বর নেই? আমি ওসব ধাপ্পায় আর বিশ্বাস করিনে। সে ১৯১৫ সালে যখন প্রথম লড়াইয়ের রূপ দেখলুম তখন থেকেই আমি ভেবে নিয়েছি ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। মোটেই নেই! থাকলেও তাঁর কোনো অধিকার নেই মানুষ যেসব কীর্তিকাণ্ড করে তাতে সায় দেবার! আমরা, লড়াইয়ের সামনের-সারির সেপাইরা, ঈশ্বরকে বাতিল করেছি, তাঁকে আমরা ঠেলে দিয়েছি বুড়ো আর মেয়েমানুষদের দলে। তারা ওতেই শান্তি পাক্‌। ওসব আঙুল টাঙুল নেই, রাজতন্ত্রও হতে পারে না। লোকে চিরদিনের মতো কবর দিয়েছে ওসব। আর এই যে আপনি অক্ষর ওলট-পালট করে ভেল্‌কি দেখাচ্ছেন···, কিছু মনে করবেন না, এও নেহাৎ ছেলেমানুষি কৌশল, তার বেশী কিছু নয়। আপনি যে কেন এসব আমায় শোনাচ্ছেন বুঝতে পারছি না। আরো সহজ সরল করে বলুন। যদিও আমি অফিসার হয়েছি, জীবনে কখনো সৈনিক বিদ্যালয়ে পড়িনি, তেমন লেখাপড়াও হয়নি। আমি যদি আরো শিক্ষিত হতাম তাহলে বোধহয় আপনার সঙ্গে এই দ্বীপে বসে থাকতাম না ভূতের মতো।—কথার শেষ দিকটা ওর একটু ক্ষুব্ধ শোনাচ্ছিল।

কাপারিন তাড়াতাড়ি বললে—তাতে কী হয়েছে! ঈশ্বরে বিশ্বাস করো বা না করো তাতে কী আসে যায়। সে হল তোমার নিজস্ব বিশ্বাস আর বিবেকের কথা। তুমি রাজতন্ত্রী কি সংবিধানসম্মত আইনসভার সমর্থক, কিংবা স্বায়ত্তশাসনের পক্ষপাতী সাধারণ কসাক, যা খুশী হও ক্ষতি নেই। যেটা কাজের কথা সেটা হল আমরা সোভিয়েত রাজত্বের বিরুদ্ধে সবাই এক কাঠ্‌ঠা। সে-বিষয়ে তুমি একমত?

—বলে যান।

—আমরা ভরসা করেছিলাম যে কসাকরা সবাই একসঙ্গে বিদ্রোহ করবে, তাই না? সে আশা দুরাশায় পরিণত হয়েছে। এখন আমাদের এ-অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতেই হবে। পরে অবশ্য বলশেভিকদের সঙ্গে লড়া যাবে, তবে ফোমিনের নেতৃত্বে কোনোমতেই নয়। এখন দরকারী কাজ হল চাচা আপনি বাঁচা, তাই তো তোমার সঙ্গে একটা চুক্তি করতে চাইছিলাম।

—কী রকম চুক্তি? কার বিরুদ্ধে।

—ফোমিনের বিরুদ্ধে।

—বুঝতে পারছি না।

—খুব সহজ। তোমাকে আমার সঙ্গী হতে বলছি।—কাপারিন আবার উত্তেজিত হয়ে জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলতে থাকে—তুমি আর আমি মিলে এই তিনটিকে মেরে ফেলে ভিয়েশেনস্কায় চলে যাব, বুঝেছ? এতেই বাঁচব আমরা। সোভিয়েত সরকারের শাস্তির হাত থেকে রেহাই পাব এই সৎকাজের ফলে। আমরা বেঁচে থাকব। বুঝলে? আমরা বাঁচব। নিজেদের জান্ বাঁচাব। সুযোগ পেলে বলশেভিকদের বিরুদ্ধে আবার লড়া যাবে সে-কথা না বললেও চলে। কিন্তু সে হবে রীতিমতো আটঘাট বেঁধে। এই হতভাগা ফোমিনের মতো খেয়ালখুশির অভিযান নয়। কেমন কিনা বল? মনে রেখো আমাদের বর্তমান বেপরোয়া অবস্থা থেকে বাঁচবার এইটেই একমাত্র পন্থা, এবং একটা চমৎকার পন্থাও বটে।

—কিন্তু কীভাবে করা যাবে কাজটা? প্রশ্ন করে গ্রিগর। মনে মনে ও রাগে জ্বলছিল। কিন্তু অতি কষ্টে মনের ভাবটা দমন করে রেখেছিল সে।

সে সব আমি আগেই ভেবে রেখেছি: আজ রাতের অন্ধকারে ঠাণ্ডা ইস্পাতে কাজ হাসিল হবে। তারপরের রাতে যে কসাকটা আমাদের খাবার আনে সে এলে আমরা ডন পেরিয়ে ওপারে যাব, ব্যস। একেবারে জলের মতো সোজা, কোনো বিশেষ চালাকির দরকার নেই?

গ্রিগর যথাসম্ভব ভদ্রতার ভান করে হেসে বললে·

—খুব ভালো ফন্দিই বের করেছেন যাহোক্। কিন্তু বলুন তো কাপারিন সাহেব, আজ সকালে যখন আপনি গাঁয়ে যেতে চাইছিলেন আগুন পোয়াবার জন্য···তখন কি ভিয়েশেনস্কাতেই যাবার ইচ্ছা ছিল না আপনার? ফোমিন ঠিকই ধরেছিল বোধহয়?

কাপারিন গ্রিগরের হাসিমাখা মুখটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে নিজেও হাসল, তবে একটু ম্রিয়মাণ আর অপ্রতিভ ওর হাসিটা।

—খোলাখুলিই বলি তোমাকে, হ্যাঁ ওই মতলবই ছিল আমার। বুঝলে তো, যখন নিজের ঘাড় বাঁচাবার প্রশ্ন আসে তখন পন্থার ইতর-বিশেষ কেউ যাচাই করে না।

—তাহলে আপনি আমাদের ধরিয়ে দিতেন ?

—হ্যাঁ, স্বীকার করে কাপারিন সরাসরিই—তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে তোমাকে ঝামেলায় না পড়তে হয় সেই চেষ্টা করতাম, মানে, দ্বীপের মধ্যে তোমাকে ধরলে।

—কিন্তু আমাদের সবাইকে খুন করে ফেললেন না কেন? রাতের বেলায় তো খুব সহজেই হয়ে যেত কাজটা!

—না, ঝুঁকি একটু থাকতই। একজনকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলে বাদবাকিরা……।

—হাতিয়ার ছেড়ে দিন!—চাপা গলায় বলে উঠল গ্রিগর, পিস্তলটা চট্ করে বের করে নিয়েছে সে—হাতিয়ার ছাড়ুন, নয়তো এখানেই গুলি করে মারব। আমি উঠে দাঁড়াচ্ছি, আপনাকে আড়াল করে দাঁড়াব যাতে কোমিন না দেখতে পায়, তারপর আপনি পিস্তলটা আমার পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিন। বুঝতে পেরেছেন? গুলি করবার চেষ্টাও করবেন না! করেছেন কি মরেছেন।

কাপারিন মড়ার মতো ফ্যাকাশে। চুপ করে বসে রয়েছে। রক্তশূন্য ঠোঁট দুটো কোনোরকমে নেড়ে ফিস্ ফিস্ করে বললে : মেরো না আমাকে।

–তা মারব না। কিন্তু আপনার অস্ত্র আমি চাই।

—তুমি আমায় ধরিয়ে দিবে।

কাপারিনের লোমশ গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ে। গ্রিগর ঘৃণা আর অনুকম্পায় ভুরু কোঁচকায়, গলার স্বর উঁচিয়ে বলে :

—পিস্তল ফেলে দাও। ধরিয়ে দেব না, তবে দেয়াই উচিত ছিল। তুমি একটা কুকুর ছাড়া আর কিছু নও। একটা নোংরা কুত্তা!

কাপারিন গ্রিগরের পায়ের কাছে ছুঁড়ে দেয় পিস্তলটা।

—ব্রাউনিংটা কী হল? সেটাও বের করে দাও। তোমার বুক-পকেটেই রয়েছে।

কাপারিন চকচকে নিকেল-করা ব্রাউনিং পিস্তলটা বের করে ছুঁড়ে দিল। দুহাতে মুখ ঢাকল সে। কান্না চাপতে গিয়ে ফুলে ফুলে উঠছিল আর কাঁপছিল কাপারিন।

—চুপ করো, বেল্লিক কাঁহাকা!—কঠিন স্বরে বললে গ্রিগর। কাপারিনকে একটা চড় বসিয়ে দেবার ইচ্ছাটা অতি কষ্টে সামলে রেখেছিল সে।

—তুমি আমায় ধরিয়ে দেবে। আমি এবার গেলুম।……

—বলেছি তো ধরিয়ে দেব না। কিন্তু এই দ্বীপ ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তুমি বরং সট্‌কে পড়ো। তোমার মতো লোককে কেউ চায় না। নিজের ঘাঁটি নিজেই খুঁজে নিও।

কাপারিন মুখ থেকে হাত সরায়। ভিজে ময়লাটে গালতুটো, ফোলা-ফোলা চোখ আর চোয়ালের কাঁপুনি, অতি বীভৎস লাগছিল দেখতে।

—তা হলে কেন···তাহলে কেন তুমি আমার হাতিয়ার কেড়ে নিলে?
—তোত্‌লাতে থাকে কাপারিন।

অনিচ্ছাভরে জবাব দেয় গ্রিগর :

—যাতে পেছন থেকে আমায় গুলি না করে বসো। তোমার মতো লোক যা-খুশী তাই করতে পার··শিক্ষিত মানুষ, হুঁঃ। বলছিলে আঙুলের নিশানা, জার আর ঈশ্বরের কথা ···গোখ্‌রো সাপ তুমি একটা!

কাপারিনের দিকে দ্বিতীয়বার না তাকিয়ে, মুখের ভেতর বারে-বারে জমে-ওঠা থুতুটা ফেলে দিয়ে গ্রিগর ধীরে ধীরে দলের সংকলের কাছে চলে আসে।

স্তেরলাদ্‌নিকফ স্থতোর আগায় মোম মাখিয়ে তার ছেঁড়া জিনটা সেলাই করছিল আর হাল্‌কা শিস্ দিচ্ছিল। ফোমিন আর চুমাকফ একটা কম্বল বিছিয়ে যথারীতি তাস পেটাচ্ছে।

ফোমিন চট্ করে গ্রিগরের দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে—কী বলছিল ও তোমাকে? কীসের কথা হচ্ছিল?

—জীবনের সম্পর্কে আক্ষেপ করছিল।·· বলছিল যেন

কাপারিনের মুখোস খুলে দেবে না প্রতিজ্ঞা করেছিল গ্রিগর, প্রতিজ্ঞা সে রেখেছে। কিন্তু সে-রাতে সে চুপিসারে কাপারিনের রাইফেলের বল্টুটা সরিয়ে লুকিয়ে রাখল। ঘুমোতে যাবার সময় ভাবছিল—রাতে আবার কী কয়বার চেষ্টা করবে শয়তানই জানে।

* * * *

পরদিন সকালে ফোমিনের ডাকে ঘুম ভাঙল গ্রিগরের। ফোমিন ওর ওপর ঝুঁকে পড়ে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলে :

—কাপারিনের হাতিয়ারগুলো তুমি নিয়ে রেখেছিলে?

—কী? কোন্ হাতিয়ার?—গ্রিগর কনুইয়ে ভর দিয়ে কাঁধ সোজা করবার চেষ্টা করে। ভোরের শিশিরে ওর কোট, ফার টুপি, বুট সব ভিজে গিয়েছিল। ঠাণ্ডায় শরীর হিম।

—ওর হাতিয়ারগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি না। তুমি নিয়েছ নাকি? মেলেখফ, চোখ খোলো!

—অ্যাঁ? হ্যাঁ, আমিই নিয়েছি। কিন্তু ব্যাপার কী?

জবাব না দিয়ে ফোমিন চলে গেল। গ্রিগর উঠে জোব্বাকোট ঝাড়ে। খানিক দূরে চুমাকফ প্রাতরাশের জোগাড় করছিল। ওদের যথাসম্বল একটা থালা, সেটাই সাফ করলে সে। তারপর বুকের ওপর রুটি রেখে টুকরো করলে

সমানভাগে কেটে। জগ থেকে থালায় দুধ ঢেলে একখণ্ড শক্ত সুজির পায়েসের দলা ভাঙলে। গ্রিগরের দিকে চেয়ে বললে :

—আজ অনেক বেলা অবধি ঘুমুলে মেলেখফ! সূর্য কোথায় উঠেছে দেখেছ?

—মনে যার গলদ নেই সে ভালো ঘুমুবে না কেন।—স্তেরলাদ্‌নিকফ কাঠের চামচেগুলো ধুয়ে কোটের কিনারায় মুছতে মুছতে বললে—কিন্তু কাপারিন সারারাতে একটি বারও চোখের পাতা বোজেনি, খালি এ-পাশ ও-পাশ ফিরেছে……।

গ্রিগরের দিকে চেয়ে ফোমিন হাসে।

চুমাকফ প্রস্তাব করে—এসো হে ডাকতের দল, বসে খাওয়া যাক্ এবার।—আর কারুর জন্য অপেক্ষা না করে চুমাকফ চাম্‌চে ডোবায় দুধে। রুটির টুকরোয় বেশ একটা বড়ো কামড় বসায়। গ্রিগর নিজের চাম্‌চেটা তুলে নিয়ে আর সকলের দিকে কড়া নজরে চেয়ে প্রশ্ন করে :

—কাপারিন কোথায়?

ফোমিন আর স্তেরলাদ্‌নিকফ চুপচাপ খেয়েই চলে। চুমাকফ এক দৃষ্টে তাকায় গ্রিগরের দিকে কিন্তু সেও কোনো কথা বলে না।

—কোথায় গেছে কাপারিন? ফের প্রশ্ন করে গ্রিগর, কিন্তু রাত্রে কিছু ঘটে গেছে এমনি ধরনের একটা দুঃখজনক সন্দেহ ওর মনে জেগেছিল।

হাসিমুখেই জবাব দিলে চুমাকফ—কাপারিন এখন অনেক দূরে। রস্তভের দিকে ভেসে চলেছে। বোধহয় উস্তখপেরস্কের কাছে কোথাও খাবি খাচ্ছে। ওই তো দ্যাখো না ওর ভেড়ার চামড়ার কোট ঝুলছে…।

কাপারিনের ভেড়ার চামড়ার কোটের দিকে চট্ করে তাকিয়ে গ্রিগর বললে—সত্যিই তোমরা ওকে মেরে ফেলেছ?

প্রশ্ন করার কোনো অর্থ ছিল না। এর মধ্যেই সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেছে, তবুও কোনো কারণে ও জিজ্ঞেস করল কথাটা। প্রথমে কেউ জবাব দেয়নি। ও আবার জিজ্ঞেস করলে।

চুমাকফ বললে—হ্যাঁ, তা মেরেছি বটে। —ধূসর, মেয়েলি সুন্দর চোখের পাতা দুটো বুজে আবার বললে—আমিই মেরে ফেলেছি তাকে। আজকাল আমার ওই কাজ, মানুষ খুন করা…।

গ্রিগর ওকে খুঁটিয়ে দ্যাখে। চুমাকফের পরিষ্কার-কামানো লাল টকটকে মুখখানা শান্ত, একটু যেন প্রফুল্লও। রোদপোড়া গালে কটা জুলপির সোনালি কিনারা আরো যেন সোনালি দেখায়, ভুরুর রেখা আর চিরুনি-চালানো চিকন চুল মনে হয় আরো কালো। চেহারাটা সত্যিই সুন্দর আর সুবিনীত ফোমিনের দলের এই অবৈতনিক জল্লাদটির। তেরপলের ওপর চামচ রেখে হাতের উল্টো দিক দিয়ে গোঁপ মুছে সে বললে :

—মেলেখফ, তোমার কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত ফোমিনকে। তোমার জান বাঁচিয়েছে ও-ই, নয়তো এতক্ষণে কাপারিনের সঙ্গে তুমিও ডনের জলে ভেসে যেতে···।

—কেন?

চুমাকফ ধীরে ধীরে টেনে টেনে বলে:

—কাপারিন যে আত্মসমর্পণ করতে চেয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। তোমার সঙ্গে কাল অনেকক্ষণ কথাবার্তা চালিয়েছে। ফোমিন, আমরা সবাই তো ভেবেছিলাম পাপ করার আগেই ওকে নিকেশ করব। সব কথা বলব একে? ফোমিনের দিকে সপ্রশ্ন চোখে তাকাল চুমাকফ।

ফোমিন সায় দেয়। চুমাকফ ভুট্টার আভাঙা বিচিগুলো চিবোতে চিবোতে গল্প চালিয়ে যায়:

—কাল সন্ধ্যায় ওক কাঠের একটা মুগুর তৈরি করেই রেখেছিলাম। ইয়াকফ ইফোমিচকে বললুম: কাপারিন আর মেলেখফ দুজনেরই বন্দোবস্ত করে রাখব রাতে। কিন্তু ও বললে, না, কাপারিনকে শেষ করে দাও, কিন্তু মেলেখফকে ছুঁয়ো না। তাতেই রাজী হলাম। কাপারিন যতক্ষণ না ঘুমোয় নজর রাখলাম, শুনলুম তুমিও নাক ডাকাচ্ছ। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে মুগুরটা সোজা ওর মাথার ওপর বসিয়ে দিলাম। আমাদের কাপ্তেন সায়েব একবারটি পা-ও ছুঁড়লেন না। বেশ চমৎকার গা এলিয়ে দিয়ে পটল তুললেন। আমরা নিঃশব্দে তল্লাসী চালিযে তাকে হাত-পা ধরে নদীর পাড়ে টেনে নিয়ে গেলুম। জামা, জুতো, ভেড়ার-চামড়ার কোট খুলে জলে ছুঁড়ে দিলাম। কিন্তু তুমি তখনো ঘোর ঘুমে, এসবের কিছুই টের পাওনি। মেলেখফ, কাল রাতে তোমার শিয়রে শমনঃএসে দাঁড়িয়েছিল। ইয়াকফ ইয়েফিমিচ্ যদিও বলেছিল তোমাকে না ছুঁতে, আমি ভেবেছিলাম: কাল ওরা দুজনে কীসের এত কথা বলছিল? পাঁচজনের মধ্যে দুজন যখন আলাদা বসে গোপন আলোচনা করে সেটা কাজের কথা নয়। একবার চুপিচুপি তোমার কাছে গিয়ে মাথার ওপর মুগুর বসিয়ে দেব বলে তৈরিও হলাম, পরে আবার ভাবলুম: মুগুর দিয়ে যদি মারি, তবে তো যা জোয়ান মদ্দ তুমি! একবারে মোক্ষম ঘা না দিতে পারলে হয়তো-বা লাফিয়ে উঠে বেধড়ক চালাবে, তখন? যাক, ফোমিন নিজেই পরে এগিয়ে এসে থামাল। গুঁড়ি মেরে এগিয়ে এসে কানে-কানে বললে: ওকে ছুঁয়ো না, ও আমাদেরই দলের। ওকে বিশ্বাস করা চলে। আমাদের কথাবার্তা হল। কিন্তু কাপারিনের পিস্তল-টিস্তল যে কোথায় বেপাত্তা হল বুঝতে পারলাম না। তাই তোমাকে রেহাই দিলুম। কিন্তু তুমি ঘুমিয়েছিলে খুব। মাথার ওপর দিয়ে কী হয়ে যাচ্ছে তার কোনো ধারণাই তোমার ছিল না।

—আমাকে নেহাত অকারণেই খুন করতে গিয়েছিলে বোকার মতো! কাপারিনের সঙ্গে আমি কোনো ষড়যন্ত্রই করিনি।

—কিন্তু তোমার কাছে ওর অস্ত্র এল কেমন করে?

গ্রিগর হাসে।

—কাল ওর পিস্তল কেড়ে নিয়েছিলাম। সন্ধ্যাব সময় ওর রাইফেলের বল্টু খুলে জিন-কাপড়ের তলায় লুকিয়ে রেখেছিলাম।—কাপারিনের সঙ্গে ওর কথাবার্তা আর তার প্রস্তাবের কথা এবার খুলে বললে গ্রিগর।

ফোমিন একটু অসন্তুষ্ট হয়ে বললে:

—কিন্তু কাল এসব কথা বলোনি কেন?

গ্রিগর সরাসরি স্বীকার করে—লোকটার জন্য আমার করুণা হয়েছিল, ছিঁচকাঁদুনে শয়তানটা!

চুমাকফ এবার সত্যিই অবাক হয়ে বলে ওঠে—আঃ মেলেখফ! কাপারিনের রাইফেলের বল্টু যেখানে রেখেছিলে তোমার দয়াও রাখা উচিত ছিল সেখানেই, একটা জিন-কাপড়ের তলায় রাখলেই হত তোমার করুণা। কারণ তোমার উপকার কিছু এমনিতেও হত না।

—আমাকে শিখিও না! কী করতে হবে না হবে আমি নিজেই জানি।—গ্রিগর জবাব দেয় শীতল কণ্ঠে।

—তোমাকে কেন শেখাতে যাব? কিন্তু ধরো যদি অকারণেই তোমাকে কাল রাতে যমের বাড়ি পাঠিয়ে দিতাম অত দয়া দেখাতে যাবার ফলে? তাহলে?

গ্রিগব মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয়—সেখানেও আমি আমার পথ করে নিতাম।—তারপর যেন খানিকটা নিজের মনেই বললে—দিন দুপুরে মরণের মুখোমুখি দাঁড়ানো বড়ো ভয়ঙ্কর কিন্তু ঘুমের ঘোরে মৃত্যু এলে তা নিশ্চয় অত কঠিন হত না…।

॥ ছয় ॥

এপ্রিলের শেষে এক রাতে ওরা নৌকোয় করে ডন পেরিয়ে এল। রুবিয়েঝিনের বাইরে নদীর ধারে ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল এক তরুণ কসাক। নিঝ্‌নি-ক্রিভ্‌স্কি গাঁয়ের আলেকসান্দর কশেলিয়ফ।

ফোমিনকে সম্ভাষণ জানিয়ে সে বলে—আমিও তোমার সঙ্গে আসছি ইয়াকফ্। ঘরে বসে হাঁপিয়ে উঠেছি।

ফোমিন কনুই দিয়ে গ্রিগরিকে খুঁচিয়ে ফিসফিস করে বললে :

—দেখলে তো? বলেছিলুম না? সবে দ্বীপ ছেড়ে বেরিয়ে এলুম, এর মধ্যেই ত্যাখো কতো লোক···এই তো এল একজন! ও আমার চেনা-জানা। খুব লড়িয়ে ছেলে। লক্ষণ ভালই মনে হচ্ছে। এবাব চট্‌পট্ কাজ এগোবে হয়তো!

গলার আওয়াজে মনে হয় ফোমিন খুব খুশী হয়ে হাসছে। একজন নতুন সাথীর আবির্ভাবে বেশ আনন্দ হয়েছে ওর সন্দেহ নেই। সাফল্যের সঙ্গে নদী পার হয়ে আসা আর তারপরেই নতুন একটি লোকের দলে যোগদান, এতে বড়ো উল্লসিত হল সে, আশা জাগল আবার।

—রাইফেল আর পিস্তল ছাড়াও একটা তলোয়ার আছে, একজোড়া দূরবিন আছে দেখতে পাচ্ছি!—অন্ধকারে কশেলিয়ফের হাতিয়ারগুলো যাচাই করে দেখতে দেখতে খুশিভরা গলায় বলে ফোমিন—এই হল একজন কসাকের মতো কসাক! দেখলেই চেনা যায় খাঁটি কসাক, ভেজাল নয়!

ফোমিনের ভাই টাট্টু ঘোড়ায় টানা একটা মালগাড়ি টেনে নিয়ে এল নদীর কিনারায়।

নিচু গলায় সে বললে—জিনসাজগুলো গাড়িতে রাখো। তাড়াতাড়ি করো ভাই, ভগবানের দোহাই। রাত বেড়ে চলেছে, এদিকে রাস্তাও লম্বা।

লোকটা নিজে উত্তেজিত হয়ে ফোমিনকেও ওস্‌কাচ্ছিল। কিন্তু ফোমিন আজ এতদিন বাদে দ্বীপ থেকে ছাড়া পেয়ে আপন গ্রামের শক্ত মাটি অনুভব করছে পায়ের নিচে, ঘণ্টাখানেকের জন্য নিজের বাড়ি হয়ে আসা অথবা গাঁয়ের লোকদের সঙ্গে দেখা করে আসায় তার একটুও আপত্তি ছিল না। ঠিক ভোরের আগে ইয়াগফ্‌নি গাঁয়ের কাছে একটা ঘোড়ার পালের ভেতর থেকে ওরা কয়েকটি সেরা ঘোড়া বাছাই করে নিলে। জিনসাজ চড়ালে তাদের ওপর। ঘোড়ার পালের তদারক করছিল যে বুড়োটা, তাকে চুমাকফ বললে :

—অত ঘাবড়িও না দাদু! ওদের নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই, অল্প খানিক দূর যাব। আরো ভালো ঘোড়া হাতে এলেই এদের ফিরিয়ে দেব মালিকের কাছে। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে কে ঘোড়া নিয়েছে, বলে দিও ক্রাস্‌নোকুৎস্কের মিলিশিয়া (পুলিশরা) নিয়েছে। ঘোড়ার মালিকরা সেখানেই যাক্। আমরা ডাকাতদলের পিছু নিয়েছি, বলে দিতে পারো।

ওরা সদর রাস্তায় পৌছে ফোমিনের ভাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিলে। তারপর বাঁ-দিকে মোড় ঘুরে পাঁচজনেই জোর কদমে দক্ষিণমুখো ছুটল। গত দু'এক দিনের মধ্যে নাকি মাস্‌লাকের দলবল মিশ্‌কভ্‌স্কির কাছে হানা দিয়েছে

এমনি গুজব শোনা যাচ্ছিল। ফোমিনরাও সেদিকপানেই ছুটল মাসলাকের দলের সঙ্গে যোগ দেবে এই স্থির করে।

মাস্‌লাকের দলের খোঁজে ওরা তিনদিন ডন নদীর ডানপারের রাস্তাগুলোয় ঘুরে বেড়ালো। সমস্ত বড়ো গ্রাম আর জেলাকেন্দ্রগুলোকে ওরা এড়িয়ে গেছে। কারগিন জেলার আশপাশে উক্রেইনীয় গ্রামে ওরা ওদের ছোটখাটো দুর্বল ঘোড়াগুলো বদলিয়ে তাজা দ্রুতগামী উক্রেইনীয় ঘোড়া বেছে নিলে।

চতুর্থ দিন সকালে সকলের আগে গ্রিগর প্রথম লক্ষ্য করল একটি গ্রামের অদূরে একসারি ঘোড়সওয়ার। দুই পাহাড়ের মাঝখানে ফাঁকা জায়গা পেরিয়ে আসছে তারা। অন্তত দুটি স্কোয়াড্রন এগিয়ে আসছিল রাস্তা ধরে। কিছুটা সামনে এবং দুপাশে ছোট ছোট টহলদারী ফৌজীদল।

ফোমিন চোখে দূরবিন লাগিয়ে বললে—হয় মাস্‌লাক, নয়তো…।

—হয় বৃষ্টি, নয় বরফ। হয় আছে, নয় নেই।—চুমাকফ বিদ্রূপ করে বলে—আরেকটু ভালো করে দেখ, ইয়াকফ ইয়েফিমিচ, যদি ওরা লালফৌজ হয় তবে আমাদের ফিরে পালাতে হবে, তাড়াতাড়ি!

ফোমিন বিরক্ত হয়ে বলে—এত দূর থেকে কেমন করে বলি?

—ওই ছাখো, আমাদের দেখতে পেয়েছে। টহলদারগুলো এদিকেই আসছে।—বলে উঠল স্তেরলাদ্‌নিকফ।

ঠিকই বলেছিল সে, ওরা দেখতে পেয়েছে। সৈন্যসারির ডানদিকের টহলদাররা চট্‌ করে ঘুরে জোর কদমে ছুটে আসছে ওদের দিকে। ফোমিন তাড়াতাড়ি দূরবিন রেখে দিল খাপের মধ্যে। কিন্তু গ্রিগর হেসে তার জিনের ওপর ঝুঁকে পড়ে ফোমিনের ঘোড়ার লাগামটা চেপে ধরল।

—তাড়াহুড়ো করো না। আসুক না কাছে। মাত্র বারোজন তো লোক। ভালো করে একবার দেখে নিই চেহারাগুলো। তারপর দরকার হলে ঘোড়া ছুটিয়ে পালাব। আমাদের তো তাজা ঘোড়া, এত ঘাবড়াচ্ছ কেন? একবার দূরবিন দিয়ে দেখ।

বারোজন ঘোড়সওয়ার ক্রমেই কাছাকাছি চলে আসছে। প্রতি মুহূর্তে তাদের বড়ো থেকে আরো বড়ো দেখায়। পাহাড়ের উঁচু উঁচু ঘাসের সবুজ পটভূমিতে ওদের অবয়বরেখা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে এখন।

গ্রিগর ও তার সঙ্গীরা ফোমিনের দিকে অধৈর্য হয়ে তাকায়। ফোমিনের দূরবিন-ধরা হাতটা অল্প কেঁপে উঠেছে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার ফলে একফোঁটা জল গড়িয়ে এল রোদের দিকে ফেরানো ওর গালটার ওপর।

—লালফৌজ! টুপিতে তারার চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি!—মোটা গলায় চিৎকার করে ফোমিন তার ঘোড়ার মুখ ফেরায়। জোর কদমে ঘোড়া ছোটাল

সবাই। পেছনে এলোমেলো গুলির আওয়াজ। প্রায় মাইল দুয়েক ফোমিনের পাশাপাশি ছুটল গ্রিগর। মাঝে মাঝে শুধু পেছনপানে চেয়ে দেখছিল।

বিদ্রূপ করে হেসে বললে সে এবার—এই তো, ওদের দলে যোগ দিয়েছি এবার!

ফোমিন মনমরা হয়ে চুপ করে ছিল। ঘোড়াটাকে একটু রুখে চুমাকফ চেঁচাল :

—গ্রামগুলোকে এড়িয়ে যেতে হবে। ভিয়েশেনস্কার মাঠের দিকে এগোনো যাক, ওদিকটা একটু নিরিবিলি।

আরো কয়েক মাইল জোর কদমে ছোটা হল। আর ছুটলে ঘোড়াগুলো হয়রান হয়ে পড়বে। ঘাড়ের ওপর ঘাম ফেনিয়ে উঠছিল, তাদের পেশীর ভাঁজে গভীর খাঁজ পড়ে যাচ্ছে।

গ্রিগর হুকুম করলে—অতো তাড়াহুড়ো করো না! আস্তে চালাও!

পেছনের বারোজন ঘোড়সওয়ারের মধ্যে শুধু নয়জন আছে। বাকিরা হাল ছেড়ে দিয়েছিল। ওদের সঙ্গে দূরত্বটা চোখের দৃষ্টিতে ঠাহর করে গ্রিগর ফের চেঁচালে—থামো! দুএক রাউণ্ড ছেড়ে দাও ওদের ওপর!

পাঁচজনেই ঘোড়াগুলোকে এবার দুলকি চালে টানে। তারপর চলতে চলতেই নেমে পড়ে। কাঁধ থেকে রাইফেল নামিয়ে নেয়।

—লাগাম কষো! একেবারে বাঁদিকের লোকটাকে টিপ্ করো। ব্যস চালাও গুলি!

ওরা প্রত্যেকেই একেক দফা কার্তুজ ব্যবহার করে। লালফৌজের একটি ঘোড়া মারা পড়ল, কিন্তু ফের তাড়া করে আসতে শুরু করল তারা। অনিচ্ছার সঙ্গে ওদের পেছু নিয়েছে। মাঝে মাঝে বেশ দূর থেকে গুলি ছোঁড়া হচ্ছিল ওদের দিকে। অবশেষে লাল সেপাইরা একেবারেই বন্ধ করে দিল পেছু নেওয়া।

স্তেরলাদ্নিকফ দূরে স্তেপ প্রান্তরের একটা নীল জলাশয়ের দিকে চাবুক দেখিয়ে বললে—ঘোড়াগুলোকে জল খাওয়ানো দরকার। ওই যে একটা পুকুর দেখা যাচ্ছে।

এবার ওরা দ্রুত হাঁটা গতিতে চলতে শুরু করল প্রত্যেকটা খানাখন্দ উপত্যকা খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতে করতে। যতটা সম্ভব এবড়ো-খেবড়ো জমির আড়ালে গা ঢেকে পথ চলছিল ওরা।

ঘোড়াদের জল খাইয়ে আবার তারা ছুটতে শুরু করল, প্রথমে দুলকি চালে, তারপর কদম চালে। স্তেপের মাঠের ঠিক মাঝখান বরাবর একটা গভীর খাত চলে গেছে। দুপুর নাগাদ তারা ওরই একদিকের ঢালে এসে থামল ঘোড়াদের খাওয়াবে বলে। ফোমিন কশেলিয়ফকে হুকুম করল

কাছাকাছি একটা টিবির ওপর উঠে উপুড় হয়ে শুয়ে চারদিকটা নজর করে দেখতে। যদি স্তেপের মাঠের কোথাও কোনো ঘোড়সওয়ার চোখে পড়ে তাহলে যেন সঙ্গে সঙ্গে ওদের সতর্ক করে দিয়ে নিজে ছুটে ঘোড়ায় গিয়ে ওঠে।

গ্রিগর ঘোড়া থেকে নেমে সেটাকে ঘাস খেতে ছেড়ে দিল। তারপর খাতের ঢালুদিকে একটা শুকনো জায়গা বেছে নিয়ে শুয়ে পড়ল সেখানেই।

উপত্যকার এই রৌদ্রোজ্জ্বল দিকটায় সবুজ কচিঘাস ঘন আর উঁচু। কালো রোদপোড়া মাটির ভ্যাপসা সোঁদা গন্ধ কিন্তু স্তেপ-কান্তারের ম্লানায়মান ভায়োলেট ফুলের মৃদু সৌরভকে ঢাকতে পারেনি। একফালি পরিত্যক্ত জমিতে ওরা ফুটে রয়েছে শুকনো তেশিরার ডাঁটির ফাঁকে ফাঁকে। ক্ষেতের পুরোনো আলের ধারে ধারে বিচিত্র আলপনায় তারা ছড়িয়ে পড়েছে। এমন-কি চকমকির মতো শক্ত পাথুরে কুমারী মাটিতেও গেল-বছরের শুকনো ঘাসের আড়াল থেকে তারা তাকিয়ে রয়েছে পৃথিবীর দিকে, শিশুর মতো নীল স্বচ্ছ চোখ মেলে। এই নির্জন সুবিস্তীর্ণ তৃণকান্তারে ভায়োলেট ফুলেরা তাদের যতটুকু বাঁচবার বেঁচেছে, এখন তাদের জায়গায় পাহাড়ী খাতের ঢালে উজ্জ্বল বর্ণাঢ্য টিউলিপ-ফুল গজাতে শুরু করেছে—সূর্যের দিকে তাদের লাল সাদা হল্‌দে জালিকা ছড়িয়ে দিয়ে। ফুলেদের নানা সৌগন্ধ্য একসঙ্গে জড়ো করে স্তেপের সুদূর প্রান্তে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে বাতাস।

উত্তরদিকের ঢালে উপত্যকার ছায়ায় এখনো বরফের স্তর জমে আছে, গলে পড়ছে তারা। বরফ থেকে হিম ওঠে, সে-হিম যেন পাণ্ডুর ভায়োলেটের সৌরভকে আরো সুরভিত করে। সুদূর অতীতের কোনো সুমূল্য স্মৃতির মতোই বেদনাবিধুর ক্ষীয়মান সেই ফুলের দল।

দুপা ছড়িয়ে কনুইয়ে ভর দিয়ে শুয়েছিল গ্রিগর। লোভী দুচোখ মেলে সে গ্রাস করছে রোদ-জ্বলা স্তেপের মাঠ, দূর পাহাড়সারির কৃষ্ণনীলিম প্রহরী শৃঙ্গগুলো, ক্রমাবতল উপত্যকার সীমায় কুয়াসামগ্ন মরীচিকা। নিমেষের জন্য চোখ বুজে গ্রিগর স্কাইলার্কের গান শোনে, দূরের, কাছের। শোনে ঘাস-খেতে-থাকা ঘোড়াদের হাল্‌কা পায়ের আওয়াজ আর নাক ঝাড়ার শব্দ, ওদের দাঁতের ফাঁকে লাগাম-লোহার টিন্‌টিন্ শব্দ আর কচি ঘাসের সঙ্গে বাতাসের কানাকানি। কর্কশ মাটির ওপর দেহের সবটুকু ভার ছেড়ে দিতে একটা অদ্ভুত বৈরাগ্য আর প্রশান্তির অনুভূতি জাগে ওর মনে। অতি পরিচিত এই অনুভূতিটুকু। একটু উদ্বিগ্নতার মধ্যে থাকলে সাধারণত তারপরেই এই রকম একটা ভাব আসে। তখন ও আশপাশের সবকিছুই যেন নতুন দৃষ্টিতে দেখতে পায়। মনে হয় ওর চোখের নজর আর শ্রবণ-শক্তি বেড়ে গেছে। এমনি সব চঞ্চল মুহূর্তগুলোয় আগে হলে যা-কিছু ওর নজর এড়িয়ে যেত এখন তাই আকর্ষণ করে ওর দৃষ্টি। একই রকম আগ্রহ নিয়ে ও ছাখে ছোট্ট পাখির পেছু তাড়া-করে-যাওয়া শিস্-কাটা বাজপাখির

তির্যক গতি, অথবা গ্রিগরের দুই কনুইয়ের মাঝামাঝি জায়গাটিতে একটা কালো গুবরে পোকার সপ্রয়াস হামাগুড়ি, কিংবা হাওয়ায় দোল-খাওয়া কোনো রক্তলাল টিউলিপের উজ্জ্বল অনাঘ্রাত সৌন্দর্য। টিউলিপ ফুলটা ওর খুব কাছেই। মেঠো ইঁদুরের বুজে-যাওয়া গর্তের কিনারায়। একটু হাত বাড়ালেই তুলে আনা যায়। কিন্তু তবু নড়ে না গ্রিগর, কেবল মুগ্ধ নীরবতায় ফুলটিকে তারিফ করে আর ঢ্যাখে শক্ত পাতাগুলো তাদের ভাঁজে ভাঁজে সযত্নে লুকিয়ে রেখেছে ভোরের শিশিরকণা। তারপর গ্রিগর দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। দিগন্তের আকাশে একটা ঈগল উড়ছে মেঠো-ইঁদুরের ঢিবির মৃত শহরটার ওপর দিয়ে। বিশেষ কিছু না ভেবেই অনেকক্ষণ চেয়ে ঢ্যাখে গ্রিগর।

ঘণ্টা দুয়েক বাদে ওরা আবার ঘোড়ায় উঠল। সন্ধ্যে নাগাদ ইয়েল্লান্স্কা জেলার চেনা-জানা গ্রামগুলোয় পৌঁছায় এই উদ্দেশ্য।

লালফৌজের টহলদার সেপাইরা নিশ্চয়ই টেলিফোনে ওদের গতিবিধির খবর দিয়েছিল। তাই কামেন্কা পল্লীর ভেতর ওরা আসতেই একটা ছোট নদীর ওপার থেকে গুলির আওয়াজ এল ওদের অভ্যর্থনায়। বাঁশির সিটির মতো বুলেটের আওয়াজ পেয়ে ফোমিন পাশ ফেরে। গুলিবৃষ্টির মধ্যেই ওরা পল্লীর প্রান্ত দিয়ে ঘুরে জোর কদমে ছোটে ভিয়েশেন্স্কা জেলার ঘোড়া-চরানো মাঠগুলোর দিকে। আরেকটি পল্লীর ওধারে ওদের গতিরোধ করতে চেষ্টা করে মিলিশিয়া-ফৌজের একটি ছোট দল।

ফোমিন প্রস্তাব করে—এসো ওদের বাঁদিক দিয়ে কেটে পড়ি।

গ্রিগর দৃঢ়কণ্ঠে বলে—না, ওদের আক্রমণ করব। ওদের ন'জন লোক, আমাদের পাঁচজন। ভেঙে বেরিয়ে যাব আমরা।

চুমাকফ আর স্তেরলাদ্নিকফও সায় দিল।

তলোয়ার খুলে নিয়ে ঘোড়াগুলোকে ওরা ছুটিয়ে দিলে হাল্কা কদমে। ঘোড়া থেকে না নেমে মিলিশিয়ার সেপাইরা দ্রুত গুলি ছুঁড়তে লাগল। তারপর পাশের দিকে লাফিয়ে সরে গেল আক্রমণ এড়াবার জন্য।

কশেলিয়ফ ঠাট্টা করে বললে—হতভাগাগুলো! লম্বা লম্বা রিপোর্ট দেবে এখন, কিন্তু ভালো করে লড়বার ক্ষমতা নেই!

মিলিশিয়া সেপাইরা একটু চাপ দিলেই ওরা গুলি ছুঁড়ে তার জবাব দিচ্ছিল। এই ভাবে ফোমিনরা পূবদিকে পেছু হটে যেতে লাগল বাঘা-বর্জোই কুকুরের তাড়া-খাওয়া নেকড়ের দলের মতো। মাঝে মাঝে উল্টো খেঁকাচ্ছিল বটে তবে থামেনি একটুও। গুলিগোলা ছোঁড়ার মাঝখানে একবার স্তেরলাদ্নিকফ জখম হয়ে গেল। ওর বাঁ পায়ের পেশীতে বুলেট ঢুকে গিয়েছিল একেবারে হাড় ঘেঁষে। পায়ের অসহ্য যন্ত্রণায় ও গোঙাতে থাকে। ফ্যাকাশে হয়ে বলে:

—একেবারে পায়ের ডিমে মেরেছে···এবারেও ওই একই পায়ে···আমার খোঁড়া পায়েই···হারামজাদা!

জিনের ওপর চিত হয়ে হো-হো করে হাসতে থাকে চুমাকফ। হাসতে হাসতে তার চোখে জল এসে পড়ে। স্তেরলাদ্‌নিকফকে ঘোড়ার ওপর সোজা হয়ে বসতে সাহায্য করে, কিন্তু সেই সঙ্গে হাসির দমকে দুলতে থাকে সে। বলে:

—ওরা তোমার খোঁড়া পা খানাই আবার বেছে নিল কীভাবে? নিশ্চয়ই একেবারে তাক করে মেরেছিল। দেখেছে একটা খোঁড়া লোক লাফিয়ে বেড়াচ্ছে, ওই পা-টায় মারলে হয়তো ধরে ফেলতে পারবে জলজ্যান্ত। ও স্তেরলাদ্‌নিকফ্! তুমি যে আমাকে মেরেই ফেলবে দেখছি। তোমার পা তো আরো সওয়া ফুট খাটো হয়ে গেল হে। এবার তুমি নাচবে কী করে? তোমার জন্য আমাকে দেখছি আরো দু'ফুট গভীর করে গর্ত খুঁড়তে হবে।

স্তেরলাদ্‌নিকফ যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে বললে—চুপ কর গাধা! এখন আমার সময় নেই মস্করার! চুপ কর্। যিশুর দোহাই!

প্রায় আধঘণ্টা বাদে একটা উপত্যকার তলা দিয়ে যাবার সময় স্তেরলাদ্‌নিকফ বললে—এসো একটু থেমে বিশ্রাম নেওয়া যাক্।···জখমটা একটু বেঁধে নিই, কী দারুণ রক্ত পড়েছে।

থামল ওরা। ঘোড়াদের ধরলে গ্রিগর। মাঝে মাঝে ফোমিন আর কশেলিয়ফ দূরে মিলিশিয়া-সেপাইদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছিল। চুমাখফ স্তেরলাদ্‌নিকফের পায়ের বুটটা খুলে দিতে লাগল।

—রক্ত তো বড়ো কম পড়েনি দেখছি তোমার।—চুমাখফ ভুরু কুঁচকে জুতোর ভেতর থেকে তরল রক্ত মাটিতে ঝেড়ে দিতে দিতে বললে। স্তেরলাদ্‌নিকফের পাতলুনের পা আরেকটু হলেই ছিঁড়ে দিয়েছিল। রক্তে মাখামাখি হয়ে ভিজে গেছে একেবারে। কিন্তু স্তেরলাদ্‌নিকফ কিছুতেই রাজী হল না।

—ভালো পাতলুন। নষ্ট করার দরকার কী।—দুহাতে মাটিতে ভর দিয়ে জখম পাটা উঁচু করে ধরল—নাও, খুলে নাও এবার, তবে খুব সাবধানে।

চুমাখফ জিজ্ঞেস করে,—সঙ্গে ব্যাণ্ডেজ আছে?—পকেট হাতড়ায় ওর।

—আমার আবার ব্যাণ্ডেজের দরকার কীসের? ও ব্যাণ্ডেজ ছাড়াই চলে যাবে।

জখমের যেদিক থেকে গুলি বেরিয়ে গেছে সেইদিকটা খুঁটিয়ে লক্ষ্য করল স্তেরলাদ্‌নিকফ। তারপর কার্তুজের থাপ থেকে দাঁত দিয়ে টেনে বের করে নিল একটা বুলেট। বারুদটা হাতের তেলোয় রেখে একটু মাটি মিশিয়ে নিল থুতু দিয়ে ভিজিয়ে। তারপর সেই মলম যথেষ্ট পরিমাণে জখমের গর্তদুটিতেই বেশ ভাল করে পুরে দিয়ে খুশী গলায় বললে:

—এ অনেক দিনের পরখ-করা ওষুধ। জখম শুকোবে। দুদিনের মধ্যে সেরে যাবে।

চিরা নদী পৌঁছোনো অবধি আর কোথাও দাঁড়াল না ওরা। মিলিশিয়া সেপাইরা বেশ দূরত্ব বজায় রেখেই পেছু পেছু আসছিল। কদাচিৎ দু'একবার গুলি ছুঁড়ছিল তারা। ফোমিন মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে মন্তব্য করছিল:

—বরাবর চোখে-চোখে রেখেছে আমাদের।...নতুন দলের জন্য অপেক্ষা করছে নাকি? অত দূরে দূরে থাকার নিশ্চয় কোনো কারণ আছে।

একটা গ্রামের কাছে চিরা নদীর ঘাটে এসে ওরা গ্রাম পেরোলো। ঘোড়াগুলোকে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে চড়াই বেয়ে উঠতে থাকে ওরা। ঘোড়াগুলো শ্রান্ত। উৎরায়ের পথেই কোনোরকমে হাঁটে, চড়াই হলে তো লাগাম ধরে তোলা ছাড়া উপায় নেই। ওদের পিঠ আর পাছার ঘামের ফেনাগুলো আঁচড়ে আঁচড়ে মুছে দিতে হয়।

ফোমিনের উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ ছিল। গ্রামের প্রায় তিন চার মাইল দূর থেকে সাতজন সেপাই নতুন তরতাজা ঘোড়ায় চেপে আবার ওদের পশ্চাদ্ধাবন শুরু করেছে।

কশেলিয়ফ মুখ কালো করে বলে—এভাবে যদি ওরা আমাদের হাত বদলি করে তাড়া করতে থাকে, তাহলে তো গেছি!

রাস্তাঘাটের তোয়াক্কা না করে মাঠের ভেতর দিয়ে ছোটে ওরা, মাঝে মাঝে শুধু পাশ ঘুরে গুলি ছোঁড়ে। দুজন ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ে শত্রুদের লক্ষ্য করে বন্দুক ছুঁড়ল। অন্যরা পাঁচশো গজ এগিয়ে গেছে তখন। ঘোড়া থেকে নেমে ওরা যখন গুলি ছুঁড়তে শুরু করল, অন্য দুজন তখন প্রায় হাজার গজ এগিয়ে গিয়ে ফের নেমে বন্দুক ছোঁড়ার জন্য তৈরি হতে লাগল। একজন মিলিশিয়া সেপাইকে ওরা হয় মেরেছে, নয় গুরুতর জখম করেছে। দ্বিতীয় জনের ঘোড়াটাকে সাবাড় করে ফেলল। একটু বাদে চুমাকফের ঘোড়া জখম হয়ে গেল। কশেলিয়ফের ঘোড়ার রেকাব ধরে সে ছুটতে লাগল তার পাশে পাশে।

ছায়া লম্বা হয়ে আসে। পশ্চিমের দিকে সূর্য ঢলেছে। গ্রিগর বললে কেউ যেন ছাড়াছাড়ি না হয়। সকলে মিলে হাঁটা চালে ঘোড়া চালিয়ে যেতে লাগল। খানিক বাদে পাহাড়ের ধারে ওরা দেখলে একটা জোড়া-ঘোড়ায় টানা মালগাড়ি। ওরা রাস্তার দিকে এগোলো। বুড়ো দাড়িওলা কসাক চালকটি ঘোড়া দুটোকে জোর দাবড়ে ছুটিয়ে দিল। কিন্তু গুলি ছোঁড়ার পর আর না দাঁড়িয়ে পারল না সে।

—হারামীকে কোতল করব! দৌড়োয় কেন বুঝিয়ে দিচ্ছি!—দাঁতের ফাঁকে চেপে চেপে বলে কশেলিয়ফ। সজোরে ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষিয়ে সে ঊর্ধ্বশ্বাসে এগিয়ে যায়।

ফোমিন সাবধান করে দেয়—ওকে ছুঁয়ো না কাশা, বারণ করে দিলাম।—তারপর খানিকটা দূর থেকেই লোকটাকে উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে বলতে লাগল—ও দাদু, শুনতে পাচ্ছ? তোমার ঘোড়াদের জোয়াল খোলো! যদি বাঁচতে চাও তো ঘোড়ার জোয়াল খোলো!

বুড়োর কান্নাকাটি আবেদন গ্রাহ্য না করে ওরা লাগামের দড়ি খুলে নিলে। লাগাম আর বগলেশ খুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি জিন চাপিয়ে দিলে ঘোড়াদুটোর পিঠে।

বুড়ো কাঁদতে কাঁদতে বললে—অন্তত বদলাবদলি করে একটা তো রেখে যাও!

কশেলিয়ফ বলে—বুড়ো শয়তান, তোর দাঁতের পাটি খুলে নেব খেয়াল রাখিস। আমাদের ঘোড়ার দরকার। তুই বরং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দে যে তোর জান নিইনি আমরা।

তাজা ঘোড়ার পিঠে ওঠে ফোমিন আর চুমাকফ। কিন্তু খানিক বাদেই পেছনের ছ'জন ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে আরো তিনজন যোগ দিয়ে পেছু তাড়া করে আসতে লাগল।

ফোমিন বলে—খুব জোরে দাবড়াতে হবে ঘোড়া! চলো ভাইসব! সন্ধ্যের আগে ক্রিভ্স্কি উপত্যকায় পৌছুতে পারলে বেঁচে যাব।

ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষায় ফোমিন। এগিয়ে চলে সামনে। বাঁ দিকে দ্বিতীয় একটা ঘোড়াকে খাটো লাগাম দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে হচ্ছিল। জানোয়ারটার খুরের নিচে টিউলিপ ফুলের লাল মাথাগুলো ছিটকে উড়ে যাচ্ছিল নানা দিকে, রক্তের বড়ো বড়ো ফোঁটার মতো। ফোমিনের পেছন পেছন আসছিল গ্রিগর। লালের ফুলঝুরি দেখেই সে চোখ বুজল। কোনো কারণে ওর মাথা ঘুরছে। একটা পরিচিত কঠিন যন্ত্রণা বুকের ভেতরটাকে চেপে ধরেছে যেন।

সবটুকু শক্তি নিঃশেষ করে ছুটেছে ঘোড়াগুলো। একটানা ঘোড়ায় চড়া আর অনাহারে মানুষ কটিও ক্লান্ত। স্তেরলাদ্নিকফ জিনে বসে টলছিল। কাগজের মতো ফ্যাকাশে। প্রচুর রক্ত ক্ষয় হয়েছে, তার ওপর পিপাসা আর বমিভাবের উপদ্রব। সামান্য একটু শুকনো রুটি খেয়েছিল, তাও উগরে দিয়েছে।

বিকেলের দিকে ক্রিভ্স্কি গাঁয়ের কাছাকাছি ওরা একপাল ঘোড়ার মধ্যে ভিড়ে গেল। তারা স্তেপের মাঠ থেকে ঘরে ফিরছিল। পেছনে শত্রুদের উদ্দেশ করে শেষ কয়েকটি গুলি ছুড়ে ওরা অবশেষে খুশী হয়ে দেখল যে আর কেউ ওদের পেছু নিচ্ছে না। দূরে ন'জন ঘোড়সওয়ার একসঙ্গে জটলা করছিল, নিশ্চয় আলোচনা করছিল পরিস্থিতি প্রসঙ্গে। তারপর সবাই ফিরে চলে গেল।

* * *

ক্রিভ্স্কি গাঁয়ে ওরা তিনদিন কাটাল, ফোমিনের এক চেনাপরিচিত লোকের বাড়িতে। মনিবের অবস্থা সচ্ছল, ওদের সাদর অভ্যর্থনা জানাল সে। একটা অন্ধকার চালাঘরে ঘোড়াগুলোকে রাখা হয়েছে, তারা যা খেতে পারে তার চেয়েও বেশী জাব্না পেয়েছে। দুদিনেই একেবারে চাঙা হয়ে উঠল তারা। দলের লোকেরা পালা করে ঘোড়া পাহারা দেয়। মাকড়সার জালে ঢাকা একটা ঠাণ্ডা চালাঘরের মেঝেয় ঘুমোয়, আর এতদিন দ্বীপের ভেতর অর্ধভুক্ত থাকার শোধ তোলে দেঁড়েমুশে খেয়ে।

পরদিনই গ্রাম ছেড়ে যেতে পারত ওরা কিন্তু স্তেরলাদ্নিকফ আটকায়। ওর জখমটা আরো খারাপ হয়েছে, ঘায়ের চারধার লাল দগ্দগে। সন্ধ্যে নাগাদ পা ফুলে অবশেষে সংজ্ঞাহারা হয়ে পড়ে। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটার অবস্থা। সারারাত ধরে যখনই ওর জ্ঞান ফিরেছে সঙ্গে সঙ্গে জল চেয়েছে, লোভীর মতো জল খেয়েছে, একেকবারে অল্প করে। গোটা রাতে বোধহয় এক বালতি জল খেয়েছিল। কিন্তু অন্যের সাহায্য ছাড়া উঠে দাঁড়াবার সামর্থ্য নেই ওর। একটু আধটু নড়াচড়া করলেই অসহ্য যন্ত্রণা। শুয়ে শুয়েই প্রস্রাব করে, আর এক নাগাড়ে ককায়। ওর গোঙানি যাতে কেউ শুনতে না পায়, তাই চালাঘরের কোণের দিকে ওকে টেনে নিয়ে যায় ওরা, কিন্তু তাতে ইতরবিশেষ কিছু হয় না। একেক সময় ভীষণ চিৎকার করতে থাকে। তারপর জ্ঞান হারালে বিকারের ঘোরে অজস্র আবোল-তাবোল বকে।

ওর ওপরেও নজর রাখতে হয়েছিল তাদের। জল খাওয়াতে হয়, উত্তপ্ত কপাল ভিজিয়ে দিতে হয়। আর যখনই গোঙায় বা চেঁচিয়ে কথা বলে, মুখে হাত বা টুপি চাপা দিতে হয়।

দুদিন পার হয়ে যাবার পর জ্ঞান ফেরে স্তেরলাদনিকফের, অনেকটা সুস্থ বোধ করছে, বলে সে।

আঙুলের ইশারায় চুমাকফকে ডেকে বলে—কবে এখান থেকে যাবে?

—আজ রাতে।

—আমিও যাব। আমাকে ফেলে যেও না, যিশুর দোহাই!

ফোমিন নিচু গলায় বলে—কিন্তু কোথাও যাবার মুরোদ তোমার আছে? নড়তেই পারছ না।

—পারি না মানে? ভাখো তাহলে!—প্রচণ্ড চেষ্টায় স্তেরলাদনিকফ নিজেকে কিছুটা খাড়া করে। তারপরেই আবার ঢলে পড়ে। মুখটা ওর লাল হয়ে উঠেছে, কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম।

চুমাকফ দৃঢ় কণ্ঠে বলে—নেব তোমাকে সঙ্গে! ঘাবড়িও না, তোমাকে আমরা নিয়ে যাব। চোখের জল মোছো, তুমি মেয়েমানুষ নও!

স্তেরলাদনিকফ ফিস ফিস করে বলে—চোখের জল নয়, ঘাম,—টুপিটা সে চোখের ওপর টেনে দেয়।

—তোমাকে আমরা ছেড়ে যেতে পারতাম, কিন্তু বাড়ির মনিব তো রাজী হবে না। মন খারাপ কোরো না ভাসিলি। তোমার পা সেরে যাবে। আবার তুমি আর আমি কুস্তি লড়ব, কসাক নাচ নাচব। মুখটা অমন কালো কেন হে? জখমটা যদি তেমন গুরুতর হত তবে না হয়···কিন্তু এ তো কিছুই নয়!

চুমাকফ বরাবরই সকলের সঙ্গে একটু অভদ্র আর কর্কশ ব্যবহার করে থাকে। এই কথাগুলো কিন্তু সে ধীরে ধীরে এমন মর্মস্পর্শী কোমলতা মিশিয়ে অকৃত্রিম কণ্ঠে বলল যে গ্রিগর অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল তার দিকে।

ভোর হবার খানিক আগে ওরা গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে গেল। স্তেরলাদ্‌-নিকফকে ওরা জিনের গদির ওপর চড়িয়েছিল অতি কষ্টে। কিন্তু আসলে বসতে পারল না সে, একবার এদিকে একবার ওদিকে ঝুঁকে পড়তে লাগল কেবলই। তাই চুমাকফ চলতে লাগল পাশাপাশি, আহত লোকটির কোমর ডান হাতে জড়িয়ে ধরে।

গ্রিগরের পাশাপাশি ঘোড়া এনে সদুঃখে ঘাড় নেড়ে ফোমিন ফিসফিসিয়ে বললে. এ হল এক ঝামেলা! কোথাও ফেলে যেতে হবে পেছনে।

—মানে? ওকে খুন করবে?

—হ্যাঁ, তাছাড়া কী? মুখ দেখব বসে বসে? ওকে ঘাড়ের ওপর রেখে আমাদের কোনো কাজ হবে?

খানিকক্ষণ ওরা হেঁটে চলে, কথা বলে না। গ্রিগর চুমাকফকে বিশ্রাম দেয়, তারপর কশেলিয়ফ আসে গ্রিগরের জায়গায়।

সূর্য উঠেছে। নিচে ডন নদীর ওপর তখনো কুয়াশা গড়িয়ে যাচ্ছে কিন্তু পাহাড়ের দিকে স্তেপের দূর দিগন্ত অতি নির্মল আর উজ্জ্বল। প্রতি মিনিটে আকাশের গম্বুজ যেন আরো নীল হয়ে ওঠে। একেবারে মাথার ওপর নিশ্চল হয়ে জমে আছে ছোট ছোট পালক পারা মেঘ। রুপোলি কংখাবের মতো ঘন শিশির ছড়িয়ে আছে ঘাসের ওপর। কিন্তু ঘোড়াগুলো যেখান দিয়ে গিয়েছে সেখানে রয়ে গেছে একটানা কালো দাগ। কেবল ভারুই পাখিরা স্তেপের বিপুল প্রান্তরের সুগম্ভীর নীরবতাকে বিমন্দ্রিত করে তুলেছে।

স্তেরলাদনিকফ ঘোড়ার হাঁটার তালে তালে অসহায়ের মতো দুলছিল এদিক ওদিক। ক্ষীণকণ্ঠে সে বলে:

—উঃ বড়ো কষ্ট!

—চুপ করো!—কর্কশ কণ্ঠে ফোমিন বাগড়া দেয়—তোমাকে সেবা করাটাও আমাদের কম কষ্ট নয়।

মোড়লের সদর রাস্তার কাছেই ঘোড়াদের খুরের সামনে একটা বাস্টার্ড

পাখি হুর্‌র্‌ করে উড়ে গেল। পাখিটার ডানার মিষ্টি হাওয়া-কাঁপানো শিস্‌ যেন স্তেরলাদনিকফের চমক ভাঙিয়ে দিল।

ও বললে—ভাইসব, আমায় ঘোড়া থেকে নামিয়ে দাও।

কশেলিয়ফ আর চুমাকফ সাবধানে ওকে জিন থেকে নামিয়ে নিয়ে ভিজে ঘাসের ওপর শুইয়ে দিলে।

ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে চুমাকফ বললে—দেখি তোমার পাটা একটু-খানি। হ্যাঁ, বোতামটা খোলো!

দারুণ ফুলে গেছে স্তেরলাদ্‌নিকফের পা। টনটনে চামড়ার কোথাও এতটুকু ভাঁজ নেই, পাতলুনের পুরো পা-খানাই ভরে গেছে। একেবারে কোমর অবধি চামড়ার রং হয়েছে চক্‌চকে কাল্‌চে বেগনি, আর একেক-জায়গায় ছুঁলে মখমলের মতো মনে হয়। ফোস্‌কা উঠেছে। খোঁদলে ঢুকে-যাওয়া শুকনো পেটেও জায়গায় জায়গায় অমনি ছোপ তবে হাল্‌কা রঙের। জখম থেকে উগ্র পচা গন্ধ আসছিল, পাতলুনে শুকিয়ে জমাট হওয়া বাদামি রক্ত থেকেও। বন্ধুর পা পরীক্ষা করতে করতে চুমাকফ নাক চেপে ধরে। ভুরু কোঁচকায়। কিন্তু গলার মধ্যে ঠেলে-ওঠা বমিভাবটাকে দমন করতে পারে না কিছুতেই। তখন সে স্তেরলাদনিকফের বুজে আসা নীল চোখের পাতার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। ফোমিনের সঙ্গেও ওর দৃষ্টি বিনিময় হয়। বলে:

—মনে হচ্ছে যেন ঘা পচতে শুরু করছে।…উম্‌-হুঁ। অবস্থাটা তো ভালো মনে হচ্ছে না, ভাসিলি স্তেরলাদনিকফ। একেবারেই সুবিধের নয়। আঃ, ভাসিয়া, ভাসিয়া, কী যে একটা করে বসলে!

স্তেরলাদ্‌নিকফ ঘন ঘন দম নিচ্ছিল, একটি কথাও বলেনি। ফোমিন আর গ্রিগর একই সঙ্গে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে। উলটো দিক থেকে হেঁটে এগিয়ে আসে জখম মানুষটার দিকে। স্তেরলাদ্‌নিকফ খানিকক্ষণ স্থির হয়ে থেকে এবার হাতের ওপর ভর দিয়ে ওঠে বসে। তারপর ঝাপ্‌সা চোখে তাকায় একবার সকলের দিকে। দৃষ্টিতে একটা বৈরাগ্যের কাঠিন্য ফুটে উঠেছে।

—ভাইসব! এবার আমাকে সঁপে দাও মৃত্যুর হাতে।…এ পৃথিবীতে এখন আমি বেঁচেও মরে আছি।…একেবারে শেষ হয়ে গেলাম, সব শক্তি ফুরিয়ে গেছে…

আবার চিত হয়ে চোখ বোজে সে। ফোমিনরা জানে এ-অনুরোধ না রেখে উপায় নেই, ওরা শুধু অপেক্ষাতে ছিল কখন কথাটা ওঠে। কশেলিয়ফের দিকে চেয়ে একটু চোখ টিপে ফোমিন সরে গেল। কশেলিয়ফ কোনো প্রতিবাদ করলে না। কাঁধ থেকে রাইফেল নামিয়ে নিলে। চুমাকফের ঠোঁটের দিকে চেয়ে "গুলি করো" কথাটা শুধু সে আন্দাজই করতে পারলে, শুনতে পায়নি। চুমাকফও কয়েক পা পেছিয়ে গেছে। কিন্তু স্তেরলাদ্‌নিকফ আবার চোখ খুলে দৃঢ় কণ্ঠে বললে:

—গুলি করো এখানে!—হাতটা তুলে নিজের নাকের হাড়টার ওপর আঙুল দিয়ে দেখায় সে।—গুলি করো যাতে একটুও দেরি না করে আলো নিভে যায়।…যদি কখনো তোমরা আমার গাঁয়ে যাও, তা হলে বউকে বোলো কীভাবে ঘটল ব্যাপারটা…বোলো যেন সে আর অপেক্ষা না করে আমার জন্য।

কশেলিয়ফ রাইফেলের বল্টুটা সন্দেহজনকভাবে অনেকক্ষণ সময় নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। চোখের পাতা নামিয়ে স্তেরলাদ্‌নিকফ ফের বললে:

—আমার সম্বল তো শুধু ওই বউটিই… ছেলেপুলে নেই।…একটাই পেটে ধরেছিল, কিন্তু সেও জন্মাল মরা। ..আর তো কেউ নেই।

তুবার রাইফেল উঁচিয়েছে কশেলিয়ফ, তুবারই নামিয়ে নিয়েছে। ক্রমেই যেন ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে সে। চুমাকফ কাঁধ দিয়ে ওকে সজোরে সরিয়ে দিয়ে রাইফেলটা হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়।

—যদি না পারো, কাজের ভার নাও কেন, নেকড়ের বাচ্চা!—ভাঙা গলায় চেঁচায় চুমাকফ। টুপি খুলে চুলে হাত বোলায়।

ফোমিন ঘোড়ার রেকাবে একখানা পা রেখে তাগিদ দেয়—জল্‌দি করো।

চুমাকফ ধীরে ধীরে বলতে থাকে। একেকটা শব্দ যেন হাতড়ে হাতড়ে খোঁজে সে:

—ভাসিলি! বিদায়! খ্রীষ্টের অশেষ দয়া স্মরণে রেখে আমাকে, আমাদের সবাইকে ক্ষমা কোরো! আবার ওপারে গিয়ে দেখা হবে, সেখানেই বিচার হবে আমাদের। তোমার স্ত্রীকে বলব যা বলতে বলেছ।—জবাবের জন্য একটু অপেক্ষা করে চুমাকফ। কিন্তু স্তেরলাদ্‌নিকফ নীরব আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় পাংশু তার মুখ। শুধু চোখের পাতা জোড়া সূর্যের আলোয় পাণ্ডুর; বাতাসে কাঁপে একটু একটু। জামার ভাঙা বোতামটা আটকাবার চেষ্টা করতে গিয়ে কোনো কারণে বাঁ হাতের আঙুলটা কেঁপে ওঠে সামান্য।

জীবনে অনেক মৃত্যু দেখেছে গ্রিগব, কিন্তু আজ আর সে স্তেরলাদ্‌নিকফের মরণ দাঁড়িয়ে দেখতে পারে না। লাগামটা টেনে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায় ঘোড়াটাকে টানতে টানতে। এমনভাবে বন্দুকের গুলির জন্য অপেক্ষা করতে থাকে যেন ওর নিজেরই পিঠে বিঁধবে সেই গুলিটা। গুলির আওয়াজের জন্য কান পেতে থাকে, প্রত্যেকটা মুহূর্ত গুনতে থাকে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের তালে। কিন্তু পেছন দিকে যখনই হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ জেগে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে ওর হাঁটু যেন অবশ হয়ে আসে, পেছিয়ে-যাওয়া ঘোড়াটাকে সামলাতেই পারে না সে।

* * * *

ঘণ্টা তুয়েক ঘোড়া দাবড়ায় ওরা। পরস্পরের সঙ্গে একটি কথাও হয়নি।

ঘোড়া থামলে চুমাকফই প্রথম নীরবতা ভঙ্গ করে। হাতের তেলোয় চোখ ঢেকে ভাঙা ধরা-গলায় বলে :

—কেন যে ছাই গুলি করে মারতে গেলুম ওকে! স্তেপের ভেতরেই ফেলে রেখে আসতে পারতাম। অযথা কেন পাপের কলঙ্ক মাথায় নিলাম। এখনো যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি ওর মুখটা···

ফোমিন বলে—কেন মানিয়ে নিতে পারছ না? এত লোককে তো মেরেছ জীবনে, এটাই বা কেন সয়ে যেতে পারবে না? তোমার বুকে হৃদয় তো নেই, আছে মরচে ধরা লোহা।···

চুমাকফ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ফোমিনের দিকে তীব্র চোখে তাকায় সে।

চাপা গলায় সে বলে—আমাকে এখন বিরক্ত কোরো না ইয়াকফ ইয়েফিমিচ! এখন আমার পেছনে লাগলে তোমাকে সুদ্ধ সাবাড় করে দিতে পারি···খুব সহজেই পারি।

—কেন খামোখা তোমায় বিরক্ত করতে যাব? তোমাকে বাদ দিয়েও আমার নিজের যথেষ্ট ভাবনা আছে!—তোয়াজের সুরে বলে ফোমিন! চিৎ হয়ে শুয়েছে। রোদের তাতের জন্য চোখ খোঁচ করে সে হাত-পা মেলে দেয় আয়েসের সঙ্গে।

সাত

গ্রিগর যা ভেবেছিল ঠিক তার উলটো ব্যাপারটাই ঘটল। পরবর্তী দশ দিনে চল্লিশজনেরও বেশী কসাক যোগ দিলে ফোমিনের দলে। সোভিয়েত বাহিনী যেসব ছোট ছোট দলগুলোকে ভেঙে দিয়েছিল, এরা তারই অবশিষ্ট। নেতাদের হারিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল এই এলাকায়। খুব খুশী হয়ে এবার ফোমিনের সেবা করতে লেগে গেল তারা। কার চাকরি করবে আর কাকেই বা খুন করবে সে সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞানই ছিল না, উচ্ছৃঙ্খল যাযাবরের জীবন আর হাতের কাছে যাকে পাবে তার ওপরেই রাহাজানি—এই পেলেই তারা সন্তুষ্ট। একদল বোম্বেটে ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না তাদের। গ্রিগর ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে আর ফোমিন

ব্যঙ্গ করে বলে—বুঝলে হে মেলেখফ, মানুষ তো নয় একপাল জীব বিশেষ। ফাঁসির আসামী সব, যেন ফাঁসির দড়ির জন্যই তৈরি। ফোমিন নিজেকে এখনও অন্তরে অন্তরে "মেহনতী জনতার যোদ্ধা" বলে মনে করে। আগের মতো ঘন ঘন না হলেও এখনো সে বলে থাকে: "কসাক ভূমির মুক্তিদাতা আমরাই।" অতি উদ্ভট আশাও সে ত্যাগ করবে না, গোঁয়ারের মতো আঁকড়ে থাকবে। নূতন সঙ্গীদের লুঠপাটের ব্যাপারে সে আবার আগের মতোই চোখ বুজে সায় দিতে থাকে। ওর ধারণা এসব নোংরা কাজ না করলেই নয়, মেনে নিতেই হবে। তারপর সময় হলে লুটেরাদের খপ্পর থেকে বেরিয়ে আসা যাবে। আজ হোক কাল হোক বিদ্রোহী বাহিনীর এক সাচ্চা কমাণ্ডার ওকে হতে হবেই, সামান্য একদঙ্গল ডাকাতের সর্দার নয়।

কিন্তু ফোমিনের দলবলকে 'ডাকাত' বলতে একটুও দ্বিধা নেই চুমাকফের। গলা ভেঙে গেলেও তর্ক করবে, ফোমিনকে বোঝাবেই যে সেও আসলে একটি উঁচুদরের ডাকাত। একলা থাকলেই জোর তর্কাতর্কি শুরু হয়ে যায় দুজনের মধ্যে।

রাগে মুখ কালো করে ফোমিন চেঁচায়—আমি সোভিয়েত হুকুমতের বিরুদ্ধে আদর্শের লড়াই করছি! আর তুমি আমাকে যা-তা বলে গালমন্দ করছ। তুমি গাধা, জানো আমি আদর্শের জন্য লড়ছি?

চুমাকফ আপত্তি জানায়—ত্থাখো, আমাকে বোকা বোঝাতে এসো না! আমায় তুমি কী শেখাবে? আমি তো শিশু নই! মহা আদর্শবাদী! তুমি হলে জন্ম ডাকাত, তার বেশী কিছুই নও। কথাটাকে এত ভয় কীসের তোমার? আমি তো বুঝতেই পারি না!

—কেন আমায় অপমান করো? নোংরামুখো আবর্জনা! আমি গবরমেণ্টের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি। হাতিয়ার নিয়ে লড়ছি গবরমেণ্টের বিরুদ্ধে। ডাকাত হয়ে গেলাম কেমন করে?

—ঠিক ওই কারণেই তো ডাকাত। গবরমেণ্টের সঙ্গে লড়ছ বলেই তো। চিরকাল ডাকাতরাই গবরমেণ্টের বিরুদ্ধে লড়ে, অ[illegible]মান কাল থেকে। সোভিয়েত গবরমেণ্ট যাই হোক না কেন গবরমেণ্ট তো বটেই। ১৯১৭ সাল থেকে সে গদিতে রয়েছে, তার বিরুদ্ধে যে লড়বে সেই ডাকাত।

—আরে মুখ্যু! জেনারেল ক্রাস্নফ, কিংবা দেনিকিন? তাঁরাও কি ডাকাত ছিলেন?

—তাছাড়া আর কী? ডাকাতই, তবে পদক-টদক আঁটতেন এই যা! পদকেরই বা কী দাম আছে বলো। তুমি আমিও আঁটতে পারি।…

তেমন লাগ্‌সই যুক্তি খুঁজে না পেয়ে ফোমিন ঘুষি ছুঁড়ে থুতু ফেলে অর্থহীন তর্কের ছেদ টানে। চুমাকফকে কিছু বোঝানো কারুর কর্ম নয়।

* *

দলে যারা যোগ দিয়েছিল তাদের বেশির ভাগেরই চমৎকার হাতিয়ার আর সাজ-পোশাক। প্রায় সবারই ভালো ঘোড়া আছে একটানা চলবার উপযুক্ত, দিনে ষাট মাইল চলতে পারে অনায়াসে। কারুর আবার দুটো ঘোড়াও আছে। একটায় চড়ে, আরেকটাকে পাশে পাশে টেনে নিয়ে যায়। দরকার হলে ঘোড়া বদল করে নেয়, পালা করে বিশ্রাম দেয়। দুটো ঘোড়া নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে করলে দিনে ১২০ মাইলও যেতে পারে।

একদিন ফোমিন বললে গ্রিগরকে :

—যদি শুরুতে আমাদের প্রত্যেকের দুটো করে ঘোড়া থাকত তাহলে কোন্ শয়তানে ধরতে পারত আমাদের। মিলিশিয়া আর লালফৌজের লোকেরা তো সাধারণ লোকের ঘোড়া নেবেই না, সে ঝোঁকই নেই তাদের। কিন্তু আমরা যা খুশি তাই করতে পারি। প্রত্যেককে একটা করে বাড়তি ঘোড়া দেব। তাহলে আমাদের ধরতে পারবে না কখনো। বুড়োরা বলে আগেকার দিনে নাকি তাতাররা ওইভাবেই চড়াও হত, প্রত্যেকের দু'দুটো ঘোড়া, এমন-কি তিনটেও থাকত মাঝে মাঝে। এমন সওয়ারদের পাকড়াবে কে? আমাদেরও ঠিক ওইরকম করতে হবে। তাতারদের কাণ্ডজ্ঞানের আমি বহুত তারিফ করি।

অল্প কদিনের মধ্যে অনেক ঘোড়া হাতালো ওরা। কিছুকালের মতো ওদের ধরা সত্যিই বড়ো দুষ্কর হয়ে উঠেছিল। ভিয়েশেন্স্কায় নতুন গড়েওঠা সরকারী ঘোড়সওয়ার মিলিশিয়া বৃথাই ওদের ধরবার চেষ্টা করতে লাগল। ফোমিনের সংখ্যাল্প সেপাই আর অতিরিক্ত ঘোড়া শত্রুকে অনায়াসেই পেছনে ফেলে দেয়, অনেকটা দূরে এগিয়ে থাকে, ফলে তেমন সাংঘাতিক মোকাবিলা কিছু হতে পারে না।

তা সত্ত্বেও মে-মাসের মাঝামাঝি ওদের দলের চেয়েও চারগুণ বড়ো একটা বাহিনী ওদের কোণঠাসা করে ফেলল উস্ত-খপেরস্ক্ জেলার ববর্ভ্স্কি থেকে খানিক দূরে, ডন নদীর ধারে। ছোটখাটো একটা লড়াইয়ের পর দল ভেঙে নদীর পাড়ে বরাবর পশ্চাদপসরণ করতে শুরু করল, হতাহত নিয়ে ক্ষতি হল আটজন। এ লড়াইয়ের পরই ফোমিন গ্রিগরকে প্রধান নায়কের পদ নিতে অনুরোধ করলে।

—আমাদের একজন শিক্ষিত মানুষ দরকার, যাতে প্ল্যান মাফিক, ম্যাপ দেখে চলা যায়। নতুবা কবে আমাদের চেপে ধরে খতম করে দেবে কে জানে। তুমি একাজের ভার নাও, গ্রিগর পান্তালিয়েভিচ।

গ্রিগর চিন্তিত ভাবে বললে—মিলিশিয়া সেপাইদের ধরে তাদের মুণ্ডু কেটে নিতে আবার নায়কের দরকার কীসের?

—প্রত্যেক ফৌজীদলেরই নায়ক থাকা উচিত। বাজে কথা বোলো না!

—যদি নায়কের এত অভাব তো চুমাকফকেই ভার নিতে বলো না কেন।

—কিন্তু তুমি নিতে চাও না কেন ভার ?

—আমি যে ওসব বুঝি না।

—চুমাকফ বোঝে ?

—না, চুমাকফও বোঝে না।

—তাহলে কেন অযথা ওর নাম বলছ ? তুমি হলে অফিসার ; তোমার একটু জ্ঞান নিশ্চয়ই আছে। কৌশল-কায়দা তো তোমার কিছু কিছু জানা থাকবার কথা।

—তুমিও যেমন ফৌজীদলের কমাণ্ডার, আমিও তেমনি অফিসার! আমাদের কৌশল তো একটাই : স্তেপের মাঠে দৌড়ে বেড়ানো আর চোখের পাতা উল্টে রাখা।—বিদ্রূপের সুরে বললে গ্রিগর।

গ্রিগরের দিকে চেয়ে চোখ টিপলে ফোমিন। আঙুল উঁচিয়ে শাসালে :

—তোমার মতলব আমার বোঝা হয়ে গেছে! খালি আড়ালে থাকছ? আলোর সামনে আসবে না ? ওতে তুমি পার পাবে না ভাই! সে তুমি ছোট ফৌজীদলের নায়কই হও আর প্রধান সেনাপতিই হও। ওরা তোমাকে পেলে কি এমনিই ছেড়ে দেবে ভেবেছ ? ভ্যাখো, সবুর করে!

—সে কথা একেবারেই ভাবছি না আমি। তুমি ভুল করেছ!—গ্রিগর ওর তলোয়ারের বাঁটটা এক দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বলে—কিন্তু আমি যা একেবারেই জানি না সে-কাজের ভার নিতেও চাই না।

—যদি না নিতে চাও নিও না। তোমাকে বাদ দিয়েই আমরা কোনোরকমে চালিয়ে নেব।—ফুঁসিয়ে উঠে ফোমিন তার মতামত জানিয়ে দিলে।

* * *

এ অঞ্চলের পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ বদলে যাচ্ছে। যে সব ধনী কসাকদের দরজা ফোমিনের জন্য আগে খোলা থাকত অ[illegible]। সেবার মস্ত আয়েজনে, এখন ওর সামনেই সে সব দরজায় খিল পড়েছে। গ্রামে ওদের দলবল এলে বাড়ির মনিবরা হুড়োহুড়ি করে পালায়। ফলবাগিচায়, বাগানে লুকিয়ে থাকে। বিপ্লবী ভ্রাম্যমাণ আদালত ভিয়েশেনস্কায় এসেছিল। যে-সব কসাক আগে ফোমিনকে আশ্রয় দিয়েছিল তাদের অনেককে কঠিন শাস্তি দিলে তারা। আদালতের রায়ের খবর জেলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। ডাকাতদের প্রতি যারা খোলাখুলি প্রীতি দেখিয়েছিল তাদের মনের ওপর তার প্রভাবও পড়ল সেই রকম।

দিন পনের উজানী ডন এলাকার সমস্ত জেলাগুলোতে ছোটাছুটি করলে ফোমিন। এখন দলের প্রায় ১০০ জন তলোয়ারধারী সেপাই। তাড়াতাড়ি-

করে গড়ে তোলা কোনো ঘোড়সওয়ার দল এখন আর ওদের পেছু নিচ্ছে না, এখন যারা তাড়া করে আসছে তারা ১৩নং অশ্বারোহী বাহিনীর একেকটা স্কোয়াড্রন—দক্ষিণ রণাঙ্গন থেকে বদলি হয়ে আসা।

আজকাল ফোমিনের যারা সাথী তারা সব দূর দেশের মানুষ। নানা বাঁকাচোরা রাস্তায় তারা ডন এলাকায় এসে ঢুকে পড়েছে। কেউ কেউ হয়তো বন্দী দল থেকে পালিয়ে এসেছে কিংবা জেলখানা বা বন্দীশিবির থেকে। কিন্তু বেশির ভাগই হল মাস্‌লাকের দলভ্রষ্ট কয়েক ডজন ঘোড়সওয়ার, অথবা কুরোচ্‌কিন দস্যুদলের ভগ্নাবশিষ্ট সেপাইরা। মাস্‌লাকের লোকজন ইচ্ছে করেই আলাদা আলাদা দলে ভেঙে গিয়েছিল, কিন্তু কুরোচ্‌কিনের দল ভাঙতে চায়নি। তারা গোটাগুটিই আলাদা হয়ে রইল, এক জোট বেঁধে। ফৌজের আর সব লোকদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখল নিজেদের। যুদ্ধে হোক, শিবিরে হোক, তারা একসঙ্গে কাজ করে, এক কাঠ্‌টা হয়ে থাকে আর কোনো সমবায় দোকান বা গুদোমবাড়ি লুঠ করে সব লুঠের মাল একজায়গায় জড়ো করে সমান ভাগবাঁটরা করে নেয়, সাম্যের আদর্শ পালন করে কঠোর ভাবে।

ফোমিনের দলে এমনিতেই রংবেরঙ্‌, নানান্‌ জাতের খিচুড়ি, তার ওপর ধুকড়ি সির্কাশিয়ান কোর্তাপরা কিছু 'তেরেক্‌', আর 'কুবান' কসাক জুটেছে; দুজন কাল্‌মিকও রয়েছে, একজন লাৎভীয় আছে হাঁটু অবধি উঁচু শিকারী বুট পায়ে। আর রয়েছে ডোরা গেঞ্জি রংজ্বলা খালাসি-মোজাওয়ালা পাঁচজন এনার্কিস্ট নাবিক।

ওদের মার্চ করে যেতে দেখে চুমাকফ একদিন বললে ফোমিনকে—তবু তুমি তর্ক করবে ডাকাত দলের নায়ক তুমি নও বলে। কিন্তু এদের কী বলা যাবে? আদর্শের জন্য লড়াকু বীর? আর একজন চাপকান খোলা পুরুত আর পাতলুনধারী গোটাকত শুয়োর হলে একেবারে ষোলোকলা, সব অবতারের সমাবেশ হয়।

ফোমিন গায়ে মাখলে না টিপ্পনিটুকু। ওর একমাত্র চিন্তা যত বেশী সম্ভব লোক জড়ো করা। স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের সময় ও কিছুর বাছবিচার করে না। যারা ওর হুকুমমতো কাজ করার ইচ্ছা জানায় তাদের ও নিজেই সরাসরি প্রশ্ন করে। সংক্ষেপে বলে:

—তুমি কাজের উপযুক্ত। নেব তোমাকে। আমার প্রধান সেনাপতি চুমাকফের কাছে যাও তোমাকে কোনো একটা ফৌজীদলে ভর্তি করে নেবে, হাতিয়ারও দেবে।

মিগুল্‌নিস্ক জেলার কোনো এক গাঁয়ে ফোমিনের সামনে হাজির করা হল ফিটফাট পোশাকপরা কোঁকড়া চুল কালচেপানা এক ছোকরাকে। দলে যোগ দেবার বাসনা জানালে সে। প্রশ্ন করে ফোমিন জানলে সে রস্তভের লোক, সশস্ত্র ডাকাতির অপরাধে সম্প্রতি শাস্তি পেয়েছিল, কিন্তু রস্তভ জেলখানা

থেকে পালিয়েছে। এখন ফোমিনের খবর শুনে উজানী ডন এলাকায় এসেছে।

ফোমিন জিজ্ঞেস করে—তোমার জাত কী? আরমেনিয়ান, না বুলগারিয়ান?

—আমি ইহুদী।—অপ্রতিভ হয়ে জবাব দিলে ছেলেটা।

এমন একটা বিস্ময়জনক স্বীকারোক্তিতে ফোমিন হতভম্ব হয়ে গেল। খানিকক্ষণ চুপ করে রইল সে। এরকম অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির মধ্যে কী জবাব দেবে ভেবেই পেল না।

মাথা চুলকে একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বললে—তা ইহুদী আছো তো আছো।...এতে আমরা নাক সিঁটকোই না। দলে একটা লোক বাড়ল এই যা। কিন্তু ঘোড়া চালাতে পার? না? শিখে নেবে! গোড়াতে তোমাকে একটা নরম-সরম ছোট ঘুড়ী দেব, শিখে ফেলবে। চুমাকফের কাছে যাও, সে তোমাকে পল্টনে ভর্তি করে নেবে।

কয়েক মিনিট বাদে চুমাকফ রেগে কাঁই হয়ে ঘোড়া দাবড়ে এল ফোমিনের কাছে।

—তুমি কি পাগল হলে, না ঠাট্টা করছ?—ঘোড়ার লাগাম রুখে সে চেঁচিয়ে বললে—কোন্ আক্কেলে একটা ইহুদীকে পাঠালে আমার কাছে? আমি নেব না ওকে! মরুক গে যেখানে পারে।

ফোমিন ঠাণ্ডা মাথায় বলে—আরে নিয়ে নাও, নিয়ে নাও; এরপর আর নেব না।

চুমাকফ মুখে গাজলা তুলে গাঁক গাঁক করতে লাগল—আমি পারব না! মেরে ফেলব তবু নেব না! কসাকরা এই নিয়ে চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে। তুমিই গিয়ে ওদের সঙ্গে কথা বল।

ওরা যখন তর্ক করছে আর পরস্পরকে শাপমণ্যি করছে কসাকরা তখন ছোকরা ইহুদীকে একটা মালগাড়ির পাশে ধরে তার ছুঁচের-কাজ-করা জামা আর সুতীর পাতলুনটা খুলে নেবার জোগাড় করছি । কসাকদের একজন বললে:

—গাঁয়ের ওপাশে একটা পুরনো ঝোপ দেখতে পাচ্ছিস্? যা, ওখানে ছুটে গিয়ে শুয়ে পড়ে থাক্। আমরা চলে যাওয়া অবধি ওইখানেই থাকবি, চলে গেলে তুই উঠে যেখানে খুশি যাস্। আমাদের ধারে কাছে আর আসবি না। এলে খুন করে ফেলব। তুই বরং রস্তভে তোর মার কাছে ফিরে যা। লড়াই করা তোদের ইহুদীদের কম্ম নয়। মহাপ্রভু তোদের ব্যবসা করতে শিখিয়েছেন, লড়াই করতে নয়। তোদের ছাড়াই ও কাজটা আমরা চালিয়ে নিতে পারব।

ইহুদীটিকে নেয়া হল না দলে, কিন্তু সেদিনই কসাকরা ধরল আধা-নিরেট পাশাকে। পাশাকে ভিয়েশেন্স্কার সব কটি গাঁয়ের লোকই চেনে। ওকে

দু'নম্বর পল্টনে ভর্তি করার সময় কসাকরা তো হেসেই খুন! স্তেপের মাঠে পাকড়াও করে ওকে গ্রামের মধ্যে আনা হল। একজন মৃত লাল-ফৌজী সেপাইয়ের উর্দি পরানো হল ওকে গুরুগম্ভীর ভাবে। তারপর রাইফেল চালাতে শেখাল কসাকরা, কীভাবে তলোয়ার ঘোরাতে হয় তাও শেখাল।

গ্রিগর যাচ্ছিল খুঁটিতে বাঁধা ওর ঘোড়াটাকে দেখতে। পথে অত ভিড় দেখে সে ঘুরে দাঁড়াল। ব্যাপারটা কী? হো-হো হাসি শুনে আরো তাড়াতাড়ি পা বাড়ালো সে। হঠাৎ সবাই চুপ করে যেতে ওর কানে এল কারুর গম্ভীর মাতব্বরি গলা:

—না, না, ওভাবে নয় পাশা! ওভাবে কি কেউ তলোয়ার ঘোরায়? কাঠ কাটতে হলে ওইরকম করে, মানুষ কাটবার সময় নয়। এইভাবে করবে বুঝলে, এই ছাখো। লোকটাকে যখনি ধরবে সঙ্গে-সঙ্গে তাকে হুকুম করবে হাঁটু গেড়ে বসতে, নয়তো দাঁড়ানো অবস্থায় তাকে কাটতে বড়ো মুশকিল হবে তোমার। সে তো হাঁটু গেড়ে বসল, তখন তুমি তার পেছন থেকে এইভাবে এলে। এসে তার গর্দানের ওপর বসালে এক কোপ।...সোজা পোঁচে কাটতে যেও না, বেশ একটু তেরছা করে তলোয়ার চালাবে।...

সবাই ঘিরে দাঁড়িয়ে। মাঝখানে নির্বোধ লোকটা অ্যাটেনশন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে শক্ত করে চেপে ধরে আছে খোলা তলোয়ারের বাঁট। হাসিমুখে ধূসর চোখদুটো মিটমিট করে সে শুনছে উপদেশগুলো। ঠোঁটের দুকোণ থেকে ফেকো বেরিয়েছে, ঘোড়ার জাবনা খাওয়ার সময় যেমন হয়। তামাটে লাল দাড়ি বেয়ে প্রচুর লালা গড়িয়ে পড়ছে বুকের ওপর অবধি। নোংরা ঠোঁট চেটে কোনোরকমে তোতলাতে তোতলাতে বললে:

—বুঝতে পেরেছি সবই, বাছা...কাজ-টা কি ঠিক? ঈশ্বরের দাসকে আমি হাঁটু গেড়ে বসাচ্ছি, গর্দান চুপিয়ে দিচ্ছি...একেবারে এফাঁক ওফাঁক। তা তোমরা আমাকে পাতলুন দিয়েছ, জামা দিয়েছ, জুতো দিয়েছ...খালি একটা কোট আমার নেই।...ছোট একটা কোট আমায় দিতে পার, তখন তোমাদের খুশী করে দেব! প্রাণপণে চেষ্টা করব খুশী করতে!

—কোনো কমিসারকে মারতে পারো তো একটা কোটও হয়ে যাবে। কিন্তু গেল বছর তোমার বিয়ে হল কেমন করে সেইটে শোনাতে হবে।—একজন কসাক প্রস্তাব করলে।

বোকাটার বড়ো বড়ো ঘোলা চোখে একটা সত্যিকারের আদিম ভয়ের চিহ্ন ফুটে ওঠে। একরাশ গালিগালাজ করে অবশেষে সকলের হাসির হর্‌রার মধ্যে সে বলতে শুরু করে কী একটা গল্প। দৃশ্যটা এমনই গুক্কারজনক যে গ্রিগর শিউরে উঠে তাড়াতাড়ি ফেরার পথ ধরে। একটা তিক্ততা আর

প্রচণ্ড রাগের অনুভূতি জাগে নিজের ওপরে, সমস্ত ঘৃণ্য জীবনটার ওপরেই। মনে মনে ভাবে—এইসব জীবের সঙ্গে আমি কিনা নিজের ভাগ্যটাকে বেঁধেছি!

খুঁটিগুলোর কাছে এসে গ্রিগর শুয়ে পড়ে। কানটা যতদূর সম্ভব চেপে রাখে যাতে ওই নির্বোধটার চিৎকার আর কসাকদের প্রচণ্ড হাসির শব্দ না শুনতে হয়। নিজের তাজা সুভুক্ত ঘোড়াগুলোর দিকে চেয়ে ওদের চমৎকার স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখে গ্রিগর সংকল্প করে—কালই সরে পড়ব! আর বেশী দেরি করা ঠিক নয়! উশাকফ্ নামে একজন মৃত মিলিশিয়া সেপাইয়ের কাছ থেকে যে সব দলিলপত্র পাওয়া গিয়েছিল সেগুলো সে তার জেব্বাকোটের আস্তরের মধ্যে সেলাই করে রেখেছে। গেল দু'হপ্তা ধরে গ্রিগর ওর ঘোডাগুলোকে তৈরি করে নিচ্ছে সংক্ষিপ্ত দূরত্ব দ্রুত ছুটে যাবার উপযুক্ত করে! নিয়মিত সময়ে জল খাওয়ায়। ফৌজী ঘোড়াদের জন্য এর আগেও যা ও করেনি এখন খুব যত্ন করে দলাই মলাই করছে। রাতে আইনি-বেআইনি নানা উপায়ে ওদের দানা জোগাড করে। আর সব ঘোডার চেয়ে অনেক তরতাজা দেখায় ওর ঘোডাগুলোকে। বিশেষ করে ছাইরঙের ছোপওয়ালা উক্রেইনীয় ঘোড়াটাকে। সমস্ত গা যেন তার তেল-পিছল, রোদ পডে বালাম্‌চি ঝিক্‌মিক্ করছে ককেসীয় মীনাকাজ-করা রুপোর মতো।

এমন ঘোডা নিয়ে সে অনায়াসেই যে কোনো শত্রু তাড়া করলে পালিয়ে যেতে পারে। উঠে দাঁড়ায় গ্রিগর। এগিয়ে যায় কাছের কুঁডেঘরটার দিকে। এক বুডী বসেছিল গোলাঘরের চৌকাঠে। গ্রিগর তাকে সসম্ভ্রমে জিজ্ঞেস করলে—একটা কাস্তে হবে, দিদিমা?

—ছিল তো আমাদের একটা। ভগবান জানেন কোথায় আছে সেটা। কাস্তের কী দরকার?

—তোমার বাগান থেকে খানিকটা সবুজ ঘাস কেটে নেবার ইচ্ছে ছিল। নিতে পারি?

বুড়ী একটু চিন্তা করে বললে:

কবে আমাদের ঘাড় থেকে নামবে বল তো বাপু? কেবলি এটা দাও, সেটা দাও। একদল এসে ফসল দাবি করলো, তো আরেকদল এসে যা কিছু নজরে পড়ল সব কেড়েকুড়ে নিয়ে চলে গেল। কাস্তে আমি তোমায় দিচ্ছি না! যা খুশি করো। আমি দেব না।

—বুড়ী মা, একটু ঘাসও ছেড়ে দিতে পারবে না? কেন গো?

—তুমি কি ভাবো একবার ঘাস তুলে নিলে সেখানে আবার ঘাস গজাবে? গরুদের খাওয়াব কী?

—কেন? স্তেপের মাঠে ঘাস নেই?

—বেশ তো, তাহলে তুমিই সেখানে গিয়ে ঘাস কাটো না, বাছা আমার? স্তেপে ঘাস তো অঢেল।

গ্রিগর বিরক্ত হয়ে বললে:

—দিদিমা ভালো চাও তো কাস্তেটা দাও। সামান্য একটু ঘাস কেটে নেব। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। তা নইলে আমাদের ঘোড়া যদি তোমার বাগানে ছেড়ে দিই, সবই তুলে নিতে পারি।

কঠিন চোখে গ্রিগরের দিকে তাকাল বুড়ী, তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিল।

বললে—যাও, নিজেই ছাখো গে'। চালাঘরের ভেতরেই টাঙিয়ে রাখা আছে নিশ্চয়।

চালাঘরে একটা পুরনো ভাঙা কাস্তে পেল গ্রিগর। বুড়ীর পাশ দিয়ে আসবার সময় পরিষ্কার শুনতে পেল বুড়ী বলছে: তোমাদের হাত থেকে আর উদ্ধার নেই, হতভাগার দল!

এমন একটা ব্যাপার যা গ্রিগরের কিছুতেই আর রপ্ত হল না। ওদের দলের সম্পর্কে কসাকদের ধারণা অনেকদিন থেকেই জানা আছে গ্রিগরের! সাবধানে পরিষ্কার করে কাস্তে চালিয়ে ঘাস কেটে নিতে নিতে গ্রিগর ভাবে—আর ওদের ভুলই বা বলি কী করে! আমাদের ওরা চাইবে কোন্ দুঃখে? কী দায় পড়েছে? আমাদের নিয়ে কারুর কোনো প্রয়োজন নেই। প্রত্যেককে শান্তিতে কাজ করতে বা বাঁচতে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছি তো আমরাই। এসব এখন বন্ধ করতে হবে। বন্ধ করার সময় হয়ে গেছে!

ঘোড়াগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে এই সব চিন্তা করছিল আর লক্ষ্য করছিল কেমন লোভীর মতো তারা কালো মখমল ঠোঁটের ফাঁকে কচি সবুজ ঘাসের ডাঁটিগুলো চিবুচ্ছে। এমন সময় একটা ভারি তরুণ কণ্ঠে ওর চমক ভাঙল, গলার আওয়াজটায় সবে ভাঙন ধরেছে:

—কী চমৎকার ঘোড়াটা! একেবারে রাজহাঁসের মতো!

বক্তার দিকে ফিরে তাকায় গ্রিগর! তরুণ কসাক, সবে দলে যোগ দিয়েছে ছেলেটি। গ্রিগরের ছাইরঙা ঘোড়াটার দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে আর মাথা নেড়ে নেড়ে তারিফ জানাচ্ছে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে ঘোড়াটার দিকে চেয়ে সে বেশ কবার ঘুরে ঘুরে দেখলে। জিভ দিয়ে চুকচুক্ আওয়াজ করে বললে—এ কী আপনারই ঘোড়া?

—কেন তা জানবার তোমার দরকার?—একটু রূঢ়ভাবে জবাব দিলে গ্রিগর।

—আসুন বদলাবদলি করি! আমার একটা বেঁড়ে ঘোড়া আছে, খাঁটি ডন রক্ত তার শরীরে। যে কোনো বিপদের মধ্যে যেতে পারে, খুব তেজী! কী তেজ তার বিশ্বাস করতে পারবেন না। যেন বজ্রের মতো!

—চুলোয় যাও!—শুকনো গলায় গ্রিগর বলে।

ছোকরাটি দু'এক মুহূর্তের জন্য চুপ করেছিল, তারপর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে কাছেই এক জায়গায় বসলে। ছাইরঙাটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে ফের টিপ্পনি কাটলে :

—জানেন, ঘোড়াটার শিরাস্ফীতির ব্যারাম আছে।

গ্রিগর নিঃশব্দে দাঁতে একটা কাঠি খোঁচায়। এই সিধেসাধা ছেলেটিকে ওর ভালেই লাগতে শুরু করেছিল।

—বদ্‌লাবদলি করবেন নাকি দাদা ?

গ্রিগরের দিকে মিনতিভরা চোখে চেয়ে সে বললে ধীরে ধীরে।

—না, করব না ! ঘোড়ার সঙ্গে তুমি এলেও বদলাবদলি হবে না।

—কিন্তু এটিকে পেলেন কোথায় ?

—আমি নিজেই বানিয়েছি।

—আরে, সত্যি কথা বলুন না !

—যে ফটক দিয়ে আসে তেমনিই এসেছিল : একটা ঘুড়ী একে ছেড়ে দিয়ে গেছে।

—নাঃ এমন গাধার সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই ! অসন্তুষ্ট গলায় কথাগুলো বলে ছেলেটি চলে গেল।

গ্রিগরের সামনে গ্রামটা পড়ে আছে শূন্য, যেন মৃত। ফোমিনের লোকজন ছাড়া একটি প্রাণীও চোখে পড়ে না। গলির মধ্যে একটা পরিত্যক্ত মালগাড়ি, উঠোনে একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর তাড়াতাড়িতে কুড়োল বসানো, কাছেই একটা আধা পালিশ-করা তক্তা। রাস্তায় মাঝখানে অলসভাবে মুড়ো ঘাস চবোচ্ছে কয়েকটা ছাড়া বলদ, কুয়োর কলের ধারে উল্‌টনো বাল্‌তি। সমস্ত দৃশ্যটা দেখলেই মনে হয় গ্রামের শান্ত জীবন যেন আচম্‌কা রূঢ়ভাবে ব্যাহত হয়েছিল, গ্রামবাসীরা তাদের কাজ অসমাপ্ত রেখেই কোথাও লুকিয়ে পড়েছে।

কসাক ঘোড়সওয়ার রেজিমেণ্ট পূব প্রাশিয়ার ভেতর দিয়ে যাবার সময়ও গ্রিগর ঠিক এমনি ধরনের ছন্নছাড়া রূপ দেখেছিল—দ্রুত পলায়নের যাবতীয় চিহ্ন। এখন বেঁচে থেকে নিজের দেশেই প্রত্যক্ষ করছে সেই জিনিস। সেবারও একই রকম বিষণ্ণ আর ঘৃণাভরা দৃষ্টি দিয়ে জার্মানরা তাদের অভ্যর্থনা করেছিল, আর এখন সেই দৃষ্টি দেখতে পাচ্ছে উজানী ডনের কসাকদের চোখে। বুড়ির সঙ্গে কথাবার্তাগুলো মনে পড়ে গ্রিগরের। জামার কলারের বোতাম খুলে দিতে দিতে ব্যথিত দৃষ্টিতে এদিকে ওদিকে চায়। সেই হতচ্ছাড়া যন্ত্রণাটা আবার শুরু হয়েছে বুকের মধ্যে।

সূর্যের খরতাপে মাটি পোড়ে। রাস্তাটাকে ঘিরে রয়েছে দুর্বোঘাস, ঘোড়ার ঘাম আর ধুলোর ভ্যাপসা গন্ধ। ফলবাগিচাগুলোর উঁচু উইলো-গাছের মগডালে নোংরা বাসার ধারে বসে কাকেরা ডাকছে কর্কশকণ্ঠে।

পাহাড়ের মাথায় কোনো ঝর্ণার জলে পুষ্ট একটা ছোট স্তেপ নদী গ্রামের ভেতর দিয়ে ধীরে বয়ে চলেছে গ্রামটিকে দুভাগে ভাগ করে। নদীর দুপাশেই লম্বা-চওড়া কসাকবাড়ির উঠোনগুলো একেবারে জলের কিনারা অবধি গুঁড়ি মেরে এসেছে, আষ্টেপৃষ্ঠে ঘন বাগানের হাঁপধরা চাপ। কুটিরগুলোর জানলার ওপর দিয়ে ডালপালা ছড়িয়েছে চেরীগাছ, সূর্যের দিকে সবুজ পাতা আর কচি ফলের গুচ্ছ বাড়িয়ে দিয়েছে আপেলের দৃঢ় শাখাগুলো।

ঝোপড়া কলাগাছের ঘন বনের দিকে ঝাপ্‌সা চোখে তাকায় গ্রিগর। ছ্যাখে কুটিরের হলদে খড়খড়ি আর খড়ের চাল, কুয়োর পাড়ে উঁচু হাঁসকল। ফসলমাড়াইয়ের আঙিনার ধারে পুরনো ওয়াট্‌ল্‌ লতার বেড়ার খুঁটির ওপর একটা ঘোড়ার মাথার খুলি। বৃষ্টির জলে ধুয়ে ধুয়ে সাদা হয়ে গেছে। শূন্য চোখের কোঠরগুলো কালো। সেই খুঁটি বেয়েই একটা সবুজ কুমড়োগাছ লতিয়ে উঠেছে। পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে এগিয়েছে আলোর দিকে। একেবারে খুঁটির ডগায় ছোট ছোট আঁকশি দিয়ে ঘোড়ার খুলির দাঁত আর উঁচু অংশ-গুলো জড়িয়ে ধরেছে। কুমড়ো লতার আরেকটা দিক যেন 'একটু অবলম্বনের আশায় এর মধ্যেই হাত বাড়িয়েছে কাছাকাছি একটা বুনো গোলাপের ঝোপের দিকে।

এসব কি আগে কখনো ও স্বপ্নের মধ্যে দেখেছিল? কিংবা দূর শৈশবের দিনগুলোতে? হঠাৎ একটা তীব্র আকূতি ওর হৃদয়কে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলল। বেড়ার ধারে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল গ্রিগর দুহাতে মুখ ঢেকে। চমক ভাঙল দূর থেকে যখন কানে এল একটানা চিৎকার—"ঘোড়ায় চড়ো!"

* * * *

সে রাতে মার্চ করতে করতে সারি ভেঙে বেরিয়ে পড়ল গ্রিগর। যেন এক ঘোড়া থেকে আরেক ঘোড়ায় জিন বদলাতে হবে এমনি ছল করে সে থামল। ধীরে ধীরে দূরে ক্ষীণতর হয়ে যাচ্ছে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ ও দাঁড়িয়ে কান পেতে শোনে। তারপর লাফিয়ে জিনে উঠে রাস্তার কোণাকুণি ছুটিয়ে দেয় ঘোড়া।

তিনমাইল এক নাগাড়ে ঘোড়া দাবড়ায় একবারও না থেমে, তারপর গতি একটু শ্লথ করে দিয়ে কান খাড়া করে শোনে পেছন থেকে কেউ তাড়া করে আসছে কিনা? স্তেপ প্রান্তর নিস্তব্ধ নিথর। শুধু একেক ফালি বেলে জমির ওপর কাদাখোঁচা পাখিরা পরস্পরকে ডাকছে আর অনেক, অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে কুকুরের ডাক।

আঁধার আকাশে একরাশ মিটমিটে তারার সোনালি ফুলঝুরি। নিঃশব্দ তৃনকান্তার, সোমরাজের আদিম তেতো গন্ধে বাতাস ভরপুর। গ্রিগর জিনের ওপর খাড়া হয়ে ওঠে। সমস্ত বুক দিয়ে টেনে নেয় গভীর স্বস্তির নিঃশ্বাস।

॥ আট ॥

ভোর হবার অনেক আগেই তাতারস্কের সামনে বনভূমির মধ্যে ঘোড়া চালিয়ে এল গ্রিগর। গ্রামের ধারে যেখানে ডন নদী অগভীর সেখানে পোশাক খুলে ঘোড়াদের গলায় কাপড়জামা, বুটজুতো, হাতিয়ার বেঁধে কার্তুজের থলিটা দাঁতে চেপে ধরে গ্রিগর জানোয়ারগুলোকে নিয়ে জলে নেমে পড়ল সাঁতরাবার জন্য। অসহ্য ঠাণ্ডায় শরীর হিম হয়ে যাবার জোগাড়। শরীর গরম রাখবার চেষ্টায় গ্রিগর ডানহাতটা তাড়াতাড়ি ছুঁড়তে থাকে জলে আর বাঁহাতে একসঙ্গে চেপে ধরে রাখে লাগামের রশিগুলো। ধীরে ধীরে সাহস দেয় ঘোড়াদের। জলে নেমে ওরা ফোঁস ফাঁস ঘোঁত ঘোঁত করছিল।

নদীর তীরে উঠে গ্রিগর তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নেয়। জিন-দড়া আঁট করে সবেগে ঘোড়াগুলোকে ছোটায় গ্রামের দিকে। এতে যদি একটু গরম হয় ওরা। ভিজে জোব্বাকোটটা, জিনের ভিজে আসনগুলো, ভিজে জামা, সব মিলে শরীরটাকে ওর একেবারে অবশ করে দিয়েছে। দাঁত ঠক্‌ঠক্‌ করে, শিরদাঁড়ায় কাঁপুনি ধরে, সারাদেহ কাঁপতে থাকে। কিন্তু দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই বেশ গরম হয়ে ওঠে শরীর। গ্রামের কাছাকাছি এসে হাঁটা চালে চলতে লাগল। চারিদিকটা দেখে নিয়ে কান খাড়া করে রইল গ্রিগর। একটা নালার ধারে ঘোড়াগুলোকে রাখবে ঠিক করেছে। সোঁতার একেবারে তলায় নেমে এল ঢালু কিনারার আলগা পাথর-নুড়িগুলো ডিঙিয়ে। ঘোড়ার খুরের নিচে নুড়িগুলো শুকনো আর্তনাদ তুলেছে। লোহার নালের ঘা খেয়ে আগুনের স্ফুলিঙ্গ উঠছে।

একটা শুকনো এল্‌ম গাছ। ছেলেবেলা থেকে চেনা। তারই গুঁড়িতে ঘোড়াগুলোকে বেঁধে গাঁয়ের দিকে হেঁটে চলল গ্রিগর।

ওই তো সামনে মেলেখফদের সেই পুরনো বাড়ি। আপেলগাছের ঘন ঝোপ। সপ্তর্ষিমণ্ডলের দিকে মাথা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে কুয়োতলার হাঁসকলটা। উত্তেজনায় হাঁপাতে হাঁপাতে গ্রিগর নদীর পাড়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সাবধানে আস্তাখফদের বাড়ির লতা-বেড়ার ভেতর দিয়ে গুঁড়ি মেরে এগুতে লাগল সে। একেবারে খড়খড়িতোলা জানলাটার কাছে। কেবল শুনতে পাচ্ছে নিজের বুকের ভেতর দ্রুত স্পন্দন আর মাথার মধ্যে ঝিমঝিম রক্তের চাপা গর্জন। আস্তে টোকা দিলে জানলার চৌকাটের ওপর—এত

আস্তে যে নিজেই প্রায় শুনতে পায়নি। আকসিনিয়া নিঃশব্দে জানলার কাছে এসে বাইরে তাকাল। গ্রিগর দেখলে বুকের ওপর দুটো হাত রেখেছে আকসিনিয়া, তারপর শুনতে পেল একটা অস্ফুট কাতরোক্তি বেরিয়ে এল তার গলা থেকে। গ্রিগর তাকে ইশারায় বললে জানলাটা খুলতে। কাঁধ থেকে রাইফেল নামিয়ে নিয়েছে সে। আকসিনিয়া জানলাটা পুরো খুলে দিলে।

—আস্তে! কেমন আছ? দরজা খুলো না। জানলা দিয়েই ভেতরে গলে যাব।—ফিস্‌ফিস্ করে বললে গ্রিগর।

দেয়ালের কিনারায় দাঁড়িয়েছে গ্রিগর। আক্‌সিনিয়ার নিরাবরণ বাহুদুটো জড়িয়ে ধরল ওর গলা। কাঁধের ওপর এমন শিউরে শিউরে কেঁপে উঠছে সেই স্নিগ্ধ মহার্ঘ দুই বাহু যে সেই কম্পন যেন গ্রিগরের দেহেও সঞ্চারিত হল।

তোত্‌লাতে তোত্‌লাতে, প্রায় শুনতে পাওয়া যায় না এমনিভাবে ফিস-ফিসিয়ে বলে গ্রিগর—ক্‌সিনিয়া···সবুর একটু···রাইফেলটা ধরো!

ও চেয়েছিল আকসিনিয়াকে আলিঙ্গন করতে। কিন্তু আকসিসিয়া ধপ্‌ করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ওর সামনে, দুহাতে জড়িয়ে ধরল ওর পা। ভিজে জোব্বাকোটের মধ্যে মুখটা গুঁজে দিয়েছে সে। চাপা কান্নায় কেঁপে উঠতে লাগল ওর দেহ। গ্রিগর ওকে তুলে বেঞ্চির ওপর বসিয়ে দেয়। গ্রিগরের ওপর শরীরের ভার ছেড়ে ওর বুকে মাথা লুকোয় আকসিনিয়া। শান্ত হয়েছে কিন্তু মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে আর দাঁত দিয়ে গ্রিগরের কোটের কলারটা সজোরে কামড়ে ধরে কান্নাটাকে চাপছে, পাছে ছেলেমেয়েরা জেগে ওঠে।

শক্ত মানুষ হলেও নানা দুর্ভোগ সয়ে আকসিনিয়াও যে ভেঙে পড়েছে তাতে সন্দেহ ছিল না। গত কয়েক মাসে তার জীবনও বড়ো তিক্ততার মধ্যে কেটেছে। পিঠের ওপর ওর চুলগুলো আদর করে বুলিয়ে দিলে গ্রিগর, ঘামে ভেজা তপ্ত কপালটাও। প্রাণভরে ওকে কাঁদতে দিয়ে অবশেষে গ্রিগর বললে :

—বাচ্চাগুলো বেঁচেবর্তে আছে তো?

—হ্যাঁ।

—আর দুনিয়া?

—সেও।···বেঁচে আছে···ভালো আছে।···

—মিখাইল বাড়িতে? সবুর সবুর! আর কেঁদো না, আমার জামাটা তোমার চোখের জলে ভিজে গেল যে!···ক্‌সিনিয়া, লক্ষ্মীটি, আর নয়। কাঁদবার সময় এখন নয়। সময় হাতে খুব কম।···মিখাইল বাড়িতে আছে?

আক্‌সিনিয়া মুখ মোছে। ভিজে হাত দুটো দিয়ে গ্রিগরের গাল চেপে ধরে। প্রিয় মানুষটির মুখের ওপর থেকে একবারও দৃষ্টি না সরিয়ে, চোখের জলের সঙ্গে হাসি মিশিয়ে নিচু গলায় বললে :

—আর তো কাঁদব না।···আর কোনদিনও কাঁদব না।···মিখাইল তাতারস্কে নেই, ভিয়েশেন্‌স্কায় আছে গেল দু'মাস ধরে, কোন এক পল্টনে কাজ করছে। এসো, ছেলেপুলেগুলোকে দেখবে একবারটি, আমরা তো ভাবতেই পারিনি তুমি আসবে, আশাই করিনি কখনো···।

মিশাৎকা আর পলিউশকা ঘুমোচ্ছে, বিছানার ওপর হাত পা ছড়িয়ে দিয়ে। গ্রিগর ওদের ওপর ঝুঁকে পড়ে দু'এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে আবার পা টিপে টিপে বেরিয়ে এসে চুপচাপ বসল আকসিনিয়ার পাশে।

—তোমার সব খবর কী?—আক্‌সিনিয়ার চাপা গলায় আতপ্ত আগ্রহ—কেমন করে এসে হাজির হলে? এতদিন ছিলে কোথায়? যদি তোমাকে ধরে ফেলে?

—আমি তোমাকে নিয়ে যাব বলে এসেছি। আমাকে ধরতে পারবে বলে মনে হয় না। তুমি আসবে?

—কোথায়?

—আমার সঙ্গে। আমি দল ছেড়ে দিয়েছি। ফোমিনের দলে ঢুকেছিলাম, শুনেছ বোধ হয়?

—হ্যাঁ। কিন্তু তোমার সঙ্গে কোথায় যাব?

—দক্ষিণের দিকে কুবান কিংবা আরো দূরে। কোনোরকমভাবে খেয়ে পরে থাকতে পারব। কোনো কাজ করতেই আমার লজ্জা হবে না। আমার এই হাতদুটো এখন কাজ চায়, লড়াই নয়। গত ক'মাসে বড্ডো কষ্ট পেয়েছি মনে।·· কিন্তু সেসব কথা পরে হবে।

—বাচ্চাদের কী হবে?

—দুনিয়ার কাছে রেখে যাব। তারপর দেখা যাবে। পরে আমরা ওদেরও নিয়ে যাব। ঠিক আছে তো? আসছ তুমি?

—গ্রিশা ··আমার গ্রিশা···

—আর ওসব নয়। কান্নাকাটি নয়! অনেক হয়েছে! পরে কাঁদা যাবে'খন, অনেক সময় পাওয়া যাবে।···এখন তৈরি হয়ে নাও। ঘোড়াগুলোকে একটা সোঁতার ধারে রেখে এসেছি। বেশ, তাহলে তুমি আসছ?

—কেন, কী ভেবেছিলে তুমি?—হঠাৎ জোরে বলে ফেলেছে কথাগুলো আকসিনিয়া, তাই ভয়ে ঠোঁটের ওপর হাত রেখে ঘুরে তাকাল বাচ্চাগুলোর দিকে। আবার ফিস্‌ফিস্ করে বললে—কী ভেবেছিলে? একা থাকাটা কি আমার পক্ষে খুব সুখের? আমি যাব, গ্রিশা, আমার গ্রিশা। হেঁটে যেতে হয় যাব। তোমার পেছন পেছন হামাগুড়ি দিয়ে যাব, তবু এখানে আর এক মুহূর্তও থাকছি না। তোমাকে ছাড়া বাঁচব না আমি। মেরে ফেলো, তবু ছেড়ে যেও না আবার।

আবেগভরে নিজেকে সে পিষ্ট করে গ্রিগরের দেহের সঙ্গে। গ্রিগর ওকে

চুমু খেয়ে চুপি চুপি জানলার দিকে তাকায়। গ্রীষ্মের রাত বড় ছোট। ওদের তাড়াতাড়ি করা দরকার।

আকসিনিয়া বলে—একটুখানি শুয়ে জিরিয়ে নেবে নাকি!

—কী ভেবেছ তুমি?—সভয়ে বলে ওঠে গ্রিগর—একটু বাদেই ভোর হয়ে যাবে, আমাদের যাওয়া দরকার। পোশাক পরে দুনিয়াকে ডেকে আনো! ওর সঙ্গে একটু কথা বলে নেয়া যাক্। সুখোই খাত অবধি আমাদের অন্ধকারের মধ্যেই চলে যেতে হবে। সারাদিন বনের মধ্যে কাটাব, আবার রাতে চলতে শুরু করব। ঘোড়া চালাতে পারবে?

—বাবা! হ্যাঁ তা সবই চালিয়ে নিতে পারব, ঘোড়ার পিঠেও অনায়াসে চাপতে পারি। আমার তো খালি মনে হচ্ছে স্বপ্ন দেখছি না তো! প্রায়ই তোমাকে স্বপ্নে দেখি···একেকবার একেকরকমভাবে।

চুলের কাঁটাগুলো দাঁতে চেপে ধরে তাড়াতাড়ি চিরুনি চালিয়ে নেয় আকসিনিয়া, নিজের মনেই কী যেন বলতে থাকে। চট্‌পট্ পোশাক পরে দরজার দিকে এগোয়।

জিজ্ঞেস করে—ছেলেদের জাগাব নাকি? ওদের একবার ভাল্ করে দেখে নিতে পারতে।

—না, দরকার নেই!—গ্রিগর দৃঢ়কণ্ঠে বলে।

টুপির ভেতর থেকে তামাকের থলিটা বের করে সিগারেট পাকাতে শুরু করে ও। কিন্তু যেই আকসিনিয়া চলে যায় অমনি তাড়াতাড়ি বিছানার কাছে গিয়ে বাচ্চা দুটিকে অনেকক্ষণ ধরে চুমু দেয়। মনে পড়ে যায় নাতালিয়ার কথা, দুরদৃষ্ট জীবনের আরো অনেক ঘটনার কথা। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে ওর।

চৌকাঠ ডিঙিয়ে আসতেই দুনিয়া বলে: এই যে দাদা, কেমন আছ শেষ অবধি এলে ঘরে? যতই বাবা মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াও···।—তারপরেই শুরু করে দেয় বিলাপ—ছেলেপিলেগুলোর কপালে বোধ হয় ছিল বাপকে দেখা।···বাপ বেঁচে থেকেও তো ওরা অনাথ হয়ে আছে কিনা।

গ্রিগর ওকে বুকের কাছে গিয়ে গম্ভীরভাবে বললে—আস্তে! বাচ্চাগুলোকে জাগিয়ে দেবে! এখন ওসব রাখো তো বোনটি! আগে ঢের শুনেছি। এসব শুনবার জন্য তোমাকে ডাকিনি। আমার ছেলেমেয়েদের রেখে একটু দেখা-শোনা করতে পারবে?

—কিন্তু কোথায় যাচ্ছ তোমরা!

—আমি চলে যাচ্ছি আকসিনিয়াকে নিয়ে। ছেলেমেয়েগুলোকে একটু দেখবে? একটা কাজকর্ম জোগাড় করে তখন এসে নিয়ে যাব ওদের।

—তা আর কী করার আছে? তোমরা দুজনেই যদি চলে যাও আমি

নিশ্চয়ই ওদের দেখব। রাস্তায় তো ফেলে দিতে পারি না, তাছাড়া অচেনা লোকের দয়ার ওপরও ছেড়ে দিতে পারো না ওদের।

গ্রিগর নীরবে ওকে চুমু দিয়ে বলে :

—আমার অজস্র ধন্যবাদ রইল তোর জন্য। আমি জানতাম তুই গররাজী হবি না।

সিন্দুকের ওপর বসে দুনিয়া জিজ্ঞেস করে :

—তোমরা কখন যাচ্ছ? এখুনি?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু বাড়িটার কী হবে? খামার বাড়ির? আকসিনিয়া ইতস্তত করে জবাব দেয় :

—যা তোমার ইচ্ছে কোরো। কাউকে থাকতে দিও কিংবা যা করতে পারো কোরো। কাপড়-চোপড় সম্পত্তি যা রইল তুমিই নিয়ে নিও।

—লোককে কী বলব? তারা যখন জিজ্ঞেস করবে তুমি কোথায়, কী জবাব দেব?

—বোলো তুমি কিছু খবর রাখো না, ব্যস্।—বললে গ্রিগর। তারপর আকসিনিয়ার দিকে ফিরলে—ক্সিনিয়া, চট্পট্ করো! সঙ্গে বেশী কিছু নিও না। শুধু একটা গরম জামা, দু-তিনটে স্কার্ট, সুতী জামা কিছু, আর এখনকার মতো খানিকটা খাবার, ব্যস্।

দুনিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, ঘুমন্ত ছেলেমেয়ে দুটিকে চুমু খেয়ে গ্রিগর আর আকসিনিয়া যখন সদর দরজার কাছে এল তখন ভোরের আলো সবে ফুটতে লেগেছে। ওরা ডনের পাড় বেয়ে নেমে এল। তারপর কিনারা ধরে ধরে এগিয়ে চলল সোঁতাটার দিকে।

গ্রিগর বললে—ঠিক এমনিভাবেই তোমাতে আমাতে মিলে গিয়েছিলাম ইয়াগদ্নয়ে। শুধু তোমার পুঁটলিটা সেবার এর চেয়ে বড় ছিল, আর আমাদের দুজনেরই বয়েস ছিল কাঁচা।......

আনন্দে আত্মহারা হয়ে আকসিনিয়া ওর দিকে কটাক্ষ করে জবাব দেয় :

—কিন্তু আমার কেবলি ভয় হচ্ছে হয়তো দেখব এসবই আমার স্বপ্ন। তোমরা হাতটা দাও তো, ছুঁয়ে দেখি, নয়তো আমার যে বিশ্বাসই হচ্ছে না!—চলতে চলতে গ্রিগরের কাঁধের ওপর চাপ দিয়ে সে নীরবে হাসতে লাগল।

গ্রিগর দেখলে ওর চোখ কেঁদে কেঁদে ফোলা, তবে খুশিতে উজ্জ্বল। রাতভোরের আঁধারিতে ফ্যাকাশে দেখায় গালদুটো। সস্নেহে হাসে গ্রিগর। ভাবে—এমনভাবে চটপট তৈরি হয়ে বেরিয়ে এল যেন কারুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে। কিছুতেই ভয় ওর নেই, আচ্ছাই মেয়ে বটে!

যেন ওর চিন্তার জবাবেই আকসিনিয়া বলে :

—দেখেছ তো কী জাতের মেয়ে আমি।···তুমি শিস্ দিলে আর আমি পোষা কুকুরটার মতো ছুটে এলুম। আমার ভালোবাসা আর তোমাকে পাবার আগ্রহ এমন এক মায়ার বাঁধনে ফেলেছে আমাকে, গ্রিশা।···শুধু দুঃখ হচ্ছে বাচ্চাগুলোর জন্য। তবে আমার নিজের,যেন একটু আহা-উহু করব না। শেষ অবধি তোমার সঙ্গে থাকব, মরণ পর্যন্ত।

ওদের পায়ের শব্দ পেয়ে ঘোড়াগুলো চঞ্চল হয়ে উঠল। খুব তাড়াতাড়ি ভোর হয়ে যাচ্ছে যেন। পূব আকাশে এর মধ্যেই এক চিলতে সরু লাল রেখা ডগডগে হয়ে উঠেছে। ডনের জলের ওপর কুয়াশার আভাস।

ঘোড়াদের বাঁধন খুলে আকসিনিয়াকে জিনের ওপর চড়িয়ে দিলে গ্রিগর। রেকাবের ফিতেটা ওর পায়ের মাপের তুলনায় একটু বেশী লম্বা হয়েছিল। আগে জিনিসটা খেয়াল করেনি বলে চটেমটে গ্রিগর ফিতে খাটো করে তারপর উঠে বসে দ্বিতীয় ঘোড়াটার পিঠে।

—আমার পেছু পেছু এসো ক্সিনিয়া। সোঁতা থেকে পেরিয়ে গিয়ে জোর কদমে চালাব। ওতে তোমার খুব মুশকিল হবে না। শুধু লাগাম দুটো ঢিলে দিও না, তোমার ও-ঘোড়া সেটা বড় পছন্দ করে না। আর হাঁটুদুটো খেয়াল রেখো! একেকসময় বজ্জাতি করে দাঁত দিয়ে হাঁটু কামড়ায়। বেশ, চলো এবার!

সুখোই বনভূমি অবধি প্রায় পাঁচ মাইল রাস্তা। অল্পক্ষণের মধ্যেই ওরা ওটুকু দূরত্ব পার হয়ে এসেছে; সূর্য ওঠার সঙ্গে একেবারে বনের কাছে চলে এল। বনের ধারে ঘোড়া থেকে নেমে গ্রিগর আকসিনিয়াকে নামিয়ে নিল।

—তারপর, কেমন মনে হল? অভ্যেস না থাকলে ঘোড়ায় চড়া একটু কঠিন বৈকি!—হেসে বললে গ্রিগর।

জোরে ঘোড়া দাবড়াবার ফলে লাল হয়ে উঠেছিল আকসিনিয়ার মুখখানা। কালো চোখের ঝিলিক দিয়ে জবাব দিলে সে:

—বেশ তো! পায়ে হাঁটার চেয়ে ভালো। শুধু আমার পা দুটো···।—একটু অপ্রতিভভাবে হাসল—তুমি একটু ওপাশে ফেরো তো গ্রিশা, দেখি কী হল। চামড়াটা জ্বলছে···ঘষটে গেছে নিশ্চয়।

—ও কিছু না, ঠিক হয়ে যাবে।—আশ্বাস দেয় গ্রিগর—একটু হাঁটো, পা দুটো কাঁপছে তোমার।—চোখ দুটো একটু ঘোঁচ করে ঠাট্টার সুরে বলে—আঃ, কসাক ছুঁড়ি!

খাতের একেবারে শেষ মাথায় একটা ছোট বনভূমির দেখা মিলল। গ্রিগর বললে:

—এই হবে আমাদের শিবির। সংসার পাতো ক্সিনিয়া!

ঘোড়াদের জিনসাজ খুলে একটু হাঁটিয়ে একটা ঝোপের তলায় জিন আর

হাতিয়ারগুলো রেখে দিলে গ্রিগর। ঘাসের ওপর প্রচুর শিশির জমেছে ঘন হয়ে। শিশিরের নিচে ঘাসগুলোকে দেখায় কপোত-ধূসর। কিন্তু পাহাড়ের ঢালে যেখানে ভোরের আঁধারি এখনো সম্পূর্ণ কাটেনি সেখানকার ঘাস ঝাপসা নীল। আধফোটা ফুলের বনে হলদে ভোমরারা ঝিমুচ্ছে। ভারুইপাখিরা স্তেপের মাঠে ঝাঁক বেঁধে উড়ছে। ফসলী ক্ষেতে, স্তেপের সুঘ্রাণ ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে কোয়েলের ডাক ঘুমোতে চল্! ঘুমোতে চল্! একটা ওক ঝোপের কাছে গ্রিগর সটান ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল মাথার নিচে একটা জিন রেখে। কোয়েলদের পাখার সজোর ঝটপটানি, ভাড়ুইদের নেশা-ধরানো গান আর ডনের ওপার থেকে সারা রাতের তপ্ত বালির নিঃশ্বাস কুড়িয়ে-আনা গরম হাওয়া গ্রিগরের চোখে ঘুম এনে দেয়। গ্রিগর আজ পর পর ক'রাত ঘুমোয়নি। সুতরাং ওর পক্ষে এখন ঘুমিয়ে পড়া বিচিত্র নয়। কোয়েলদের ডাকের মর্ম ও বুঝেছে, তাই ঘুমের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে ওর চোখ বুজে আসে। আকসিনিয়া বসেছিল ওর পাশে, চুপচাপ! একটা ফুলের বেগুনি পাঁপড়ি ঠোঁট দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলছিল কী ভাবতে ভাবতে।

—গ্রিশা, আমাদের কেউ ধরে ফেলবে না তো এখানে?—নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল ও ফুলের ডাঁটা দিয়ে গ্রিগরের কর্কশ গালটা ছুঁয়ে।

অতি কষ্টে তন্দ্রার ঘোরটা কাটিয়ে গ্রিগর ভারি গলায় জবাব দিলে—স্তেপের মাঠে জনমনিষ্যি নেই। এখন তো চাষের মরশুম নয়। আমি একটু ঘুমোই কৃসিনিয়া, তুমি ঘোড়াগুলোকে ছাখো। তারপর তুমিও ঘুমিয়ে পাড়ো। না ঘুমিয়ে শরীরটা আমার খারাপ লাগছে। আজ চারদিন হল··· পরে কথা হবে'খন।

—ঘুমোও গ্রিশা, ভালো করে ঘুমিয়ে নাও!

গ্রিগরের ওপর ঝুঁকে ওর কপাল থেকে আলগোছে একগাছি চুল সরিয়ে দেয় আকসিনিয়া, তারপর ঠোঁট দিয়ে আস্তে করে ছোঁয় ওর গাল। ফিসফিস করে বলে :

—আমার আদরের গ্রিশা, কত চুল পেকেছে তোমার! তাহলে তুমি বুড়ো হচ্ছ বল? অথচ এই তো মাত্র সেদিনও ছিলে ছেলেমানুষ···।—একটা ম্লান করুণ হাসি হেসে গ্রিগরের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

ঠোঁট জুটো সামান্য একটু খুলে গ্রিশা ঘুমোচ্ছে। এক ছন্দে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। চোখের কালো পাতা একটু একটু কাঁপে, কোণের দিকটা রোদ পড়ে সাদাটে দেখায়। ওপরের ঠোঁটটা নড়ে উঠতে ওর ঘননিবদ্ধ সাদা দাঁতগুলো চোখে পড়ে। আরো কাছ থেকে ওকে এবার লক্ষ্য করছে আকসিনিয়া। গত ক'মাস আলাদা থাকার সময় অনেকখানিই পরিবর্তন হয়েছে ওর চেহারায়, বুঝতে পারে বেশ. ওর প্রিয় মানুষটির কপালের গভীর রেখায়, মুখের ভাঁজে আর গালের উঁচু হাড়ে একটা কঠোর, প্রায় নিষ্ঠুর

অভিব্যক্তি। এই প্রথম যেন আকসিনিয়ার মনে হল ও নিশ্চয় লড়াইয়ের মাঠে বড় ভয়ঙ্কর, ভয়ঙ্কর ঘোড়ার পিঠে, আর উন্মুক্ত তলোয়ার হাতে। চোখ নামিয়ে নিয়ে গ্রিগরের প্রকাণ্ড পেশী-কঠিন হাতদুটোর দিকে তাকিয়ে কোনো কারণে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে আকসিনিয়া।

খানিক বাদে নিঃশব্দে উঠে ও বনের ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে ওধারে চললে। শিশিরভেজা ঘাসে ঘাগরাটা ভিজে যাবে বলে উঁচু করে ধরেছে। কাছে-পিঠেই কোথাও একটা ছোট নদী কুলকুল করে পাথর নুড়ি ডিঙিয়ে চলেছে। আকসিনিয়া নেমে এলো জলের ধারে। পাড় বরাবর চ্যাপটা হাল্কা সবুজ শেওলা-ধরা নুড়ি। ঠাণ্ডা ঝরণার জল খেয়ে হাত-পা ধুয়ে ওড়না দিয়ে রাঙা মুখখানা বেশ করে মুছে ফেললে আকসিনিয়া। ঠোঁটের ওপর ক্ষীণ হাসিটুকু লেগেই আছে! চোখদুটো খুশিতে ঝিকমিক করছে। আবার এসেছে গ্রিগর ওর কাছে! আবার বুঝি কোন্ অজানা ওকে হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে আসন্ন সুখের রাজ্যে। অনেক বিনিদ্র রাত অনেক চোখের জল ফেলে কাটিয়েছে আকসিনিয়া। গত কয়েক মাসে বহু দুঃখ সে সয়েছে। গতকালও বাগানে গিয়েছিল। পড়শিদের আলুক্ষেতে মেয়েরা আলু তুলতে তুলতে গান গাইছিল। করুণ সে গান। শুনতে শুনতে ব্যথায় মোচড দিয়ে উঠছিল ওর বুকের ভেতরটা। অনিচ্ছা সত্বেও শুনেছে গানটা :

ওগো বলাকা, ঘরের পানে মেলেছ পাখা,
সাঙ্গ করেছো কমল-বনে খেলা ?
সিনান করেছো সাথীরে লয়ে মেলা ?
আমি বিরহিনী কেঁদেছি শুধুই দুয়ারে একা ?

এ গান গাইছিল কোনো রমণী তার আপন ভাগ্যহত জীবনের খেদ জানিয়ে, শুনে আকসিনিয়া হারিয়ে ফেলেছিল আত্মসংযম। চোখের জল উপচে পড়েছিল কোনো বাধা না মেনে। কাজের মধ্যে নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিল, হৃদয়ে আকস্মিক জেগে ওঠা তীব্র আকুতি দমন করবার চেষ্টায়। কিন্তু তবু বারবার চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপ্সা হয়ে এল। সে চোখের জল আলুগাছের সবুজ পাতাতেও পড়েছে, পড়েছে ওর অসহায় হাতদুটোতে। খানিকক্ষণ দেখতে পায়নি কিছু। কাজ করতে পারেনি কিছু। কোদাল ফেলে দিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়েছে। অবশেষে দুহাতে মুখ ঢেকে বাঁধনহারা কান্নায় ছেড়ে দিয়েছে নিজেকে।

গতকালও নিজের অভিশপ্ত জীবনটাকে নিয়ে আক্ষেপ করেছে, মেঘলা দিনের মতোই বিমর্ষ করুণ মনে হয়েছে আশেপাশের সব কিছু। কিন্তু আজকের পৃথিবী উজ্জ্বল, জয়গানে মুখর, বর্ষণান্ত গ্রীষ্মদিনের মতো। উদীয়মান সূর্যের তির্যক কিরণে স্ফুলিঙ্গ-লাল ওকপাতাগুলোর দিকে

অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে আকসিনিয়া ভাবলে—আমরাও জীবনের সন্ধান পেয়ে যাব।

ঝোপের কাছাকাছি যে-সব জায়গায় রোদের ফালি পড়েছিল সেখানে নানাবর্ণের সুগন্ধ ফুল ফুটে উঠেছে। আকসিনিয়া একরাশ ফুল তুলে ফেললে। গ্রিগরের কাছাকাছি সাবধানে বসে মালা গাঁথতে শুরু করলে সে যৌবনের দিনগুলোর কথা ভেবে। মালা গাঁথা হল, বিচিত্র বর্ণের সুন্দর একখানি মালা। নিজেই খানিকক্ষণ তারিফ করে মালাটার মধ্যে কয়েকটা কাঁটা-গোলাপলতার ফুল বসিয়ে দিলে। তারপর সেটাকে রেখে দিলে গ্রিগরের মাথার কাছে।

বেলা ন'টা নাগাদ ঘোড়ার ডাকে ঘুম ভেঙে যায় গ্রিগরের। সঙ্গে সঙ্গে সচকিত হয়ে ও বন্দুকের জন্য হাত বাড়ায়।

আকসিনিয়া শান্তকণ্ঠে বলে—কেউ নেই এখানে। ভয় কীসের।

চোখ রগড়ে ঘুমচোখে হাসে গ্রিগর।

—খরগোশের মতো কান খাড়া করে থাকা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। ঘুমোই, কিন্তু ঘুমের মধ্যেও একচোখ খুলে দেখি, সামান্য আওয়াজে ভড়কে যাই ··এ অভ্যেস কাটিয়ে উঠতে অনেক সময় লাগবে, খুকি! তা, অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি, না?

—নাঃ। আরো খানিকক্ষণ ঘুমোতে চাও?

—আসলে আমার পুরো ঘুমটা দরকার ক্লান্তি কাটিয়ে ওঠার জন্য। আগে বরং প্রাতরাশ সেরে নেয়া যাক্। আমার ঝুলিতে রুটি আছে, ছুরি আছে। তুমি ওগুলো আনো. আমি গিয়ে ঘোড়াগুলোকে জল দিই।

উঠে দাঁড়িয়ে জোব্বাকোটটা খুলে আড়মোড়া ভাঙে গ্রিগর। রোদ এখন চড়া হয়ে উঠেছে। দমকা হাওয়ায় গাছের পাতাগুলো শিউরে ওঠে, বনের মর্মরে ঢাকা পড়ে ছোট নদীটার কলগান।

নদীর জলে নেমে গ্রিগর পাথর আর ডাল-পালা দিয়ে ছোট একটা বাঁধ তৈরি করে। তলোয়ার খুঁচিয়ে মাটি তুলে পাথরের মাঝের ফাঁকগুলো ভরাট করে ফেলে। তারপর বাঁধের পেছনে জল নেমে গেলে ঘোড়াগুলোকে নিয়ে আসে জল খাওয়াতে। মুখ থেকে লাগাম-লোহা খুলে ওদের ঘাস খেতে ছেড়ে দেয় এবার।

খেতে বসে আকসিনিয়া বললে:

—এখান থেকে আমরা যাব কোথায়?

—মরোজভ্স্কি। প্লাতফ অবধি ঘোড়ায় চড়ে যাব। তারপর হেঁটে।

—ঘোড়াদের কী হবে?

—কোথাও ছেড়ে দেব।

—আপসোস গ্রিগর। কী চমৎকার ঘোড়াদুটো। ওই ছাইরঙাটার

দিকে তো ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেয়ে থাকতে হয়! আর এটাকেই ছেড়ে দিতে হবে? কোথায় পেয়েছিলে এটিকে?

—পেয়েছিলাম কোথায়…। বিষণ্ণ হাসি হাসল গ্রিগর—লুঠ করেছিলাম এক উক্রেইনীয়ের কাছ থেকে।

একটু চুপ করে থেকে সে ফের বললে:

—আপসোস হলেই বা কী, ওদের ফেলে যেতেই হবে। আমরা ঘোড়ার ব্যবসা করতে যাচ্ছি না।

—কিন্তু রাইফেল নিয়ে চলেছ কেন? ওটাই বা কী কাজে লাগবে তোমার? ঈশ্বর করুন কেউ না দেখতে পায়, নয়তো ওই নিয়ে বিপদ হবে আমাদের।

—রাতে আমাদের কে দেখবে? রেখেছি যদি দরকার হয়। না থাকলে কেমন ন্যাড়া ন্যাড়া লাগে। ঘোড়া ছেড়ে দেবার সময় রাইফেলও ত্যাগ করব। তাবপর আর দরকার হবে না।

প্রাতরাশের পর ওরা কোটটা বিছিয়ে শোয়। গ্রিগর বৃথাই চেষ্টা করছিল চোখের ঘুমটাকে ঠেকিয়ে রাখতে। আকসিনিয়া তখন একটা কনুইয়ে ভর দিয়ে কাত হয়ে ওকে শোনাচ্ছে তার বিরহ জীবনের কথা। গ্রিগব শুনতে পায় ওর একটানা গলার আওয়াজ দুর্দম তন্দ্রার ভেতর দিয়ে, ওর আর শক্তি নেই ভারি চোখের পাতাদুটো খুলে চাইবার। একেক সময় কোনো কথাই ওব কানে ঢোকে না। আকসিনিয়ার কণ্ঠস্বর যেন দূবে সরে যাচ্ছে, ক্রমেই ক্ষীণতর হয়ে একেবাবে মিলিয়ে গেল। চমকে জেগে ওঠে গ্রিগর, ফের চোখ বুজে আসে। ওর ইচ্ছাশক্তি আর পাল্লা দিতে পারছে না ক্লান্তির সঙ্গে।

আকসিনিয়া বলছিল:

—…ওরা তোমার জন্য অপেক্ষা করে থাকত আর বলত: বাবা কোথায়? আমি যতটা পারি করতাম ওদের জন্য, বকাবকি প্রায় করতামই না। ওরা ক্রমে আমাকে বেশ মেনে নিল, ভালও বাসল। দুনিযার কাছে অতো আর যাওয়া-আসা করত না। পলিউশ্‌কাটা ভারি শান্ত আর চুপচাপ। এটা-ওটা দিয়ে পুতুল গড়ে দিতাম ওকে, সেগুলো নিয়েই বসে থাকত টেবিলের নিচে। কিন্তু একদিন মিশাৎকা কাঁপতে কাঁপতে ছুটে এসেছিল রাস্তা থেকে। আমি বললুম—কী ব্যাপার? ও তো কেঁদে ফেলল, কী ভীষণ কান্না। বললে: অন্য ছেলেরা খেলবে না আমার সঙ্গে, বলে আমার বাবা ডাকাত। মা, সত্যি আমার বাবা ডাকাত? ডাকাত কী? আমি বোঝালুম: তোর বাবা ডাকাত নয় মোটেই। উনি…হতভাগ্য, এই যা। কিন্তু ওর প্রশ্নের আর শেষ নেই: কেন হতভাগ্য, হতভাগ্য মানে কী? আমি তো আর বোঝাতেই পারলুম না ব্যাখ্যা করে।

ওরা নিজেরাই আমাকে 'মা' বলে ডাকতে শুরু করেছিল, গ্রিশা! আমি ওদের শিখিয়েছি সে-কথা ভেবো না যেন। কিন্তু মিখাইল ওদের খুব ভালবাসত···সত্যিই আদর করত। আমার সঙ্গে সে কখনো কথা বলত না, দেখা হলেই মাথা ঘুরিয়ে চলে যেত। কিন্তু ওদের জন্য অনেকবার ভিয়েশেন্স্কা থেকে চিনি এনে দিয়েছে। প্রোখর তো খালি তোমার কথা বলে আর দুঃখু করে। বলে: ওই একটা ভালো মানুষ বিবাগী হয়ে গেল! আগের হপ্তায় এসে তোমার কথা বলতে বলতে ওর চোখে তো জলই এসে গিয়েছিল।···ওরা আবার আমার ঘর খানাতল্লাসী করেছে, কোণাঘুঁজি, ছাদ, সব জায়গায় খুঁজেছে হাতিয়ার।···

ওর গল্পের শেষ অবধি না শুনেই ঘুমিয়ে পড়েছিল গ্রিগর। মাথার ওপর কচি দেবদারু গাছটার পাতাগুলো হাওয়ায় সর্‌সর্‌ করছে। ওর মুখের ওপর সোনালি রোদের টুকরো খেলা করছে। আকসিনিয়া অনেকক্ষণ ধরে ওর বোজা চোখের পাতায় চুমু খেল, তারপর সেও পড়ল ঘুমিয়ে, গ্রিগরের হাতের ওপর গাল রেখে। ঘুমের মধ্যেও হাসছে আকসিনিয়া।

* *

রাতে ওরা যখন সুখোই খাত ছেড়ে বেরুল তখন চাঁদ উঠেছে আকাশে। ঘণ্টা কয়েক ঘোড়া চালিয়ে ওরা একটা টিলা ছেড়ে চিরা নদীর দিকে নেমে যেতে লাগল। বুনো জলার মধ্যে পানকৌড়ি ডাকছে, নদীর খাড়ির নলবনে ব্যাঙেরা গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে। দূরে কোথায় যেন কোঁচবক ডেকে উঠল ভরা গলায়।

নদীর পাড় ধরে ঘন ফলবাগান। আঁধার কুয়াশায় ভেতরে যাবার পথ যেন রুখে দাঁড়িয়ে আছে।

ছোট একটা সাঁকোর কাছে গ্রিগররা দাঁড়িয়ে পড়ল। মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধতা গ্রামে। গোড়ালি দিয়ে ঘোড়াটাকে একটু ছুঁয়ে ডানদিকে মোড় নিলে গ্রিগর। সাঁকো পার হওয়াটা তার তেমন পছন্দ হয়নি। থমথমে নিস্তব্ধতা ওকে কেমন যেন সন্দিগ্ধ করে তুলেছে। একটু ভয়ও পেয়ে গেছে। গ্রামের বাইরে এসে ওরা নদী পার হল। সবে একটা সরু গলিতে ঢুকেছে সঙ্গে সঙ্গে একটা খাতের ভেতর থেকে একটি লোক বেরিয়ে এল, পেছনে আরও তিনটি মূর্তি।

—থামো! কে যায়?

যেন আচমকা একটা ঘুষি খেয়ে চমকে উঠেছে গ্রিগর। ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল সে। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে চেঁচিয়ে জবাব দিলে: দোস্ত! তারপরেই ঘোড়া ঘুরিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে আকসিনিয়াকে চাপা গলায় বললে— উল্টোদিকে ফেরো! আমার পেছন পেছন এসো!

পাহারা ঘাঁটির চারটি সেপাইকে রাতের পাহারায় রেখেছিল শস্যসংগ্রাহক ফৌজী দল। তারা ধীরে সুস্থে এগিয়ে এল ওদের দিকে নিঃশব্দে। একজন থেমে সিগারেট ধরাবার জন্য দেশলাই জ্বালে। গ্রিগর আকসিনিয়ার ঘোড়ার ওপর সজোরে চাবুক কষিয়ে দিল। জানোয়ারটা ভড়কে উঠেই তীব্র বেগে ছুটে চলল। নিজের ঘোড়াটার কাঁধ বরাবর ঝুঁকে গ্রিগর সেটাকেও ছুটিয়ে দিল পেছু পেছু। পর পর কয়েকটি অস্বস্তিকর মুহূর্ত একেবারে নিস্তব্ধ। তারপরেই জেগে উঠল এলোমেলো বন্দুকের গর্জন, অন্ধকারের বুক চিরে আগুনের শিখার ঝলক। গ্রিগর শুনতে পেল বুলেটের জলন্ত আর্তনাদ আর একটানা একটা চিৎকার :

—হাতিয়ার সামাল!

নদী থেকে প্রায় দুশো গজ দূরে এসে গ্রিগর ছাইরঙা ঘোড়াটাকে ধরে ফেলল। লম্বা লম্বা টানা পা ফেলে ছুটছিল ঘোড়াটা। কাছাকাছি এসে গ্রিগর চেঁচিয়ে বলল আকসিনিয়াকে :

—মাথা নিচু করো, কৃসিনিয়া, মাথা নিচু!

কিন্তু আকসিনিয়া ঘোড়ার লাগাম টেনে পিছনদিকে হেলে একদিকে কাত হয়ে পড়েছে। গ্রিগর কোনোরকমে তাকে ধরে ফেলল, নয়তো বোধহয় পড়েই যেত।

ভাঙা গলায় গ্রিগর বললে—জখম হয়েছ নাকি? কোথায় লেগেছে গুলি? কথা বলো!

আকসিনিয়া নির্বাক। ক্রমেই আরো বেশী করে গ্রিগরের হাতের ওপর ঝুঁকে পড়ছে সে। ঘোড়া চালাতে চালাতেই ওকে কাছে টেনে নিয়ে গ্রিগর হাঁপাতে হাঁপাতে চাপা গলায় বললে :

—ঈশ্বরের দোহাই! একটা কথা বলো। কী হল তোমার?

কিন্তু নির্বাক আকসিনিয়ার মুখ থেকে একটা কথা বা একটু গোঙানিও শুনতে পেল না গ্রিগর।

গ্রাম থেকে মাইল দুয়েক দূরে গিয়ে হঠাৎ ও রাস্তা ছেড়ে ঘুরে একটা খাতের দিকে এগিয়ে গেল। নিজে ঘোড়া থেকে নেমে আকসিনিয়াকেও নামিয়ে নিল সে। আলগোছে তাকে মাটিতে শুইয়ে দিল।

আকসিনিয়ার গরম জামা খুলে পাতলা সুতীর ব্লাউজ আর জামাটা বুকের কাছে পড়্‌পড়্‌ করে ছিঁড়ে ফেলল, হাতড়ে খুঁজতে লাগল জখমটা। বাঁ দিকে কাঁধের হাড় ফুঁড়ে বুলেট ঢুকেছিল, হাড় চূর্ণ করে ওপাশে ডান কণ্ঠার হাড় তেরছা করে ভেদ করে বেরিয়ে গেছে। রক্তাক্ত কাঁপা হাতে ব্যাণ্ডেজের কাপড় আর ব্যাগ থেকে পরিষ্কার শার্টখানা বের করল গ্রিগর। আকসিনিয়াকে উঁচু করে ওর পিঠের দিকে নিজের হাঁটু রেখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে শুরু করে দিল জখমটার ওপর। কণ্ঠার হাড়ের তলা দিয়ে ঝিনিক দিয়ে রক্ত ঝরছিল।

সেটাকে প্রাণপণে বন্ধ করার চেষ্টা করতে লাগল। শার্ট আর ব্যাণ্ডেজের টুকরো দেখতে দেখতে ভিজে লাল হয়ে উঠল। ওর আধখোলা মুখের ভেতর থেকেও রক্ত গড়াতে শুরু করেছিল, ফেনার বুদ্বুদের মতো উঠে গলার কাছে ঘড়ঘড় করতে লাগল। শঙ্কায় বিমূঢ় হয়ে গ্রিগর অবশেষে বুঝতে পারল সব শেষ হয়ে গেছে। ওর জীবনে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যা ঘটতে পারত তাই ঘটে গেছে!

খাড়াই ঢাল বেয়ে, ঘাসের ওপর পায়ে-হাঁটা সরু পথটা ধরে সে সাবধানে এগিয়ে চলল খাতের ভেতরের দিকে। কোলে আকসিনিয়া। ওর কাঁধের ওপর আকসিনিয়ার মাথাটা অসহায়ভাবে এলিয়ে পড়েছে। কানে আসছে আকসিনিয়ার ডুকরে-ওঠা শিসের শব্দের মতো নিঃশ্বাস। টের পাচ্ছে উষ্ণ রক্ত ওর শরীর থেকে মুখ বেয়ে বেরিয়ে এসে নিজের বুকখানা ভিজিয়ে দিচ্ছে। ঘোড়া দুটোও পেছু পেছু আসছিল খাতের ভেতর। ফোঁস ফোঁস করে, লাগাম-লোহা বাজিয়ে ওরা সরস ঘাস চিবোতে শুরু করেছে।

ভোর হবার খানিক আগে গ্রিগরের কোলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে আকসিনিয়া। ওর জ্ঞান আব ফিরে আসেনি মরার আগে। নিঃশব্দে ওর ঠোঁটে চুমু দিল গ্রিগর। ঠাণ্ডা, রক্তের নোন্‌তা স্বাদ সে ঠোঁটে। সাবধানে ওকে নিচু করে ঘাসের ওপর শুইয়ে দিয়ে গ্রিগর উঠে দাঁড়াল। একটা অজ্ঞাত শক্তি ওর বুকের ওপর আঘাত হেনেছে। চিত হযে পড়ে গিযেছিল গ্রিগর কিন্তু পবক্ষণেই সভয়ে লাফিয়ে উঠল। আবার পড়ে গেল, সজোরে আঘাত লেগে ঠুকে গেল ওর মাথাটা একটা পাথরেব ওপর। তাবপব হাঁটু গেড়ে উঠে না বসেই ও তলোয়ারটাকে খাপ থেকে খুলে নিল। একটা কবর খুঁড়তে শুরু কবল সেই অবস্থাতেই। মাটি ভিজে আর নবম। খুব তাড়াতাড়ি হাত চালাচ্ছিল গ্রিগর, কিন্তু আবার ওব গলাটা যেন সজোবে কেউ টিপে ধরেছে, ভালো করে নিঃশ্বাস নিবার জন্য গলার কাছে বোতামটা খুলে ফেলল সে টান দিয়ে। ভোবের টাটকা বাতাসে ওর ঘামভেজা গা-টা ঠাণ্ডা হয়ে গেল, তারপর আর কঠিন মনে হল না কাজ করতে। হাত দিয়ে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে তুলতে লাগল, তলোয়ারও বিশ্রাম নিল না এক মহূর্ত। কিন্তু ওর কোমর অবধি কবরের গর্ত খুঁড়তে অনেক সময় লেগে গেল।

প্রভাতের উজ্জ্বল আলোয় আকসিনিয়াকে কবর দিলে গ্রিগর। আকসিনিয়ার মৃত্যুপাণ্ডুর অথচ কাল্‌চে হাত দুটো বুকের ওপর ভাঁজ করে দিলে, মুখের ওপর ঢেকে দিলে ওর ওডনাখানা, পাছে ওর আধ-খোলা, আকাশের দিকে নিবদ্ধ উজ্জ্বল চোখদুটোর ওপর মাটি এসে না পড়ে। তারপর গ্রিগর বিদায় নিলে, মনে মনে এই দৃঢ় ধারণা নিয়ে যে ওরা বেশীদিন বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে না উভয়ের কাছ থেকে

ধৈর্য সহকারে হাতের তেলো দিয়ে ভিজে হলদে মাটি চেপে চেপে দিলে ও

ঢিবিটার ওপর। কবরের পাশে হাঁটু গেড়ে অনেকক্ষণ বসে রইল মাথা নিচু করে। শরীরটা ওর অল্প অল্প দুলছিল।

এখন তো আর ওর তাড়াহুড়ো নেই। সবই শেষ হয়ে গেল।

তপ্ত হাওয়ার ধোঁয়াটে কুয়াশা ভেদ করে পূর্ব দিকে পাহাড়ী খাতের ওপাশ থেকে সূর্য উঠছে। গ্রিগরের মাথার পাকা চুলের ওপর সূর্যের রূপোলি কিরণ এসে পড়েছে। সে কিরণ চলকে পড়েছে ওর ফ্যাকাশে অভিব্যক্তিহীন নিথর মুখমণ্ডলের ওপরেও। যেন একটা যন্ত্রণাকর নিদ্রা থেকে উঠে গ্রিগর মাথা তুলে দেখল ওপরের কালো আকাশটা, আর চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বল মার্তণ্ডের কালো চক্রটা।

॥ নয় ॥

বসন্তের শুরুতে যখন তুষার হয় অদৃশ্য আর শীতকালের বরফচাপা ঘাসগুলো শুকনো হয়ে ওঠে, তখন স্তেপের প্রান্তরে জ্বলে দাবানল। হাওয়ার টানে স্রোতের মতো এগিয়ে চলে আগুনের শিখা, লোভীর মতো গ্রাস করে শুকনো ফক্সটেল ঘাস, লেলিহান জিভ মেলে থিস্‌ল্ ঘাসের উঁচু ডাঁটিগুলোর দিকে, মাগওয়ার্ট-এর বাদামি মাথাগুলো ডিঙিয়ে যায় নিচু জমিতে ছড়ানো থাকে বলে। তারপর স্তেপের মাঠে ভেসে বেড়ায় পোড়া ফাটা মাটির ঝাঁঝালো অঙ্গারগন্ধ। সর্বত্র এখন কচি ঘাস উজ্জ্বল শ্যামল শোভা নিয়ে এসেছে, অসংখ্য ভারুইপাখি নীল আকাশে ডানা ছড়ায়, দূরাগত বলাকারা পুষ্টিকর তৃণদলের মধ্যে আহার্যের সন্ধান পায়। বাস্টার্ড পাখিরা গ্রীষ্মদিনের বসবাসের আয়োজন করে তাদের বাসা বানিয়ে। কিন্তু স্তেপের দাবানল যেখানেই ছড়িয়েছে সেখানেই মরা পোড়া মাটি অলক্ষুণে কালো। কোনো পাখি সেখানে বাসা বাঁধে না, জানোয়াররা এড়িয়ে চলে, শুধু জোরালো খরগামী বাতাসই সেখানকার অতিথি। কপোতধূসর ছাই আর কালো ঝাঁঝালো ধুলো নিয়ে স্তেপের দূরতম প্রান্তে ছড়িয়ে দেয় সে বাতাস।

আগুনে পোড়া স্তেপে মাটির মতো গ্রিগরের জীবনও পুড়ে কালো। যা কিছু ওর কাছে ছিল প্রিয় তার সবটুকু থেকেই বঞ্চিত হয়েছে সে। নির্মম

মৃত্যু ওর কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে সব, বিনষ্ট করেছে সমস্ত কিছু। শুধু বেঁচে রয়েছে ছেলেমেয়ে দুটো। আর সেও এখনও মাটি কামড়ে পড়ে আছে যেন, ওর এই ভগ্ন জীবন তার নিজের কাছে অথবা আর কারুর কাছে কতই মূল্যবান!

আকসিনিয়াকে কবর দিয়ে তিনদিন নিরুদ্দিষ্ট ভাবে ঘুরে বেড়াল গ্রিগর স্তেপের মাঠে মাঠে। কিন্তু তবু বাড়ি অথবা ভিয়েশেন্স্কা কোথাও সে গেল না আত্মসমর্পণ করতে। চারদিনের দিন, উস্তখপেরস্ক জেলার এক গ্রামে ঘোড়াদুটোকে ছেড়ে দিয়ে সে ডন পেরিয়ে পায়ে হেঁটে চলল স্লাশেভ্স্কির এক বনের দিকে। এখানেই বনের ধারে গত এপ্রিল মাসে ফোমিনের দলবল প্রথম জবরদস্ত ঘা খেয়ে গিয়েছিল। সেই এপ্রিলেই ও শুনেছিল যে অনেক ফেরারী নাকি বনের ভেতর আশ্রয় নিয়েছে। তাই ওদের কাছেই চলল গ্রিগর, ফোমিনের কাছে ফিরবার কোনো বাসনাই ওর ছিল না।

প্রকাণ্ড বনের ভেতর বেশ কদিন ঘুরে বেড়াল। খিদেয় ওর পেট জ্বলছে কিন্তু কোনো মানুষের বসতিতে যাবার কথা ও যেন ভাবতেই পারে না। আকসিনিয়ার মৃত্যুতে ওর সহজাত বুদ্ধি যেন হারিয়েছে। আগের সেই সাহসও নেই। সামান্য একটা ডাল ভাঙা, গভীর বনের ভেতর পাতার মর্মর অথবা কোনো রাতের পাখির আচমকা চিৎকার শুনে ভয়ে ওর প্রাণ আড়ষ্ট হয় যেন। বুনো স্ট্রবেরীর কাঁচা ফল ছোট-ছোট বুনো ব্যাঙের-ছাতা আর হ্যাজেল ঝোপের পাতা খেয়ে বেঁচে আছে। ভয়ানক রোগা আর দুর্বল হয়ে গেছে সে। পঞ্চম দিনের শেষে ফেরারীরা ওকে বনের মধ্যে পেয়ে নিজেদের আড্ডায় ধরে নিয়ে গেল।

দলে ওদের সাতজন। সবাই স্থানীয় গ্রামের বাসিন্দা। গেল বছরের শরৎকাল থেকে বনে বসবাস করছে, যাতে পল্টনে ভর্তি না হতে হয়। বনের ভেতর মাটি খুঁড়ে মস্ত আস্তানা গড়েছে, বাড়ির মতোই স্বাচ্ছন্দ্য সেখানে। বিশেষ কিছুর অভাব নেই। রাতে প্রায়ই ওরা নিজেদের পরিবারদের সঙ্গে দেখা করতে যায়, ফিরে আসে জোয়ার, ভুট্টা, রুটি, ময়দা, আলু নিয়ে। আর স্টুয়ের জন্য মাংস পেতেও বড়ো অসুবিধে হয় না। যে সব গাঁয়ে ওদের চেনে না সেখান থেকে প্রায়ই এক আধটা ভেড়া চুরি করে আনা হয়।

ফেরারীদের একজন বারো নম্বর কসাক রেজিমেন্টে কাজ করেছিল। সে গ্রিগরকে চিনতে পারল। তাই আর বেশী উচ্চবাচ্য না করে ওরা দলের মধ্যে নিয়ে নিল গ্রিগরকে।

দুঃসহ অন্তহীন দিনগুলো। গ্রিগর তারিখ গুনতেই ভুলে গেছে। অক্টোবর মাস পর্যন্ত কোনো রকমে বনের মধ্যে কাটিয়ে দিল সে, কিন্তু শারদ

বর্ষার মরশুম শুরু হয়ে যখন শীত এসে পড়ল তখন ওর মনের মধ্যে জাগল ছেলেমেয়েদের দেখার তীব্র বাসনা। একটা নতুন অপ্রত্যাশিত আবেগ এল নিজের দেশ গাঁ দেখবার।

সময় কাটাবার জন্য দিনের পর দিন তক্তপোষে বসে ও কাঠ কুঁদে চাম্‌চে বানায়। কাঠের পিরিচের তলা ঘষে নিচু করে, নরম পাথর দিয়ে সুকৌশলে মানুষ জন্তু ইত্যাদির খেলনায় মূর্তি তৈরি করে। সব চিন্তা মাথা থেকে জোর করে সরিয়ে রাখে, বুকের মধ্যে জেগে উঠতে দিতে চায় না সেই নির্মম আকৃতি। দিনের বেলায় ওর চেষ্টা অবশ্য সফল হয়। কিন্তু শীতের দীর্ঘ রাত্রিগুলোয় বহু স্মৃতিবিজড়িত প্রবল আকৃতি ওর মনকে গ্রাস করে। খালি বালিশে মাথা এপাশ-ওপাশ করে, ঘুম আসে না চোখে। দিনের বেলায় কিন্তু আস্তানার বাসিন্দারা ওর মুখে একটি আক্ষেপের কথাও শোনে না। কিন্তু রাতে ও প্রায়ই জেগে উঠে কাঁপা হাতটা মুখের ওপর বুলোয়। চোখের জলে ভিজে থাকে ওর গাল, আর গেল ছ-মাসে ঘন হয়ে গজানো দাড়ি।

প্রায়ই স্বপ্নে দ্যাখে ছেলেমেয়েদের, আকসিনিয়াকে, ওর মাকে, আর সমস্ত প্রিয়জনদের যারা আর এ পৃথিবীতে বেঁচে নেই। এখন ওর গোটা জীবনটাই অতীতের; কিন্তু সে অতীতকে মনে হয় ক্ষণস্থায়ী অস্বস্তিময় নিদ্রার মতো। মাঝে মাঝে ও ভাবে—আর একবার যদি সেই পুরনো ঘরবাড়িগুলো দেখতে পেতাম, দেখতে পেতাম ছেলেমেয়েগুলোর মুখ। ব্যস্‌, তারপর নিশ্চিন্তে মরতে পারি।

বসন্তের শুরুর দিকে একদিন অকস্মাৎ চুমাকফ এসে হাজির। কোমর অবধি জলে ভেজা, আগের মতোই চঞ্চল আর ফুর্তিবাজ রয়েছে। আগুনের ধারে কাপড়-চোপড় শুকিয়ে একটু গরম হয়ে ও গ্রিগরের পাশে গদীটার ওপর বসে পড়ল।

—তুমি আমাদের ছেড়ে যাবার পর, গ্রিগর, আমরা কত যে ঘুরে মরেছি! প্রায় আস্ত্রাখান অবধি পৌঁছে গিয়েছিলাম। কালমিক স্তেপ অবধি।...সারা পৃথিবী চষে এসেছি! আর রক্তও যা ঝরিয়েছি ..তার আর লেখাজোখা নেই! লাল সেপাইরা ইয়াকফ য়েফিমোভিচের বউকে জামিন হিসেবে বন্দী করেছিল, ওর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিল। কিন্তু ও পাগল হয়ে হুকুম জারি করল যে কোনো লোক সোভিয়েত সরকারের গোলামি করছে তাকেই খুন করো! তখন আমরা শুরু করলাম খুন করতে: স্কুলের শিক্ষক, ডাক্তার, কৃষিবিদ্‌দের।..কাকে যে খুন করিনি শয়তানই জানে! কিন্তু এবার ওরা আমাদের সাবাড় করে দিল, একেবারে!—বলতে বলতে ঠাণ্ডায় আরো যেন শিউরে উঠছিল চুমাকফ—তিশানস্কার কাছাকাছি প্রথম আমরা জবর ঘা খেয়ে গেলুম। তারপর আরেকবার মার খেলাম সালোনিতে, হপ্তাখানেক আগে। রাত্তিরবেলায় তিনদিক থেকে আমাদের একেবারে ছেঁকে ধরেছিল।

কেবল চড়াইয়ের রাস্তা খোলা রেখেছিল আমাদের সামনে, কিন্তু সেখানেও ঘোড়াদের কোমর সমান বরফ। সকালের দিকে ওরা মেশিন গান চালাতে শুরু করল, ব্যস সেই হল দুর্ভাগ্যের শুরু। মেশিনগান চালিয়ে একেবারে কাটা ঘাসের মতো মাটিতে শুইয়ে দিল আমাদের। আমি আর ফোমিনের ছোট্ট ছেলেটা, এই দুজনই শুধু বেঁচে গেলাম কোনমতে। গত শরৎকাল থেকেই ফোমিন তার ছেলে দাভিদ্‌কাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরছিল। ইয়াকফ য়েফিমোভিচ (ফোমিন) নিজেও মারা গেল। নিজের চোখে মরতে দেখলুম তাকে। প্রথম বুলেটটা তার পায়ে লেগে হাঁটুর মালাইচাকি ভেঙে দিয়েছিল। দ্বিতীয় গুলিটা সোজা মাথার ওপরে। তিনবার ঘোড়া থেকে পড়ে গেল। প্রত্যেকবারই থেমে আমরা ওকে জিনের ওপর তুলে বসিয়ে দিই, খানিকটা গিয়ে আবার পড়ে যায়। তিন নম্বর বুলেটটা ওকে একেবারেই সাবাড় করে দিল, পাশের দিকে লেগেছিল গুলিটা। এরপর আমাদের হাল ছেড়ে দিতে হল। খানিকটা দূর এগিয়ে গিয়ে আমি ফিরে তাকালাম। দেখলাম দুজন ঘোড়সওয়ার সেপাই এর মধ্যেই ওর মাটিতে পড়ে থাকা দেহটার ওপর তলোয়ারের কোপ বসাচ্ছে।

গ্রিগর উদাসীনভাবে বললে—তা, ওই রকমটাই তো হবার কথা।

* * *

চুমাকফ রাতটা ওদের আস্তানাতেই কাটায়। সকাল বেলায় বিদায় নিতে আসে।

গ্রিগর বলে—চললে কোথায়?

হেসে চুমাকফ জবাব দেয়

—সহজ জীবনের খোঁজে। তুমিও আসবে নাকি?

—না, তুমিই যাও।

—ঠিক আছে। তোমার সঙ্গে আমার পোষাবেও না। তোমার কাজ হল পেয়ালা আর চামচে তৈরি করা, ও আমার পেশা নয়।—ঠাট্টার সুরে চুমাকফ বলে। টুপি খুলে সেলাম জানায় শান্তিপ্রিয় দস্যুরা। অতিথি-সেবা আর আশ্রয় দান করেছ বলে ঈশ্বর তোমাদের বাঁচিয়ে রাখুন। ঈশ্বর তোমাদের খোশমেজাজে রাখুন। বড্ডো একঘেয়ে জীবন তো তোমাদের। বনবাসী হয়ে থাকা। ও আবার একটা জীবন হল?

* * * *

চুমাকফ চলে যাবার পর আর একটি সপ্তাহ গ্রিগর ছিল বনের মধ্যে তারপর তৈরি হল যাবার জন্য।

ফেরারীদের একজন জিজ্ঞেস করলে—বাড়ি চললে?

আস্তানায় যে কদিন ছিল আজই প্রথম গ্রিগর একটু হাসল। ক্ষীণ হাসি।

—হ্যাঁ। বাড়িই চললাম।

বসন্তকাল পর্যন্ত সবুর করতে পারতে। মে দিবসের উৎসবে আমাদের ক্ষমা দেখাবেন সরকার। তখন আমরা সবাই ঘরে ফিরব।

—না। আমি আর অপেক্ষা করব না।—জবাব দিয়ে গ্রিগর বিদায় নিলে।

পরদিন সকালে তাতারস্কের মুখোমুখি ডনের ওপারে এসে হাজির হল গ্রিগর। দূর থেকে দাঁড়িয়ে ওর বাড়ির আঙিনাটা দেখতে পাচ্ছিল। আনন্দে উত্তেজনায় ও যেন একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। রাইফেলটা কাঁধ থেকে নামিয়ে নিল সে। বন্দুক সাফ করার শনের গাছিটা আর মেশিন তেলের ছোট বোতলটাও বের করল। কী কারণে যেন কার্তুজগুলো একবার গুণে দেখল। বারোটা থাপ আর ছাব্বিশটা খুচরো বুলেট রয়েছে।

খাতের গভীরে নদীর ধার থেকে বরফ সরে গিয়েছিল। সবুজ স্বচ্ছ জল ছলাৎ ছলাৎ করে পাড়ে ধাক্কা খেয়ে ছুঁচলো বরফগুলোকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। গ্রিগর ওর রাইফেল আর পিস্তলটা ছুঁড়ে ফেলে দিল ডনের জলে। তারপর কার্তুজগুলোও ভাসিয়ে দিয়ে জোব্বাকোটের কিনারায় হাত দুটো বেশ ভালো করে মুছে নিল।

গাঁয়ের ঠিক ওপারে নদীর বুকে বরফ নীল হয়ে জমে আছে, আধগলা, এখানে ওখানে গর্ত। মার্চমাসের বরফ। সেই বরফ ডিঙিয়ে ডন পার হয়ে এল গ্রিগর। লম্বা লম্বা পা ফেলে এগোলো নিজের বাড়ির দিকে। বেশ খানিকটা দূরে থাকতেই দেখতে পেল মিশাৎকাকে। ঘাটের সিঁড়ির দিকের ঢালু রাস্তার ওপর মিশাৎকা। নিজেকে সামলাতে না পেরে গ্রিগর ছুটে গেল ছেলের দিকে।

একটা পাথরের গা বেয়ে বরফের চাঙড় ঝুলে আছে। মিশাৎকা তাই ভেঙে ভেঙে ঢালু পাড়ের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছিল আর হাঁ করে চেয়ে দেখছিল নীল বরফের টুকরোগুলো কেমন গড়িয়ে গড়িয়ে যায়।

গ্রিগর ঢালু রাস্তা ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে গিয়ে ভাঙা গলায় ডাকলে: মিশেন্‌কা রে! ছোট্ট বাবা আমার!

মিশাৎকা সভয়ে একবার ওর দিকে চেয়ে চোখ নামিয়ে নিলে। এই দাড়িওয়ালা ভয়ংকর চেহারার মানুষটাই যে ওর বাবা তা ও আন্দাজ করতে পেরেছে।

ওক বনে রাতের পর রাত ছেলেমেয়েদের কথা স্মরণ করে কতো কিছুই মিষ্টি কথা মনে মনে আউড়ে রেখেছিল চুপি চুপি। এখন সে সবই ভুলে গেল। হাঁটু গেড়ে বসে ছেলের লাল্‌চেপানা ছোট্ট ঠাণ্ডা হাত দুখানি ঠোঁটে চেপে

ধরা গলায় শুধু বলতে পারল কটি মাত্র কথা :—আমার ছোট্ট বাবামণি ··
।ণিক আমার !

ছেলের হাতটি ধরলে এবার গ্রিগর। তীব্র আনন্দের আগুন জ্বালা শুকনো চোখদুটো লোভীর মতো ছেলের মুখের পানে রেখে সে প্রশ্ন করলে :

—কেমন আছিস বে তোরা ? পিসিমা, পলিউশ্‌কা,·· সব কেমন, ভালো আছে তো ?

তখনো বাপের মুখের দিকে না চেয়ে মিশাৎকা শুধু নিচু গলায় জবাব দিলে :

—দুনিয়া পিসি ভালো আছে কিন্তু পলিউশ্‌কা মরে গেছে ··ডিপ্‌থিরিয়া হয়ে। আর মিখাইল পিসে সেপাই হয়েছে···।

তারপব ··কতো বিনিদ্র রাতে যার স্বপ্ন দেখেছিল, সেই সামান্য ঘটনাটুকুই অবশেষে ঘটে গেল। নিজের ঘবের দরজাব সামনে দাঁড়াল গ্রিগব ছেলের হাতটি ধরে।

ওর জন্য জীবনের এইটুকুই সঞ্চয় বযে গিয়েছিল বুঝি শেষ অবধি—আবো কিছুকালেব জন্য যা তাকে দিতে পারবে মাটির সঙ্গে আত্মীযতার বন্ধন, শীতল সূর্যেব নিচে উজ্জ্বল এই বিশাল পৃথিবীর সঙ্গে আবো কিছুকালের যোগাযোগ।

শেষ